# “বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের আইনগত মর্যাদা ও উত্তরাধিকার”

তত্ত্বাবধায়ক
**ড. শওকত আরা হোসেন**
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক

মাহমুদা খান মলি

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

*Dhaka University Institutional Repository*

## প্রত্যয়নপত্র

মাহমুদা খান মলি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত "বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের আইনগত মর্যাদা ও উত্তরাধিকার" গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোন অংশ কোন প্রকার ডিগ্রী অথবা প্রকাশনার জন্য ইতিপূর্বে কোথাও দাখিল হয় নি। অভিসন্দর্ভটি কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেওয়ার জন্য আমি অনুমোদন করছি।

তারিখ:
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

তত্ত্বাবধায়ক

**ড. শওকত আরা হোসেন**
অধ্যাপক,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

*Dhaka University Institutional Repository*

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মানবজাতির অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে ইসলামই নারী জাতিকে দিয়েছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুমহান মর্যাদা। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে ইসলামের এ ভূমিকাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। এ প্রেক্ষাপটে আলোচ্য গবেষণায় ইসলামে নারীর সঠিক স্থান এবং তার পাশাপাশি বাংলাদেশসহ বহির্বিশ্বে নারীর অবস্থান মূল্যায়ন করা হয়েছে।

গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করণের জন্য প্রথমেই মহান রাব্বুল আলামীনের লাখো শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে শত প্রতিকূলতার ও চরম বিপর্যয় অবস্থার মধ্যেও এ কাজ সম্পাদনের তওফিক দান করেছেন। নানা সমস্যা এবং প্রতিকূলতার মাঝে গবেষণা কাজটি সমাপ্ত করা হয়েছে বলে এতে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক, সেজন্য প্রথমেই আমি সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

সন্দর্ভটি সমাপ্ত করণের জন্য আমি প্রথমেই আমার অন্তরের অন্তঃস্থল হতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষিকা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. শওকত আরা হোসেন যার সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া আমার গবেষণা কর্মটি সমাপ্তকরণে সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব ছিলো। যিনি গবেষণা কাজের প্রতিটি পর্যায়ে ধৈর্য্য সহকারে আমার সমস্যা দেখেছেন এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এর উৎকর্ষ সাধন করেছেন। তাঁর মূল্যবান সময় এ গবেষণাকর্মে ব্যয়ের জন্য আমি তার কাছে চির ঋণী। তাছাড়া আমি আমার গবেষণা কাজে সার্বিকভাবে সহযোগিতা পেয়েছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় সাবেক শিক্ষিকা ইউ.এ.বি. রাজিয়া আক্তার বানু। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা ও উৎসাহ দিয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মনোয়ার কবির এবং পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষিকা আনোয়ারা বেগম। আমি তাদের সবাইকে অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

আমার এ গবেষণা কর্ম সম্পাদনে ব্যবহার করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, উইমেন ফর উইমেন প্রভৃতি লাইব্রেরী। সকল লাইব্রেরীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী বৃন্দকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার গবেষণা কাজে সহযোগিতা করার জন্য। তাছাড়া কম্পিউটার কম্পোজের ক্ষেত্রে যারা খুব যত্ন সহকারে সংক্ষিপ্ত সময়ে আমার অভিসন্দর্ভটি মুদ্রণ করেছেন তাদের কাছেও আমি ঋণী।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা-আলী হোসেন খান, মাতা-আফরোজা হোসেন খান, আমার শ্বাশুড়ি মা-মনোয়ারা খাতুন এবং আমার জীবন সঙ্গী জনাব সৈয়দ মমিনুজ্জামান লিয়নকে। যাদের সার্বক্ষণিক উৎসাহ উদ্দীপনা আমাকে নিরলসভাবে কাজ করার শক্তি যুগিয়েছে সমস্যা সংকুল পরিবেশে। বিশেষত, আমার পরম শ্রদ্ধেয় নানু-রওশন আরা খান, খালা-মাসুদা ইসলাম খান, ছোট ভাই-ইকবাল হোসেন খান টিটু এবং তারেক হোসেন খান রাসেল তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার চাচী শ্বাশুড়ি-খুরশিদা আখতার, চাচা শ্বশুর-সৈয়দ শহীদুজ্জামান এবং ননদিনী-লিয়া আপু ও শচীর প্রতি। যারা আমার গবেষণাকালীন এবং থিসিস লিখার সময়ে একমাত্র শিশুপুত্র সৈয়দ আফরাজ্জামান মানাফকে সময় দিয়েছে। আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ জানাচ্ছি আমার শিশুপুত্রকে যার মুখ ভরা হাসি আমার লেখার উৎসাহ যুগিয়েছে।

সবশেষে এ গবেষণা কাজটি বর্তমান চলমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ক্ষেত্রে কিছুটা অবদান রাখতে পারলে আমার কষ্টার্জিত এ শ্রম স্বার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
এপ্রিল ২০১৪

মাহমুদা খান মলি

*Dhaka University Institutional Repository*

# এ্যাবষ্ট্রাক্ট

## “বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের আইনগত মর্যাদা ও উত্তরাধিকার”

**তত্ত্বাবধায়ক**
**ড. শওকত আরা হোসেন**
**অধ্যাপক**
**রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ**
**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।**

**গবেষক**
**মাহমুদা খান মলি**
**রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ**
**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।**

*Dhaka University Institutional Repository*

সমস্যার বিবরণ ঃ

আর্থ-সামাজিক এবং তথ্য প্রযুক্তির যুগে নারীর সমান অংশগ্রহণের বিষয়টি নারী অগ্রগতির জন্য একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীকে সম্পৃক্তকরণের মূল হাতিয়ার হচ্ছে নারীর আইনগত মর্যাদা ও উত্তরাধিকার ভোগ। নারী ছাড়া এ সমাজ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল। মানব জাতির শুরু থেকে আমরা যে নারীকে পুরুষের জীবন সঙ্গিনীরূপে দেখতে পাচ্ছি, এ বিশ্বোত্তর কালের সেই সঙ্গিনীকে মানুষ অমর্যাদা করবে এ হতেই পারে না। যে পৃথিবীতে আমরা বাস করছি এটাও বেহেস্তেরই প্রতিকৃতি। এ পৃথিবীর নেয়ামত উপভোগ করার যে সুযোগ আমাদের হচ্ছে তাও তো নারীর দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। তাই নারী বিশ্ব মানবের পৃথিবীতে আনয়নকারিনীর মর্যাদার পাত্রী। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এমন একটি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে মানুষ নিজে স্বার্থসিদ্ধির জন্য সর্বক্ষেত্রেই বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে।

সৃষ্টির শুরু থেকে চলে আসা এ নর-নারীর স্রোতধারা যুগে যুগে প্রমাণ করেছে যে, এরা একে অন্যের ওপর দারুনভাবে নির্ভরশীল, একের জন্য অন্য জন একান্ত অপরিহার্য। সৃষ্টির সেরা মানব জাতির রক্ষণ, বর্ধন ও সম্প্রসারণের জন্য নর ও নারীর একত্রীভূত প্রচেষ্টাই কাজ করছে সর্বত্র। কাজেই বলতে হয় সৃষ্টির পূর্ণতার কাজে নর ও নারী উভয়েরই দান সমান। একজনে যখন অন্য জনের সম্পর্ণূ মুখাপেক্ষী তখন উভয়েরই প্রতি উভয়ের প্রেম-প্রীতি, আকর্ষণ ও মর্যাদাবোধ স্বাভাবিক। আদিকাল থেকেই দেখা যায়, পুরুষ নারী অপেক্ষা দৈহিক শক্তিতে অগ্রনী। তাই পৃথিবীর চাক্ষুষ কৃর্তত্ব নেতৃত্ব পুরুষেরই ভাগে পড়েছে প্রায় সবখানি। কিন্তু একটু নিবিড়ভাবে দেখলে দেখতে পাবেন যে ঐ সকল কর্তৃত্ব নেতৃত্বের মধ্যেও নারী কাজ করেছে সব সময়। মোট কথা একজন আরেকজনের পরিপূরক। তাই কবি বলেছেন, পৃথিবীতে যা কিছু আছে অর্ধেক তা করেছেন নারী, অর্ধেক তার নর।

নারী ও পুরুষ অভিন্ন মানব সমাজের দুটি অপরিহার্য অঙ্গ। নর-নারী মিলেই মানব সমাজ পরিপূর্ণ হয়। পুরুষ মানবতার একাংশের প্রতিনিধি। অপর অংশের প্রতিনিধিত্ব করে নারী। নারী সমাজকে বাদ দিয়ে মানব সমাজ কল্পনাই করা যায় না। আলাহ তায়ালা রহমত ও দানের ব্যাপারে যেমন তার সৃষ্টির মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি, তেমনি তার বিধানে নারী-পুরুষের অধিকার ও মর্যাদার মধ্যেও কোন তারতম্য রাখেননি। মানবজাতির হেদায়াতের জন্য আলাহ তায়ালার মনোনীত জীবন বিধান হলো ইসলাম। ইসলাম একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের বিধান নারী পুরুষ সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। ইসলামী বিধান নারী-পুরুষ সকলের অধিকার ও মর্যাদা সমানভাবে নিশ্চিত করেছে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারী জাতি তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ইসলামের আগমনের মাধ্যমে নারী তার হারানো অধিকার ও মর্যাদা ফিরে পায়। ইসলাম চৌদ্দশত বছর পূর্বে নারীকে যে সকল অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে তা মহান আলাহর দেয়া বৈধ অধিকার, বিনা আন্দোলনে এবং বিভিন্ন অঙ্গনে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে। ধর্মীয় অধিকার, সামাজিক অধিকার, পারিবারিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, আইনগত অধিকারসহ সকল বিষয়ে ইসলাম নারীকে ন্যায্য অধিকার দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ইসলামের স্বর্ণযুগে নারীরা তাদের প্রতিভা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিল। ইসলাম সে যুগে নারী জাতিকে তার যথাযোগ্য অধিকার দিয়েছে। ইসলামের আবির্ভাবে নারী পেয়েছে ধর্মে-কর্মে, শিক্ষা-দীক্ষায় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে পুরুষের ন্যায় ন্যায্য অধিকার। নারী জাতির অধিকার, মর্যাদা ও স্বাধীনতার বিবরণ দিয়ে পবিত্র কোরআরনের পূর্ণ একটি সূরা (আন নিসা) তার জ্বলন্ত উদাহরণ। ইসলামের দেয়া নারীর এসকল অধিকার থেকে যদি কোন নারী বঞ্চিত থাকে, তবে তার জন্য সংশিষ্ট মুসলিম সমাজ দায়ী, ইসলাম নয়।

ইসলাম নারী জাতিকে শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণে ক্ষেত্রবিশেষ ছাড়া পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে। মানুষ হিসেবে নারী চিন্তায় ও কর্মে ভোগ করবে যুক্তিপূর্ণ স্বাধীনতা। শত শত বছরের ইসলামী বিধানকে আধুনিকতার নামে সেকেলে মনে করছে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক না হওয়ায় পাশ্চাত্যের প্রপাগন্ডায় মুসলিম সমাজের একটি অংশ জঘন্য অশীলতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাদের ধারণা ইসলাম তাদেরকে ঠকিয়েছে। পর্দার নামে তাদেরকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে। ইসলামী শিক্ষার অভাবে আজ তারা পথভ্রষ্ট হচ্ছে। মূলত: তাদের এ ধারণা বর্তমান মুসলিম সমাজের ইসলাম বিমুখ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার কাঠামো থেকে তৈরি হয়েছে। কেননা ইসলাম নারীর যে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রে তা অহরহ লঙ্ঘিত হচ্ছে। ইসলামী বিধান নারীকে কি কি অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে এ বিষয়ে সবাইকে সজাগ করানোর জন্যই এ গবেষণা কর্ম। "বাংলাদেশের মুসলিম নারীর আইনগত মর্যাদা ও উত্তরাধিকার" শীর্ষক গবেষণাকর্ম থেকে যদি বর্তমান বিশ্বের ধর্ম-বর্ণ, দলমত নির্বিশেষে সকল মানব সমাজ বিশেষ করে নারী সমাজ সামান্যতম উপকৃত হন এবং ইসলামী ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নূন্যতম জ্ঞানার্জন করতে পারেন তাহলে নিজেকে সার্থক মনে করব।

আলোচ্য গবেষণাকর্ম ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়াও ৬টি অধ্যায় রয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়কে বিষয়ভিত্তিক অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব ও পরবর্তী সভ্যতা ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মে নারীর অধিকার, মর্যাদা ও অবস্থান এবং বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের আইনগত মর্যাদা ও কর্তব্য আলাদা আলাদা অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এ গবেষণাকর্মে ইসলামী বিধানে নারীর আইনগত অধিকার, মর্যাদা ও উত্তরাধিকার এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করা

*Dhaka University Institutional Repository*

হয়েছে। এ গবেষণাকর্মে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর গভীর অধ্যায়নের মাধ্যমে ইসলামী বিধানে নারীর অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখে কোরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহ পেশ করা হয়েছে। কোরআনের ক্ষেত্রে আয়াতসমূহ উলেখ করে পাঠোদ্ধারের সুবিধার্থে আয়াত সমূহের অর্থ দেয়া হয়েছে। হাদীসের ক্ষেত্রে সিহাহ সিত্তার হাদীসসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে সিহাহ সিত্তাহ ছাড়াও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের হাদীস নেয়া হয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় হাদীসের এবারত সমূহ পরিহার করে অনুবাদ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে সর্বস্তরের মানুষসহ মুসলিম নারীর আইনগত মর্যাদা ও উত্তরাধিকার তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলামী ব্যবস্থা আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে, যখন সারা পৃথিবীর কোন অংশে নারীর উত্তরাধিকার তেমনভাবে স্বীকৃত হয়নি, সেই সময়ে নারীদের উত্তরাধিকারের অধিকার ঘোষণা করেছে। আলাহ তায়ালা বলেন, "পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, উহা অল্পই হউক অথবা বেশিই হউক, এক নির্ধারিত অংশ।"

বস্তুত নারীর কল্যাণে ইসলামী ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠতম অবদান হচ্ছে উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি। কন্যা, স্ত্রী এবং মাতারূপে তারা সব সময় "মীরাস" পায়। কোন সময়ই তারা বঞ্চিত হয় না। অবশ্য বিশেষ কারণে পুত্রের তুলনায় কন্যার এবং স্বামীর তুলনায় স্ত্রীর এবং ভাইয়ের তুলনায় ভগ্নীর অংশ কম নির্ধারিত হয়েছে। কন্যা হওয়ার কারণে সে যুগে তাদের জীবন্ত পুঁতে ফেলা হত। সে যুগে ইসলাম নারীর জন্য যে সম্মান ও মর্যাদার কথা ঘোষণা করেছে তা ইসলামী ব্যবস্থার সর্বকাল উপযোগিতার এক অপূর্ব নিদর্শন। ইসলাম ঘোষণা করেছে যে, "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।"

এ দুনিয়ায় এমন আর কেউ নেই যার মর্যাদা মায়ের সমকক্ষ। সন্তানগণ যাতে তাদের মায়ের উপর যত্নবান হন সেজন্য আল-কোরআন স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তাদের সেই অসহায় দিনের কথা, যখন তারা শিশু ছিল। আলাহ তায়ালা বলেন, "আমি মানুষকে তাহার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি। তাহার জননী তাহাকে গর্ভে ধারণ করিতে ও তাহার স্তন্য ছাড়াইতে লাগে ত্রিশ মাস।"

ইসলাম অবরোধ প্রথাকে সমর্থন করেনি। ইসলামে নারী এবং পুরুষদের প্রতিও নির্দেশ আছে তার দৃষ্টিকে সংযত করতে এবং এমনভাবে নিজেকে উন্মুক্ত না করতে যাতে একে অপরের প্রতি প্রলুব্ধ হয়। অবশ্য এ নির্দেশের অর্থ এ নয় যে, নারী শুধু ঘরের চার দেয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে। কেননা আবদ্ধতার মধ্যে দৃষ্টি সংযত করার কোন প্রয়োজন নেই। একজন অবরুদ্ধ নারীর পুরুষকে উত্তেজিত করার অবকাশই বা কোথায়? ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় অবরোধ নেই, কিন্তু শালীনতা রক্ষার নির্দেশ আছে। সুন্দর, শালীন এবং সংযত জীবন যাপন করার জন্য ইসলাম বারবার তাগিদ দিয়েছে। ইসলামী ব্যবস্থায় বিবাহ একটি পবিত্র চুক্তি। নর ও নারীর মিলনে তাদের দাম্পত্য জীবন সুন্দর হোক, মধুময় হোক, ইসলামী ব্যবস্থার এটাই কাম্য। কিন্তু মধুময়তার পরিবর্তে যদি নিদারুন তিক্ততা নেমে আসে নর নারীর জীবনে, তবে সেই বিবাহ বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত। ইসলাম তাই বিবাহ বিচ্ছেদের বিধানও দিয়েছে। স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে, কিন্তু সে অধিকার তাকে প্রয়োগ করতে হবে সংযত ও সুচিন্তিত বিবেচনায়, ক্ষণিক উত্তেজনায় নয়। আর তালাক দিলেই স্বামীর সব দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে না, তাকে শোধ করতে হবে দেনমোহর এবং দিতে হবে ইদ্দতকালীন ঘোরপোষ। তালাক দেবার পরও স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে, আল-কোরআন এ কড়া নির্দেশও দিয়েছে। স্ত্রীরও অধিকার আছে বিবাহ ভঙ্গ করার, সে যা পেয়েছে তার বিনিময়ে সে বিবাহ ভঙ্গ করতে পারে।

নারীর সর্বাধিক অধিকার সংরক্ষণ এবং নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত বেইজিং বিশ্ব নারী সম্মেলনে তাই উলেখ করা হয় নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ধর্মীয় কোন প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে না। ১৬৯৯ সালে উলেখযোগ্য নারী ব্যক্তিত্ব মেরী ওলস্টোনক্রাফটকে তাই বলতে শোনা যায়, ব্যাখ্যা করতে দেখা যায়- সমাজে নারী-পুরুষ বৈষম্য প্রাকৃতিক কিংবা ধর্মীয় বিধান হিসেবে নয় বরং এটি মানুষের তৈরি বিধান।

**যথার্থতা ঃ**

আদিকাল থেকে বিশ্বের প্রায় প্রত্যেক দেশে নারী সমাজ পুরুষের কর্তৃত্বাধীন হিসেবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে। তাই সমগ্র বিশ্বে নারী সমাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার জন্য এবং নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সমাজবিজ্ঞানে একজন বিশেষজ্ঞ বলছেন যে, নারীর মর্যাদা বলতে একটি পরিবারে একজন নারীর ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং তার প্রতি পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কর্তৃক প্রদর্শিত সম্মানকে বোঝায়। এ সংজ্ঞানুযায়ী আমাদের সমাজে একটি পরিবার পুরুষদের তুলনায় নারীরা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা যেমন- জ্ঞান অনুসন্ধানের সুযোগ, অর্থনৈতিক উপাদানের উপর নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক অধিকার ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, নারীর আইনগত মর্যাদা এবং উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। গবেষণায় "নারীর মর্যাদার" এ সংজ্ঞাটিকে বাস্তবে রূপদানের জন্যই এ গবেষণার গরুত্ব ।

**গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ**

গবেষণা বলতে আমরা বুঝে থাকি সত্য অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। মূলত: এ গবেষণাকার্য হচ্ছে পুন: অনুসন্ধান, অপেক্ষাকৃত উন্নত পর্যবেক্ষণ ও বাড়তি জ্ঞান সংযোজন করার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা। "বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের আইনগত মর্যাদা ও উত্তরাধিকার"যা গবেষণার মূল বিষয়বস্তু। এ বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন হবে । পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মে আমাদের সমাজের নারীর অবস্থান এবং বহিঃ বিশ্বে নারী সমাজের তূলনামূলক আলোচনা করা হবে ।

ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে আমরা সবাই কম বেশি অবগত আছি। তবু এ ক্ষেত্রে পুন: অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা হয়েছে ইসলাম নারীকে কি কি অধিকার দিয়েছে? মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের নারীরা কি কি অধিকার ভোগ করছে? সেই সাথে দেখানো হবে তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে ইসলামে দেয়া অধিকার গুলোই বিশ্বের অন্যান্য ধর্ম এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেয়া অধিকারগুলোর চেয়ে অধিকতর কার্যকর এবং শান্তিপূর্ণ।

এ গবেষণাকর্মটি নিয়ে তেমন কোনো গবেষণা হয়নি, সেহেতু আমার মনে হয় এ গবেষণার মাধ্যমে মুসলিম নারীর আইনগত মর্যাদা ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতন হবেন মানুষ। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় যারা সম্পৃক্ত এবং আইন বা সংবিধান প্রণেতাগণ শুধু আইনের কাঠামোতে সীমাবদ্ধ না রেখে বস্তবে তার যথাযথ প্রয়োগ করবে এটাই গবেষণার উদ্দেশ্য। আমাদের সমাজের লোকেদের ইসলাম সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে ইসলামের নামে অনেক অপবাদ আরোপ করে বসে যার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামের সঠিক জ্ঞান থাকলে তারা এটা বলত না। এ ধরনের বিষয়গুলোর মধ্যে নারীর অধিকার একটি।

গবেষণায় দেখানোর চেষ্টা করেছি ইসলাম সত্য বিষয়ে ব্যাখ্যাকারী, পথ প্রদর্শনকারী শান্তিপূর্ণ জীবন বিধান তথা নারী অধিকার রক্ষায় উত্তম জীবন ব্যবস্থাপনা।

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে-

১। অনগ্রসর নারী সমাজকে তাদের আইনগত মর্যাদা এবং উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

২। মুসলিম নারীদের আইনগত মর্যাদা ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতন করা।

৩। বাস্তবে নারী কতটুকু এ অধিকার ভোগ করছে ?

৪। সর্বোপরি আইন প্রণেতা এবং রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ যাতে নারীর নিরাপত্তা এবং আইনী অধিকার আইনী কাঠামোতে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তবে প্রয়োগ করেন তার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

**গবেষণা পদ্ধতি ঃ**

গবেষণা পদ্ধতির মৌল উপাদান হলো গবেষণার বিষয়বস্তুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার-বিশেষণ করা। প্রকৃতভাবে যা পর্যবেক্ষণ করা হয় তার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই গবেষণা পদ্ধতি দ্বারা সামাজিক আচার-আচরণের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মৌলিক পদ্ধতিকে সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রচেষ্টা বহুকাল ধরে চলে আসছে। "বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের আইনগত মার্যাদা ও উত্তরাধিকার"- শীর্ষক গবেষণা কর্মটি একটি সামাজিক গবেষণাকর্ম। যেকোন বিজ্ঞানের অস্তিত্ব নির্ভর করে তার উদ্ভাবিত এবং ব্যবহৃত পদ্ধতির উপর। পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক মর্যাদা লাভের কারণ তাদের সঠিক ও যৌক্তিক পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সফলতা। সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণা কর্ম হিসাবে এ গবেষণা কর্মটিও বিশেষণ নির্ভর। গবেষণা সমস্যার প্রকৃতি, গবেষণার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও পরিধি বিবেচনা করে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার জন্য নিম্নে বর্ণিত তিনটি পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে-

**(ক) ঐতিহাসিক পদ্ধতি ঃ**

ঐতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে মানব সমাজে ধর্মের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও কার্যধারা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য অতীত সভ্যতা ও সামাজিক আচার বিধি প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করা হয়েছে । বর্তমান সমাজে নারীর আইনগত মর্যাদা ও ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার এবং মর্যাদার গতি-প্রকৃতি বিশেষণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে আমার এ গবেষণাতে। আমাদের বর্তমান সমাজের রীতি-নীতি, জীবন-যাপন পদ্ধতি প্রভৃতির মূল নিহিত রয়েছে অতীতে এবং সে অতীত উৎস যথোপযুক্ত অনুসন্ধানের মাধ্যমেই এসবের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রাক ইসলামী সময়ে নারীর অবস্থান এবং বর্তমান সময়ে নারীর অবস্থান পর্যালোনা করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি তুলনামূলক আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

**(খ) বর্ণনামূলক ঃ**

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির মত পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে মানুষ যেমনি ধর্মের অনুসরণ করে আসছে ঠিক তেমনি এর ভুল ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যাও হয়ে আসছে। কেউ হয়ত ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন অথবা সেটির ভুলভাবে অনুসরণ করেছেন সৎ উদ্দেশ্যে অথবা না জেনে। আবার কেউ কেউ এর ভুল ব্যাখ্যা করেছেন অসৎ উদ্দেশ্যে। অতএব একথা বলা যায় ধর্মের অপব্যবহার বা অসদ্ব্যবহার সকল যুগে ও সকল সময়ে হয়ে আসছে। নারীর আইনগত মর্যাদা ও ইসলামের রীতিবদ্ধ আইন আমার গবেষণাতে বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন সমাজের চিত্র তুলে ধরে বর্ণনার মাধ্যমে তথ্যের গুণগত দিক বিশেষণ করা হয়েছে। ইসলাম

পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী মানবিক আচার-আরচণ, জনগোষ্ঠী, সম্প্রদায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে জড়িত উপাদানসমূহ অনুসন্ধান করে এবং এগুলোকে বিশেষণ করে এবং সম্ভাব্য সকল দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বর্ণনা করা হয়েছে।

**(গ) বিশেষণমূলক পদ্ধতি ঃ**

ইসলামে নারীর মর্যদা স্বীকৃত একটি পন্থা । ইসলামই একমাত্র নারীকে মর্যদা দিয়ে উচ্চ মর্যদায় ভূষিত করেছে এটি গভীরভাবে বিশেষণ করলে দেখা যায় । আমার এ গবেষণাকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রীতিবদ্ধ, বস্তুনিরপেক্ষ বর্ণনা করে বিষয়বস্তুকে বিশেষণ করা হয়েছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিষয়সমূহের চিরাচরিত পুনশ্চ পরীক্ষা বা সমালোচনার দ্বারা তুলনামূলক ভাবে তা বিচার বিবেচনার মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে বিশেষণ করে রীতিবদ্ধ এবং বস্তুনিরপেক্ষ করা হয়েছে।

**তথ্য সংগ্রহ ঃ**

গবেষণা কর্মে প্রাথমিক উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহের জন্য মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের বঙ্গানুবাদ ও বাংলাতে লেখা সহী হাদীস গ্রন্থ আলোচনা করা হয়েছে। তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রের প্রাপ্ত ধর্ম, ইসলাম, ইসলামী আইন, বিশ্বকোষ, অভিসন্দর্ভ, জার্নাল-নিবন্ধ, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, প্রতিবেদন ইত্যাদি উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। দেশের ভেতরের লেখক এবং বহির্বিশ্বের লেখকদের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলী, এম.ফিল এবং পি.এইচ.ডি গবেষকদের বিভিন্ন গবেষণাকর্ম সর্বোপরি সিডও সনদের পর্যালোচনা ইত্যাদি মূলসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। উলে-খিত গ্রন্থাবলী ও প্রকাশনা থেকে গবেষণা বিষয়ক মৌলিক ধারণা লাভের সাথে সাথে তাত্ত্বিক ও কাঠামোগত জ্ঞানও লাভ করা সহজ হয়েছে।

**সীমাবদ্ধতা ঃ**

একজন নারী সব সময় কারো না কারো নিয়ন্ত্রণে থাকে। যেমন জন্মের পর পিতা-মাতার, বিবাহের পর স্বামীর এবং স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তানের উপর নির্ভরশীল হয়ে একজন নারীকে দিন যাপন করতে হয়। এ নির্ভরশীলতার কারণে তারা নিয়ন্ত্রিত। আর তাদের সম্পত্তি যাদের কাছে থাকে তাদের হাতে চলে যায়। যদি কোনো লোক একমাত্র মেয়ে কিংবা অধিক মেয়ে রেখে মারা যায় এবং ব্যক্তির কোনো পুত্র সন্তান না থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তির সকল সম্পত্তির মালিক হবে মেয়েরা। নারীরা মা, স্ত্রী এবং মেয়ে হিসেবে সম্পত্তি লাভ করলেও সম্পত্তি ভোগের ক্ষেত্রে আমরা এক বিরাট বৈষম্য দেখতে পাই। এ বৈষম্যের বিচারকদের অভিমত হচ্ছে- একজন নারী বিভিন্ন উৎস হতে সম্পত্তি লাভ করে। ফলে তাদের সম্পত্তির অংশ কম হয় না। এছাড়া একজন নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার নিজের নয়। সে অন্যের দ্বারা পোষিত হচ্ছে। সময়ের আবর্তে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। প্রায়ই দেখা যাচ্ছে- নারীদের আইনগত যে সুযোগ রয়েছে তারা সেটি ভোগ করতে পারছে না। ইসলাম সম্পত্তিতে নারীদের যে অধিকার প্রদান করেছে তা নানা কারণে ভোগ করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে নারীদের বিশেষত: নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসচেতনতা এবং গবেষণা কাজের প্রতি তাদের নেতিবাচক মনোভাব, তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ও সন্দেহ প্রবণতা, উত্তরাধিকার, যৌতুক ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সংকোচবোধ ও আশঙ্কা এবং অজ্ঞতা তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

**উপসংহার ঃ**

একটি দেশ তখনই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে, যখন দক্ষ ও জবাবদিহিতামূলক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি উক্ত সরকার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানের নারী পুরুষের সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণ ও কার্যকর প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব হবে। কেননা একটি দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী তথা নারী সমাজকে সুবিধা বঞ্চিত রেখে দেশের সুষম উন্নয়ন সম্ভব নয়। মোট কথা একটি দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর চাহিদা, আশা-আকাঙ্খা, মনোভাবের প্রতিফলন, সমাজ তথা রাষ্ট্রের পরিকল্পনা, উন্নয়ন কৌশল নির্মাণ সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ থাকা একান্ত বাঞ্চনীয়।

# সূচীপত্র


প্রথম অধ্যায় পৃষ্ঠা
ভূমিকা ৪-১৩
১.১. সমস্যার বিবরণ
১.২. যথার্থতা
১.৩. গবেষণার উদ্দেশ্য
১.৪. গবেষণা পদ্ধতি
১.৫. তথ্য সংগ্রহ
১.৬. পুস্ড়ক পর্যালোচনা
১.৭. অধ্যায় সমুহের বিষয়বস্তু বিন্যাস
১.৮. সীমাবদ্ধতা
১.৯. উপসংহার

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৪-৩২
প্রাক ইসলাম এবং বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে নারীর অবস্থান
২.১. ইসলামে নারী, সমাজ ও সভ্যতা
২.২. সভ্যতার দৃষ্টিকোণে নারী
ক. রোমান সভ্যতায় নারী
খ. গ্রীক সভ্যতায় নারী
গ. ব্রিটিশ সভ্যতায় নারী
ঘ. পারস্য সভ্যতায় নারী
ঙ. হাম্মুরাবীর আইনে নারী
চ. চীনা সভ্যতায় নারী
ছ. ভারতীয় সভ্যতায় নারী
২.৩. ধর্ম ও মানব জীবন
২.৪. ধর্ম ও সংহতি
২.৫. ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে নারী ঃ
ক. খৃষ্ট ধর্মে নারী
খ. ইয়াহুদী ধর্মে নারী
গ. হিন্দু ধর্মে নারী
ঘ. বৌদ্ধ ধর্মে নারী
ঙ. প্রাক ইসলাম সমাজে নারীর অবস্থান

তৃতীয় অধ্যায় ৩৩-৭১
ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা
৩.১. ইসলাম একটি শাশ্বত দ্বীন
৩.২. ন্যায়সঙ্গত অধিকার বা মর্যাদা
৩.৩. মৌলিক অধিকারের মধ্যেই মানবাধিকার নিহিত
৩.৪. মৌলিক অধিকারের যৌক্তিক সমতা
৩.৫. ইসলামে নারীর মানবাধিকার
৩.৬. ইসলামে নারীর মর্যাদার নানা দিক ঃ
ক. নারীর স্বার্থক জীবন ও ইসলাম
খ. নারীর মানবিক মর্যাদা
গ. ইসলামে নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা
ঘ. নারীর ইবাদত করার অধিকার ও মর্যাদা
ঙ. বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা
চ. স্বামী নির্বাচনে নারীর অধিকার
ছ. পুনরায় বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার
জ. বিবাহ বিচ্ছেদ
ঝ. ভরণ-পোষণ প্রাপ্তির অধিকার
ঞ. নারীর সদাচরণ পাবার অধিকার
ট. নারী শিক্ষার মাধ্যমে বুদ্ধি-বৃত্তিক মর্যাদা
ঠ. আইনগত সমান অধিকার

ড. নারীর নিরাপত্তার অধিকার
ঢ. সাক্ষী ও বিচারক হিসেবে নারী
ণ. ন্যায় বিচার লাভের অধিকার
ত. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার
থ. রাজনৈতিক আশ্রয় ও নাগরিকত্ব লাভের অধিকার
দ. জাতীয়তার অধিকার
ধ. নারীর কর্মসংস্থান লাভের অধিকার
ন. সম্পত্তির মালিকানার অধিকার

চতুর্থত অধ্যায় ৭২-১১২
বাংলাদেশে মুসলিম নারীদের আইনগত মর্যাদা
৪.১. নারী সম্পর্কে ইসলামের নীতিমালা
৪.২. নারী পুর"ষের সম অধিকারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি
৪.৩. আল-কুরআনে নারী
ক. হযরত আদম (আ.) এবং বিবি হাওয়া (আ.)
খ. হযরত মূসা (আ.)
গ. বিবি মরিয়ম (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)
ঘ. হযরত মুহাম্মদ (স.)
৪.৪. ইসলাম ও বর্হি বিশ্বে নারী
৪.৫. বাংলাদেশের সংবিধানে প্রদত্ত নারীর সাংবিধানিক মর্যাদা
ক. বাংলাদেশে প্রচলিত মুসলিম পারিবারিক আইন
খ. বাংলাদেশে প্রচলিত হিন্দু পারিবারিক আইন
গ. বাংলাদেশে প্রচলিত খ্রিষ্টান পারিবারিক আইন
ঘ. বাংলাদেশে প্রচলিত নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইন
৪.৬. বিভিন্ন দেশের মুসলিম পারিবারিক আইনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

পঞ্চম অধ্যায় ১১৩-১৭৯
নারীর উত্তরাধিকার

**ষষ্ঠ অধ্যায়** ১৮০-১৯২
বাংলাদেশের মুসলিম নারীর আইনগত মর্যাদা ও উত্তরাধিকার- বাস্ড়বতা

সপ্তম অধ্যায় ১৯৩-১৯৪
সুপারিশমালা

অষ্টম অধ্যায় ১৯৫-২০০
উপসংহার

**পরিশিষ্ট** ২০১-২১০
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য এবং বাস্ড়বায়ন কৌশল
৯.১. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ
৯.২. নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ
৯.৩. মেয়ে শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সাধন এবং সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা
৯.৪. নারীর প্রতি সকল নির্যাতন দূরীকরণ
৯.৫. সশস্ত্র সংঘর্ষ ও নারীর অবস্থা
৯.৬. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
৯.৭. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি
৯.৮. জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকা"ে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ
৯.৯. নারীর দারিদ্য দূরীকরণ
৯.১০. নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন
৯.১১. নারীর কর্মসংস্থান
৯.১২. সহায়ক সেবা
৯.১৩. নারী ও প্রযুক্তি
৯.১৪. নারীর খাদ্য নিরাপত্তা

৯.১৫. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন
৯.১৬. নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন
৯.১৭. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি
৯.১৮. গৃহায়ণ ও আশ্রম
৯.১৯. নারী ও পরিবেশ
৯.২০. নারী ও গণমাধ্যম
৯.২১. বিশেষ দুদর্শাগ্রস্থ নারী
৯.২২. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি বাস্ড়বায়ন কৌশল
ক. জাতীয় পর্যায় ঃ
১. নারী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো
২. জাতীয় মহিলা উন্নয়ন পরিষদ
৩. সংসদীয় কমিটি
৪. নারী উন্নয়ন ফোকাল পয়েন্ট
৫. নারী উন্নয়ন বাস্ড়বায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি
খ. জেলা ও উপজেলা পর্যায়
গ. তৃণমূল পর্যায়
৯.২৩. নারী উন্নয়নে এনজিও এবং সামাজিক সংগঠনগুলোর সাথে সহযোগিতা
৯.২৪. নারী ও জেন্ডার সমতা বিষয়ক গবেষণা
৯.২৫. নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
৯.২৬. কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে কৌশল
৯.২৭. আর্থিক ব্যবস্থা
৯.২৮. নারীর ক্ষমতায়ন ও আন্ড়র্জাতিক সহযোগিতা

গ্রন্থপুঞ্জী ২১১-২১৪

# প্রথম অধ্যায়

## ভূমিকা

১.১. সমস্যার বিবরণ ঃ

আর্থ-সামাজিক এবং তথ্য প্রযুক্তির যুগে নারীর সমান অংশগ্রহণের বিষয়টি নারী অগ্রগতির জন্য একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীকে সম্পৃক্তকরণের মূল হাতিয়ার হচ্ছে নারীর আইনগত মর্যাদা ও উত্তরাধিকার ভোগ। নারী ছাড়া এ সমাজ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল। মানব জাতির শুর“ থেকে আমরা যে নারীকে পুর“ষের জীবন সঙ্গিনীরূপে দেখতে পাচ্ছি, এ বিশ্বোত্তর কালের সেই সঙ্গিনীকে মানুষ অমর্যাদা করবে এ হতেই পারে না। যে পৃথিবীতে আমরা বাস করছি এটাও বেহেস্ড়েরই প্রতিকৃতি। এ পৃথিবীর নেয়ামত উপভোগ করার যে সুযোগ আমাদের হচ্ছে তাও তো নারীর দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। তাই নারী বিশ্ব মানবের পৃথিবীতে আনয়নকারিনীর মর্যাদার পাত্রী। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এমন একটি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে মানুষ নিজে স্বার্থসিদ্ধির জন্য সর্বক্ষেত্রেই বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে।

সৃষ্টির শুর“ থেকে চলে আসা এ নর-নারীর স্রোতধারা যুগে যুগে প্রমাণ করেছে যে, এরা একে অন্যের ওপর দার“নভাবে নির্ভরশীল, একের জন্য অন্য জন একান্ড় অপরিহার্য। সৃষ্টির সেরা মানব জাতির রক্ষণ, বর্ধন ও সম্প্রসারণের জন্য নর ও নারীর একত্রীভূত প্রচেষ্টাই কাজ করছে সর্বত্র। কাজেই বলতে হয় সৃষ্টির পূর্ণতার কাজে নর ও নারী উভয়েরই দান সমান। একজনে যখন অন্য জনের সম্পর্ণূ মুখাপেক্ষী তখন উভয়েরই প্রতি উভয়ের প্রেম-প্রীতি, আকর্ষণ ও মর্যাদাবোধ স্বাভাবিক। আদিকাল থেকেই দেখা যায়, পুর“ষ নারী অপেক্ষা দৈহিক শক্তিতে অগ্রনী। তাই পৃথিবীর চাক্ষুষ কৃর্তত্ব নেতৃত্ব পুর“ষেরই ভাগে পড়েছে প্রায় সবখানি। কিন্তু একটু নিবিড়ভাবে দেখলে দেখতে পাবেন যে ঐ সকল কর্তৃত্ব নেতৃত্বের মধ্যেও নারী কাজ করেছে সব সময়। মোট কথা একজন আরেকজনের পরিপূরক। তাই কবি বলেছেন, পৃথিবীতে যা কিছু আছে অর্ধেক তা করেছেন নারী, অর্ধেক তার নর।

নারী ও পুর“ষ অভিন্ন মানব সমাজের দুটি অপরিহার্য অঙ্গ। নর-নারী মিলেই মানব সমাজ পরিপূর্ণ হয়। পুর“ষ মানবতার একাংশের প্রতিনিধি। অপর অংশের প্রতিনিধিত্ব করে নারী। নারী সমাজকে বাদ দিয়ে মানব সমাজ কল্পনাই করা যায় না। আলণ্ডাহ তায়ালা রহমত ও দানের ব্যাপারে যেমন তার সৃষ্টির মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি, তেমনি তার বিধানে নারী-পুর“ষের অধিকার ও মর্যাদার মধ্যেও কোন তারতম্য রাখেননি। মানবজাতির হেদায়াতের জন্য আলণ্ডাহ তায়ালার মনোনীত জীবন বিধান হলো ইসলাম। ইসলাম একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের বিধান নারী পুর“ষ সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। ইসলামী বিধান নারী-পুর“ষ সকলের অধিকার ও মর্যাদা সমানভাবে নিশ্চিত করেছে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারী জাতি তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ইসলামের আগমনের মাধ্যমে নারী তার হারানো অধিকার ও মর্যাদা ফিরে পায়। ইসলাম চৌদ্দশত বছর পূর্বে নারীকে যে সকল অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে তা মহান আলণ্ডাহর দেয়া বৈধ অধিকার, বিনা আন্দোলনে এবং বিভিন্ন অঙ্গনে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে। ধর্মীয় অধিকার, সামাজিক অধিকার, পারিবারিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, আইনগত অধিকারসহ সকল বিষয়ে ইসলাম নারীকে ন্যায্য অধিকার দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ইসলামের স্বর্ণযুগে নারীরা তাদের প্রতিভা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিল। ইসলাম সে যুগে নারী জাতিকে তার যথাযোগ্য অধিকার দিয়েছে। ইসলামের আবির্ভাবে নারী পেয়েছে ধর্মে-কর্মে, শিক্ষা-দীক্ষায় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে পুর“ষের ন্যায় ন্যায্য অধিকার। নারী জাতির অধিকার, মর্যাদা ও স্বাধীনতার বিবরণ দিয়ে পবিত্র কোরআনের পূর্ণ একটি সূরা (আন নিসা) তার জ্বলন্ড় উদাহরণ। ইসলামের দেয়া নারীর এসকল অধিকার থেকে যদি কোন নারী বঞ্চিত থাকে, তবে তার জন্য সংশিণ্ডষ্ট মুসলিম সমাজ দায়ী, ইসলাম নয়।[১]

ইসলাম নারী জাতিকে শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণে ক্ষেত্রবিশেষ ছাড়া পুর“ষের সমান অধিকার দিয়েছে। মানুষ হিসেবে নারী চিন্ড়ায় ও কর্মে ভোগ করবে যুক্তিপূর্ণ স্বাধীনতা। শত শত বছরের ইসলামী বিধানকে আধুনিকতার নামে সেকেলে মনে করছে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক না হওয়ায় পাশ্চাত্যের প্রপাগন্ডায় মুসলিম সমাজের একটি অংশ জঘন্য অশণ্ডীলতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাদের ধারণা ইসলাম তাদেরকে ঠকিয়েছে। পর্দার নামে তাদেরকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে। ইসলামী শিক্ষার অভাবে আজ তারা পথভ্রষ্ট হচ্ছে। মূলত: তাদের এ ধারণা বর্তমান মুসলিম সমাজের ইসলাম বিমুখ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার কাঠামো থেকে তৈরি হয়েছে। কেননা ইসলাম নারীর যে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রে তা অহরহ লঙ্ঘিত

হচ্ছে।[২] ইসলামী বিধান নারীকে কি কি অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে এ বিষয়ে সবাইকে সজাগ করানোর জন্যই এ গবেষণা কর্ম। "বাংলাদেশের মুসলিম নারীর আইনগত মর্যাদা ও উত্তরাধিকার" শীর্ষক গবেষণাকর্ম থেকে যদি বর্তমান বিশ্বের ধর্ম-বর্ণ, দলমত নির্বিশেষে সকল মানব সমাজ বিশেষ করে নারী সমাজ সামান্যতম উপকৃত হন এবং ইসলামী ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নূন্যতম জ্ঞানার্জন করতে পারেন তাহলে নিজেকে সার্থক মনে করব।

আলোচ্য গবেষণাকর্ম ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়াও ৬টি অধ্যায় রয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়কে বিষয়ভিত্তিক অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব ও পরবর্তী সভ্যতা ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মে নারীর অধিকার, মর্যাদা ও অবস্থান এবং বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের আইনগত মর্যাদা ও কর্তব্য আলাদা আলাদা অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এ গবেষণাকর্মে ইসলামী বিধানে নারীর আইনগত অধিকার, মর্যাদা ও উত্তরাধিকার এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ গবেষণাকর্মে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর গভীর অধ্যায়নের মাধ্যমে ইসলামী বিধানে নারীর অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখে কোরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহ পেশ করা হয়েছে। কোরআনের ক্ষেত্রে আয়াতসমূহ উলেণ্ঢখ করে পাঠোদ্ধারের সুবিধার্থে আয়াত সমূহের অর্থ দেয়া হয়েছে। হাদীসের ক্ষেত্রে সিহাহ সিত্তার হাদীসসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে সিহাহ সিত্তাহ ছাড়াও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের হাদীস নেয়া হয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় হাদীসের এবারত সমূহ পরিহার করে অনুবাদ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে সর্বস্ড়রের মানুষসহ মুসলিম নারীর আইনগত মর্যাদা ও উত্তরাধিকার তুলে ধরা হয়েছে।[৩]

ইসলামী ব্যবস্থা আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে, যখন সারা পৃথিবীর কোন অংশে নারীর উত্তরাধিকার তেমনভাবে স্বীকৃত হয়নি, সেই সময়ে নারীদের উত্তরাধিকারের অধিকার ঘোষণা করেছে। আলণ্ঢাহ তায়ালা বলেন, "পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুর"ষের অংশ আছে এবং পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, উহা অল্পই হউক অথবা বেশিই হউক, এক নির্ধারিত অংশ।"[৪]

বস্তুত নারীর কল্যাণে ইসলামী ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠতম অবদান হচ্ছে উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি। কন্যা, স্ত্রী এবং মাতারূপে তারা সব সময় "মীরাস" পায়। কোন সময়ই তারা বঞ্চিত হয় না। অবশ্য বিশেষ কারণে পুত্রের তুলনায় কন্যার এবং স্বামীর তুলনায় স্ত্রীর এবং ভাইয়ের তুলনায় ভগ্নীর অংশ কম নির্ধারিত হয়েছে। কন্যা হওয়ার কারণে সে যুগে তাদের জীবন্ড় পুঁতে ফেলা হত। সে যুগে ইসলাম নারীর জন্য যে সম্মান ও মর্যাদার কথা ঘোষণা করেছে তা ইসলামী ব্যবস্থার সর্বকাল উপযোগিতার এক অপূর্ব নিদর্শন। ইসলাম ঘোষণা করেছে যে, "মায়ের পায়ের নিচে সন্ড়ানের বেহেশত।"[৫]

এ দুনিয়ায় এমন আর কেউ নেই যার মর্যাদা মায়ের সমকক্ষ। সন্ড়ানগণ যাতে তাদের মায়ের উপর যত্নবান হন সেজন্য আল-কোরআন স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তাদের সেই অসহায় দিনের কথা, যখন তারা শিশু ছিল। আলণ্ঢাহ তায়ালা বলেন, "আমি মানুষকে তাহার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি। তাহার জননী তাহাকে গর্ভে ধারণ করিতে ও তাহার স্ড়ন্য ছাড়াইতে লাগে ত্রিশ মাস।"

ইসলাম অবরোধ প্রথাকে সমর্থন করেনি। ইসলামে নারী এবং পুর"ষদের প্রতিও নির্দেশ আছে তার দৃষ্টিকে সংযত করতে এবং এমনভাবে নিজেকে উন্মুক্ত না করতে যাতে একে অপরের প্রতি প্রলুব্ধ হয়। অবশ্য এ নির্দেশের অর্থ এ নয় যে, নারী শুধু ঘরের চার দেয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে। কেননা আবদ্ধতার মধ্যে দৃষ্টি সংযত করার কোন প্রয়োজন নেই। একজন অবর"দ্ধ নারীর পুর"ষকে উত্তেজিত করার অবকাশই বা কোথায়? ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় অবরোধ নেই, কিন্তু শালীনতা রক্ষার নির্দেশ আছে। সুন্দর, শালীন এবং সংযত জীবন যাপন করার জন্য ইসলাম বারবার তাগিদ দিয়েছে। ইসলামী ব্যবস্থায় বিবাহ একটি পবিত্র চুক্তি। নর ও নারীর মিলনে তাদের দাম্পত্য জীবন সুন্দর হোক, মধুময় হোক, ইসলামী ব্যবস্থার এটাই কাম্য। কিন্তু মধুময়তার পরিবর্তে যদি নিদার"ন তিক্ততা নেমে আসে নর নারীর জীবনে, তবে সেই বিবাহ বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত। ইসলাম তাই বিবাহ বিচ্ছেদের বিধানও দিয়েছে। স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে, কিন্তু সে অধিকার তাকে প্রয়োগ করতে হবে সংযত ও সুচিন্ড়িত বিবেচনায়, ক্ষণিক উত্তেজনায় নয়। আর তালাক দিলেই স্বামীর সব দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে না, তাকে শোধ করতে হবে দেনমোহর এবং দিতে হবে ইদ্দতকালীন ঘোরপোষ। তালাক দেবার পরও স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে, আল-কোরআন এ কড়া নির্দেশও দিয়েছে। স্ত্রীরও অধিকার আছে বিবাহ ভঙ্গ করার, সে যা পেয়েছে তার বিনিময়ে সে বিবাহ ভঙ্গ করতে পারে। [৬]

নারীর সর্বাধিক অধিকার সংরক্ষণ এবং নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত বেইজিং বিশ্ব নারী সম্মেলনে তাই উলেণ্ঢখ করা হয় নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ধর্মীয় কোন প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে না। ১৬৯৯ সালে উলেণ্ঢখযোগ্য নারী ব্যক্তিত্ব মেরী ওলস্টোনক্রাফটকে তাই বলতে শোনা যায়, ব্যাখ্যা করতে দেখা যায়- সমাজে নারী-পুর"ষ বৈষম্য প্রাকৃতিক কিংবা ধর্মীয় বিধান হিসেবে নয় বরং এটি মানুষের তৈরি বিধান। [৭]

**১.২. যথার্থতা ঃ**

আদিকাল থেকে বিশ্বের প্রায় প্রত্যেক দেশে নারী সমাজ পুর"ষের কর্তৃত্বাধীন হিসেবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে। তাই সমগ্র বিশ্বে নারী সমাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার জন্য এবং নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ গুর"ত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সমাজবিজ্ঞানে একজন বিশেষজ্ঞ বলছেন যে, নারীর মর্যাদা বলতে একটি পরিবারে একজন নারীর ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং তার প্রতি পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কর্তৃক প্রদর্শিত সম্মানকে বোঝায়। এ সংজ্ঞানুযায়ী আমাদের সমাজে একটি পরিবার পুর"ষদের তুলনায় নারীরা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা যেমন- জ্ঞান অনুসন্ধানের সুযোগ, অর্থনৈতিক উপাদানের উপর নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক অধিকার ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ড় গ্রহণের ক্ষমতা, নারীর আইনগত মর্যাদা এবং উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। গবেষণায় "নারীর মর্যাদার" এ সংজ্ঞাটিকে বাস্ড়বে রূপদানের জন্যই এ গবেষণার গর"ত্ব ।

**১.৩. গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ**

গবেষণা বলতে আমরা বুঝে থাকি সত্য অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। মূলত: এ গবেষণাকার্য হচ্ছে পুন: অনুসন্ধান, অপেক্ষাকৃত উন্নত পর্যবেক্ষণ ও বাড়তি জ্ঞান সংযোজন করার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা। "বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের আইনগত মর্যাদা ও উত্তরাধিকার" যা গবেষণার মূল বিষয়বস্তু। এ বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন হবে । পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মে আমাদের সমাজের নারীর অবস্থান এবং বহিঃ বিশ্বে নারী সমাজের তূলনামূলক আলোচনা করা হবে ।

ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে আমরা সবাই কম বেশি অবগত আছি। তবু এ ক্ষেত্রে পুন: অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা হয়েছে ইসলাম নারীকে কি কি অধিকার দিয়েছে? মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের নারীরা কি কি অধিকার ভোগ করছে? সেই সাথে দেখানো হবে তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে ইসলামে দেয়া অধিকার গুলোই বিশ্বের অন্যান্য ধর্ম এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেয়া অধিকারগুলোর চেয়ে অধিকতর কার্যকর এবং শান্ড়িপূর্ণ।

এ গবেষণাকর্মটি নিয়ে তেমন কোনো গবেষণা হয়নি, সেহেতু আমার মনে হয় এ গবেষণার মাধ্যমে মুসলিম নারীর আইনগত মর্যাদা ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতন হবেন মানুষ। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় যারা সম্পৃক্ত এবং আইন বা সংবিধান প্রণেতাগণ শুধু আইনের কাঠামোতে সীমাবদ্ধ না রেখে বস্ড়বে তার যথাযথ প্রয়োগ করবে এটাই গবেষণার উদ্দেশ্য। আমাদের সমাজের লোকেদের ইসলাম সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে ইসলামের নামে অনেক অপবাদ আরোপ করে বসে যার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামের সঠিক জ্ঞান থাকলে তারা এটা বলত না। এ ধরনের বিষয়গুলোর মধ্যে নারীর অধিকার একটি।

গবেষণায় দেখানোর চেষ্টা করেছি ইসলাম সত্য বিষয়ে ব্যাখ্যাকারী, পথ প্রদর্শনকারী শান্ড়িপূর্ণ জীবন বিধান তথা নারী অধিকার রক্ষায় উত্তম জীবন ব্যবস্থাপনা।

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে-

১। অনগ্রসর নারী সমাজকে তাদের আইনগত মর্যাদা এবং উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

২। মুসলিম নারীদের আইনগত মর্যাদা ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতন করা।

৩। বাস্ড়বে নারী কতটুকু এ অধিকার ভোগ করছে ?

৪। সর্বোপরি আইন প্রণেতা এবং রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ যাতে নারীর নিরাপত্তা এবং আইনী অধিকার আইনী কাঠামোতে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্ড়বে প্রয়োগ করেন তার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

**১.৪. গবেষণা পদ্ধতি ঃ**

গবেষণা পদ্ধতির মৌল উপাদান হলো গবেষণার বিষয়বস্তুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার-বিশেণ্ডষণ করা। প্রকৃতভাবে যা পর্যবেক্ষণ করা হয় তার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই গবেষণা পদ্ধতি দ্বারা সামাজিক আচার-আচরণের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মৌলিক পদ্ধতিকে সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রচেষ্টা বহুকাল ধরে চলে আসছে। "বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের আইনগত মার্যাদা ও উত্তরাধিকার"- শীর্ষক গবেষণা কর্মটি একটি সামাজিক গবেষণাকর্ম। যেকোন বিজ্ঞানের অস্ড়িত্ব নির্ভর করে তার উদ্ভাবিত এবং ব্যবহৃত পদ্ধতির উপর। পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক মর্যাদা লাভের কারণ তাদের সঠিক ও যৌক্তিক পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সফলতা। সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণা কর্ম হিসাবে এ গবেষণা কর্মটিও বিশেণ্ডষণ নির্ভর। গবেষণা সমস্যার প্রকৃতি, গবেষণার উদ্দেশ্য, গুর"ত্ব ও পরিধি বিবেচনা করে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার জন্য নিম্নে বর্ণিত তিনটি পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে-

**(ক) ঐতিহাসিক পদ্ধতি ঃ**

ঐতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে মানব সমাজে ধর্মের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও কার্যধারা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য অতীত সভ্যতা ও সামাজিক আচার বিধি প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করা হয়েছে । বর্তমান সমাজে নারীর আইনগত মর্যাদা ও ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার এবং মর্যাদার গতি-প্রকৃতি বিশেণ্ডষণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে আমার এ গবেষণাতে। আমাদের বর্তমান সমাজের রীতি-নীতি, জীবন-যাপন পদ্ধতি প্রভৃতির মূল নিহিত রয়েছে অতীতে এবং সে অতীত উৎস যথোপযুক্ত অনুসন্ধানের মাধ্যমেই এসবের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রাক ইসলামী সময়ে নারীর অবস্থান এবং বর্তমান সময়ে নারীর অবস্থান পর্যালোনা করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি তুলনামূলক আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

**(খ) বর্ণনামূলক ঃ**

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির মত পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে মানুষ যেমনি ধর্মের অনুসরণ করে আসছে ঠিক তেমনি এর ভুল ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যাও হয়ে আসছে। কেউ হয়ত ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন অথবা সেটির ভুলভাবে অনুসরণ করেছেন সৎ উদ্দেশ্যে অথবা না জেনে। আবার কেউ কেউ এর ভুল ব্যাখ্যা করেছেন অসৎ উদ্দেশ্যে। অতএব একথা বলা যায় ধর্মের অপব্যবহার বা অসদ্ব্যবহার সকল যুগে ও সকল সময়ে হয়ে আসছে। নারীর আইনগত মর্যাদা ও ইসলামের রীতিবদ্ধ আইন আমার গবেষণাতে বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন সমাজের চিত্র তুলে ধরে বর্ণনার মাধ্যমে তথ্যের গুণগত দিক বিশেণ্ডষণ করা হয়েছে। ইসলাম পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী মানবিক আচার-আরচণ, জনগোষ্ঠী, সম্প্রদায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে জড়িত উপাদানসমূহ অনুসন্ধান করে এবং এগুলোকে বিশেণ্ডষণ করে এবং সম্ভাব্য সকল দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বর্ণনা করা হয়েছে।

**(গ) বিশেণ্ডষণমূলক পদ্ধতি ঃ**

ইসলামে নারীর মর্যদা স্বীকৃত একটি পন্থা । ইসলামই একমাত্র নারীকে মর্যদা দিয়ে উচ্চ মর্যদায় ভূষিত করেছে এটি গভীরভাবে বিশেণ্ডষণ করলে দেখা যায় । আমার এ গবেষণাকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রীতিবদ্ধ, বস্তুনিরপেক্ষ বর্ণনা করে বিষয়বস্তুকে বিশেণ্ডষণ করা হয়েছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিষয়সমূহের চিরাচরিত পুনশ্চ পরীক্ষা বা সমালোচনার দ্বারা তুলনামূলক ভাবে তা বিচার বিবেচনার মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে বিশেণ্ডষণ করে রীতিবদ্ধ এবং বস্তুনিরপেক্ষ করা হয়েছে।

**১.৫. তথ্য সংগ্রহ ঃ**

গবেষণা কর্মে প্রাথমিক উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহের জন্য মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের বঙ্গানুবাদ ও বাংলাতে লেখা সহী হাদীস গ্রন্থ আলোচনা করা হয়েছে। তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রের প্রাপ্ত ধর্ম, ইসলাম, ইসলামী আইন, বিশ্বকোষ, অভিসন্দর্ভ, জার্নাল-নিবন্ধ, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, প্রতিবেদন ইত্যাদি উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। দেশের ভেতরের লেখক এবং বহির্বিশ্বের লেখকদের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলী, এম.ফিল এবং পি.এইচ.ডি গবেষকদের বিভিন্ন গবেষণাকর্ম সর্বোপরি সিডও সনদের পর্যালোচনা ইত্যাদি মূলসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। উলেণ্ডখিত গ্রন্থাবলী ও প্রকাশনা থেকে গবেষণা বিষয়ক মৌলিক ধারণা লাভের সাথে সাথে তাত্ত্বিক ও কাঠামোগত জ্ঞানও লাভ করা সহজ হয়েছে।

**১.৬. পুস্ড়ক পর্যালোচনা ঃ**

আমার গবেষনা কর্মটি 'বাংলাদেশের মুসলিম নারীর আইনগত মর্যাদা ও উত্তরাধিকার' সম্পর্কিত বিষয় বস্তুর উপর লেখা। মুসলিম নারীর আইনগত মর্যাদা সংক্রান্ড় পুস্ড়ক রচনা হয়েছে প্রচুর, কিন্তু ব্যাপক আকারে এর উপর আলোচনা করা হচ্ছে না।

মিশরীয় ইসলামী চিন্ড়াবিদ আব্দুল হালিম আবু সুখাহ্ তার 'Women Freedom at the time of Prophet' নামক গ্রন্থ থেকে নারী সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় পবিত্র কোরআনের আলোকে আলোচনা করেছেন। তিনি আরও তুলে ধরেছেন মহানবী (স.)-এর সময় নারীদের সম্মানজনক অবস্থা। পবিত্র কোরআন শরীফে হাদিসের আলোকে তিনি যৌক্তিকভাবে দেখিয়েছেন নবী-রাসূলদের সময় সমাজে নারীর অবস্থান কতটুকু দৃঢ়, স্বাধীন এবং সম্মানজনক যা গতানুগতিক মুসলিম সমাজে লক্ষণীয় নয়। আবু সুখাহ্ মনে করেন ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে অপ্রতুল ধারনার ফলেই নারীর প্রতি বিদ্বেষ ও কঠোর মনোভাবের জন্ম নেয়। এই বইয়ের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ খন্ডের বাংলায় অনুবাদিত গ্রন্থ হচ্ছে 'রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা'।

ড. সিবাই সিরিয়ার ইউনিভার্সিটির একজন ভাইস চ্যান্সেলর, সংসদ সদস্য এবং দেশটির প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি বিশ শতকের মুসলিম বিশ্বের একজন বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্ড়াবিদ ছিলেন। ড. মুস্ড়ফা আস-সিবাই এর "almar atu bainash shariati wal qanun" নামক গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদিত "ইসলাম ও প্রাশ্চত্য সমাজে নারী" বইটিকে বারটি খন্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। বইটিতে লিঙ্গ বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামে বহুগামীতা, নারীর রাজনৈতিক অধিকার, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মুসলিম নারীদের অবস্থা এবং নারীর সামাজিক অধিকারের বিষয়গুলো বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। ড. সিবাই এর মতে ইসলাম নারীর স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। কিন্তু তিনি সমর্থন করেছেন পুর"ষের বহু বিবাহের বিষয়টি। যেখানে স্ত্রীদের অধিকার সমানভাবে নিশ্চিত হয় না।

ড. ইউসুফ আল কারদিস এর ইসলামে হালাল-হারামের বিধান বইটি লিঙ্গ বিষয়ক একটি উলেণ্ঢখযোগ্য গ্রন্থ । তিনি মুসলিম বিশ্বের একজন বড় মাপের পন্ডিত ব্যক্তি। তার উলেণ্ঢখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আরবি ভাষায় লেখা "Al-Halalu Wal-Haramu fil Islam" যেটির অনুবাদক বাঙ্গালি লেখক মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুর রহিম একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্ড়াবিদ এবং প্রাক্তন সংসদ সদস্য। এই বইটি চারটি অধ্যায়ে লেখা। ড. কারদিস এখানে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে লিঙ্গ বিষয়ক ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি জনসম্মুখে নারীদের বিভিন্ন কার্যবিধিকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু তিনি নারীদের রাষ্ট্রীয় উচ্চ ক্ষমতা পদে প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী রূপে অধিষ্ঠিত হবার বিরোধীতা করেছেন।

শাহ আব্দুল হালিম নারী সম্পর্কিত তিনটি বিষয়ে পুরাতন ধ্যান-ধারনা সম্বলিত দৃষ্টিভঙ্গির কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি তার প্রবন্ধে বলেন, প্রত্যেক মানুষ নারী- পুরষ নির্বিশেষে সবাই সমান এবং আদম ও হাওয়ার উৎপত্তি মূলত একই আত্মা থেকে। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম অনুযায়ী ঈশ্বর আদমের পাঁজর থেকে হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। যার ফলশ্র"তি নারী সবসময়ই পুর"ষের অধীনস্ড়। তিনি আরও বলেন, ইসলামিক পন্ডিতেরা বিভিন্ন সময়ে পবিত্র কোরআন শরিফে নারী সম্পর্কিত বিভিন্ন আয়াত ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করে নারীর প্রতি ইসলামের কঠোর মনোভাব তুলে ধরেছেন। শাহ আব্দুল হালিম বলেন, তারা কোরআন শরিফকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেননি বরং আক্ষরিকভাবে অর্থ তুলে ধরেছেন। আর এভাবেই তারা অগভীর পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে নারী জাতি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন গতানুগতিক চিন্ড়া ধারার ফলে সমাজে আশানুরূপ বদল হয়নি এবং সাংস্কৃতিক দ্বন্দ, দুর্ভাবনা থেকে সমাজ মুক্ত হয়নি ।

তিনি বলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রার ফলে পবিত্র কোরআনের আয়াত বিশেণ্ঢষনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে যা পুর্বেকার বিশেণ্ঢষনের চেয়ে অনেক আলাদা এবং গভীরও বটে। শাহ আব্দুল হালিম তার প্রবন্ধে আরো বলেন ইসলামের মুল উদ্দেশ্য সর্ব ক্ষেত্রে শান্ড়ি প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে শাসন করতে প্রয়োজনে স্ত্রীকে প্রহার করবার বিষয়ে কোরআনের আয়াত দিয়ে সত্যায়ন করবার যে চেষ্টা করা হয়েছে তা মূলত কোরানের বিভিন্ন আয়াত সমূহের অপব্যাখ্যা এবং গ্রন্থটির মূল লক্ষ্য ও চেতনায় শান্ড়ি প্রতিষ্ঠার বিরোধী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্ট্যাডিস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শফিক আহম্মেদ তার 'Rights of women in Islam' নামক প্রবন্ধে বলেছেন ইতিহাসের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার মধ্যে দিয়ে পশ্চিমা বিশ্বে নারীর অধিকার চিহ্নিত হয়। অথচ ইসলামী যুগেই নারীর অধিকার সংরক্ষিত হয়। কিন্তু কালক্রমে এর অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায়। শফিক আহম্মেদ নারীর অধিকার কালক্রমে ক্ষুণ্ন হওয়ার পেছনে কিছু কারণ উলেণ্ঢখ করেন। তার মতে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজ ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়াতে সমাজে নারীর অবস্থান আরও দুর্বল হয়। তিনি বলেন- কিছু সংখ্যক মুসলমান কোরআন শরীফের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে ফতোয়া প্রদান করে নারীর উপর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীকে পুর"ষের অধীন"ড় করার চেষ্টা করেছে। তিনি আরও বলেন- সামাজিক বিভিন্ন প্রথা ও নিয়ম পুর"ষকে নারীর উপর কর্তৃত্ব স্থাপনে সর্বদা সহায়তা করেছে। তাছাড়া পশ্চিমারা সর্বদাই বিভিন্ন গণমাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে এসেছে যে, ইসলামের চোখে নারীরা সবসময় অধিকার বঞ্চিত ও পুর"ষের অধ:ন"ড়।

'The Pioneer' নামক জার্নালটি মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান কর্তৃক সম্পাদিত ৩৪টি প্রবন্ধে সমন্বিত। যেখানে আলোকপাত করা হয়েছে নারী সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় এবং নারীর প্রতি ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গিসহ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান। প্রবন্ধগুলোতে আলোচনার অন্যতম মূল বিষয় ইসলামের বিভিন্ন অপব্যাখ্যার ফলে নারী কিভাবে বৈষম্যের শিকার হয়। বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে নারী-পুর"ষ বিভিন্ন ভাবে আলাদা হলেও তাদের অধিকার সর্বক্ষেত্রে সমান।

বিভিন্ন বাংলাদেশী প"িতেরাও নারী সমতার বিষয়ে গুর"ত্বারোপ করেছেন। ড. খালেদ সালাউদ্দিন ও অন্যান্য লেখক কর্তৃক সম্পাদনকৃত গ্রন্থ 'States of Human Rights in Bangladesh: Women's Perspective' বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের অবস্থান সম্পর্কিত একটি গুর"ত্বপূর্ণ বই। বইটিতে নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী পাচার ও নারীর রাজনৈতিক অধিকার সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। বইটিতে মানবাধিকার লংঘনের বিষয়টি বাংলাদেশের সংবিধানের ও আ"র্জ্জাতিক কনভেনশন ও ঘোষণাপত্রের আলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

জাহানারা হক, নাজমা চৌধুরী, ইসরাত শারমিন এবং হামিদা আক্তার বেগম সম্পাদনকৃত গ্রন্থ 'Women Politics and Bureaucracy' নামক গ্রন্থে রাজনীতিতে নারী এবং স্থানীয় সরকার, সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন, রাজনৈতিক দলে নারী, রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা, জনপ্রশাসনমূলক ক্ষেত্র সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর পদচারণা ও ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। বইটিতে অনেক পরিসংখ্যান ও উপাত্ত তুলে ধরা হয়েছে যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীর প্রকৃত অবস্থান নির্ণনয়ের জন্য খুবই গুর"ত্বপূর্ণ । যেখানে স্পষ্টই ফুটে উঠে নারীর অধিকার খর্ব হবার বিভিন্ন চিত্র।

ড. নাজমুন্নেছা মাহতাব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওমেন এ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিস বিভাগের একজন অধ্যাপক। তার 'Women in Banglaesh' নামক গ্রন্থে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থান তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন- চাকুরী সহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী কিভাবে বৈষম্যের শিকার হয় এবং নারী কর্মক্ষেত্রে কতটা নিরাপত্তাহীন। তিনি তার লেখায় বিষদভাবে তুলে ধরেছেন উন্নত রাষ্ট্রগুলো কিভাবে বাংলাদেশের নারী সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সচেষ্ট থেকেছে। তিনি আরও দেখিয়েছেন নারীদের ক্ষমতায়ন সর্বদা বাধাগ্রস্থ হয়েছে। কেননা ইসলামী প্রথা ও নিয়ম অনুযায়ী পুর"ষ সমাজ ব্যবস্থায় তারা সবসময় পুর"ষের অধ:স্ড়া থেকেছে এবং পুর"ষের কাছে মাথা নত করে রেখেছে।

ড. রামাদান তার 'Problems facing in the Muslim World' নামক প্রবন্ধটিতে সমাজের নারীদের দুর্দশাগত অবস্থার বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন মুসলিম সমাজে নারীরা কিভাবে নিগৃহীত হয়। তিনি দেখিয়েছেন বিভিন্ন যুগে নবী-রাসূলদের নব-সময়ে নারীর মর্যদাপূর্ণ অবস্থান এবং নারীদের নব্যুয়াত প্রাপ্তির পথযাত্রায় তাদের সঙ্গদান, যা অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ তাদের মধ্যে ইসলামের মা মরিয়ম (আ:), মহানবী হযরত (স.) এর স্ত্রী খাদিজা (রা:) উলে"খযোগ্য। ড. রামাদান বলেন- পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং নবী-রাসূলদের সময়ে নারীর জীবন-যাপন চিত্র স্পষ্টত উলে"খ্য করে। নারীর অবস্থান, সম্মান, অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, পবিত্র কোরআন শরীফে আলণ্ডাহ নারী-পুর"ষের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন এবং উভয়কেই সমান দৃষ্টিতে দেখেছেন।

ড. জামাল এ. বাদাঈ কানাডার হেলিফাক্স রাজ্যের সেন্ট মারি বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিলিজিয়ান (Management and Religion) বিষয়ক একজন অধ্যাপক। তার ইসলামের 'সামাজিক বিধান, খ"-৩' গ্রন্থটির ড. আবু খালাদু আল মাহমুদ এবং ড. শারমিন ইসলাম কর্তৃক অনুবাদিত। লিঙ্গ বিষয়ক সম্পর্কে বইটি অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ। মিশরীয় ইসলামীক প"িত বাদাঈ ইসলাম সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধানের জন্য জগৎ বিখ্যাত। তিনি ইসলামে নারীদের অবস্থান, তার দায়িত্ব, সম্মান, লিঙ্গ সম্পর্ক, দাম্পত্য জীবন, ইসলামী দৃষ্টিতে পরিবারের গুর"ত্ব, পিতা-মাতার অধিকার সহ বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা নুসরাত আমিন তার 'Wife Abuse in Bangladesh' গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের নারীদের অধ:স্ড়া অবস্থানের চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের আইনগত অবস্থান এবং বা"ড়ব ক্ষেত্রে এর প্রয়োগে অসামঞ্জস্যপূর্ণতা যৌতুক প্রথাকে কেন্দ্র করে নারীদের উপর পুর"ষের নির্যাতন সহ আরও বিবিধ বিষয়। তিনি বলেন- স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে নির্যাতনের ব্যাপারটি সমাজে অনেক

আমলেই নানান কারণ তারা মনে করে। এটি ইসলামী স্বীকৃত আর এভাবেই (গৃহ নির্যাতনের) বিষয়টি সমগ্র বাংলাদেশেরই একটি সংক্রামিত ব্যাধি। যা কিনা অন্ড়রালে থেকে গেছে।

সালমা খানের লেখা 'The fifty percent' গ্রন্থটি লিঙ্গ বিষয়ে অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ। বইটি নারীদের অবস্থান এবং দেশের উন্নয়নে নারীর ভূমিকা সহ বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করেছেন। বইটিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সরকারী চাকুরী, সিদ্ধান্ড় গ্রহণ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান কিরূপ সেই বিষয়গুলোও আলোচনা করা হয়েছে।

আসিফা দুযা, জাহানারা হক, খালেদা সালাউদ্দিন এবং সৈয়দা রওশন কাদির দ্বারা সম্পাদনকৃত 'Education and Gender Equity' বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারী শিক্ষা বিষয়ক একটি উলেণ্ঢখযোগ্য গ্রন্থ। প্রাথমিক শিক্ষা এবং নারীর সীমাবদ্ধতা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় নারীদের উপস্থিতি, শিক্ষা নীতিসহ বিবিধ বিষয় বইটিতে আলোচিত হয়েছে। বইটি বিষদভাবে আলোচনা করা হয়েছে নারীরা কিভাবে বৈষম্যের শিকার হয়ে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়। ফলশ্র"তিতে নারীরা কর্মক্ষেত্রে সুযোগ হারায় এবং পুর"ষের অধিনস্থ হয়েই থাকে। এখানে আরো উলেণ্ঢখ করা হয়েছে যে, সামাজিক মূল্যবোধগুলো তৈরি হয় মূলত ধর্মীয় বিধি থেকে আর সেখানে ধর্ম শিক্ষার মধ্য দিয়ে নারীর স্বাবলম্বী ও স্বাধীন হবার চেয়ে বাল্যবিবাহের ব্যাপারে বেশি উপদেশ দেয়।

শহীদুজ্জামান এবং মাহফুজুর রহমান সম্পাদনকৃত "Gender Equality in Bangladesh" ১৩টি রচনা সম্বলিত লিঙ্গ বিষয়ক একটি গ্রন্থ। বইটিতে সবার মানসিকতা পরিবর্তনের উপর গুর"ত্ব আরোপ করা হয়েছে জেন্ডার জাস্ট ল' ও লিঙ্গ সমতাসহ বিভিন্ন বিষয় বাস্ড়বায়ন করবার জন্য। বইটিতে বলা হয়েছে- নারীরা তাদের কার্যের মধ্যে দিয়ে উন্নয়নে গুর"ত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে স্বাক্ষর রাখছে এবং একটি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনেও ভূমিকা রাখছে।

ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ- "কোরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ পর্যালোচনা, প্রমাণ, সুপারিশ" সংক্রান্ড় বইটি লিখেছে। কিন্তু এতে ইসলামের আইন বা রীতি-নীতি সংক্রান্ড় তথ্যাদি সম্পর্কে অপব্যাখ্যা দিয়েছেন। যার ফলে মানুষ দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ছে।

পি. এইচ. ডি গবেষক ফেরদৌস আরা খানম এর "ইসলামে নারীর মর্যাদা ঃ বাংলাদেশে তার অবস্থান " সম্পর্কিত গবেষণাটিতে নারীর মর্যাদার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন কিন্তু আইনগত মর্যাদা বাস্ড়বায়ন কিভাবে হবে, সেটি ব্যাপক আকারে আলোচনা করেননি।

এম.ফিল গবেষক আব্দুল করিম তার "ইসলামী বিধানে নারী ও বর্তমান বিশ্বে নারী ঃ একটি তুলনামূলক আলোচনা" সম্পর্কিত বইটিতে তার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু সংশিণ্ঢষ্ট গবেষণা কর্মটিতে কি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন এতে তা উলেণ্ঢখ করেননি। ফলে গবেষণা কর্মটি গতানুগতিক হয়েছে। তাছাড়া নারীর উত্তরাধিকার সম্পর্কে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয় নি। বইটিতে গবেষণার নীতিমালা পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করা হয়নি। তবে তিনি বইটিতে ভালো লিখেছেন।

গবেষক নাজমুন নাহারের "নারীর অধিকার ও ইসলাম ঃ বাংলাদেশে নারীর অবস্থান সম্পর্কিত একটি রাজনৈতিক পর্যালোচনা" সংশিণ্ঢষ্ট এম.ফিল গবেষণাটিতে **ভূমিকার অধ্যায়ে** গবেষণার ধাপ উলেণ্ঢখ করা হলেও তা ক্রমানুসারে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয় নি। যা আমার গবেষণায় করা হয়েছে। তিনি সংশিণ্ঢষ্ট গবেষণামূলক বইটিকে ছয়টি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। এ গবেষণাতে বাংলাদেশের নারীর অধিকারের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তা কিভাবে বাস্ড়বায়ন করতে হবে সেটি সুস্পষ্টভাবে উলেণ্ঢখ করা নেই এবং কোন সুপারিশমালা করা হয়নি। গবেষকের এই গবেষনাকে আমি আরো বিস্ড়তভাবে আমার গবেষণায় উপস্থাপন করেছি।

লেখক ইয়াসমিন নূর তাঁর "ইসলামে নারীর মর্যাদা ও কর্তব্য" বইটিতে কোরাআনের আয়াত সমূহের বিভিন্ন জায়গায় ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আমি আমার গবেষণাতে ইসলামী রীতিবদ্ধ আইন এবং বাস্ড়ব প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছি।

লেখক ইসহাক ওবায়দী এর "যুগে যুগে নারী বইটিতে" শারীরিকভাবে নারী পুর"ষের পার্থক্য দেখিয়েছেন এবং নারীর চেয়ে পুর"ষের বল বাহুলতার দিকে দৃষ্টিপাত করে নারীকে শারীরিকভবে দুর্বল মনে করে বিভিন্ন কর্ম ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহনের বিরোধীতা করেছেন। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর সামর্থ্যকে কোথাও খাটো করে দেখা হয় নি বরং নারীকে অতি উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। সূরা আল ইমরানের একটি আয়তে বলা হয়েছে- প্রত্যেক ঈমানদার ব্যাক্তিকে হযরত মরিয়ম (সাঃ) এর সাথে তুলনা করা হয়েছে, অর্থাৎ মরিয়ম (সাঃ) একজন মহিলা হয়েও সকল আস্থা ও বিশ্বাসের কষ্টি পাথর। যে কোন কর্ম

ক্ষেত্রে আস্থা অর্জনে প্রথমেই প্রয়োজন বিশ্বাস, আস্থা ও যোগ্যতা; যার উজ্জল দৃষ্টান্ড় খোদার বিচারে বিবি মরিয়ম (সাঃ) যিনি একজন মহিলা। এদিকে হেলেন সিজ্কস তার বিখ্যাত প্রবন্ধ 'লাফ অফ মেডিউসা' **(Laugh of Medusa)** তে নারীর কল্পনা শক্তি, মেধা এবং কর্ম ক্ষেত্রে নারীর সামর্থ্যকে পুর"ষের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী বলে পরিক্ষিত ভাবে প্রমান করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন নারী পুর"ষের দৈহিক মিলনের সময় নারীর ক্ষেত্রে শ্বেতস্রাব হয় চক্রাকারে অন্য ক্ষেত্রে পুর"ষের বীর্যপাতের সাথে সাথে যৌন উত্তেজনার সমাপ্তি ঘটে। হেলেন সিজ্কস বলেছেন নারীর কল্পনাশক্তি এবং ক্ষমতাও সীমাহীন যা চক্রাকারেই পরিচালিত হয়।

গবেষক ড. শারীফ আব্দুল আজীম এবং অনুবাদে মুহাম্মদ ইসমাইল জাবীহুল্লাহ "ইসলামে নারী বনাম পুস্ড়ক ও বাস্ড়বতায় ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মে নারী" সম্পর্কিত গবেষণা বইটিতে ইসলামসহ অন্যান্য ধর্মে নারীর মর্যাদা ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। কিন্তু আমার গবেষণাতে এ সম্পর্কে আরো বিস্ড়তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষক খন্দকার ফাহমিদা সুলতানা তাঁর "নারীর সামাজিক নিরাপত্তা ও ইসলামী বিধান ঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর প্রায়োগিক পর্যালোচনা" সম্পর্কিত গবেষণাতে ইসলামী বিধানের আলোকে নারীর সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়টি আলোচনা করেছেন । আমার গবেষণাতে ইসলামী বিধানের সঙ্গে সম্পৃক্ততা রেখে বাংলাদেশের সাংবিধানিক আইনের বাস্ড়বরূপ আলোচনা করেছি।

গবেষক মোঃ গোলাম ছারোয়ার "ইসলামে সার্বজনীনতা প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ" সম্পর্কিত তাঁর গবেষণাতে ইসলামী নীতিমালার বিভিন্নদিক তুলে ধরেছেন। আমি আমার গবেষণাতে নারীর উত্তরাধিকার আইন এবং তার আলোচ্য ইসলামী নীতিমালা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কতটুকু বাস্ড়বায়িত হয়েছে তা বিশদভাবে আলোচনা করেছি।

গবেষক মোঃ গোলাম কিবরিয়া "ইসলাম ও বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেনমোহর ঃ একটি পর্যালোচনা" সম্পর্কিত গবেষণাতে বিবাহে মোহরানা প্রসঙ্গে বিস্ড়তভাবে আলোকপাত করেছেন । এটি ইসলামের নীতিমালার শুধুমাত্র একটি দিক।

গবেষক পারভীন সুলতানার "মানবাধিকার সনদ ও ইসলামে নারীর অধিকার ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ" গবেষণাতে বাংলাদেশে মানবাধিকার সনদ এবং ইসলামে নারীর অধিকারের সম্পৃকক্ততা দেখিয়েছেন। আমার গবেষণাতে মানবাধিকার সনদের সঙ্গে ইসলামের নীতিমালার সম্পৃকক্ততা এবং বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর মর্যাদা ও উত্তরাধিকার কতটুকু বাস্ড়বায়িত হয়েছে তা বিশদভাবে আলোকপাত করেছি।

গবেষক মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী "ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ" সম্পর্কিত তাঁর গবেষণাতে যদিও ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তবে আমার গবেষণাতে এ সম্পর্কে বিস্ড়তভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত গবেষণা ও রচনাবলী হতে আমার গবেষণা কর্মে কিছু কিছু ধারণা গ্রহণ করা হয়েছে।

**১.৭. অধ্যায় সমুহের বিষয়বস্তু বিন্যাস ঃ**

গবেষণাকর্মটি সর্বমোট আটটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে । অধ্যায়গুলো নিম্নরূপ-

প্রথম অধ্যায় ঃ এ অধ্যায়ের শিরোনাম ভূমিকা। এতে রয়েছে- সমস্যার বিবরণ। যথার্থতা। গবেষণার উদ্দেশ্য। গবেষণা পদ্ধতি। তথ্য সংগ্রহ। পুস্ড়ক পর্যালোচনা। অধ্যায় সমূহের বিষয়বস্তু বিন্যাস । সীমাবদ্ধতা। উপসংহার।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ এ অধ্যায়ের শিরোনাম হলো - প্রাক ইসলাম এবং বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে নারীর অবস্থান। এ অধ্যায়ে রয়েছে ইসলামে নারী, সমাজ ও সভ্যতা। সভ্যতার দৃষ্টিকোণে নারী, এর অধীনে যে সকল বিষয় রয়েছে তা হলো- রোমান সভ্যতায় নারী, গ্রীক সভ্যতায় নারী, ব্রিটিশ সভ্যতায় নারী, পারস্য সভ্যতায় নারী, হাম্মুরাবীর আইনে নারী, চীনা সভ্যতায় নারী,ভারতীয় সভ্যতায় নারী। ধর্ম ও মানব জীবন। ধর্ম ও সংহতি। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে নারী , এর অধীনে যা আছে তা হলো- খৃষ্ট ধর্মে নারী, ইয়াহুদী ধর্মে নারী, হিন্দু ধর্মে নারী, বৌদ্ধ ধর্মে নারী, প্রাক ইসলাম সমাজে নারীর অবস্থান ।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ এ অধ্যায়ের শিরোনাম হলো - ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা । এ অধ্যায়ে যে সকল বিষয় রয়েছে- ইসলাম একটি শাশ্বত দ্বীন।

ন্যায়সঙ্গত অধিকার বা মর্যাদা, মৌলিক অধিকারের মধ্যেই মানবাধিকার নিহিত। মৌলিক অধিকারের যৌক্তিক সমতা। ইসলামে নারীর মানবাধিকার। ইসলামে নারীর মর্যাদার নানা দিক এর অধীনে যে সকল বিষয় রয়েছে ঃ নারীর স্বার্থক জীবন ও ইসলাম, নারীর মানবিক মর্যাদা, ইসলামে নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা, নারীর ইবাদত করার অধিকার ও মর্যাদা, বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা, স্বামী নির্বাচনে নারীর অধিকার, পুনরায় বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদ, ভরণ-পোষণ প্রাপ্তির অধিকার, নারীর সদাচরণ পাবার অধিকার, নারী শিক্ষার মাধ্যমে বুদ্ধি-বৃত্তিক মর্যাদা, আইনগত সমান অধিকার, নারীর নিরাপত্তার অধিকার, সাক্ষী ও বিচারক হিসেবে নারী, ন্যায় বিচার লাভের অধিকার, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার, রাজনৈতিক আশ্রয় ও নাগরিকত্ব লাভের অধিকার, জাতীয়তার অধিকার, নারীর কর্মসংস্থান লাভের অধিকার, সম্পত্তির মালিকানার অধিকার।

চতুর্থত অধ্যায় ঃ এ অধ্যায়ের শিরোনাম হলো- বাংলাদেশে মুসলিম নারীদের আইনগত মর্যাদা। এ অধ্যায়ে যা রয়েছে তা হলো- নারী সম্পর্কে ইসলামের নীতিমালা। নারী পুর"ষের সম অধিকারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি । আল-কুরআনে নারী, এতে রয়েছে- হযরত আদম (আ.) এবং বিবি হাওয়া (আ.), হযরত মূসা (আ.), বিবি মরিয়ম (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.), হযরত মুহাম্মদ (স.) । ইসলাম ও বর্হি বিশ্বে নারী। বাংলাদেশের সংবিধানে প্রদত্ত নারীর সাংবিধানিক মর্যাদা এর অধীনে যে সকল বিষয় রয়েছে ঃ বাংলাদেশে প্রচলিত মুসলিম পারিবারিক আইন, বাংলাদেশে প্রচলিত হিন্দু পারিবারিক আইন, বাংলাদেশে প্রচলিত খ্রিষ্টান পারিবারিক আইন, বাংলাদেশে প্রচলিত নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইন। বিভিন্ন দেশের মুসলিম পারিবারিক আইনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ এ অধ্যায়ের মধ্যে রয়েছে নারীর উত্তরাধিকার।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ এ অধ্যায়ের শিরোনাম বাংলাদেশের মুসলিম নারীর সামাজিকভাবে আইনগত মর্যাদা ও উত্তরাধিকার বা"ড়বায়ন ।

সপ্তম **অধ্যায়** সুপারিশমালা ঃ এ অধ্যায়ে সুপারিশমালা করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ, সুধী সমাজ, আইন প্রণেতাগণের কাছে।

অষ্টম অধ্যায় ঃ এ অধ্যায়ে রয়েছে উপসংহার।

সবশেষে পরিশিষ্ট। এতে রয়েছে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য এবং বা"ড়বায়ন কৌশল। সর্বশেষে গ্রন্থপুঞ্জী ।

**১.৮. সীমাবদ্ধতা ঃ**

একজন নারী সব সময় কারো না কারো নিয়ন্ত্রণে থাকে। যেমন জন্মের পর পিতা-মাতার, বিবাহের পর স্বামীর এবং স্বামীর মৃত্যুর পর সন"ড়নের উপর নির্ভরশীল হয়ে একজন নারীকে দিন যাপন করতে হয়। এ নির্ভরশীলতার কারণে তারা নিয়ন্ত্রিত। আর তাদের সম্পত্তি যাদের কাছে থাকে তাদের হাতে চলে যায়। যদি কোনো লোক একমাত্র মেয়ে কিংবা অধিক মেয়ে রেখে মারা যায় এবং ব্যক্তির কোনো পুত্র সন"ড়ন না থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তির সকল সম্পত্তির মালিক হবে মেয়েরা। নারীরা মা, স্ত্রী এবং মেয়ে হিসেবে সম্পত্তি লাভ করলেও সম্পত্তি ভোগের ক্ষেত্রে আমরা এক বিরাট বৈষম্য দেখতে পাই। এ বৈষম্যের বিচারকদের অভিমত হচ্ছে- একজন নারী বিভিন্ন উৎস হতে সম্পত্তি লাভ করে। ফলে তাদের সম্পত্তির অংশ কম হয় না। এছাড়া একজন নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার নিজের নয়। সে অন্যের দ্বারা পোষিত হচ্ছে। সময়ের আবর্তে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। প্রায়ই দেখা যাচ্ছে- নারীদের আইনগত যে সুযোগ রয়েছে তারা সেটি ভোগ করতে পারছে না। ইসলাম সম্পত্তিতে নারীদের যে অধিকার প্রদান করেছে তা নানা কারণে ভোগ করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে নারীদের বিশেষত: নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসচেতনতা এবং গবেষণা কাজের প্রতি তাদের নেতিবাচক মনোভাব, তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ও সন্দেহ প্রবণতা, উত্তরাধিকার, যৌতুক ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সংকোচবোধ ও আশঙ্কা এবং অজ্ঞতা তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

**১.৯. উপসংহার ঃ**

একটি দেশ তখনই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে, যখন দক্ষ ও জবাবদিহিতামূলক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি উক্ত সরকার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানের নারী পুর"ষের সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণ ও কার্যকর প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব হবে। কেননা একটি দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী তথা নারী সমাজকে সুবিধা বঞ্চিত রেখে দেশের সুষম উন্নয়ন সম্ভব নয়। মোট কথা একটি দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর চাহিদা, আশা-আকাঙ্খা, মনোভাবের প্রতিফলন, সমাজ তথা রাষ্ট্রের পরিকল্পনা, উন্নয়ন কৌশল নির্মাণ সিদ্ধান্ড়ে অংশগ্রহণ থাকা একান্ড় বাঞ্চনীয়।[৯]

## তথ্য নির্দেশিকা


১. আব্দুল করিম- ইসলামী বিধানে নারী ও বর্তমান বিশ্বে নারী ঃ একটি তুলনামূলক আলোচনা, পৃ-১।

২. আব্দুল করিম- ইসলামী বিধানে নারী ও বর্তমান বিশ্বে নারী ঃ একটি তুলনামূলক আলোচনা, পৃ-২।

৩. আব্দুল করিম- ইসলামী বিধানে নারী ও বর্তমান বিশ্বে নারী ঃ একটি তুলনামূলক আলোচনা, পৃ-৩।

৪. আল কোরআন: ২৪-২৭।

৫. আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইবনু শু'আইব আন-নাসাঈ; সুনানুন নাসাঈ, দিল-ী, কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ; ১৪১০ হিজরী।

৬. মোঃ আবু বকর সিদ্দিক- নারী ও শিশুর মনবাধিকার বিষয়ে ইসলাম এবং বাংলাদেশের (১৯৭২-২০০০) পরিস্থিতি: একটি পর্যালোচনা, পৃ-৭।

৭. সমাজ নিরীক্ষণ,আগষ্ট ২০০০,কলাভবন,ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত: পৃ-৬৬।

৮. নাজমুন নাহার- নারীর অধিকার ও ইসলাম: বাংলাদেমের নারীর অবস্থান সম্পর্কিত একটি রাজনৈতিক পর্যালোচনা, পৃ-৪।

৯. সৈয়দ রওশন কাদের, পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনে মহিলা কমিশনারদের ভূমিকা, ক্ষমতায়ন, সংখ্যা ১, ১৯৯৬, ইউমেন ফর উইমেন, ঢাকা, পৃ-১৭৩০।

*Dhaka University Institutional Repository*

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## প্রাক ইসলাম এবং বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে নারীর অবস্থান

**২.১. ইসলামে নারী, সমাজ ও সভ্যতা ঃ**

প্রাচীন আরব দেশে নারীদের মতামতের কোন মূল্য ছিল না। গৃহপালিত জন্তু জানোয়ারের মত তাদেরকে বেচাকেনা কিংবা জীবন্ত কবর দেয়াকে কৌলিণ্যের কাজ মনে করা হত। মেয়ে হওয়াকে আরবের পিতারা লজ্জাস্কর বলে মনে করত।[১] "প্রাচীন সমাজে নারীজাতি ছিল অমঙ্গলের প্রতীক। প্রাক ইসলামী যুগে নারীদের বলা হতো শয়তানের সৃষ্টি, অমঙ্গলের অগ্রদূতী। কেউ ইচ্ছা করলে তার স্ত্রীকে অন্যের নিকট ঋণ দিতে পারতো। বিশ্বাস করা হতো নারীদের মানবীয় প্রতিভা নেই।[২] কোন কোন সমাজে নারীদেরকে মোহের বাস্তবরূপ এবং মানবাত্মার নির্মাণ লাভের অন্তরায় মনে করা হতো। কোন কোন সভ্যতায় তাদেরকে 'সকল পাপের মূল উৎস, নারী নরকের দ্বার, মানুষের দুঃখের কারণ, শয়তানের মুখপাত্র, তীব্র বিষধর বিচ্ছু, পক্ষধর ভূজঙ্গের বিদ্বেষ ইত্যাদি হীনতম বিদ্বেষ হিসেবে ভূষিত করেছে।[৩]

নারীজাতি সম্পর্কে এরকম আরো বহু কথা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে নারীকে মানবতার জন্য একটা দুর্বহ বোঝা মনে করতো। সেবিকা হিসেবে পরিবারের মানুষের সেবা করা ছাড়া তাদের ধারণা মত নারী জাতির জীবনের আর অন্য কোন লক্ষ্য ছিলনা। যুক্তিবাদী গ্রীকদের ভাষায় "অগ্নিদগ্ধ হওয়ার এবং সর্প দংশনের প্রতিকার সম্ভব কিন্তু নারীর কুপ্রভাব ও অকল্যাণের প্রতিকার সম্ভব নয়।[৪] সভ্যতা, জ্ঞান, শিক্ষা ও যুক্তির শীর্ষস্থানে অবস্থানকারীগণের দৃষ্টিতে নারীদের অবস্থান কি তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। একজন গ্রীক সাহিত্যিক বলেন, দু'টি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের জন্য আনন্দের কারণ হয় এক হচ্ছে তার বিয়ের দিন এবং দুই তার মৃত্যুর দিন।[৫]

খৃষ্ট্রীয় পঞ্চম শতাব্দীতে খৃষ্টানদের এক ধর্মীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে বলা হয়, নারীর আত্মা নেই এবং দোযখ হলো তার বাসস্থান। মরিয়ম ইহার ব্যতিক্রম। নারী মানুষ কিনা এ বিষয় আলোচনার জন্য পরবর্তী শতাব্দীতে তাহাদের অপর একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সিদ্ধান্ত হয়, নারী মানুষ বটে, তবে পুরুষের কল্যাণ ও দাসত্বের জন্যই তাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে।[৬]

প্রখ্যাত গ্রীক চিন্তাবিদ সক্রেটিস ভেবেচিন্তে বলেন, আমরা যৌন তৃপ্তির জন্য বেশ্যালয়ে যাই এবং সন্তান উৎপাদনের জন্য স্ত্রী গ্রহণ করি। গ্রীক সভ্যতায় সর্বপ্রথম অত্যাচারের পাশাপাশি তারা তাদের দেবতার কাছে অনুশোচনা করতো এই বলে যে, একই সূর্যের নীচে পুরুষের সাথে নারীকে কেন দেয়া হল, নারীর চেয়ে দুনিয়ায় আর কোন নিকৃষ্ট বস্তু নেই। এই ছিল খ্যাতনামা সক্রেটিসের বক্তব্য।[৭]

কিশ্বকোষ ব্রিটানীকায় উল্লেখ আছে, "সপ্তাদশ শতাব্দীতে রোমের পাদরীবর্গ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, নারীজাতির আত্মা নেই। সুতরাং তারা স্বর্গে প্রবেশ করবে না।[৮] এ থেকে বুঝা যায় খৃষ্ট ধর্মে নারী কোন চোখে দেখা হত।

বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর। সত্যিই তাই। পৃথিবী নামক মহাবিশ্বে নরনারী একসাথে বসবাস করছে। উভয়েই একই বৃন্তের দু'টি ফুল। আর ইসলামে তো নারী-পুরুষে কোন প্রকার বৈষম্য নেই। ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এতে নরের জন্য যেমন বিধি-নিষেধ রয়েছে, দিক নির্দেশনা রয়েছে তেমনি নারীর জন্যও রয়েছে সুস্পষ্ট জীবন নীতিমালা। কারো কাছে ছোট করা হয়নি ইসলামে। বরং যার যার অবস্থানে সে মর্যাদাবান। পৃথিবীর অপরাপর ধর্মের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় ইসলামই নারীকে সর্বোৎকৃষ্ট মর্যাদার আসনে আসীন করেছে। মুলসমান নারী-পুরুষ উভয়ই সমান অধিকারের দাবীদার। মানবতার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বিদায় হজ্জে ঘোষণা করেছেন- "নারী পুরুষ সম অধিকার।" বিদায় হজ্জের ভাষণে নবী (সা) দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেনঃ "হে আমার উন্মতেরা শোন, নারী জাতির কথা ভুলোনা। নারীর উপর পুরুষের যেরূপ অধিকার আছে, পুরুষের উপর নারীরও সেরূপ অধিকার আছে।" বর্ণিত হাদীসের আলোকে বলা যায় ইসলামে সংকীর্ণতার স্থান নেই আবার বল্গাহীনতারও ছাড় নেই। পবিত্র কুরআনে ইসলাম, ইসলামী জীবন বিধান ও শরীয়তকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব ধরনের সংকীর্ণতামুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন, "তোমাদের জন্য ইসলামে কোন জটিলতা ও সংকীর্ণতা রাখা হয়নি।" অতএব মুসলিম নারীর জীবন, কর্মতৎপরতা, তার সম্মান-মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষণে কোন ধরনের বাঁধার অবকাশ নেই।

নারীর স্বাধীন ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন, সমাজ জীবনে তার অংশগ্রহণ এবং পুরুষের সাথে তার অপরিহার্য সাক্ষাতের বিষয়টি শরীয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং রাসূল (সা) তা বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। ইসলামী জীবন বিধানের অনুসারী একজন নারী নির্ধারিত বিধি-নিষেধ অথচ কল্যাণকর নির্দেশিকা মান্য করে পুরুষের পাশাপাশি বৈধ সকল প্রকারের কর্মতৎপরতায় অংশ নিতে পারে। এ অধিকার ইসলাম তাকে দিয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সা) স্বীকৃত মর্যাদায় মুসলিম নারীরাই ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে মুসলমানরা আজ ষড়যন্ত্রের শিকার।

ইসলাম নারীকে ভারসাম্যপূর্ণ কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থার প্রতি উৎসাহিত করেছে। নারীকে দিয়েছে সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা-দীক্ষা, আইনগত অধিকার। এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে বিভিন্ন সভ্যতায় নারী এবং ধর্ম ও ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়।[৯]

**২.২. সভ্যতার দৃষ্টিকোণে নারী ঃ**

মানব জাতির কয়েকশত বছরের ইতিহাস পাঠে জানা যায় স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন ধর্ম মানব সমাজের আদর্শ হিসেবে কাজ করেছে এবং ধর্মকে কেন্দ্র করে এক একটি সভ্যতা মানব জাতিকে জ্ঞান ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। চীন, মিশরীয়, পারস্য, বেবিলনীয়, ভারতীয়, রোমান ও গ্রীক প্রতিটি সভ্যতা ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তবে এ কথা সত্য যে, ধর্মের অথবা ধর্মগুরুর অনুসরণকারীরা বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তি ও সংকীর্ণ গোষ্ঠিস্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করেছে। অথবা সামাজিক পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা না করে গোঁড়ামীর আশ্রয় নিয়েছে এবং ধর্মকে হীন গণস্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে ধর্মের গতিশীলতাকে অস্বীকার করে মানব জাতির অনেক অকল্যাণ করেছে। তথাপিও সভ্যতার বিনির্মাণে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। সভ্যতার বিনির্মাণ, স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা যোগান, সামাজিক সংহতি ও ঐক্য সৃষ্টিতে নারীর অনন্য ভূমিকা রয়েছে।

**ক.** রোমান **সভ্যতায় নারী ঃ**

রোমান সমাজে নারীর অবস্থা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ছিল। তাদেরকে কৃতদাসীদের চেয়েও নিকৃষ্টরূপে গণ্য করা হত। সে সময় তারা নারীর মানব সত্ত্বাকে স্বীকার করত না। বরং তারা নারীকে মানুষ ও প্রাণীর মাঝা-মাঝি কোন বিশেষ শ্রেণী বা প্রজাতি মনে করত। রোমানদের কাছে নারীরা ছিল অপবিত্র বস্তু/জন্তু, তাদের আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই। ড. জামাল এ. বোদাই বলেছেন, "সপ্তদশ শতাব্দীতে রোমের পাদরীগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, নারী জাতির আত্মা নেই। সুতরাং তারা স্বর্গে প্রবেশ করবেনা।[১০]

প্রাচীন রোমান সমাজে এরূপ প্রথা ছিল যে, সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, তাকে পরিবারের অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছে, অন্যথায় ধরে নেয়া হতো যে, পিতা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সে ক্ষেত্রে শিশুকে কোন খোলা ময়দানে অথবা উপসনালয়ের বেদীতে রাখা হতো। ছেলে হলে পরবর্তী সময়ে কেউ ইচ্ছা করলে তাকে গ্রহণ করতো, নচেত শিশুটি ক্ষুধা, পিপাসায়, গরমে কিংবা শীতে ধুকে ধুকে মরতো।[১১]

বিশ্বকোষ ব্রিট্যানিকা-তে রোমানীয় সভ্যতায় নারীর সামাজিক অধিকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

"রোমীয় আইনে একজন বিবাহিতা রমনীর অধিকার ছিল যে, নিজে এবং তার ধন-সম্পত্তি তার স্বামীর কর্তৃত্বাধীনে চলে যেত, স্ত্রী ছিল তার স্বামীর কেনা সম্পত্তি। ক্রীতদাসীর মতই তাকে স্বামীর লাভের জন্য আনা হত। সাধারণ কোন অফিস পরিচালনা করার কোন অধিকার কোন নারীর ছিল না। সে সাক্ষী হতে পারতো না, পারতো না কারো জামিনদার, অভিভাবক বা তত্ত্বধায়ক হতে পারতনা। সে অর্পণকারিনী বা অর্পিতাও হতে পারতো না অথবা কোন উইলকার বা চুক্তিপত্র করা বা স্বাক্ষর করার অধিকারও তার ছিলনা।[১২]

জন স্টুয়ার্ট মিল তার " দি সাবজেকশন অব ওমেন" (The Subjection of Women)- এ লিখেছেন, "আমাদেরকে বারবার বলা হচ্ছে যে, সভ্যতা ও খৃষ্ট ধর্ম নারী জাতির যথাযোগ্য অধিকার পুন:স্থাপিত করেছে। স্ত্রী হচ্ছে তার স্বামীর প্রকৃত কৃতদাসী, এর চেয়ে সে কম নয়। বৈধ আইনে যতদূর বাধ্য-বাধকতা আছে তাতে নারীকে ক্রীতদাত্রীই বলা হতো।"[১৩]

অর্থনৈতিক যোগ্যতার দিক দিয়ে কন্যা শিশুর আদৌ কোন মালিকানা অধিকার থাকতো না। সে কোন অর্থ উপার্জন করলেই সেটা পরিণত হতো পরিবার প্রধানের একটা বাড়তি সম্পতিতে। এমনকি মেয়ের বয়োপ্রাপ্তি কিংবা বিয়ে হয়ে গেলেও তার কোন মালিকানা থাকতো না। পরবর্তীকালে সম্রাট কনস্টানটাইনের শাসনামলে স্থির হয় যে, মেয়ে যে সম্পত্তি তার মায়ের উত্তরাধিকার হিসেবে পাবে, তা তার পিতার সম্পত্তি হবে না, বরং মেয়ের সম্পত্তি হবে, তবে পিতা সে সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারবে। মেয়ে যখন পিতার আনুগত্য থেকে মুক্ত হবে, তখন পিতা তার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ নিজের মালিকানাধীন করে নিতে পারবে এবং বাকী দুই তৃতীয়াংশ মেয়ের থাকবে। পরিবার প্রধান মারা গেলে বয়োপ্রাপ্ত পুত্র সন্তান স্বাধীন হয়ে যেত। কিন্তু যুবতী কন্যা স্বাধীন হতো না। কন্যা যতদিন বেঁচে থাকতো, ততদিন অন্য একজন অভিভাবক তার মনিব হতো। পরবর্তীকালে এ বিধি সংশোধিত হয়। আইনগত অভিভাবকের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এরূপ কৌশল প্রবর্তন করা হয় যে, নারী নিজেকে নিজের মনোপুত কোন অভিভাবকের কাছে বিক্রি কারে দেবে এবং উভয়ের মধ্যে এ মর্মে চুক্তি হবে যে, এ আত্মবিক্রির উদ্দেশ্য হলো পূর্ববর্তী মনিবের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করা। এ চুক্তির কারণে নতুন মনিব তাকে তার পছন্দমত যেকোন কাজে বাঁধা

দিত না। আর যদি যুবতী কন্যা বিয়ে করে, তবে তাকে তার স্বামীর সাথে সার্বভৌমত্ব চুক্তি নামে একটা চুক্তি সম্পাদন করতো হতো, অর্থাৎ স্বামীকে স্ত্রীর উপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব দিতে হতো।" [১৪]

প্রাচীন রোমান সমাজে নারীর দন্ডমুন্ডের অধিকারী ছিলেন পরিবার প্রধান। সন্তান মেয়ে হলে তাকে আজীবন পিতার অনুগত থাকতে হতো। সন্তানের ন্যায় নিজের স্ত্রীর ওপর। নিজের পুত্রদের স্ত্রীদের উপর এবং পৌত্রদের ওপরও পরিবার প্রধানের কর্তৃত্ব বজায় থাকত। এই কর্তৃত্ব বলতে বুঝাতো বিক্রি করার অধিকার, বহিষ্কার করার অধিকার, শাস্তি দেয়ার অধিকার, এমনকি হত্যা করার অধিকারও। পরিবার প্রধানই এককভাবে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতো এবং এ ব্যাপারে তাদের মতামতের আদৌ কোন অধিকার থাকতো না। পরিবার প্রধান মারা গেলো বয়োঃপ্রাপ্ত পুত্র সন্তান স্বাধীন হয়ে যেত। কিন্তু যুবতী কন্যা স্বাধীন হতো না। বিয়ে হয়ে গেলে নারীর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব অর্পিত হত একটি সার্বভৌমত্ব চুক্তি, অপচুক্তির মাধ্যমে। এ সমাজে নারীর আইনগত অধিকার ছিল শর্ত সাপেক্ষে। দাসদাসী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুরা, বালক-বালিকা, বুদ্ধিতে অপরিপক্ক,ঋণগ্রস্ত, ঋণগ্রস্তপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যা ও স্ত্রীগণ। অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে ঋণগ্রস্ত ও অভিভাবকের আশ্রিত স্বাধীন প্রাপ্তবয়স্কা নারীগণ।[১৫]

বিশ্বকোষ ব্রিট্যানিকার পরবর্তী সংস্করণে উল্লেখ রয়েছে ঃ "প্রাচীন রোমদেশে নারী জাতির বৈধ অবস্থান ছিল, সে ছিল পরিপূর্ণ পরাধীন। সে প্রথমে তার বাপের অথবা তার ভাইয়ের অধীনে থাকতো, অত:পর তার স্বামীর কর্তৃত্বাধীন চলে যেত। স্বামী তার স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব করার পৈত্রিক ক্ষমতা লাভ করত। আইনের দৃষ্টিতে নারী জাতিকে নির্বোধ বা দুর্বলচেতা গণ্য করা হতো। নারীর এ নির্বুদ্ধিতা তাকে নির্দিষ্ট কোন অবস্থায় আইন অমান্য করার ক্ষেত্রে দোষের অভিযোগ অস্বীকার করার সমর্থনে বাদানুবাদ করতে সক্ষম করতো এবং ইহা নারীর জন্যে দোষ লঘু করার অবস্থা বিবেচিত হতো। কিন্তু এতে তার কোন চুক্তিপত্রে সহি করা বা উইল করা বা সাক্ষ্য দেয়ার কাজ করার অযোগ্য প্রমাণিত হতো। আর তারা জনসাধারনের কোন অফিস পরিচালনা করতেও পরতো না।[১৬]

পরবর্তীতে নারীদের সম্পর্কে রোমানদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয়েছিল। রোমান আইন তাদেরকে পিতা ও স্বামীর কর্তৃত্ব হতে স্বাধীন করে দিয়েছিল। ফলশ্রুতিতে সমাজের সামাজিক ক্ষমতা পুরুষের পরিবর্তে নারীদের হাতে কুক্ষিগত হল। নারীরা স্বামীদিগকে উচ্চহারে সুদের টাকা কর্জ দিতে লাগল ফলে স্বামী ধনাঢ্য স্ত্রীর দাসে পরিণত হল। তালাক এত সহজ বস্তু হয়ে পড়ল যে, কথায় কথায় দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন হতে লাগলো। বিখ্যাত রোমান দার্শনিক ও পন্ডিত 'স্নীকা' খ্রিষ্টপূর্বঃ (৫৬-৪) খ্রিষ্টাব্দ তালাকের আধিক্যের জন্য অনুতাপ করে বলেন, "আজকাল রোমে তালাক কোন লজ্জার ব্যাপার নহে, নারী তাহার স্বামীর সংখ্যার দ্বারাই নিজের গণনা করে।"[১৭]

**খ. গ্রীক সভ্যতায় নারী ঃ**

গ্রীক সভ্যতায় নারীর কোন অধিকার ছিল না। নারীরা ছিল সন্তান প্রসবের যোগ্য ক্রীতদাসী, গৃহের মধ্যে বিচিত্র, শিক্ষা হতে বঞ্চিত, স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়া বেশি কিছু নয়। নারীর অধিকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্তমান বিশ্বকোষ ব্রিট্যানিকায় উল্লেখ রয়েছে ঃ "নারীর মর্যাদা অধ:পতিত হয়ে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে নারীদেরকে কেবলমাত্র সন্তান প্রসবের যোগ্য ক্রীতদাসী মনে করা হতো। তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ঘরের মধ্যে রাখা হতো। জ্ঞান অর্জনের কোন অধিকার তাদের ছিল না। অন্য কোন অধিকার ছিল না বললেই চলে। স্বামীদের কর্তৃক স্ত্রীদেরকে অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়া আর কিছু মনে করা হতো না।"[১৮]

সে সময় বিয়েতে নারীর মতামত দেয়ার অধিকার ছিল না। এথেন্সে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "বিয়েতে নারীর মতামত দেওয়ার অধিকার ছিল না। কাজেই বিয়েতে সাধারণত ঃ তাদের সম্পত্তি নেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হতো না। উক্ত বইতে আরো বলা হয় ঃ "She was obliged to submit to the wishes of her parents, and receive from them her husband and her lord, even though he was stranger to her."[১৯]

গ্রীক সভ্যতায় নারী সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ণ অত্যন্ত ভয়াবহ ও শোচনীয়। প্রাচীন গ্রীক সমাজে নারী ছিল অত্যন্ত ঘৃণিত, অবহেলিত ও অসামাজিক বস্তু। সক্রেটিসের ভাষায় বেশ সুন্দররূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। তিনি বলেন, "নারী জগতে বিশৃঙ্খল ও ভাঙ্গণের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। সে দাফালি বৃক্ষের ন্যায়, যা বাহ্যত খুব সুন্দর দেখায়। কিন্তু চড়ুই পাখি ইহা ভক্ষণ করলে এদের মৃত্যু অনিবার্য।"[২০] কিন্তু প্রাচীন গ্রীক সমাজের নারীকেই প্রথম সভ্য নারী বলা চলে।

এন্ডারস্কি (Anderoski) নারী সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করে বলেন, "অগ্নিতে দগ্ধ রোগী ও সর্প দংশিত ব্যক্তির আরোগ করা সম্ভব নয়।" [২১]

গ্রীক সমাজে নারীদের সামাজিক অবস্থা নিয়ে ফ্রান্সের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ Geustavele Bond তাঁর Arad civilization বইতে লিখেছেন ঃ গ্রীকদের কাছে নারীরা ছিল সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম জীব। তারা মনে করতো বংশধারা সংরক্ষণ এবং সন্তান লালন-পালনের জন্যেই নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে। এর বাইরে নারীদের কোন ক্ষেত্র থাকতে পারে না। গ্রীক জনকরা প্রতিবন্ধী আপন সন্তানদের হত্যা করতেও কুণ্ঠাবোধ করত না।[২২]

গ্রীক চিন্তাবিধ ডিমোসথিনেস (Demosthenes) এর ভাষায়, "আমরা গার্লফ্রেন্ড গ্রহণ করি কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য, কিন্তু একমাত্র বৈধ সন্তান প্রাপ্তিই আমাদের বিবাহের মূল উদ্দেশ্য।"[২৩]

অতপর গ্রীক সভ্যতা যখন উন্নতির উচ্চতর শিখরে আরোহণ করলো, তখন নারীরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলো এবং পুরুষের সাথে প্রকাশ্যে সভা সমিতিতে অবাধে মেলামেশা করতে লাগলো। ফলে নির্লজ্জতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়লো যে, ব্যভিচার আর দূষণীয় মনে হতো না।[২৪]

আব্দুল্লাহ এ.এম. হাতিমি গ্রীক নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করে বলেন, "গ্রীক সভ্যতার গৌররোজ্জ্বল যুগে সতী-সাধ্বী নারী মহামূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত হতো। সে সময় পর্দা প্রথা মেনে চলত। পরবর্তী যুগে বারবনিতালয় গ্রীসের সর্বস্তরে লোকদিগকে আকর্ষণ করে এবং তখন জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণেও পতিতাদের প্রভাব প্রতিফলিত হত। পতিতালয় যেন তখন এক প্রকার উপাসনালয়ে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছিল। কারণ তাদের মতে প্রেম ও সৌন্দর্য্যের দেবী আফ্রোদিতি প্রতিনিধি। সে তার স্বামীদেরকে পরিত্যাগ করে অপর তিন দেবতার সঙ্গে অবৈধ প্রেমে নিমজ্জিত হয়েছিল।[২৫]

স্পার্টাবাসীরা অবশ্য নারীদের প্রতি কিছুটা নমনীয় ছিল। এর কারণ ছিল স্পার্টার দীর্ঘ যুদ্ধাবস্থা। যেহেতু পুরুষরা সারাক্ষণ যুদ্ধে ব্যস্ত থাকত, তাই তারা গৃহস্থালির কাজ নারীদের দায়িত্ব দিত। এ কারণে স্পার্টার নারীরা এথেন্স ও অন্যান্য গ্রীস নগরীর মহিলাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি স্বাধীনতা ভোগ করত। তথাপি নারীদেরকে এরিস্টটল এই অধিকার প্রদানের জন্য স্পার্টাবাসীকে দোষারোপ করতেন এবং অধিকার প্রদানই স্পার্টার পতনের জন্য দায়ী মনে করতেন।[২৬]

লেকী তার ইউরোপের নৈতিকতার ইতহাস গ্রন্থে লিখেছেন, "সামগ্রিকভাবে সতী সাধবী গ্রীক ললনাদের মর্যাদা ছিল চরম অধি:পতিত। তাদের গোটা জীবন অতিবাহিত হত দাসত্বের উশৃঙ্খলে। শৈশবে পিতা-মাতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধ্যক্যে তারা ছিল ছেলেদের তত্ত্বাবধানে শৃঙ্খলিত।[২৭]

প্লেটো অবশ্য নারী পুরুষের সমতার দাবী করে ছিলেন। কিন্তু তা মৌখিক ও তাত্ত্বিক বৈ কিছুই ছিলনা। বরং বাস্তব জীবনে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল নিরেট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক। অর্থাৎ বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান শক্তিশালী সন্তান উৎপাদন দেশের প্রতিরক্ষার কাজে আসবে। স্পার্টার আইনে একথা স্পষ্ট লিপিবদ্ধ ছিল যে, অল্প বয়স্ক ও দুর্বল স্বামীর উচিত তার অল্প বয়স্কা স্ত্রীকে অন্য কোন যুবকের হাতে তুলে দেয়া, যাতে সেনাবাহিনীতে শক্তিশালী সৈনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

**গ. বৃটিশ সভ্যতায় নারী ঃ**

এক শতাব্দীর কিছু পূর্বে বৃটিশ সাম্রাজ্যে নারীরা পুরুষের জুলুম নির্যাতনের স্বীকার ছিল। এমন কোন শক্তিশালী আইন ছিল না, যা পুরুষের বাড়াবাড়িকে প্রতিরোধ করতে পারত। ইংল্যান্ডের আইনে এ বিষয়টি স্বীকৃত ছিল যে, বিয়ের পর পুরুষের স্বভাব প্রকৃতিতে কোন পরিবর্তন আসে না। কিন্তু বিয়ের পর নারীর ব্যক্তিত্ব পুরুষের ব্যক্তিত্বের একটা অংশে পরিণত হয়। এর উপর ভিত্তি করে নীতি গড়ে উঠেছিল যে, নারীর কোন ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি থাকলে বিয়ের পরে তা পুরুষের মালিকানায় চলে যাবে। তবে বিয়ের পূর্বে নারী তার সম্পদের ব্যাপারে কোন চুক্তি করলে তা চুক্তি অনুযায়ী কার্যকর হবে। পুরুষ ইচ্ছা করলে নারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারত। পক্ষান্তরে তাকে স্ত্রীর সম্পদের বৈধ হকদার মনে করা হতো। কোন কাজ করার ব্যাপারে নারীর স্বাধীনতা ছিল না। এমনকি অর্থ উপার্জন করে নিজের জন্য খরচ করা কিংবা পছন্দমত বিয়ে করার অধিকারও তার ছিল না।

মেয়েদেরকে পিতা-মাতার মালিকানা মনে করা হত। পিতা-মাতা যার সাথে ইচ্ছে বিয়ে দিত। বিয়ে ছিল একটি ব্যবসার মত, যার মাধ্যমে পিতা-মাতা মেয়েদেরকে অন্য ছেলেদের কাছে বিক্রি করে দিত। নারী স্বাধীনতার বিখ্যাত প্রবক্তা জেমস মিল (James Mill) তার "দি সাবজেকশন অব ওমেন " গ্রন্থে লিখেছেন, ইউরোপের ইতিহাসের দিকে তাকান, দেখতে পাবেন, খুব বেশী দিন অতিবাহিত হয়নি, যখন বাপ তাঁর মেয়েকে যেখানে ইচ্ছে বিক্রি করে দিত। এ ব্যাপারে তার ইচ্ছার কোন তোয়াক্কাই করা হতো না। [২৮]

খ্রিষ্ট ধর্ম প্রসারের পূর্বে পুরুষ ছিল সবকিছুর একমাত্র মালিক। নারীর তুলনায় পুরুষের অপরাধের জন্য কোন শাস্তি বা আইন কিছুই ছিল না। পুরুষ যখনই চাইতো স্ত্রীকে পরিত্যাগ করত। কিন্তু কোন অবস্থায়ই  সাথে নারীর সম্পর্ক পুরুষের ছিন্ন করার এখতিয়ার ছিল না।

ইংল্যান্ডের প্রাচীন আইনে পুরুষকে নারীর মালিক বলা হয়েছে। তবে কার্যত সে ছিল তার বাদশাহ। এমনকি স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে হত্যা করার পদক্ষেপকে আইনের পরিভাষায় ছোট-খাটো বিদ্রোহ বলে হালকাভাবে দেখা হতো। কিন্তু নারী ঐ একই অপরাধে অপরাধী হলে তাকে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ ছিল। নারী ছিল পুরুষের খরিদ করা দাসীর মত। স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কোন সম্পদ গচ্ছিত করতে পারত না। যদি করতো তাহলে আপনা হতে তা স্বামীর সম্পদ বলে গণ্য হতো। এক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের আইন নারীর এতটুকু মর্যাদাও স্বীকার করত না যা অন্য সব দেশে দাসেরাও ভোগ করত।

**ঘ. পারস্য সভ্যতায় নারী ঃ**

পারস্য সভ্যতায়ও নারীরা ছিল চরম নির্যাতনের স্বীকার। হাম্মুরাবীর (hammurabi) আইনে নারীকে গৃহপালিত জীব-জন্তুর পর্যায়ে ফেলা হত। একারণে কেউ কারো মেয়েকে হত্যা করলে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে ঐ মেয়ের বাবার কাছে হত্যাকারীর নিজের মেয়েকে চিরতরে হস্তান্তর করতে হতো। সে মেয়েকে হত্যা করুক বা দাসী হিসেবে ভোগ করুক, সেটা ছিল তার ইচ্ছাধীন ব্যাপার। তারা নারীকে সর্ব সাধারণের সম্পত্তি বলে মনে করত। প্রত্যেক পুরুষ যে কোন কারো স্ত্রীর সাথে নিজের স্ত্রীর মত আচরণ করতে পারত। নারীকে পণ্য রূপে বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করা হতো।

**ঙ.** হাম্মুরাবীর **আইনে নারী ঃ**

হাম্মুরাবীর আইনে নারীকে গৃহ পালিত জীব-জন্তুর পর্যায়ে ফেলা হতো। এ কারণে কেউ কারো মেয়েকে হত্যা করলে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে ঐ মেয়ের বাবার কাছে হত্যাকারীর নিজের মেয়েকে চিরতরে হস্তান্তর করতে হত। সে ঐ মেয়েকে হত্যা করুক বা দাসী হিসেবে রেখে দিক সেটা তার ব্যাপার।[২৯]

**চ. চীনা সভ্যতায় নারী ঃ**

প্রাচীন চীনা সভ্যতায় নারীদের মর্যাদা ও সামাজিক নিরাপত্তা ছিল সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। চীনের ধর্মগ্রন্থে নারীকে Waters of woe (দুঃখের প্রস্রবণ) হিসেবে বর্ণিত করে উল্লেখ রয়েছে- যা সকল সৌভাগ্য ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নারী কোন সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত না। এমনকি তার সন্তানদিগের উপরও কোন অধিকার থাকত না। স্বামীর যখন ইচ্ছা তখনই স্ত্রীকে তালাক দিতে পারত এবং অপরের উপ-পত্নীরূপে তাকে বিক্রিও করতে পারত। বিধবা হলে তাকে স্বামীর পরিবারের সম্পত্তিরূপে জীবন যাপন করতে হত এবং পুনঃ বিবাহ তার জন্য প্রায় অসম্ভব ছিল।[৩০]

চীনা নারী সম্পর্কে Said Abdullah Seif Al-Hatimy লিখেছেন, "ব্যভিচারের ন্যায় অপরাধে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারত। তার মাতা-পিতা তাকে গ্রহণ করতে সম্মত হলে সে তাদের নিকট চলে যেত। অন্যথায় তাকে রাস্তায় বাহির করে দিত।"[৩১]

চীনদেশের নারীদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে জনৈকা চীনদেশীয় নারী বলেন, "মানব সমাজে নারীদের স্থানই সর্বনিম্ন। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস, নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারী থেকে নিকৃষ্ট আর কিছুই নেই।"[৩২] সভ্যতা ও শিক্ষার দিক থেকে চীনারা ছিল বেশ উন্নত। কিন্তু নারীদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারা উদাসীন ছিল। নারীরা ছিল অবহেলিত ও নির্যাতিত। একটি চীনা প্রবাদে আছে, "তোমরা স্ত্রীর কথা শোন, তবে বিশ্বাস করো না।"

**ছ. ভারতীয় সভ্যতায় নারী ঃ**

ভারতীয় উপমহাদেশেও ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারী জাতির অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। নারী পাপ এবং নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা ধ্বংসের মূল উৎস বলে বিবেচিত হত। সুতরাং তাকে সর্বদা শাসনাধীনে রাখাই ছিল আসল রীতি। মনু'র মতে তাকে দিবা-রাত্র অবশ্যই পুরুষের কড়া শাসনে রাখা আবশ্যক। কারণ, নারী জন্মগতভাবেই দুশ্চরিত্রা ও লম্পট। অতএব, তাকে কঠোর শাসনে না রাখলে সে অবশ্যই বিপথগামী হবে।[৩৩]

প্রাচীন ভারতে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল সতীদাহ প্রথা। সে সমাজে নারী ছিল অশুভ প্রাথী বিশেষ। সতীদাহ প্রথা অনুসারে বিধবা নারী স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন করাকে অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন যাপন অপেক্ষা শ্রেয় মনে করত। এ সম্পর্কে প্রফেসর ইন্দ্রিয়া বলেন, æনারীর ন্যায় এত পাপ-পঙ্কিলতাময়

প্রাণী আর নেই। নারী প্রজ্জুলিত অগ্নিস্বরূপ সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এ সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট তৎকালীন হিন্দু সমাজে পুত্র সন্তান জন্মালে আনন্দের শেষ ছিল না কিন্তু বিষাদের ছায়া নেমে আসত তখনই যখন কন্যা সন্তান জন্মাত।"[৩৪]

æহে দেবতা: নারী সন্তান অন্যত্র দান কর। আমাদের পুত্র সন্তান দাও।" [৩৫] মনুসংহিতায় নারীকে দাসী হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে আর স্বামীকে দেবতার আসনে সমুন্নত করা হয়েছে। স্বামী যতই দুশ্চরিত্র, মদ্যপায়ী, আফিমখোর, ভাংখোর ও পরনারী আসক্ত হোক না কেন, স্ত্রী হিসেবে স্বামী দেবতার পদসেবা করাই নারীর ধর্ম এবং এতেই রয়েছে নারীর মুক্তি ও স্বর্গবাস। শুধু তাই-ই নয়, পতি দেবতার মৃত্যু হলে তার স্ত্রীকে এমনকি বাল্য বধুকেও স্বামীর একই চিতায় দগ্ধ হয়ে সহমরণে শরীক হয়ে স্বর্গবাসের সনদপত্র দিতে হবে-এটাই হল এ ধর্মের অনুমোদিত নিষ্ঠুর প্রথা যা সতীদাহ প্রথা নামে পরিচিত। এ ধর্মের যে আইনটি নারীদের নিরাপত্তার সবচেয়ে বেশি অভাব ঘটিয়েছে তা হচ্ছে পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী নয় বলেই বিবাহের সময় বিরাট অঙ্কের টাকা পাত্রকে যৌতুক দিয়ে মেয়েকে পাত্রস্থ করতে হয় অথচ সেই টাকায় কন্যার তেমন কোন উপকার হয় না। কারণ পুরা টাকাটাই পাত্র পক্ষের ইচ্ছা অনুযায়ী খরচ হয়ে যায়। ভবিষ্যতে বিপদাপদে মেয়ের কোন উপকারেই আসে না।[৩৬]

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীদের বিবাহ পিতা কর্তৃক কন্যা বিক্রয়স্বরূপ ছিল। নারীরা সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত না। সে যুগে বালিকাকে দেবতার নামে উৎসর্গ করা হত দেবতারা তাদের সঙ্গে বিবাহিত স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করত। অবশেষে বালিকাগণ মন্দিরের পুরোহিত ধর্মকর্তাদের অধীনে চলে যেত। বৈদিক যুগে নারী যুদ্ধে লব্ধ লুটের মালের ন্যায় ছিল। স্বামী স্ত্রীকে সেবাদাসী রূপে ব্যবহার করত। কন্যা সন্তান প্রসবকারী স্ত্রী সর্বদা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হত। বিবাহে নারীদের মতামত দেয়ার অধিকার ছিল না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল, রেষারেষি, শত্রুতা ও ঘৃণা বিরাজ করলে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো যেত না।[৩৭] বিধবা নারীর বিবাহ করা নিষিদ্ধ ছিল।

**২.৩.ধর্ম ও মানব জীবন ঃ**

জীবনের প্রতি মানুষের অতৃপ্ত বাসনা, অন্যান্য অভিজ্ঞতা থেকে ধর্মীয় অভিজ্ঞতাতেই অধিকতর সার্থকতা লাভ করে। ধর্ম মানুষকে পরিপূর্ণ জীবনের সন্ধান যেভাবে দিয়েছে তেমনটি অন্য কোন মতবাদ দিতে পারেনি। জৈব-আকাঙ্খার বেড়াজাল ভেঙ্গে ধর্ম জীবনকে অনেক ঊর্ধ্বে স্থাপন করতে পেরেছে। কেবলমাত্র অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত না রেখে মানুষকে সত্য শিব ও সুন্দরের মধ্যে উন্নততর পরিতৃপ্তির সন্ধান দিয়েছে। অবশ্য একথা সত্য নাও হতে পারে যে, ধর্মই কেবল আমাদের এ অভিনব মূল্যের সন্ধান দিয়েছে। কারণ ধর্মীয় অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক অভিজ্ঞতার সাহায্যেও মানুষ সত্য-সুন্দরের অন্বেষণ করেছে। কিন্তু ধর্ম-জীবনকেই মানুষ ঐ মূল্যগুলিকে একটা বিশাল সুসংবদ্ধ জীবন-যাপন প্রণালীর মধ্যে সুসংঘটিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং এ বিধানকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। যে জীবনে আছে পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধির নির্দেশ, যে জীবনে আছে ইন্দ্রিয় জয় করার উপায়, সেই জীবনকেই আমরা আদর্শ জীবন বলি।[৩৮]

একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, আদিম মানুষের কাছে এসব ধারণা ছিল নিতান্ত অস্পষ্ট। স্পষ্টতর রূপ নিতে এ ধারণাগুলোকে বিবর্তণের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করতে হয়েছে। এক সময় ধর্ম ছিল লৌকিক শুভ বা পার্থিব মঙ্গল লাভের উপায়মাত্র। যুদ্ধজয়, প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ প্রকৃতি তখন ছিল মঙ্গলের রূপ। এ মঙ্গল আদিম মানুষের জীবন সংগ্রামের সহায়ক ছিল। বিপজ্জনক পরিবেশের মধ্যে নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্তা লাভের অনুভূতি থেকে আদিম মানুষের মনে এ মঙ্গলের ধারণা জন্মছিল। কিন্তু এ ধারণা যতই বিকাশ লাভ করতে লাগল কেবলমাত্র জৈব-আকাঙ্খার পরিতৃপ্তির মধ্যে তখন আর সে সীমাবদ্ধ থাকলো না। জীবনের বিশেষ এক ধরনের আকাঙ্খার পরিতৃপ্তির পথ সে অন্বেষণ করতে আরম্ভ করলো। দৈহিক মঙ্গলের ধারণা মানুষ ক্রমে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করলো, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় সুখে মানুষ তৃপ্ত হতে পারে না। পাকস্থলী ও আত্মা দুটি পৃথক জিনিস। তাছাড়া ধর্ম প্রথম থেকেই আত্মিক প্রকৃতির। একটি অদৃশ্য শক্তি অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'য়ালার দ্বারা মানুষ সর্বদা নিয়ন্ত্রিত-এ বিশ্বাস থেকেই ধর্মের সূচনা হয়েছিল। সেই অস্পষ্ট অনুভূত অদৃশ্য শক্তি মহান আল্লাহর ধারণা, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক ধারণায় ক্রমশ রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

পৃথিবীর আদিকাল থেকে ধর্ম মানুষ ও মানব সমাজের একান্ত সহযাত্রী হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর সূচনাকাল থেকে অদ্যাবধি অধিকাংশ মানুষ ধর্মের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। অতএব মানব সমাজে ধর্ম একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। মনীষী ফেজারের মতে ধর্ম বলতে বুঝায়, "মানুষের চেয়ে এক উচ্চতর শক্তির সন্তুষ্টি বিধান, যে শক্তি মানব জীবন ও প্রকৃতির ধারাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। তাঁর মতে ধর্মের উপাদান দুইটি। একটি মানুষের চেয়ে উচ্চতর শক্তিতে বিশ্বাস। আর অপরটি সেই উচ্চতর পরম শক্তির আরাধনা করা।[৩৯] ফরাসী সমাজ বিজ্ঞানী এমিল

দূরখাইমও ধর্মের অনুরূপ দুইটি উপাদানের কথা বলেছেন, "একটি হল বিশ্বাস আর অপরটি হল আচার।[৪০] ধর্ম বলতে আমরা বুঝি এমন একটি ব্যবস্থাকে যে ব্যবস্থা মানুষের সে সব চরম সমস্যা মোকাবেলা করতে চেষ্টা করে যে সব সমস্যা আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দিয়ে সমাধান করা সম্ভব নয়।

মানব সমাজের যাত্রালগ্ন থেকে আমরা দেখি ধর্ম ও সমাজের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আদিম মানুষের ক্ষেত্রে ধর্ম বিশ্বাসের চেয়ে আবার পদ্ধতি ছিল প্রধান। এই আচার পদ্ধতি বলতে বুঝায় পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের কর্ম সম্পাদনের রীতিনীতি। এই প্রার্থনা ও অর্চনার পদ্ধতি এক সময় উপাসনার বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে এবং পবিত্র সঙ্গীত, কীর্তন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে নৃত্য নিবেদন, বলিদান ও নৈবেদ্য সামাজিক রীতিনীতি তথা এক ধরনের ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। যা কিছু মানুষের কাছে বিস্ময়রূপে দেখা দেয় এবং কোন অস্তিত্বের কোন ব্যাখ্যা দিতে সে যখন অক্ষম বা অপারগ হয় তখন সে বস্তু যা তার কাছে আপাত রহস্যাবৃত মনে হয় তার ওপর অলৌকিকত্বের গুণারোপ করে মূর্তি বা বিগ্রহের জন্ম দেয়। এভাবে উদ্ভব ঘটে দেবদেবীর উপাসনা এবং নিস্প্রাণ অক্ষম এ জড় মূর্তি বা বিগ্রহের কাছে মানুষ তার সকল কামনা, বাসনা বা আকাঙ্খা ব্যক্ত করে প্রার্থনা বা অর্চনায় রত হয়। গোত্রভিত্তিক সমাজ হওয়ায় আদিম মানুষ তাদের প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানই সমবেতভাবে করত।

মানব জাতির কয়েকশত বছরের ইতিহাস পাঠে জানা যায় স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন ধর্ম মানব সমাজের আদর্শ হিসেবে কাজ করেছে এবং ধর্মকে কেন্দ্র করে এক একটি সভ্যতা মানব জাতিকে জ্ঞান ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। চীনা, মিশরীয়, পারস্য, বেবিলনীয়, ভারতীয়, রোমান ও গ্রীক প্রতিটি সভ্যতা ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তবে এ কথা সত্য যে, ধর্মের অথবা ধর্মগুরুর অনুসরণকারীরা বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তি ও সংকীর্ণ গোষ্ঠিস্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করেছে। অথবা সামাজিক পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা না করে গোঁড়ামীর আশ্রয় নিয়েছে এবং ধর্মকে হীন গণস্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে ধর্মের গতিশীলতাকে অস্বীকার করে মানব জাতির অনেক অকল্যাণ করেছে। তথাপিও সভ্যতার বিনির্মাণে ধর্মের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

একথা অনস্বীকার্য যে, সমাজের সাথে ধর্মের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। সমাজের সাথে সংস্কৃতির এবং এর সঙ্গে তার ধারক মানবগোষ্ঠির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। ফলে ধর্মের সঙ্গে শুধু যে সমাজের যোগসূত্র তাই নয় ধর্মের সাথে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির ও সংস্কৃতির নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। সমাজের আর্থিক ব্যবস্থা ও তাঁর শ্রেণী বিভাজন, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, সমাজে রাজনৈতিক সমস্যা ও সংগঠন, জ্ঞাতি সম্পর্ক এমনকি পরিবার ও বিবাহ প্রথা, নন্দনতত্ত্ব এবং সামাাজিক সৌন্দর্যবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানকে ধর্মবিশ্বাস ধর্মাচার অনিবার্যভাবে প্রভাবিত করে।

ধর্ম সমাজের সংহতির সহায়ক, ধর্মীয় বিশ্বাস আচার পদ্ধতি, ধর্মীয় প্রতীক ও ধর্মীয় তীর্থস্থান সমূহের মাধ্যমে ধর্ম সমাজকে সংহত করে এবং মানুষকে একটি অতিন্দ্রীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে। দৈনন্দিন কর্মমুখর জীবনে মানুষ নিজ নিজ ব্যক্তিগত এবং শ্রেণীগত স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত থাকে। তার অর্থ হলো সমাজের সাধারণ মানুষের সমষ্টিগত স্বার্থের বিষয়টি তখন অনেকটা অবহেলিত বা উপেক্ষিতই থাকে। সমাজের উপর ধর্মের প্রভাব সুদূরপ্রসারী ও অনস্বীকার্য। ধর্মীয় উৎসব ও আচার পদ্ধতি সমাজে মানুষের যৌথ জীবনকে মহিমান্বিত ও সমমর্মী করে তোলে।

সমাজের সংহতি বিধানে ধর্মের ভূমিকা অনস্বীকার্য ও অপরিহার্য। কেননা মানুষ পরস্পরের সঙ্গে নিরন্তন আদান প্রদান লেনদেন সম্ভাব ও সংঘাতে লিপ্ত থাকে। মানুষ আত্ম-সচেতন, স্বার্থপর এবং আত্মোন্নতিতে সব সময়ে সচেষ্ট থাকে। নিজের স্বার্থোদ্ধার তার প্রধানতম লক্ষ্য, এই লক্ষ্য অর্জনে সে নিজের পছন্দসই মূল্যবোধ গড়ে তোলে। আর অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ব্যক্তি নিজ স্বার্থে অন্যের স্বার্থের শুধু পরিপন্থীই হয়েই দাঁড়ায় না সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষের বিনাশ সাধনে উদ্যোগী হয়। এতে কেউ চরম বিকৃতির তৃপ্তি লাভ করে আবার অনেকে সাফল্য অর্জন করলেও গৌরববোধ করা থেকে বঞ্চিত থাকে। অন্যকে দুঃখ দিয়ে কেউবা সুখ নিশ্চিত করে। আবার অন্যের উন্নতির পথে কেউবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আত্মোন্নয়নের চরম শিখরে উঠতে চেষ্টা করে। এ থেকে জন্ম নেয় পরশ্রীকাতরতা যা থেকে হিংসা, বিদ্বেষ, অসূষ, পৈশন্য ও সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠে।

আমরা মানুষের মাঝে পরস্পর বিরোধী দু'টি প্রবণতা লক্ষ করি। একটি হলো সমাজের হিত কামনা, অন্যটি হলো ব্যক্তির স্বার্থ। পরস্পর বিরোধী এ দু'টি সত্তার মাঝে এমন একটি মূল্যবোধ দরকার যা দিয়ে মানুষের পাশবিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তার ব্যক্তি স্বার্থ সমাজের সমষ্টিগত স্বার্থের যাতে ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য তার উপর এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সামাজিকায়নের মাধ্যমে সঞ্চালিত মূল্যবোধ ছাড়া আর কোথায়ও পাওয়া যায়না। বলাই বাহুল্য সকল মূল্যবোধ মানুষের সংস্কৃতি ও পরিশীলিত জীবন ধর্ম নির্ভর। ধর্মই সমাজের মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত রাখে। ধর্মীয় আচার পদ্ধতির প্রকাশ্য অনুষ্ঠান ও অনুশীলন এবং যৌথভাবে সামাজিক অনুশাসন প্রতিপালনের মধ্যদিয়ে ধর্ম সমাজকে ঐকবদ্ধ রাখে। পুরুষানুক্রমে ধর্মই সমাজের একাত্মবোধকে সচল রাখে। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নানা সন্ধিক্ষণে ধর্ম সকলকে বিশ্বাসের একতা দিয়ে বিপদাপন্ন ব্যক্তি ও ভঙ্গুর সমাজকে রক্ষা করে। ব্যক্তির

পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টার সামনে ধর্ম পারত্রিক মুক্তি লাভের সম্ভাবনা তুলে ধরে। ফলে, ব্যক্তির নিজ স্বার্থের সঙ্গে পারত্রিক মোহের একটা আপোষের সৃষ্টি হয় যার ফলে স্বার্থসিদ্ধির তীব্রতা হ্রাস পায়। স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা হ্রাস করে আশাহতের বেদনাকে লাঘব করে ধর্ম সমাজকে সংহত করে।

**২.৪. ধর্ম ও সংহতি ঃ**

পরম সত্তা মহান আল্লাহ তা'য়ালার উপলব্ধি এবং তাঁর সাথে এক ও অভিন্ন হবার মানুষের আগ্রহ ও প্রচেষ্টাকে বলা হয় ধর্ম। ধর্ম এ অর্থে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করে। ধর্মবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ পূর্ণ ও পরম সত্তাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। ধর্ম যেমন একদিকে মানুষের আত্মিক শক্তিকে জাগ্রত ও উন্নত করে, তেমনি অপর দিকে সমাজকেও ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করে। ধর্মবন্ধনে মানুষ যেমন আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত হয়, তেমনি আবার পূর্ণ সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরস্পর ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়। ধর্ম হল আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের অধীনে মানুষের ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি প্রকৃত ধর্ম শুধু মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে যায় না, তার সামাজিক জীবনেকেও উন্নত ও মহৎ করে তোলে। ধর্ম মানুষকে উদারতা, নিঃস্বার্থপরতা, দয়া, প্রীতি, ক্ষমা প্রভৃতি সদগুণ শিক্ষা দেয়। যার মধ্যে প্রকৃত ধর্মবোধ জাগ্রত হয়েছে সে প্রতিবেশীকে ভালবাসে, তার সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং সমগ্র মানব সমাজের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান, আচার ও রীতি-নীতির মাধ্যমে জনসাধারণ ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তাদের সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও সুসংহত হয়।[৪১]

আল্লাহর সাথে মানুষের যোগাযোগের সম্পর্ক স্থাপন করা ধর্মের মূল লক্ষ্য বটে, কিন্তু একই সঙ্গে ধর্ম মানুষের মধ্যে পারস্পারিক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে সামাজিক মেলামেশার ভিত্তিক সুদৃঢ় করে। ধর্মপরায়ণ তা ব্যক্তির অসৎ প্রবৃত্তিগুলিকে দমন করে নিজের বাহ্যিক আচরণকে মার্জিত ও সংহত করে। এভাবে ধর্ম মানুষকে মার্জিত ও সংহত করে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে প্রভূত সহায়তা করে থাকে। মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ তথা মানবতাবোধ জাগ্রত করার ব্যাপারে ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে এবং সমাজের সংহতি স্থাপনের কাজে ধর্মের অবদান যথেষ্ট। ধর্ম যেমন একদিকে সমাজের ও রাষ্ট্রের ঐক্য ও কল্যাণ সাধনে এবং মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানে যথেষ্ট সহায়তা করে, তেমনিই আবার অন্যদিকে সমাজের প্রভূত অকল্যাণ করে এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে রাখে। ধর্মযাজক, ধর্মবেত্তা ও পুরোহিতরা জনসাধারণের অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের সুবিধা মত ধর্মীয় অনুশাসনের ব্যাখ্যা দেয় এবং সমগ্র জনসম্প্রদায় অন্ধ বিশ্বাসে সেই ব্যাখ্যাগুলি মানিয়ে নেয় এবং তদনুযায়ী নিষ্ক্রিয় যন্ত্রের মত পরিচালিত হয়। ফলে তাঁরা স্বাধীন বিচার বুদ্ধির ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, সম্যক ধারণা গঠন করতে পারে না, কতগুলি অহিতকর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থেকে অদৃষ্টবাদী ও রক্ষণশীল হয়ে পড়ে এবং সংকীর্ণ বাঁধাধরা আচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে সামাজিক প্রগতি সম্বন্ধে উদাসীন মনোভাব পোষণ করে। এজন্য সমাজ সংস্কারকদের পক্ষে সামাজিক কুসংস্কার ও দূর্নীতি দূর করা কঠিন হয়ে পড়ে, এমনকি বিজ্ঞানীদের ধর্ম প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট থেকে নানা বাধা পেতে হয়, ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

ধর্ম একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শক্তি। এটি কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সমষ্টি নয়। ধর্ম জনমতের উৎসও বটে। সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রেও ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মানুষের ধর্ম বিশ্বাস তার রাজনৈতিক চেতনাকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করে। ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্কের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয় ধারণার সঙ্গে মুসলিম ও ইহুদী ধর্মের ধারণার সথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সম্রাট কনষ্টানটাইন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে খ্রীষ্ট ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত খ্রীষ্ট জগতে ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা ছিল। কিন্তু প্রথম থেকে ইহুদী ধর্ম ও ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতিকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবেই গণ্য করা হতো এবং রাজনীতি ধর্মীয় ব্যাখ্যাকে লংঘন করার সাহস রাখত না।

এশিয়ার অনেক দেশে আধুনিক জাতীয়তাবাদের প্রেরণা সৃষ্টি ও জাতি রাষ্ট্রের যৌক্তিকতা প্রদর্শনে ধর্ম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের জীবনেও ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এখানকার বৈসাদৃশ্যপূর্ণ সমাজে সংহতি আনয়ন করার জন্য ইহজাগতিকতা (ধর্মনিরপেক্ষ) মনস্ক রাজনৈতিকরাও ধর্মের দিকে ঝুঁকি পড়েন। এখানকার সংস্কৃতিতে ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী এবং যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে এর প্রভাব সমাজমনস্ক যে কোন ব্যক্তি লক্ষ্য করবেন। এছাড়াও এখানকার জনগণের প্রাথমিক মূল্যবোধ গঠনেও সামাজিক রীতিনীতি, রেওয়াজকে প্রাতিষ্ঠানিকতা দানে ধর্ম মূখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এসব দেশসমূহের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ধর্মের ঘনিষ্ট সম্পর্কের কারণে নেতৃত্বের বৈধতা অর্জনের ক্ষেত্রেও ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের এদেশেও সিপাহী বিদ্রোহ, ওহাবী আন্দোলন, ফরায়েজী আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলনসমূহ প্রত্যেকটিতে ধর্ম একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে তিতুমীর, হাজী শরিয়ত উল্লাহসহ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের পেছনে ধর্ম যে এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছে তা ইতিহাস গবেষকগণ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন। এমনকি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জাতীয় অধ্যাপক

সৈয়দ আলী আহসান ধর্ম বিষয়ে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রে বহু কথিকা পাঠ করেছেন এবং কোরআন ও হাদীসের আলোকে মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতার ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন।

সভ্যতার বিনির্মাণ, স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা যোগান, সামাজিক সংহতি ও ঐক্য সৃষ্টিতে ধর্মের অনন্য ভূমিকা থাকলেও বিভিন্ন যুগে যে ধর্মের অপব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার হয়নি তা নয়। আজকের ন্যায় বিভিন্ন সময়ে ধর্মকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠি স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ গনমানুষের ধর্ম হল ইসলাম। সুতরাং এদেশেও বিভিন্ন সময়ে ইসলামের অপব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। তাই আমার গবেষণাকর্মে ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।[৪২]

**২.৫. ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে নারী ঃ**

গ্রীক, রোম, ইউরোপ, এশিয়াসহ সর্বত্রই নারী ছিল নির্যাতিতা। প্রাক-ইসলাম যুগে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারী লোক ছিল। ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মে নারী স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার, নারীর জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা, মীরাস, সামাজিক অধিকার, মতামত ব্যক্ত করার অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। অন্যান্য ধর্মে নারী সম্পর্কে নারী সম্পর্কে বিধি-বিধান ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তাই বিভিন্ন ধর্মে নারীকে কিভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ

**ক. খৃষ্ট ধর্মে নারী ঃ**

খৃষ্ট ধর্মের নামে নারী জাতির উপর নির্মম, নিষ্ঠুর এবং অমানসিক নৃশংস আচরণ করা হয়েছে। নারীদের পাপের উৎস হিসেবে খৃষ্ট ধর্ম বিবেচনা করা হতো। প্রথম নারী "ইভ" প্রথম পাপ করে এবং স্বর্গ হতে আদমের পতনের কারণ সে। ফলে জগতের সকল পাপের জন্য নারীকে দায়ী করা হয়েছে। পোপ শাসিত! 'পবিত্র' রোম-সাম্রাজ্যে তাদের (নারীদের) দেহে গরম তেল ঢেলে দেয়া হতো, দ্রুতগামী অশ্বের লেজের সাথে তাদেরকে বেঁধে হেঁচড়ানো হতো এবং মজবুত স্তম্ভে বেঁধে তাদেরকে আগুনে পুড়ে মারা হতো।[৪৩] এতেও নারী জাতির নির্যাতনের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। সপ্তদশ শতাব্দীতে "কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ" এর এক অধিবেশন রোম নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় : æনারীর কোন আত্মা নেই।"[৪৪]

খৃষ্ট ধর্ম নারীকে যতদূর নীচে নিক্ষেপ করা সম্ভব ছিল তা করেছে। নারী সম্পর্কে এ ধর্মের অনুভূতি তারতুলীনের নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় ঃ
"হে নারীকুল, তোমরা জান না যে, তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন হাওয়া। তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র যে ফতোয়া ছিল তা যদি এখনও বর্তমান থাকে, তাহলে উক্ত অপরাধ প্রবণতাও তোমাদের মধ্যে বর্তমান আছে। তোমরা তা শয়তানের দরজা। তোমরাই খোদার প্রতিচ্ছবি পুরুষদের ধ্বংস করেছ।"

সেন্ট পল তার একটি পত্রে লিখেন ঃ "নারী পূর্ণ বশ্যতা শিক্ষা করুক। আমি পুরুষদেরকে উপদেশ দিবার কিংবা পুরুষদের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার নারীকে দেই না। তাকে মৌনভাবে থাকতে বলি। কারণ প্রথমে আদমকে এবং পরে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। আদম প্রবঞ্চিত হলেন না। কিন্তু হাওয়া প্রবঞ্চিতা হয়ে অপরাধে পতিত হলেন।"

তিনি অপর একটি পত্রে লিনে ঃ আমার ইচ্ছা এই, তোমরা যেন জান যে, প্রত্যেক পুরুষের মস্তকস্বরূপ খৃষ্ট, স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ পুরুষ আর খৃষ্টের মস্তকস্বরূপ ঈশ্বর। যে পুরুষ মস্তক আবৃত করে প্রার্থনা করে কিংবা ভাববাণী বলে, সে আপন মস্তকের আপমান করে। আর যে স্ত্রী অনাবৃত মস্তকে প্রার্থনা করে কিংবা ভাববাণী বলে, সে আপন মস্তকের অপমান করে। কারণ পুরুষ স্ত্রীলোক হতে নয় বরং স্ত্রীলোক পুরুষ হতে। আর স্ত্রীর নিমিত্ত পুরুষের সৃষ্টি হয় নি, কিন্তু পুরুষের নিমিত্ত স্ত্রীর সৃষ্টি হয়েছে।[৪৫]

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে খৃষ্টধর্ম নারীকে চরম লাঞ্চনা পঙ্কে নিমজ্জিত করে দিত। জনৈক পাদ্রী বলেন, "নারী সব অন্যায়ের মূল, তার থেকে দূরে থাকাই বাঞ্চনীয়। নারী হচ্ছে পুরুষের মনে লালসা উদ্রেককারী, ঘরে ও সমাজের যত অশান্তির সৃষ্টি হয় সব তারই কারণে।[৪৬] ড. এসপ্রিঙ্গ (Dr. Aspring) তাঁর গ্রন্থে মধ্যযুগে নারীজাতির উপর জঘণ্য নির্যাতনের বিশদ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : "১৫০০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে নারী জাতির বিচারের জন্য একটি পরিষদ গঠিত হয়। এটা নারীদের উপর নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন চালানোর নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করে। এ আইনের বলে খৃষ্টানগণ নব্বই লক্ষ জীবন্ত নারীকে অগ্নিতে দগ্ধ করে হত্যা করে। খৃষ্টান সাম্রাজ্যে নারীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অবিচার বর্ণনাতীত।[৪৭] খৃষ্টজগতের বিশিষ্ট ধর্মযাজক টারটুলিয়ানের মতে "নারী হলো শয়তানের দোসর, নিষিদ্ধ বৃক্ষের প্রতি আহবানকারী খোদাই বিধানের পথ লঙ্ঘনকারী এবং পুরুষের সর্বনাশকারী নারীই পৃথিবীর সকল অশুভ কার্যের উৎস।" [৪৮]

ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মমতে নারীই গোটা মানবতার দূর্দশার কারণ। অতীতের বহু বিখ্যাত পাদ্রী নারী জাতির উপর প্রকাশ্যে দোষারোপ করেছেন এবং নারীকে দরকারী আপদ (Necessary evil) বলে অভিহিত করেছেন।[৪৯] আলেকজান্দ্রিয়ান ক্রিমেন্ট বলেন ঃ "নারী বলেই তার লজ্জায় অভিভূত হয়ে থাকা উচিত।[৫০]

বিশ্ববরেণ্য ধর্মযাজক ও পুরোহিত সেন্ট বার্নাড, সেন্ট এ্যাটর্নী, সেন্ট পলও নারী জাতির উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন। তাদের অভিমত হল নারী যখন আদি পাপের উৎস মানুষের জন্মগত পাপের কারণ, তখন সকল ভৎসনা অবজ্ঞা ঘৃণা নারীরই প্রাপ্ত। উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাধু ক্রীসোষ্টম নারীর প্রতি পুরোহিতদের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, "নারী হল একটি অপরিহার্য পাপ, একটি প্রাকৃতিক প্রলোভন, একটি অবশ্যম্ভাবী বিষয়, একটি পারিবারিক বিপদ, একটি মারাত্মক আকর্ষণ, একটি বিমূর্ত কলঙ্ক।"[৫১]

খৃষ্টান ধর্মে বিবাহ ছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্থায়ী পবিত্র বন্ধন, যা আমৃত্যু বলবৎ থাকবে।[৫২] কিন্তু খৃষ্টান জগতের শ্রেষ্ঠ অবতার ও রচয়িতা সেন্টপল বিবাহকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পবিত্র ধর্মীয় বন্ধন বলে স্বীকার করেন না। এটাকে তিনি স্বাভাবিক এবং সামাজিক জীবনের সম্মানজনক ও আনন্দদায়ক কিছু বলেও বিশ্বাস করেন না। সেন্টপল বলেন : æয ব্যক্তি তার কন্যাকে বিবাহ দেয় না; সে উত্তম কাজ করে।"[৫৩]

খৃষ্টান ধর্মে নিয়মানুসারে তালাকের অনুমতি নেই। তালাক প্রসঙ্গে বাইবেলে বলা হয়েছে- æস্ত্রী তার স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হবে না; আর স্বামীও তার স্ত্রীকে তালাক দিবে না।" [৫৪] মার্ক (Mark) বলেন, যিশু তালাকের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে বলেন: æয ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অপর স্ত্রী গ্রহণ করে, সে তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে। আর যে স্ত্রী নিজ স্বামীকে বর্জন করে অপর স্বামী গ্রহণ করে, সে ব্যভিচার করে।[৫৫] কিন্তু মতান্তরে খ্রীষ্টান ধর্মে তালাক ও পুন: বিবাহ অবৈধ নয়।"[৫৬]

সেন্টপলের শিক্ষা নারীদেরকে ধর্মানুষ্ঠান থেকে বহির্গত করেছে এবং এজন্যই গির্জায় গমন তাদের উচিত নয়। তিনি নারীকে কলরবকারী ও মুর্খ বলে ধারণা করতেন। তাই তাদেরকে ধর্ম প্রচার ও ধর্ম বিষয়ে অভিমত প্রকাশে অনুমতি দেননি। তিনি বলেন, "নারীরা গির্জায় নিরব থাকবে। কারণ, তাদেরকে কথা বলার অনুমতি প্রদান করা হয়নি: তারা অধীন হয়ে থাকবে। এটাই আইনের নির্দেশ। তারা কোন কিছু জানতে চাইলে বাড়িতে তাদের স্বামীদেরকে জিজ্ঞেস করে নিবে। কারণ, গির্জায় কথা বলা নারীর পক্ষে লজ্জার বিষয়।"[৫৭] বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক Bernard shaw (বার্নাড শ) বলেছেন ঃ "ইংলিশ আইনানুসারে বিবাহের সাথে সাথে একজন নারী সমস্ত ব্যক্তিগত অর্থ সম্পত্তি তার স্বামীর আওতাভূক্ত হয়ে যায়।"[৫৮]

**খ. ইয়াহুদী ধর্মে নারী ঃ**

পৃথিবীর সব ধর্ম আকীদা এবং তত্ত্বের ভিত্তিতে জীবনের বাস্তব সমস্যাদি সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছে, ইয়াহুদী ধর্ম তারই একটি। এ ধরনের একটি ধর্ম নারী জাতি সম্পর্কে বাস্তববাদী ধ্যান-ধারণা পেশ করবে এরূপ আশা করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ধর্ম আমাদের সামনে যে ধারণা পেশ করে তার সারমর্ম এই যে, পুরুষ সৎস্বভাব বিশিষ্ট ও সৎকর্মশীল আর নারী বদস্বভাব বিশিষ্ট এবং ভন্ড।

ইয়াহুদী ধর্ম মতে, মানব জাতির প্রথম সদস্য হযরত আদম (আ) জান্নাতে মহাসুখে জীবন-যাপন করেছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহর অনুগত বান্দা। কিন্তু তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আ) তাঁকে প্রথমে আল্লাহর অবাধ্য হতে প্ররোচিত করেন এবং তাঁকে এমন একটি ফল খাওয়ান বা খেতে আল্লাহ্ তাঁকে নিষেধ করেছিলেন। ফলে তিনি আল্লাহর সব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হলেন এবং তাঁর ভাগ্যলিপিতে কায়-ক্লেশের লিপিবদ্ধ হলো।

বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে লিপিবদ্ধ আছে যে, মহান আল্লাহ হযরত আদম (আ) কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "যে বৃক্ষের ফল ভোজন করতে তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, তুমি কি তার ফল ভোজন করেছ? আদম কহিলেন, তুমি আমার সঙ্গিনী করে যে স্ত্রী দিয়েছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়েছিল, তাই আমি উহা ভোজন করেছি।'

এরপর আল্লাহ্ হাওয়াকে বললেন, "আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করে দিব। তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করবে। স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকবে। সে তোমার উপর কর্তৃত্ব করবে।'

অন্য কথায়, হাওয়া (আ) আদম (আ)-কে পথভ্রষ্ট করে যে অপরাধ করেছিলেন, আল্লাহ'র তরফ থেকে তার সেই অপরাধের শাস্তি হলো সন্তান প্রসবকালে কষ্ট এবং তার উপর পুরুষের স্থায়ী কর্তৃত্ব। পুরুষ কিয়ামত পর্যন্ত নারীর উপর এ কর্তৃত্ব চালাতেই থাকবে।

এ দর্শনের ফলশ্রুতিতে ইয়াহুদী শরীয়তে পুরুষের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব এত বেশি যে, কোন স্ত্রীলোক যদি যৌবনকালে আপন পিতৃগৃহে বাস করবার সময়ে সদা প্রভুর উদ্দেশ্যে কোন মানত করে অথবা কোন ব্রতবন্ধনে আপনাকে আবদ্ধ করে এবং তার পিতা যদি তার সেই মানত বা ব্রতের কথা শুনে তাকে তা পালন করতে নিষেধাজ্ঞা করে, তবে তার সে মানত বা ব্রতবন্ধন স্থির থাকবে না তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। ফলে তার পিতার নিষেধ কার্যকর হবে এবং সদ্যপ্রভু সেই যুবতীকে ক্ষমা করবেন না। কারণ পিতা তাকে অনুমতি প্রদান করেন নি। আর যদি সে কোন পুরুষের স্ত্রী হয়ে তার অধীনে হয় এবং এ অবস্থায় কোন মানত করে অথবা স্বামী যদি শুনতে পায় এবং শ্রমণের দিন স্বামী তাকে নিষেধ করে তবে ঐ মানত বা ব্রতি স্থির থাকবে না। কারণ তার স্বামী তা ব্যর্থ করেছে। আর সদ্যপ্রভূ সেই স্ত্রীকে ক্ষমা করবেন না। স্ত্রীর প্রত্যেক মানত ও দিব্য তার স্বামী ইচ্ছা করলে স্থির রাখতেও পারে অথবা উহা ব্যর্থও করে দিতে পারে। পুরুষ ও স্ত্রীর বিষয়ে এবং যৌবনে পিতৃগৃহে অবস্থানকালে কন্যার বিষয়ে সদ্যপ্রভূ মোশিকে এ সকল আজ্ঞা করলেন। ইয়াহুদী আইন অনুসারে পুরুষ উত্তরাধিকারীর বর্তমানে নারী উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত। অনুরূপভাবে নারীর দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকারও নেই।[৫৯]

আদালতের রায়ে তালাক হলে গোঁড়া ও রক্ষণশীল ইয়াহুদী সমাজ এরূপ বিবাহ বিচ্ছেদ গ্রহণ করে না। স্ত্রীকে পূর্ব স্বামীর বিবাহিতা বলে গণ্য করে। স্বামী স্ত্রীকে 'গেট' বা বিবাহ বিচ্ছেদের সনদ না দিলে ধর্মীয় আইনে বিবাহ অটুট থাকে। সংশোধিত ইয়াহুদী আইন ও সিভিল আইনে তার পুনর্বিবাহ হলেও গোঁড়া ও রক্ষণশীলদের নিকট স্ত্রী ব্যভিচারিণী এবং সে বিবাহের সন্তানগণ বংশানুক্রমে বা অবৈধ সন্তান বলে গণ্য হবে। 'গেট' তাওরাতে লিপিবদ্ধ আইনেরই অংশ। ইয়াহুদীদের বিশ্বাস এ আইন সিনাই পর্বতে আল্লাহ হযরত মুসা (আ) কে দিয়েছিলেন।[৬০]

ওল্ড টেস্টামেন্টে হযরত আদম ও হাওয়ার জান্নাত হতে বহিস্কৃত হওয়ার ঘটনাটি এভাবে পেশ করা হয়েছে ঃ

"তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কোথায়? তিনি কহিলেন, আমি উদ্যানে। তোমার রব শুনিয়া ভীত হইলাম। কারণ আমি উলঙ্গ। তাই আপনাকে লুকাইয়াছি। ঈশ্বর কহিলেন, তুমি যে উলঙ্গ উহা তোমাকে কে বলিল? যে বৃক্ষের ফল খাইতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম তুমি কি তাহার ফল ভোজন করিয়াছ? তাহাতে আদম কহিলেন, তুমি আমার সঙ্গিনী করিয়া যে স্ত্রী দিয়াছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়াছিল। তাই খাইয়াছি। তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর নারীকে কহিলেন, তুমি এ কি করিলে? নারী কহিলেন, সর্প আমাকে ভুলাইয়াছিল, তাই খাইয়াছি।"

এর অর্থ এই যে, বেহেশত থেকে বহিস্কৃত হওয়া আদম তথা মানব জাতির পক্ষে অভিশাপ বিশেষ এবং এ অভিশাপের মূল কারণ হচ্ছে নারী- আদমের স্ত্রী। এ জন্যে ইয়াহুদী সমাজে স্ত্রীলোক চির লাঞ্ছিত, জাতীয় অভিশাপ এবং ধ্বংস ও পতনের কারণ। এ জন্যে পুরুষ সব সময়ই নারীর উপর প্রভুত্ব করার স্বাভাবিক অধিকার। এ অধিকার আদমকে হাওয়া বিধি কর্তৃক নিষিদ্ধ ফল খাওয়ানোর শাস্তিবিশেষ। যতদিন নারী বেঁচে থাকবে, ততদিন এ শাস্তি তাকে ভাগ করতেই হবে।

ইয়াহুদী সমাজে নারীকে ক্রীতদাসী না হলেও চাকরাণীর পর্যায়ে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে বাপ নিজ কন্যাকে নগদ মূল্যে বিক্রি করতে পারত। মেয়ে কখনও পিতার সম্পত্তি থেকে মীরাস লাভ করত না। করত কেবল তখন, যখন পিতার কোন পুত্র সন্তানই থাকত না।

ইয়াহুদী ধর্মে নারীকে 'পুরুষের প্রতারক' বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইয়াসরিবের (বর্তমান মদীনা শহর) ফিতুম নামক এক ইয়াহুদী বাদশাহ আইন জারী করেছিল ঃ যে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হবে, স্বামীর ঘরে যাওয়ার আগে তাকে বাধ্যতামূলকভার তার সাথে এক রাত্রিযাপন করতে হবে।[৬১]

বাগদত্তা বা বিবাহিতা নারী পরপুরুষ দ্বারা বলপূর্বক ধর্ষিতা হইলে ধর্ষণের সময় সাহায্য চাহিয়া চিৎকার না দিলে সে জীবনের অধিকার হারাইয়া ফেলিত এবং প্রস্তারাঘাতে হত্যাই ছিল তাহার শাস্তি। ধর্ষিতা কুমারী হইলে ধর্ষণকারীর সহিত বিবাহই ছিল ইহার বিধান।[৬২]

ইয়াহুদীরা নিজ ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে এ অধিকার লাভ করে থাকে যে, যখন তারা ইচ্ছা করবে, ক্ষুদ্রতম অপরাধের কারণেও স্ত্রীকে বিদায় করে দিতে পারবে। তার স্ত্রীদেরকে হায়েয ও নেফাসের সময় অপবিত্র বলে মনে করে। এ সময় তারা স্ত্রীদের সাথে উঠা-বসা, কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা করা, এমনকি তাদের হাতের তৈরি খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করাকেও নিজেদের জন্য জঘন্যতম অপমানজনক কাজ বলে মনে করে থাকে।[৬৩]

ইয়াহুদী সমাজে বিবাহ ছিল ব্যক্তিগত ব্যাপার। সুতরাং এজন্য রাষ্ট্র ও ধর্মের অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। বাস্তবে ইহা ছিল না। বাস্তবে ইহা ছিল এক প্রকার ব্যবসা এবং যৌতুকের গুরুত্ব ইহাতে খুব বেশী ছিল।[৬৪]

সামাজিক প্রার্থনায় দশজ পুরুষের উপস্থিতি জরুরী ছিল। কিন্তু নয়জন পুরুষ এবং বহু নারী উপস্থিত থাকলেও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হত না। কারন, নারী মানুষরূপে পরিগণিত ছিল না। [৬৫]

**গ. হিন্দু ধর্মে নারী ঃ**

ভারতবর্ষকে একটি ধর্মভিত্তিক দেশ মনে করা হয়। কারণ, এর অন্যান্য যে কোন দিকের চেয়ে ধর্মীয় দিকটি সব সময় বেশী প্রভাব বিস্তার করে আছে। তাই এ দেশে নারীর অধিকারকে চরমভাবে কর্ব করা হয়েছে। সতীদাহ প্রথা, গঙ্গা-সাগরে কন্যা নিক্ষেপ করার বিবরণ আজো ইতিহাসের পাতা হতে মুছে যায়নি। ধর্মের নামে দেবদাসী, সেবাদাসীরূপে নারীত্বের চরম অবমাননা ও নারী-নির্যাতন অব্যহত রয়েছে। অবিবাহিতা হিন্দুনারী পিতা, ভাই প্রভৃতির কাছে পণ্যদ্রব্য মাত্র। বেদবানীতে নারীর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে-

"বৈদিক যুগে বহু যুবতীর বিবাহ হতো না। তারা কুমারী অবস্থাতেই পিতৃগৃহে থাকতো। বিকলাঙ্গ কন্যাদের বিবাহ হতো না। বিয়ে হয়ে গেলে কন্যার পৈতৃক সম্পত্তিতে তার অধিকার থাকতো না। এ জন্য কন্যার ভ্রাতারা ভগিনীর বিবাহ দিতে চেষ্টিত থাকতো। বিধবা প্রায়ই স্বামীর ভ্রাতাকে বিয়ে করতো। কন্য হরণ করে বীরগণ বিয়ে করতো। বিধবা হলে পত্নী পতিত চিতায় শয়ন করে দেবরের আহবানে উঠে আসতো ও পতির শবদাহ করতো।[৬৬]

ভারতবর্ষের বিখ্যাত রচয়িতা মুনজার নারী সম্পর্কে বলেছেন ঃ নারী অপ্রাপ্ত বয়স্কা, প্রাপ্ত বয়স্কা বা বৃদ্ধা যাই হোক না কেন স্বাধীন যেন না হয়। শৈশবে নারী তার পিতার অধীনে থাকবে, যৌবনে থাকবে স্বামীর অধীনে আর বিধবা হওয়ার পর থাকবে পুত্রের অধীনে। কোন সময়ই সে স্বাধীন থাকবে না।[৬৭]

কোন কোন হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বলা আছে ঃ বিষ, সাপ, আগুন, মৃত্যু, নরক ও ঝড় বন্যা এসব কোন কিছুই নারীর চেয়ে খারাপ নয়।[৬৮]

কুরবানী বা ব্রত পালন নারীর জন্য পাপ। তার উচিত শুধু স্বামীর সেবা করা। স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় স্বামী গ্রহণের কথা মুখে আনাও নারীর উচিত নয়। বরং স্বল্পাহারী হয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো কাটিয়ে দেয়া উচিত।[৬৯]

অত্যাচার নিপীড়ন সীমাহীন যন্ত্রণা, ব্যাঙ্গ, হেয়প্রতিপন্ন করার পাশাপাশি বিভিন্ন কুপ্রথার প্রচলন করে হিন্দু সমাজের নারী জীবনকে করা হয়েছে দুর্বিসহ যাতনামত তমসাচ্ছন্ন। এমনকি নারীদের প্রতি ঘৃণাভবে উক্তি প্রকাশ করা হয়েছে, নারীদিগকে ভালবাসা পুরুষদের উচিৎ নয়।[৭০]

বিভিন্ন বর্ণনা হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, হিন্দুদের মাঝে বিবাহ পিতা কর্তৃক কন্যা বিক্রি স্বরূপ। হিন্দু নারী কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারত না। কন্যা সন্তান প্রসবকারিনী সর্বক্ষেত্রে লাঞ্চিত ও অপমানিতা হত। এমনকি স্বামীর মৃত্যুতেও বিবাহ ভঙ্গ করা যেত না। ভগবত গীতায় বলা হয়েছে, শুধুমাত্র পাপপূর্ণ আত্মাই নারী, বৈশ্য ও শুদ্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। নারীর মর্যাদা ক্ষুন্ন করে বিজয়নগরের তেলেগু রাজার ১২০০ জন স্ত্রী এবং রাজা মানসিংহের ১৫০০ জন স্ত্রী ছিল।[৭১] বিরল ক্ষেত্রে একজন নারীর একাধিক স্বামী থাকতে পারত। তবে এটা সমাজে মোটেই গ্রহণযোগ্যতা নয় বরং ঘৃণিত কাজ।[৭২] হিন্দু ধর্মের সামাজিক নিয়মনীতি, আইন-ব্যবস্থা বিধি-বিধান নারীর প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে।

**ঘ. বৌদ্ধ ধর্মে নারী ঃ**

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ জাতির জন্য কিছুই করে যাননি। কোন কিছু করার প্রয়োজনও তিনি বোধ করেন নি। একদিন বুদ্ধের এক শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "নারী জাতির সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে?" বুদ্ধ উত্তর করলেন, "নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়াও মানবীয় পবিত্রতার পরিপন্থী।" অন্য এক সময় তিনি আরও বলেছেন, "নারীদের সাথে কোনরূপ মেলামেশা করো না এবং তাদের প্রতি কোন অনুরাগ রেখো না। আর তাদের সাথে কথাবার্তও বলো না। কেননা, পুরুষের পক্ষে নারী ভয়ঙ্কর বিপদস্বরূপ। নারী তার মনোহর কমনীয় ভঙ্গি দ্বারা পুরুষের বিশ্বাস-ধন লুট করে নেয়। নারী একটি সশরীরী ছলনা মাত্র। সুতরাং নারী থেকে বাঁচার চেষ্টা কর।'

বৌদ্ধ ধর্ম আরো বলে যে, "নারীর সঙ্গে বাস করা অপেক্ষা বাঘের মুখে চলে যাওয়া কিংবা, জল্লাদের ছুটির নীচে মাথা পেতে দেওয়া উত্তম।" সুতরাং যে ধর্ম এ কথা বলে সে দর্শন কখনো নারীকে শান্তি ও মর্যাদা দিতে পারে না।

গৌতম বুদ্ধের শিক্ষার সারমর্ম এই যে, নারীর সঙ্গে বসবাসকারী পুরুষ পরকালের মুক্তি হতে বঞ্চিত থাকবে। নারীরা পুরুষের মোক্ষ লাভের অন্তরায়। তাদের সাহচার্যে থেকে আত্মিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। এ জন্যেই গৌতম বিয়ে প্রথার বিরোধী ছিলেন। তিনি লোকদেরকে সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাসব্রতের আহ্বান করে গিয়েছেন।[৭৩]

বৌদ্ধ ধর্মমতে নারী হলো সকল অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ। এ সম্পর্কে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়েষ্টারমার্ক (Westermark) বলেন ঃ æমানুষের জন্য প্রলোভন যতগুলি ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিপদজনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভুত হয়ে আছে যা সমগ্র বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়।"[৭৪]

বিখ্যাত বৌদ্ধ পন্ডিতের নারী সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করে বেটনী (Bettany) তাঁর World's Religiouns গ্রন্থে বলেন, æপানিতে মাছের গতিপথের গভীরতা যেমন নির্ণয় করা সম্ভব নহে, নারীর চরিত্র হল তেমনি নিবিড়- যা বহুবিধ ছলনায় আচ্ছাদিত। তার মধ্যে সত্য পাওয়া দুষ্কর। তার নিকট মিথ্যা সত্যসদৃশ এবং সত্য মিথ্যা সম।"[৭৫]

**ঙ. প্রাক ইসলাম সমাজে নারীর অবস্থান ঃ**

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের তুলনায় একমাত্র ইসলামে নারীর অবস্থা অধিকতর উন্নত, সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ ছিল। কিন্তু ইসলাম ধর্ম পূর্ব সমাজে অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বে নারী ছিল অবহেলিত, অমর্যাদাকর, লাঞ্ছিত, অবাঞ্ছিত, অপমানিত, জঘন্য প্রাণীর চেয়েও নিকৃষ্ট। ইসলাম পূর্ব সমাজে নারীর অবস্থা কেমন ছিল তা নিম্নে আলোকপাত করা হলো ঃ

জাহেলিয়া যুগে নারী ছিল ঘৃণিত, মর্যাদা বহির্ভূত এবং অধিকারহীন ও মূল্যহীন। তারা মানবরূপে পরিগণিত ছিল না। পুরুষ ও জীবজন্তুর মধ্যস্থলে ছিল নারীদের অবস্থান। কন্যা সন্তান জন্ম হলে সে পরিবারের এক চরম অভিশাপ বলে গণ্য হত। আল-ইসলাম রুহুল মাদানিয়্যাহ গ্রন্থে শায়খ মুস্তফা আল-গালাযীনী বলেন ঃ "ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পুরুষের অধিকৃত বিষয় সম্পদে মধ্যে নারীর সাথে পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হত। নারীর মর্যাদা এত নীচে ছিল যে, তাদের তুলনায় পশুদের প্রতি অধিকতর সুনজর দেয়া হত। আরবের নারীরা এমন নিদারুণ অবস্থায় নিপতিত ছিল যে, দুনিয়ার অপর কোন জাতিই আরবের ন্যায় নারীদেরকে এত অধিক অপমানিত ও নির্যাতিত করত না। কন্যা সন্তান জন্মকে আরবরা কুলক্ষণ ও অপমানজনক মনে করত। নবজাত কন্যা সন্তান হত্যার নীতি বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেয়া হত। পণ্য দ্রব্যের মত বিক্রয় করা হত এবং পশুর বদলে বিনিময় করা হত। আরবরা এ ধরনের কার্য করার কারণ হিসেবে কন্যা সন্তানকে অপমানজনক ও অমর্যাদাকর ধারণা করত।' [৭৬]

হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব অধিবাসীরা নারীর অস্তিত্বকে লজ্জাজনক ও লাঞ্ছনাকর বলে মনে করত। কন্যা সন্তানের জন্মই ছিল তাদের জন্য গভীর দুঃখ এবং মনোকষ্টের কারণ। পুত্র সন্তান নিয়ে তারা গর্ব ও অহঙ্কার করত। আর কন্যা সন্তানের অস্তিত্ব তাদের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করত। পবিত্র কুরআনে তাদের এই অনুভূতি ও মনোবৃত্তির বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

"উহাদের কাহাকেও যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তাহার মুখমন্ডল কালো হইয়া যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। উহাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তাহার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হইতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে উহাকে রাখিয়া দিবে, না মাটিতে পুঁতিয়া দিবে। সাবধান! উহারা যাহা সিদ্ধান্ত করে তাহা কত নিকৃষ্ট।[৭৭]

নারীর প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা এমন চরমে পৌছেছিলে যে, কারো ঘরে কন্যা সন্তানের জন্ম হলে ঐ ঘরটিকে সে একটি অলক্ষুণে ঘর মনে কর তা পরিত্যাগ করত। এর চেয়েও বড় কথা ছিল যে, মেয়েদের জন্য তাদের হৃদয়ে দয়া-মায়া ও স্নেহ-মমতার বিন্দুমাত্র অনুভূতিও ছিল না। তা না হলে নিজের সন্তানকে জীবিত দাফন করা সম্ভব হত না। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এ নিষ্ঠুরতা কোন কোন সময় এমন সব ব্যক্তিদের তরফ থেকেও প্রকাশ পেত যাদের হৃদয়কে স্নেহ ও ভালবাসার উৎস বলে মনে করা হত। প্রসঙ্গে এমন কিছু হৃদয়বিদারক ঘটনাও বর্ণিত আছে, যা শোনা মাত্রই কেঁপে উঠে।[৭৮]

এক ব্যক্তি রসূলে করীম (স.) কে তার জাহিলী যুগের কাহিনী শুনিয়ে বললঃ "আমার একটি মেয়ে ছিল। সে আমার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। আমি যখনই তাকে ডাক দিতাম, সে বড়ই খুশি মনে আমার কাছে দৌড়ে আসত। এমনি করে একদিন আমি তাকে ডাকলাম। সে দৌড়ে আমার কাছে এল। আমি তাকে সাথে নিয়ে নিকটবর্তী একটি কুপের পাশে গেলাম। তখন হঠাৎ করে ধাক্কা দিয়ে তাকে ঐ কুপের মধ্যে ফেলে দিলাম। তখনো সে আব্বা, আব্বা বলে চিৎকার করছিল।' ঘটনাটি শুনে নবী করীম (স.) এর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। এমনকি তার পবিত্র দাড়ি পর্যন্ত ভিঁজে গেল। এর চেয়ে বড় পাপ আর কি হতে পারে যে, বাপের স্নেহসিক্ত হাত দু'টি আপন সন্তানের হিংস্র নেকড়ের থাবায় পরিণত হলো ।[৭৯]

জাহেলী যুগে আরবরা কন্যা সন্তান লাভ করাকে ক্ষতি ও অপমানের কারণ মতে করত। আর পুত্র সন্তান লাভ করাকে তারা মনে করত লাভ ও গৌরবের বিষয়। তাই কন্যা সন্তানের পরিবর্তে সর্বদা তারা পুত্র সন্তান কামনা করত। পবিত্র কুরআনে তাদের এ হীন মানসিকভাবে প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে ঃ

"উহারা নির্ধারন করে আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান- তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং উহাদের জন্য তাহাই, যাহা উহারা কামনা করে।" [৮০]

প্রাক ইসলাম যুগে নারী বিয়ের আগে পিতার এবং বিবাহোত্তর সময়ে স্বামীর অধীনস্থ ছিল। সমাজে বহু বিবাহ প্রথা চালু ছিল এবং পরিবারে পুরুষের ভূমিকাই ছিল মুখ্য।[৮১]

জোসেফের মতে, হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সময়ের পূর্ব পর্যন্ত বেদুঈন ও অন্যান্য শ্রম বিমুখ আরব সমাজে সুসংগঠিত রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত ছিল। সুসংগঠিত কোন বিচার ব্যবস্থাও ছিল না। [৮২] নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্ব বলতে কিছু ছিল না। ব্যতিক্রম একমাত্র পবিত্র কুরআনেই নারীর মর্যাদার কথা সুস্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে।[৮৩]

প্রাক-ইসলাম যুগে কোন কন্যা সন্তান জন্মালেই তাকে হত্যা করার নিয়ম চালু ছিল। এ জন্য ধারণা পোষন করা হত যে, কন্যা সন্তান জন্মালেই পরিবারে অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে অথবা যুদ্ধকালীন অবস্থায় মেয়েরা শত্রুদের হাতে বন্দী হলে সংশ্লিষ্ট পরিবারকে সমাজের বিচারে হেয় প্রতিপন্ন হবে হবে। এ সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে-

"তোমাদের সন্তানদিগকে দারিদ্র ভয়ে হত্যা করিও না। উহাদিককেও আমিই রিযক দেই এবং তোমাদিগকেও। নিশ্চয়ই উহাদিগকে হত্যা করা মহাপাপ।"[৮৪]

ইসলাম পূর্ব আরব সমাজে নবজাতক কন্যা সন্তানকে বিভিন্ন উপায়ে হত্যা করত। কেউ গর্ত খনন করে পুতে ফেলত, কেউ উচুস্থান হতে নিক্ষেপ করত, কেউ পানিতে ডুবিয়ে মারত, কেউ কেটে ফেলত। এ সকল নির্যাতনের কারণে নারী মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পন করত যেন তার জন্ম

মৃত্যুবরণের জন্য। আরবরা তাদের স্ত্রী কন্যা সন্তান জন্ম দিলে তা গোপন রাখত, যেন এটা ভীষণ পাপ এবং স্থায়ী অমর্যাদার কারণ। কন্যা সন্তান আল্লাহর সন্তান বর্ণনা করা হয়েছে।

"যারা নির্বুদ্ধিতার দরুণ ও অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করে এবং আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে, তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা অবশ্যই বিপথগামী হয়েছে এবং তার সৎপথ প্রাপ্ত ছিল না।"[৮৫]

প্রাচীনকালে আরবদের সুশৃঙ্খল সমাজ-জীবন সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না। তারা বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে বিভক্ত হয়ে যাযাবররূপে বসবাস করত। তাদের গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকত। যুদ্ধে বিজয় হলে পরাজিত গোত্রের নারীদের নিয়ে বিবাহ করত জোর করে। এ জন্যই আরবগণ কন্যা সন্তান জন্মকে ভয় ও ঘৃণা করত এবং পুত্র জন্মকে পছন্দ করত। কারণ পুত্র সন্তান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও যুদ্ধের ময়দানে সাহায্যকারী হত। এ কারণে আরবরা কন্যাদের জীবিত কবর দিয়ে হত্যা করত।[৮৬]

প্রাক-ইসলামী যুগে আরব সমাজে প্রচলিত বিবাহ নীতি ইতিবৃত্ত পর্যবেক্ষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষেরা যে কাউকে বিবাহ করতে পারত। রক্ত সম্পর্কে বা বংশগতসূত্রে কোন অন্তরায় ছিল না। এ সম্পর্কে Said Abdullah Seif AlHatimy বলেন "অজ্ঞতার যুগে পিতার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র মাতার উত্তরাধিকারী হইত। সে নিজেই তাহাকে বিবাহ করিতে পারিত। অথবা নিজ ইচ্ছানুসারে যে কোন লোকের নিকট বিবাহ দিতে পারিত আর সে তাহার বিবাহ বন্ধ করিতে পারিত। মাতা অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে চাহিলে পুত্রকে মুক্তিপন দিতে হইত।[৮৭]

তৎকালীন সভ্যতায় বহু বিবাহ প্রথা প্রচলন ছিল তেমন আরবেও বহু বিবাহ প্রথা ছিল। একজন স্বামী কয়েকজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত, সরকারী আইন, সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মের বিধানে এর কোন সীমা নির্ধারিত ছিল না; সামর্থ্য থাকলে যে যতখুশি বিবাহ করতে পারত।[৮৮]

আবু দাউদ ও তিরমিযীর ভাষ্য মেত, হযরত ওহাব আসাদী (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন তার স্ত্রী ছিল দশজন। আর হযরত গায়না ছাকাফী মুসলমান হবার সময় তার দশজন স্ত্রী ছিল।[৮৯]

অন্য সূত্রে জানা যায় যে, আরব রমনীদের স্বামী নির্বাচনের কোন অধিকার ছিল না। পিতা বা তার কোন পুরুষ আত্মীয় তার স্বামী নির্বাচনের পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। মুতআ বিবাহ (নারী পুরুষের মধ্যে চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের জন্য বিবাহ) এবং বহুপতি গ্রহণের প্রথাও আরবে প্রচলিত ছিল। আরববাসী তার বৈমাত্রের বোন, বিমাতা এমনকি তার বিধবা পুত্রবধুকেও বিবাহ করত। ভ্রাতার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃবধুকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করতে পারত।[৯০]

আরবদের মধ্যে তালাকের ব্যাপারেও কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। পুরুষের যখনই ইচ্ছা বিবাহ করত এবং যতবার খুশী স্ত্রীকে তালাক দিত। আবার ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগেই খেয়াল-খুশি মত তাকে ফিরিয়ে আনত অথবা প্রত্যাহার করত। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নাজেহাল করার উদ্দেশ্য বললঃ "আমি তোমাকে সাথেও

রাখব না আবার পরিত্যাগও করব না। তার স্ত্রী জানতে চাইল, তা সে কিভাবে করবে? সে বললঃ আমি তোমাকে তালাক দিব এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই আবার রুজু করব। এরপর আবার তালাক দিব এবং ইদ্দত শেষ না হতেই পুনরায় রুজু করব।"[৯১]

জালিম স্বামীদের কবল থেকে স্ত্রীদের মুক্তি পাওয়ার কোন পথ ছিল না। এভাবে নারীদের বিবাহিত জীবনে সুখ-শান্তির পরিবর্তে নেমে আসত অশান্তি ও গ্লানি। ঘরে একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্বেও স্বামী অন্যান্য নারীদের সাথে অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করত। কিন্তু স্ত্রীদের এর প্রতিবাদ করার কোন অধিকার ছিল না। স্বামীরা মন না চাইলে স্ত্রীদের সাথে দৈহিক সম্পর্ক করত না আবার তালাকও দিত না। নারীরা বন্দীজীবন যাপন করত এবং এভাবেই তাদের মৃত্যু হত। স্বামীরা স্ত্রীদের উপর সীমাহীন অত্যাচার ও নির্যাতন চালাত। কখনো কখনো জোরপূর্বক স্ত্রীদেরকে অন্য পুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করত এবং এর মাধ্যমে স্বামীরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করত।[৯২]

স্বামীর জীবদ্দশায় স্ত্রী তার অধীনে থাকত। স্বামীর মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারীরা তার বিধবা স্ত্রীর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করত। তারা নিজেরা কেউ চাইলে তাকে বিয়ে করত অথবা অন্য কারো সাথে বিয়ে দিত। আবার তাকে আদৌ বিয়ে না দেয়ার ব্যাপারেও তাদের এখতিয়ার ছিল।[৯৩]

আরও একটি বিষয় উল্লেখ যে, একজন নারীর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির কোন অধিকার তো ছিলই না, বরং বিয়ে বাবদ ধার্য্য দেনমোহরেও তার কোন হক ছিল না। এভাবেই একজন নারী সম্পূর্ণভাবে পুরুষের ইচ্ছার কাছে বাঁধা পড়ে যেত।[৯৪] ইসলাম পূর্ব আরবে নারীরা এত অবহেলিত ছিল যে নামী-দামী খাবার তারা কখনই খেতে পারত না। পুরুষেরা ছিল এসব খাবারের যোগ্য। আল্লাহ বলেন, "তাহারা আরো বলে, 'এইসব গবাদি পশুর গর্ভে যাহা আছে তাহা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং ইহা আমাদের স্ত্রীদের জন্য অবৈধ; আর উহা যদি মৃত হয় তবে সকলেই ইহাতে অংশীদার।' তিনি তাহাদের এইরূপ বলিবার প্রতিফল অচিরেই তাহাদিগকে দিবেন; নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।"[৯৫]

জাহেলীয়া যুগের নারীদের মর্যাদা বর্ণনা করে হযরত ওমর ফারুক (রা.) বলেছেন, "আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমরা জাহেলী যুগে নারীদের কোন মর্যাদাই দিতাম না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন হেদায়েত নাযিল করেন এবং তাদের জন্য মিরাসী স্বত্বে একটি অংশ নির্ধারণ করেন।[৯৬]

তৎকালীন আরব সমাজে মদ, জুয়া ও যুদ্ধ ছাড়া নারীকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করেছে। এ সম্পর্কে ইঙ্গিত করে ঐতিহাসিক খোদা বক্স বলেন, War, woman and wine were the there absorbing prossessins of the Arab." [৯৭]

সুশৃঙ্খল জীবন সম্পর্কে আরববাসীদের কোন জ্ঞান ছিল না। অরাজকতায় ভরে গিয়েছিল দেশ। তাই জনৈক ঐতিহাসিক বলেন, æঅর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (স.) দমন না করা পর্যন্ত এ নিদারুণ ঘৃণ্য প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।"[৯৮]

ইতিহাস ও অন্যান্য ধর্মসহ প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামপূর্বে কোন ধর্ম, সমাজ, জাতি ও সভ্যতায় নারীর কোন সম্মান, মর্যাদা, নিরাপত্তা ও উত্তরাধিকারিতা ছিল না। এ বাস্তব ও চিরন্তন সত্য উপলব্ধি করে জনৈক ঐতিহাসিক বলেন, "ইসলামের আবির্ভবের পূর্বে দুনিয়ার কোন দেশেই নারী স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কোথাও নারী সম্পত্তির মালিক ও উত্তরাধিকারী হতে পারত না।"[৯৯]

ইসলামই প্রথম উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর মৌলিক অধিকার প্রদান এবং প্রাক-ইসলাম যুগের নারী পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইসলামী সভ্যতা এবং ধ্যান-ধারণা বিকাশের সাথে সাথে নারীর জীবন যাত্রার মান উন্নত হয় এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে তার প্রভাব বিস্তার লাভ করে। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সম্মুখ সমরে অংশ গ্রহণ করেছে।[১০০]

## তথ্য নির্দেশিকা

১. প্রাগুক্ত

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত

৪.জালালুদ্দিন উমরী, সাইয়েদ: ইসলামী সমাজে নারী, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১,পৃ২৩।

৫ প্রাগুক্ত, পৃ-২৩।

৬. আব্দুল খালেক- নারী, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ-১৪।

৭. নারী নির্যাতনের রকমফের, পূর্বোক্ত, পৃ-১৩।

৮. নারী অধিকার, পূর্বোক্ত।

৯. মুহম্মদ আবু ইউসুফ- বাংলাদেশের সমাজে ধর্মের ব্যবহার, অপব্যবহার, অসদ্ব্যবহার, অসদ্ব্যবহার (৯১-২০০১), ফাতওয়া একটি রাজনৈতিক সমাজ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, পৃ-৬৬।

১০. Encyclopedia Britanicac; 11th ed. 1911 vol-28, p-782.

১১. ড. মুসতাফা আস্ সিবায়ী, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সামজে নারী, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০৪, পৃ-১০।

১২. Quotaed in Mace,Dovid and evra,Marriage: East and West Dolphin Books, Double day and co.Lne Ng.D60,P-82।

১৩. Encyclopedia Britanicac, vol-19, 1974, p-909।

১৪. ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১-১২।

১৫. রোমান আইনের ইতিহাস, দাওয়ালিবী, মারুফ, গ্রীসের নারী ও রোমান সমাজের নারী- মাহমুদ সালাম জান্নাতী দ্রষ্টব্য।

১৬. আব্দুল খালেক, নারী-দীনা পাবলিকেশন্স, ৯৩, মতিঝিল, ঢাকা, পৃ-৫।

১৭. সাইয়েদ আবুল আলী মওদুদী, পর্দা ও ইসলাম, অনুবাদক আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশীন, ঢাকা প্রথম সংস্করণ: পৃ-১৬।

১৮. বিশ্বকোষ ব্রিট্যানিকা ইনকরপোরেশন,বিশ্বকোষ ব্রিট্যানিকা,কানাডা, ১৯৭৪, অনু:-১৯, পৃ: ১০।

১৯. Allen, E.A. History of civilisation, vol-3, p-344।

২০. আব্দুল খালেক, নারী, দীনা পাবলিকেশন, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯, পৃ: ৯২-৯৩।

২১. Nazhat Afza and Khurshid Ahmed: The position of women in Islam, Islamic Book Publishers, Kuwait 1982, p-9-10।

২২. Husain Al-Shaikh, Studies in the Greek and Romans civilization,p.149।

২৩. Arab civilization by Dr. G.Lebon P-406,

২৪. আসমা জাহান হেমা -ইসলামের ছায়াতলে নারী, আল-এছহাক প্রকাশনী২/৩ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা,অক্টোবর, ২০০২ইং,পৃ-৩১।

২৫. ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ-১০।

২৬. Said Abdullah Seif Al-Hatimy: Women in Islam, Islamic Publication Ltd. Lahore, Pakistan, Oct, 1979, p-2-3।

২৭. ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী, অনুবাদক-আকরাম ফারুক, বাংলাদেশ ইসলামীক সেন্টার, ঢাকা। ১ম সংস্করণ-১৯৯৮, পৃ-১০।

২৮. ইসলামী সমাজে নারী, অনুবাদক, মোহাম্মদ মজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী সংস্থা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃ-২৩।

২৯. ইসলামী সমাজে নারী, অনুবাদক: মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা ২য় সংস্করণ: ১৯৯৭, পৃ-৩০।

৩০. হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর সমসাময়িক রাজা নমরুল ধ্বংসের পর ইরাকের সবচেয়ে নামজাদা রাজা ছিল হামুরবি। এটাই ছিল হামুরাবি রাজার সর্বোচ্ছ সহানুভূতি।

৩১. আবদুল খালেক, নারী, প্রাগুক্ত, পৃ-৬।

৩২. Said Abdullah self Al-Hatimy. Women in Islam, Islamic Publication Ltd. Lahore, Pakistan, 1979, P-7.

৩৩. আব্দুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-৫।

৩৪. Ramesh Chandra Mazumdarv op.cit. p-19.

৩৫. Professor Indra; Statues of Women in Mahbharat, p-16.

৩৬. আব্দুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-৪।

৩৭. ড. ক্যাপ্টেন আবদুল বাসেত, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩।

৩৮. ইমাম আল জাসসাসশ (অনু: মাওলানা আবদুর রহীম), আহকামুল কুরআন, ২য় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৫, পৃ-১৪৮।

৩৯. Thouless, R.H: Introduction to the psychology of Religion, Cambridge University, London, 1923, P.-63.

৪০. Ibid, P.-108.

৪১. আবুল কাশেম: ধর্ম, সমাজ ও বিজ্ঞান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ-১৯।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ-১৯

- বাংলাদেশের সমাজে ধর্মের ব্যবহার, অপব্যবহার, অসদ্ব্যবহার, অসদ্ব্যবহার (৯১-২০০১), ফাতওয়া একটি রাজনৈতিক সমাজ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-মুহম্মদ আবু ইউসুফ, পৃ-২৮-৩০(৪০,৪১,৪২,৪৩)।

৪৩. রমেশচন্দ্র মুন্সী, শ্রীঃ ধর্মতত্ত্ব পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, এ.মুখার্জী এন্ড কোং, কোলকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ৬৮-৬৯।

- মুহম্মদ আবু ইউসুফ- বাংলাদেশের সমাজে ধর্মের ব্যবহার, অপব্যবহার, অসদ্ব্যবহার, অসদ্ব্যবহার (৯১-২০০১), ফাতওয়া একটি রাজনৈতিক সমাজ তাত্ত্বিক বিশেøষণ, পৃ.৩১-৩২(৪৪)।

৪৪. মাসিক মদীনা, জুন ২০০২, সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা ৫৫/বি, পুরানা পল্টন,ঢাকা-১০০০,পৃ- ৪১ ।

৪৫. ড. মাহবুবা রহমান, কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃ-২০।

৪৬. আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-১০

৪৭. মাসিক মদীনা, প্রাগুক্ত, পৃ-৪১।

৪৮. আবদুল খালেক, পূর্বোক্ত, পৃ-১০।

৪৯. Nazhat Afza and Khurshid Ahmed, Ibid, P-4

৫০. মাসিক মদীনা, প্রাগুক্ত, পৃ-৪১।

৫১. Pospishil, Victor : Divorce and Marriage, London, P-49.

৫২. Klansner, Joseph : From Jesus to Paul, London, 1964, P-571-572.

৫৩. আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-১২।

৫৪. আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-১২।

৫৫. Bible, Mark-10 : 11-12.

৫৬. Pospishil, victor : op.cit. P-38.

৫৭. মাসিক মদীনা, প্রাগুক্ত, পৃ-৪১।

৫৮. Dr. G. Iebon, Arab Civilization, P-406.

৫৯. সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসারী উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ-৩১-৩৩।

৬০. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা, নারীর অধিকার ও মর্যাদা, ঢাকা: আসা রাফিয়া বইঘর, ১৯৯৫,পৃ-১৯।

৬১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদশ, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ-৬২। ড. আলামা জামাল আল বাদাভী, ইসলামিক টিচিং কোর্স, ৩য় খন্ড, অনুবাদঃ আবু খালদুন আল মাহমুদ, ইসলামের সামাজিক বিধান, ঢাকাঃ দি পাইও নিয়ার, ১৯৯৯, পৃ-৪৯-৫৫।

৬২. The Jewish Encyclopaedia, Vol.XII.P-556.

৬৩. মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী, মহানবী (স:) এর পারিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা, ঢাকা ঃ ফরদাবাদী মহল, ১৯৯৫, পৃ-৬৫, আলামা আবদুল কাইউম নদভী, ইসলাম আওর আওরাত, লাহোরঃ ইদারায়ে ইসলামিয়া, তা.বি.পৃ-২৩।

৬৪. আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-৮।

৬৫. আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-৮।

৬৬. সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪।

৬৭. ড. মাহবুবা, প্রাগুক্ত, পৃ-২৩।

৬৮. ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩।

৬৯. ড. মাহবুবা, প্রাগুক্ত, পৃ-২৩।

৭০. মাসিক মদীনা, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৮।

৭১. আসমা জাহান হেমা, প্রাগুক্ত, পৃ-২৯।

৭২. আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ-৯।

৭৩. মাওলানা ইসহাক ওবায়দী, যুগে যুগে নারী, শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৬, পৃ-২১-২২। মুফতী আব্দুলøাহ ফারুক, ইসলাম রমনীর মাল, আলফারুক প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ-১৯-২০।

৭৪. The Encyclopedia Britanicac, Vol-V, P-732.

৭৫. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, দেববানী, পৃ-৩২৪-৩২৭ দ্রষ্টব্য।

৭৬. Philip Hitti, History of the Arabs, London, Sent Martin Press, 1951, P-28.

৭৭. আল কুর আনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৬ঃ ৫৮-৫৯।

৭৮. সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ-২৬।

৭৯. আবু মুহাম্মদ আব্দুলøাহ ইবনে আবদুল রহমান আল দারেমন, সুনানুদ দারেশী, ১ম খন্ড, করাচীঃ কাদীমী কুতুবখানা, তা.বি.পৃ-১৪/ড. মাহবুবা, প্রাগুক্ত, পৃ-২৭।

৮০. আল কুরআন, ১৬ ঃ ৫৭।

৮১. Robartson Smith : Kinship and Marrage in Early Arabla (Cambrize University Press, 1903, P-92-94.

৮২. সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, গবেষণা বিভাগ, জুন, ২০০১, পৃ-৩২৬-৩২৭।

৮৩. Rewben Lady, The Social strueture of Islam, London, Cambrize University Press, 1971, P-91-92.

৮৪. আল কুরআন, ১৭ ঃ ৩১।

৮৫. আল কুরআন, ৬ ঃ ১৪০।

৮৬. Rustum and Zurayk : History of the Arab's and Arabic Culture, Beirut, 1940, P-36.

৮৭. Said Abdullah Seif Al-Hatimy, Ibid, P-15.

৮৮. সাইয়েদ জালাল উদ্দিন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬।

৮৯. সাইয়েদ জালাল উদ্দিন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬।

৯০. O' Leary D Lacy : Arabia Before Muhammad, London, 1927, P-191, Jhomas, Berfram, The Arabs, London, 1937, P-16.

৯১. আবু দাউদ, সুলায়মান ইবনুল আশআস, সুনান, ১ম খন্ড, কিতাবুত তালাক, দিলøী, মাকতাবা রাশীদিয়া, প্রা. বি.পৃ-৩০৪।

৯২. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, ঢাকা: আর আই এস পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫, পৃ-১১।

৯৩. সাইয়্যেদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ-১৮।

৯৪. Ruth in Ansion (SM): Family : Its Runction and Desuing Newyourk, Harpar and Brather's 1989, P.58-79.

৯৫. আল-কুরআন, ৬ ঃ ১৩৯।

৯৬. মাসিক মদীনা, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৩।

৯৭. মাসিক মদীনা, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৩।

৯৮. O'Leary De Lacy : Arabia Before Muhammad, London, 1927, P-282.

৯৯. মাসিক মদীনা, পৃ-৪৩।

১০০. Thamas Arnald: The Prencher of Islam, London, Constable, co-1993, P-8.

*Dhaka University Institutional Repository*

# তৃতীয় অধ্যায়

## ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

**৩.১. ইসলাম একটি শাশ্বত দ্বীন ঃ**

ইসলাম সর্বকালের সকল মানুষের জীবন চলার পথে এক নির্ভূল পথ নির্দেশনা, যা আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক বিধানের মতই শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়।'ইসলাম' এর শাব্দিক অর্থ শান্তি। সত্যিকার অর্থে আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন হল ইসলাম।[১] অপর অর্থে শান্তি স্থাপন তথা বিরোধ পরিহার করা অর্থাৎ আত্মসমর্পণে আল্লাহর সঙ্গে শান্তি স্থাপিত হয় এবং তার বিরুদ্ধতা পরিত্যক্ত হয় এবং আল্লাহর সৃষ্ট মানুষের সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতির অনুভূতিতে সাম্য নীতির স্বীকৃতিতে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। সুতরাং ইসলাম নির্দেশিত শান্তির পথে আল্লাহ ৬ মানবাত্মার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করা অর্থাৎ আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মানবতার উন্নয়নে সৎকাজ করা এবং মানুষের অকল্যাণ ও অন্যায় থেকে বিরত থাকাই হল মুসলমানের মূলনীতি। তাদের সম্পর্কেই আল-কোরআনে বলা হয়েছে- "হ্যা, যে কেহ আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন করে এবং সৎকার্য পরায়ণ হয়, তাহার ফল তাহার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে এবং তাহাদের কোন ভয় নেই ও তাহারা দুঃখিত হইবে না।"[২]

ইসলাম এর আভিধানিক অর্থ অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা, শান্তির পথে চলা, মুসলমান হওয়া, শরীয়াতের পরিভাষায় আল্লাহর অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা ও তার নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা, বিনা দ্বিধায় তার

আদেশ নিষেধ মেনে চলা এবং তার দেয়া বিধান-অনুসারে জীবনযাপন করা। আর যিনি ইসলামের বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করেন, তিনি হলেন মুসলিম বা মুসলমান।

ইসলাম আরবী শব্দ। সালমুন ধাতু হতে উৎপন্ন। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শান্তি, আপোষ, বিরোধ পরিহার। কোরআনে বিভিন্ন আকারে একই অর্থে একই ধাতু হতে নিষ্পন্ন কয়েকটি পদের ব্যবহার দেখা যায়। শব্দটির অর্থগত দিক বিশেøষণ করলে আমরা আরও দেখতে পাই এর অর্থ হচ্ছে-

- এক ও অদ্বিতীয় আলøাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা।[৩]
- শান্তি স্থাপন তথা বিরোধ পরিহার করা।

  দ্বিতীয় কথাটি ব্যাখ্যা করে আমরা বলতে পারি যে,

  ক) আত্মসমর্পণে আলøাহর সাথে শান্তি স্থাপিত হয় এবং তাহার বিরুদ্ধতা পরিত্যক্ত হয়।

  খ) আলøাহর সৃষ্ট মানুষের সহিত একাত্মতার অনুভূতিতে সাম্য নীতির স্বীকৃতিতে সমাজে শান্তি-নিরাপত্তার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়।[৪]

ইসলাম একটি দ্বীন। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।[৫] যা বিশ্বাস আনুষ্ঠানিক ইবাদত, দার্শনিক তত্ত্ব ইত্যাদি অপেক্ষা মানবের কর্মজীবন নিয়ন্ত্রণের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে। এ দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে আমলে সালিহ বা সৎকর্মে আত্মনিয়োগ। তাই ইসলাম যখন অন্যান্য জাতিকে তার আদর্শ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিল, তখন শান্তি, নিরাপত্তা ও মুক্তির বাহকরূপে এ ধর্মকে চিহ্নিত করা হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা ইসলাম শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে বলতে পারি, এমন একটি ধর্ম বা আদর্শ যা মানুষকে শান্তিতে বসবাস করতে এবং নিরাপত্তা লাভে ও নিরাপত্তা দিতে সহায়তা করে। এখন দেখা যাক, কিভাবে এ ধর্ম অধিকার লাভে ও নিরাপত্তায় সহায়ক হয়।

ইসলাম আল্লাহ তায়ালার মনোনীত একমাত্র দ্বীন, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানব জাতির জন্য আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত এই জীবন ব্যবস্থার সকল বিধি-বিধান কোরআন সুন্নাহর মতাদর্শের উপর নির্ভরশীল। রাসূলুল্লাহ্ (সা:) তার নব্যুওয়াতী জীবনের দীর্ঘ ২৩ বৎসর এই বিধানকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ধারণ করেছেন এবং নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছেন অনাগতকালের মানব গোষ্ঠীকে তারা জীবন পথে কিভাবে ইসলামকে মেনে চলবে। এর মাধ্যমেই তিনি প্রমাণ করেছেন ইসলামের একটি বিধানও এমন নেই যা মানুষের জীবনে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। মানুষের উপর আল্লাহর কি অধিকার, তার প্রতি মানুষের কি কর্তব্য এবং মানুষের প্রতি মানুষের কি দায়িত্ব রয়েছে সে সম্পর্কেও ইসলাম এক সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন।[৬]

মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনকে সর্বাংশে সুন্দর ও পরম সৌভাগ্যপূর্ণ করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইসলাম এসেছে।[৭] ইসলাম জ্ঞান ও বিবেকের সাথে সঙ্গতি রেখে পৃথিবীর সকল ধর্মের উপর নিজ শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণ করেছে, সমন্বয় সাধন করেছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে। এতে রয়েছে মানব জীবনের পূর্ণ

বিকাশ, সহজ স্বচ্ছন্দ গতি ও পরিণতির দিক নির্দেশনা যা মানবিক সুবিচার ও শান্তির নিশ্চয়তা। এখানেই ইসলাম ও তার মহান নবীর বিশেষত্ব যা অন্য কোন শান্তি ও মুক্তির বার্তাবাহকগণের ক্ষেত্রে খুব কম দেখা যায়।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হল আল্লাহর বিধান ও রাসূলুল্লাহ্ (সা:)-এর জীবাদর্শের প্রতি নিরঙ্কুশ ও আকুণ্ঠ আত্মসমর্পণ।[৮] ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বাইরে অন্য কোন কিছুই মানব জাতি ও সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। তাই কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তাই ইসলামের পূর্ণতা, মৌলিকত্ব ও স্বাতন্ত্র পরীক্ষিত ও কালোত্তীর্ণ। মানব জাতির জন্য ইসলামী বিধানের মধ্যে রয়েছে সার্বিক কল্যাণ, সামাজিক শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও মুক্তির বিধান। ইসলামই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যেখানে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত। এজন্য ইসলাম হল দল-মত, ধর্ম-বর্ণ, সাদা-কালো, নির্বিশেষে সকলের মুক্তি ও কল্যাণের নিশ্চয়তা।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা:) এর জীবনাদর্শের ভিত্তিতে আল্লাহর কাছে নিঃশর্ত, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।[৯] ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন।[১০] এ জীবন ব্যবস্থার বাইরে আর কোন কিছুই মানবজাতি ও সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। তাই কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।[১১] এ বিষয়ে হাদীসে এসেছে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়া, সালাত আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা পালন করা এবং যাতায়াতের সামর্থ থাকলে বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্ব আদায় করা।[১২] পারিভাষিক অর্থে ইসলাম শব্দের অর্থ নিরাপত্তা ও শান্তি। নিরাপত্তা একারণেই বলা হয়েছে, কেননা ইসলাম শব্দটি মূল ধাতু সিলম, সিলাম এবং সালিম শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ দাঁড়ায় কঠিন প্রস্তর। কারণ উহাতে কোমলতা নাই, নরম হওয়া হতে মুক্ত। সালাত এর অর্থ বাবলা বৃক্ষের ন্যায় কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ; যে বৃক্ষ কণ্টক থাকায় বিপদ আপদ হতে মুক্ত থাকে।[১৩]

বস্তুত ইসলাম সকল নবী রাসূলের অভিন্ন ধর্ম। হযরত আদম (আ:) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সা:) পর্যন্ত আগমনকারী সকল নবী রাসূলগণই মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন এবং এরই ভিত্তিতে নিজ নিজ উম্মতকে গড়ে তুলেছেন।[১৪] ইসলাম ধর্মের মূল মর্ম হল আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা, আর প্রত্যেক পয়গম্বরই যেহেতু নিজে আল্লাহর পূর্ণ অনুগত থাকার সাথে সাথে উম্মতকেও এর দিকে দাওয়াত দিয়েছেন, তাই সকল নবীর দ্বীনই ইসলাম।[১৫] এ বিষয়ে আরো উদাহরণ মিলে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটিতে যেখানে বলা হয়েছে,

'হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের উভয়কে মুসলিম তথা তোমার অনুগত বানাও এবং আমাদের বংশধর হতে এক উম্মাতে মুসলিমাহ্ অর্থাৎ তোমার এক অনুগত উম্মাত বানাও।'[১৬]

হযরত ইব্রাহীম (আ:) তার সন্তানদের প্রতি ওসীয়ত স্বরূপ বলেছিলেন, যা কুরআনে নিম্নোক্তভাবে এসেছে, "তোমরা মুসলমান না হওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।[১৭] মুসলমানদের নামকরণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এসেছে হযরত ইব্রাহীম (আ:) উম্মতী মুহাম্মদীয়াকে মুসলমান নামে অভিহিত করেছেন।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

'এটা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত। তিনি পূর্বেই তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম এবং এই কিতাবে।'[১৮]

উপরোক্ত আয়াত তিনটিতে পরপর 'মুসলিম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব বুঝায় এবং সাথে সাথে এটিও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সকল নবী এবং রাসূলগণের প্রচারিত ধর্মের কোন মৌলিক পার্থক্য ছিল না। তবে প্রত্যেকের শরীয়ত ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, 'আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীয়াত ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি।'

হযরত আদম (আ:) থেকে নবী রাসূলদের যে সিলসিলা (পরমপরা) শুরু হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটে, হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর মাধ্যমে। তিনি সর্বশেষ নবী। তারপর আর কোন নবী এ পৃথিবীতে আসবে না। তার আগমনে পূর্ববর্তী সমস্ত শরীয়াত হয়ে গেছে। তাই এখন ইসলাম বলতে হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর আনীত শরীয়াতকে এবং মুসলিম বলতে উম্মাতী মুহাম্মদীয়াকে বুঝাবে।[১৯]

প্রকৃতপক্ষে হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর নির্দেশনা মোতাবেক নিজকে আল্লাহর নিকটে সপে দেয়া এবং পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করার নামই হল ইসলাম। যে আত্মসমর্পণ করে তাকে বলা হয় মুসমিল। ইসলাম গ্রহণ করার পর কোন ব্যক্তি ইসলাম পরিপন্থি নিজস্ব খেয়াল খুশি এবং ধ্যান-ধারণা অনুসরণে কোন সুযোগ থাকে না।[২০]

এ বিষয়ের সমর্থন পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে পাওয়া যায়-

'আল্লাহ ও তার রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মুনি পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তার রাসূল (সা:)- কে অমান্য করলে সেতো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে।'[২১]

এ সত্যটি কালপরিক্রমায় মানবজাতি সর্বাধিক প্রত্যক্ষ করেছে। তাই ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা, মৌলিকত্ব ও স্বাতন্ত্র আজ পরীক্ষিত ও কালোত্তীর্ণ। এর অন্যতম পরিচয় এটি মানুষের স্বভাব ধর্ম, আল্লাহ প্রদত্ত।

**৩.২. ন্যায়সঙ্গত অধিকার বা মর্যাদা ঃ**

ইংরেজী প্রতিশব্দ Right যার শাব্দিক অর্থ ন্যায়সঙ্গত, ন্যায়গত বা সঠিক। অধিকার বলতে আইন দ্বারা সীমিত একজন ব্যক্তির কোন কিছু করার স্বাধীনতা, কোন কিছু নিজের অধীনে রাখা বা অন্যের কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করাকে বোঝায়। আইনের ভাষায় অধিকার হল একটি স্বার্থ যা সংবিধান বা সাধারণ আইন দ্বারা সৃষ্ট ও বলবৎযোগ্য হয়। অধিকারের সঙ্গে কর্তব্য সম্পৃক্ত। অন্যরা কর্তব্য পালন না করলে আমাদের পক্ষে অধিকার ভোগ করা সম্ভব নয়। তাই আমরা বলতে পারি যে, অধিকার বলতে মানুষের আত্মবিকাশের জন্য কতিপয় সুযোগ সুবিধাকে বোঝায় যার হয় নৈতিক না হয় আইনগত ভিত্তি রয়েছে। অধিকার দু'ধরনের-

(১) নৈতিক অধিকারঃ-

নৈতিক অধিকারের ভিত্তিতে সমাজে মানুষের একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান থাকা উচিত। সে মানুষ হিসেবে সম্মানের পাত্র এবং সমাজের অন্যান্য লোকের মত তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সরকারের জন্য অপরিহার্য। যে ব্যক্তিই কোন কর্তৃত্ব বলে তার সাথে ব্যবহার করে তার একথা ভুললে চলবে না যে, সে একজন মানুষ এবং মানবীয় সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে সে কেবলমাত্র কোন ক্ষমতা বলে অথবা পদাধিকার বলে অন্যদের তুলনায় বিশেষ কোন মর্যাদার অধিকারী নয়।'[২২]

(২) আইনগত অধিকারঃ-

যে অধিকার দেশের আইন দ্বারা স্বীকৃত, যা আইনগত ভাবে দাবী করা যায় এবং যা ভঙ্গ করলে আইনগত অপরাধ হয় তাকে আইনগত অধিকার বলে। অধিকার সমাজে জন্ম লাভ করার পর প্রথমে নৈতিক অধিকার হিসেবে উহা বিরাজ করে। পরবর্তীতে উহার দাবীর গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে আইন উহাকে স্বীকৃতি দেয় এবং বলবৎকরণের ব্যবস্থা করে, ফলে উক্ত আইনগত অধিকারে পরিণত হয়। সকল আইনগত অধিকার নৈতিক অধিকারও বটে।[২৩]

একজন নারীর স্বাধীনতা, সুবিচার ও শান্তির ভিত্তি হচ্ছে মানব পরিবারের সকল সদস্যের জন্মগত ও স্বাভাবিক মর্যাদা এবং তাদের অভিন্ন ও হস্তান্তর অযোগ্য অধিকারের স্বীকৃতি। আর এ সকল সুযোগ সুবিধাগুলো হচ্ছে নারীর প্রকৃত অধিকার।

ইসলামে নারীর অধিকার ও কর্তব্য আল্লাহ ও তার রাসূল (স.) নিশ্চিত করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ ও তার রাসূল (স.) কারো অধিকার নির্ধারণ করতে গিয়ে এমন কোন সমাজকে সম্বোধন করেননি, যারা মহান আল্লাহর প্রেরিত পবিত্র ইসলামের পরিবর্তে অন্য কোন সভ্যতা, সমাজ ব্যবস্থা অনুসরণ করতে ইচ্ছুক। অবশ্য অমুসলিম নারীদের বেলায় কর্তব্য ও দায়িত্ব কমিয়ে দেখার পাশাপাশি অধিকারের ব্যাপারে কিছুটা ছাড় দিয়েছে। তাদের কিছু অধিকার তাদের নিজ নিজ ধর্ম মোতাবেক হয়ে থাকে। অধিকার দু'ধরনের-

১. সাধারণ অধিকার- এ ব্যাপারেও নারী,পুরুষ সবাই সমান।

২. নর-নারীর পৃথক অধিকার- এ অধিকার উভয়ের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা কিন্তু হিসাব উভয়েরই সমান।[২৪]

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ আরো যেসকল অধিকার একজন পুরুষ ভোগ করবে সেসকল অধিকারগুলো সমানভাবে একজন নারীও ভোগ করবে এটাই হচ্ছে নারীর অধিকার। তবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান যার জন্য যেটা সেটাই তার জন্য যথাস্থানে বাস্তবায়িত হবে। তাছাড়া নারী ও পুরুষ যেহেতু আলাদা প্রকৃতির সেহেতু নারী তার প্রয়োজন অনুপাতে তার সুযোগটুকু বিনা বাধায় ভোগ করাই হচ্ছে নারীর প্রকৃত অধিকার। একজন নারী, নারী হিসাবে যেখানে যে অবস্থায় যে সকল মানবিক সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন সেখানে সে অবস্থায় সে সুবিধার নিশ্চয়তা হচ্ছে নারীর অধিকার।

**৩.৩. মৌলিক অধিকারের মধ্যেই মানবাধিকার নিহিত ঃ**

মৌলিক অধিকার হল সে প্রাকৃতিক অধিকার এবং মানবাধিকার যেগুলো কোনব্যক্তি তার দেশের নাগরিক হিসেবে ভোগ করে এবং সেগুলো নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত। মৌলিক অধিকার মানুষের সম্মান, মর্যাদা ও গাম্ভীর্যকে একনায়কতন্ত্র, নির্মম স্বৈরতন্ত্র ও নির্দয় সাম্যবাদের প্রভাব থেকে হিফাজতের ব্যবস্থা করে। সম্মানের সঙ্গে জীবন যাপনের নিশ্চয়তা দেয়া, মানুষের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উন্মেষ ঘটানো, ব্যক্তিগত যোগ্যতার দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দেয়া এবং চিন্তাকর্মের স্বাধীনতার এমন এক পরিমণ্ডলের ব্যবস্থা করা যা রাষ্ট্র এবং সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ থাকবে। গাজী শামসুর রহমান উল্লেখ করেছেন, 'মানুষকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে যেসব অধিকার তার থাকা আবশ্যক, সেসব অধিকারের নাম মানবাধিকার। মানুষের সম্ভাবনাকে পূর্ণভাবে বিকাশ হতে দেয়ার জন্য যে সব অধিকার থাকা আবশ্যক, সেসব অধিকারের নামও মানবাধিকার। আন্তর্জাতিকভাবে যেসব অধিকারকে মানবাধিকার বলা হয়, নিজের দেশের সেগুলো মৌলিক অধিকার নামে চিহ্নিত করা হয়।'[২৫]

মানবাধিকার শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, মানবাধিকার বলতে মানুষের যে কোন অধিকারকে বোঝানো হয় না, আইন ও নৈতিক অধিকারগুলোর মধ্যে সেগুলোই মানবাধিকার যা শুধু মানুষ হিসেবে পৃথিবীর সকল মানুষ ভোগ ও ব্যবহার করার দাবী করতে পারে। এসকল অধিকারসমূহ কোন দেশ বা কালের সীমানায় আবদ্ধ নয় বরং এটা সহজাত, সর্বজনীন, চিরন্তন ও শাশ্বত। সাংবিধানিক আইন গ্রন্থে বলা হয়েছে, মানবাধিকার এমন একটি অধিকার যা ক্রয়যোগ্য, বিক্রয়যোগ্য বা হস্তান্তরযোগ্য নয়। সর্বোপরি কোন বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে এ সকল অধিকারসমূহ সৃষ্টি হইতে পারে না। একে বরং প্রাকৃতিক অধিকার বলা যেতে পারে।[২৬]

মানবাধিকারের অন্তর্নিহিত বিষয় হচ্ছে মানুষ ও অধিকার। এ শব্দগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ যে সকল আইনগত অধিকারের মালিক সেগুলোই মানবাধিকার। মানবিক সত্তায় অতুলনীয় মানুষ এ কথা উচ্চারিত হয়েছে যেমনি আল-কোরআনে, তেমনি বেদ পুরানে, কবি কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। বাউলের গীতিতে, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তার উপরে নাই' বলেছেন প্রাচীন বাংলার কবি চণ্ডিদাস প্রখ্যাত সাফিষ্ট দার্শনিক প্রোটাগেরাস বলেন, 'মানুষই সত্যের নিয়ামক।' অতএব মানুষ হচ্ছে অমৃতাস্য বা আশরাফুল মাখলুকাত বা সবার উপরে।[২৭]

মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা, সহজাত ক্ষমতার সৃজনশীল বিকাশ এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় কতিপয় অধিকার হচ্ছে মানবাধিকার। এসব এমন অধিকার যেগুলো ব্যতীত মানুষ সত্যিকার মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে পারে না। অধিকারগুলো মানুষের মর্যাদা ও মূল্যবোধের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং মানুষরূপে জন্মলাভ করার কারণে তার জন্মগত অধিকার। সৃষ্টিকর্তা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাই সৃষ্টিকর্তা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপনের জন্য সমানভাবে এ অধিকারগুলো প্রদান করেছেন। সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক এসব অধিকার প্রদত্ত বলেই সম্ভবত এগুলোকে প্রাকৃতিক অধিকার বলা হয়। Encyclopedia Britannica- তে এ অধিকারগুলোকে প্রাকৃতিক আইনের আওতায় প্রাপ্য মানুষের অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয়েছে- 'Rights thought to belong to the individual under natural law as a consequence of this being human.' [২৮]

মানবাধিকারের অর্থবোধ মানুষের প্রয়োজন পূরণের সুবিধাদি প্রাপ্যতার মধ্যেও খোঁজ পাওয়া যায়। মানুষের প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে তার অস্তিত্ব রক্ষা পায়, বিকাশ সাধিত হয় এবং শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ হয় বলে মানবাধিকার এসব প্রয়োজন পূরণের সুবিধাদি প্রাপ্যতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। যদিও মানুষের চাহিদা সম্পর্কিত জ্ঞান অপূর্ণাঙ্গ তথাপি মানবীয় বুদ্ধি বিকাশের দিক হতে বিবেচনা করলে কতিপয় পারস্পারিক সম্পর্কবদ্ধ মৌলিক চাহিদা পূরণের মধ্যে এর একটি সাধারণ পরিচয় বিবৃত করা যায়। এতে অন্তর্ভুক্ত মৌলিক চাহিদাগুলো হলঃ (ক) জীবতাত্ত্বিক চাহিদা বস্তুগত (খাদ্য, আশ্রয়, বস্ত্র ইত্যাদি),

(খ) উৎপাদনশীল সৃজনাত্মক (কাজ করা ও সৃষ্টি), (গ) নিরাপত্তা (গোপনীয়তা ও নিরাপদ থাকা) এবং (ঘ) আধ্যাত্মিক (ধর্মকর্ম ও নিজ অস্তিত্বকে অর্থবহ রূপে খুঁজে নেয়া)।[২৯]

মানবাধিকারের ঘোষণার ভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বিশ্ব মানবাধিকারের ঘোষণা ৩০টি ধারায় বিন্যস্ত করা হয়েছে। অবশ্য এতে কোন কোন বিষয়ের একাধিক ধারায় পুনরোক্তি হয়েছে, অথবা অন্ততঃ কোন কোন ক্ষেত্রে এক ধারায় যা উল্লেখ করা হয়েছে তার ফলে অপর কতক ধারার বক্তব্যের আর প্রয়োজনীয়তা থাকে না। অন্যদিকে কোন কোন ধারা একাধিক ধারায় বিভক্ত করার উপযোগী।[৩০]

তবে ঘোষণাপত্রের ভূমিকায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এসেছে এবং যা বিবেচনার দাবি রাখে তা হচ্ছে ঃ

১। মানুষ এক ধরনের হস্তান্তর অযোগ্য জন্মগত ও প্রাকৃতিক মর্যাদা, সম্মান ও অধিকারের অধিকারী।

২। মানুষের জন্মগত ও প্রাকৃতিক মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার হচ্ছে সাধারণ ও সার্বজনীন মানব জাতির সকল সদস্য যার আওতাভুক্ত। এক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্যের অবকাশ নেই, সাদা ও কালো, লম্বা ও খাটো, নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এর অধিকারী। ঠিক যেভাবে এক পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কেউ তার মূল সত্তাকে পরিবারের অন্য সদস্যদের তুলনায় অধিকতর সম্ভ্রান্ত ও অধিকতর বনেদী বলে মনে করতে পারে না, ঠিক সেভাবেই মানব জাতির সকল সদস্য এক বৃহত্তর মহাপরিবারের সদস্য ও এক বিশাল দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিসেবে মর্যাদার বিচারের পরস্পর সমান। তাদের কারো পক্ষেই নিজেকে অন্যদের তুলনায় অধিকতর মর্যাদাবান বলে দাবি করা সম্ভব নয়।

৩। স্বাধীনতা, শান্তি ও সুবিচারের ভিত্তি হচ্ছে এই যে, সকল মানুষই তার বিবেকের গভীরে এ সত্য অর্থাৎ মানুষের জন্মগত ও প্রকৃতিগত মর্যাদা ও সম্মানে বিশ্বাসী হবে এবং তাকে স্বীকার করবে। এ ঘোষণা বলতে চায়, মানব জাতির সদস্যরা পরস্পরের জন্য যেসব দুঃখ-কষ্ট তৈরি করছে তার উৎস তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ, জুলুম-অত্যাচার, সীমালঙ্ঘন এবং ব্যক্তি ও জাতিসমূহের পৈশাচিক কর্মকান্ডের উৎস হচ্ছে মানুষের জন্মগত ও স্বাভাবিক মর্যাদা ও সম্মানের স্বীকৃতিহীনতা। কতকের পক্ষ থেকে এই স্বীকৃতিহীনতা তাদের প্রতিপক্ষকে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহে বাধ্য করে এবং এর ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন হবে।

৪। সকল মানুষের জন্য যে সর্বোচ্চ আকাঙ্খার বাস্তব রূপায়নের চেষ্টা করা উচিত তা হচ্ছে এমন এক বিশ্বের আত্মপ্রকাশ যেখানে বিশ্বাস ও চিন্তার স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও বস্তুগত কল্যাণ পুরোপুরি নিশ্চিত হবে এবং শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা, ভয়-ভীতি ও দারিদ্র মূলোৎপাটিত হবে। ৩০ ধারা বিশিষ্ট এ ঘোষণাটি উক্ত আকাঙ্খা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই প্রণীত হয়েছে।

৫। মানুষের অলঙ্ঘনীয় ও হস্তান্তর অযোগ্য জন্মগত মর্যাদা ও সম্মানে বিশ্বাস শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে সকল মানুষের মধ্যেই সৃষ্টি করতে হবে।

মানুষ হিসেবে অধিকারের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মাঝে অধিকারের ক্ষেত্রে কোন ভেদাভেদ নেই। নারী এবং পুরুষের যার যতটুকু অধিকার পাওয়া দরকার তার ততটুকু সংরক্ষিত আছে তবে এ ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মাঝে যে সামঞ্জস্য হবে তা সাম্য না কি সমতা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন।

পাশ্চাত্যবাসীগণের দাবী এ যে, মৌলিক ও মানবাধিকারের ইতিহাস মাত্র তিন চারশো বছরের পুরাতন। তারা এ সময়কালে নিজেদের এখানে প্রকারান্তরে সংগ্রাম ও চেষ্টা সাধনার যা কিছু অর্জন করেছে তার দ্বারা আজও গোটা দুনিয়া উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু কোরআন মাজীদ আমাদের সামনে যে ইতিহাস পেশ করছে তা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, প্রথম মানব যে দিন এ পৃথিবীতে পদার্পণ করেছেন সেদিন থেকে মৌলিক অধিকার তার চেতনা ও অনুভূতির অংশ হয়ে আছে। এসব অধিকার নির্ধারণ ও অর্জন তার নিজের অবদান নয় বরং স্বয়ং একচ্ছত্র অধিপতি পর্যায়ক্রমে তাকে দান করেছেন। আজ পৃথিবীর যেখানেই এসব অধিকারের প্রতিধ্বনি শোনা যায় সেখানে ঐশী শিক্ষার আলোকরশ্মির দ্বারাই মৌলিক অধিকারের চেতনা জাগ্রত হয়েছে।

**৩.৪. মৌলিক অধিকারের যৌক্তিক সমতা ঃ**

ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে শুধু সুবিচার প্রতিষ্ঠা করেনি বরং নারী পুরুষের মৌলিক অধিকারের যৌক্তিক সমতা দান করেছে। ইসলামী বিধান এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ। তা প্রতিষ্ঠিত হলে নারীর পক্ষে অভিযোগ তোলার একবিন্দু কারণ থাকবে না পুরুষের। আর তাহলে পুরুষ কোনরূপ অবিচার বা নিপীড়ন চালাবার সুযোগ পাবে না। ইসলামী আদর্শের সমাজই হচ্ছে মানুষের সকল প্রকার অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্র। মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন: 'কিয়াসের মধ্যে তোমাদের জীবন রহিত রয়েছে। হে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা! সম্ভবত তোমরা খোদাভীতি অর্জন করতে পারবে।'[৩১]

হত্যাকারী নারী-পুরুষ যেই হোক, তার অপরাধের জন্য তার প্রাণ বধ করা হবে। এক্ষেত্রে সে নারীকে হত্যা করেছে না পুরুষকে হত্যা করেছে তা ধর্তব্য নয়। কারণ পুরুষের প্রাণ যেমন নিষিদ্ধ ও সম্মানিত তেমনি নারীর প্রাণও নিষিদ্ধ ও সম্মানিত। এজন্য নবী করীম (স.) ইয়ামেনবাসীদের জন্য লিখিত চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন, 'কোন পুরুষ যদি কোন নারীকে হত্যা করে তাহলে তাকেও হত্যা করা হবে।'[৩২]

ইসলামী বিধানে কিয়াসের ব্যাপারে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নারীর চোখ, কান এবং যেকোন অঙ্গের জখমের পরিবর্তে পুরুষের (যদি অপরাধী হয়) নিকট থেকে অনুরূপ বদলা নেয়া হবে। আর যদি কোন পুরুষ নারীকে হত্যা করে তাহলে তাকেও হত্যা করা হবে।[৩৩]

এভাবে ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কেই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকার অনুমতি প্রদান করেছে এবং তাদের পারিশ্রমিকের ফলকে বৈধ অধিকার বলে স্বীকার করেছে। তার এ কাজে কেউই আইনগতভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারেনা। এমনকি স্বামীও স্ত্রীর সম্পদে কর্তৃত্ব খাটানোর অধিকারী নয়। তেমনি স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর নিজের মর্জি খাটানোর কোন আইনগত বৈধতা নেই। পুরুষের জন্য তাদের উপার্জনের ন্যায্য অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে। আর মেয়েদের জন্যও তাদের উপার্জনের ন্যায্য অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে। আল্লাহর কাছেই তোমরা তার নিয়ামতের জন্য প্রার্থনা কর।[৩৪]

ইসলাম স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য যৌক্তিক অধিকার বিধিবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করেছেন এবং পুরুষকে পরিবারের প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত করলেও তাকে স্বেচ্ছাচারী হবার অনুমতি দেয়নি। এ সম্পর্কে মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করেন, 'নারীদের তেমনি ন্যায় সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। আর আল্লাহতায়ালা মহাপরাকমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৩৫]

প্রাচীন ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায় নারী পুরুষের সামাজিক আইনের ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল। সর্ব যুগের পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা ছিল বঞ্চিত ও নিগৃহীত। কিন্তু ইসলাম নারী-পুরুষকে আইনের ক্ষেত্রে যৌক্তিক সমতা দান করেছে। ইসলাম নারী-পুরুসকে আন্নাস তথা মানব জাতি হিসেবে অভিহিত করেছে। কোরআনের ভাষায় রব্বিন্নাস, মালিকিন্নাস, ইলাহিন্নাস অর্থাৎ মানব জাতির রব, মানব জাতির অধিপতি এবং মাবন জাতির হুকুমদাতা, কোথাও রাব্বির রিজাল, মালিকির রিজাল, ইলাহির রিজাল, তথা পুরুষের প্রভু, পুরুষের অধিপতি, পুরুষের হুকুমদাতা বলা হয়নি। বরং কোরআনের বাণী ইনসান অর্থাৎ নারী-পুরুষ তথা গোটা মানবকুলের জন্য। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বর্ণনা করেন- 'আমি আসমান-জমিন ও পাহাড়ের সামনে আমানত (কোরআন) পেশ করলাম। কিন্তু তারা সবাই তা বহন করতে অপারগতা জানিয়ে অস্বীকার করলো এবং ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ তা বহন করলো, যে বড় জালেম ও অজ্ঞ। এটা এ জন্যে যেন আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দেন। আর তিনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর তওবা কবুল করেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়াম।'[৩৬]

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আরও বর্ণনা করেন: 'আল্লাহ ও তার রাসূল ঈমানদার নারী-পুরুষদের ব্যাপারে কোন ফয়সালা দিলে সে ব্যাপারে তাদের আর কোন এখতিয়ার থাকা ঠিক নয়। যে আল্লহর ও তার রাসূলদের অবাধ্য হবে সে স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।'[৩৭]

এক কথায় কোরআন নারী-পুরুষের জন্য একই জীবন-বিধান তথা পথ চলার নির্দেশিকা দান করেছে। কারো জন্য স্বতন্ত্র কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। নারী-পুরুষ একই আদর্শের অনুসারী এবং একই পথের পথিক। তারা কোন শ্রেণী বৈষম্যে বিভক্ত নয়। তারা জীবনযুদ্ধে একই রণাঙ্গণের সৈনিক। তাদের কর্মক্ষেত্রেও লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন।

মানব জাতি হচ্ছে আদমের সন্তান। আল্লাহ তায়ালা কোরআন মাজীদে অন্তত ২০/৩০ বার বলেছেন, 'ইয়া বনি আদম'- (হে আদমের সন্তান)। বাবা মা ও সন্তানেরা মিলে যেমন পরিবার গঠিত হয়, তেমনি ইসলামের দৃষ্টি মানব জাতি একটি পরিবার। সব পরিবারের উপর হল মানব জাতির পরিবার। তার অর্থ হল সবার মৌলিক সম্মান ও মর্যাদা সমান। ছোটখাটো কারণে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। আইনের চোখে সবাই সমান, তেমনি আল্লাহর কাছেও সবাই সমান। আল্লাহর কাছে সম্মানের একমাত্র ভিত্তি হল 'তাকওয়া'। আল্লাহ তায়ালা কোথাও বলেন নাই যে তার কাছে পুরুষ সম্মানিত বা নারী সম্মানিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হইতে পার। তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।

আল্লাহ তায়ালার কাছে যদি মর্যাদার এ ভিত্তি হয়, তাহলে মানুষের পার্থক্যের কী আসে যায়। অতএব, সবাই এক পরিবারের সন্তান এবং মৌলিক মর্যাদা সমান।[৩৮] সুতরাং মৌলিক সামাজিক মর্যাদা এক্ষেত্রেও সমান বলে প্রতীয়মান হল।

**৩.৫. ইসলামে নারীর মানবাধিকার ঃ**

মানবাধিকার মানুষ ও তার স্বকল্পিত শাসক গোষ্ঠীর পারস্পারিক দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং তাদের মাঝে কৃত চুক্তির মাধ্যমে অস্তিতিশীল নয়। কিংবা কোন দার্শনিক রাজনীতিবিদ অথবা আইনজ্ঞের গভীর চিন্তা প্রসূত এবং স্বীয় সৃষ্টিকুলের জন্য তাদের স্রষ্টার। বরং স্বীয় প্রজাদের জন্য তাদের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত। তা মানুষের সত্ত্বার সাথে অবিচ্ছেদ্য, যা মানব সৃষ্টির সাথে নির্ধারিত হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে মানবাধিকার ধারণাটি বর্তমান যুগের আধুনিক ধারণা নয়। প্রায় চৌদ্দশত বছরেরও আগে আল-কোরআন এবং হাদীসের মাধ্যমে ইসলামী আইনে মানবাধিকারকে বিধিবদ্ধ করা হয়। ইসলামী আইনে সংযোজিত মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের নীতিসমূহ বর্তমানকালে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

যদিও সাধারণভাবে ধারণা করা হয়, মানবাধিকার সম্পর্কিত জ্ঞানের উৎপত্তি বিকাশ ইউরোপ ও আমেরিকার দার্শনিক ও বিপ্লবীগণের চিন্তাধারার ফসল। প্রকৃতপক্ষে তাদের এ সম্পর্কিত চিন্তা ধারার ভিত্তিতে সাম্প্রতিককালে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বহু পূর্বে প্রায় চৌদ্দশত বছরের আগে সপ্তম শতাব্দীতে পবিত্র আল-কোরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে ইসলামী আইনে মানবাধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়। ইসলামই মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সম্পর্কিত এক ফলপ্রসূ দিক নির্দেশনা উপস্থাপন করেছে।[৩৯]

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় এ পৃথিবীতে মানব জাতির অস্তিত্ব যত প্রাচীন, মৌলিক মানবাধিকারের ধারণাও তত প্রাচীন। এ পৃথিবীতে পদার্পনকারী প্রথম মানবতার জীবনের সূচনা অজ্ঞতার অন্ধকারে নয়, জ্ঞানের আলোতেই শুরু করেছিলেন। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মুহাম্মদ (স.) এর ধর্মের বাণী ছিল আল্লাহর একত্বতাবাদকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সেই সঙ্গে সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও নিরহংকার মূল্যবোধের আলোকে মানবাজীবনকে সর্বাঙ্গীণ করা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো সৃষ্টি করে আইনের মাধ্যমে মানব সমাজে অধিকার প্রতিষ্ঠা।[৪০]

আল-কোরআন ও রাসূল (স.) এর সুন্নাহতে মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে সপ্তম শতাব্দীতেই ইসলাম মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সম্পর্কিত এক ফলপ্রসূ দিক নির্দেশনা উপস্থাপন করেছে। মহানবী (স.) এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত মদীনা প্রজাতন্ত্র ৬২২ সালে প্রণীত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম লিখিত সংবিধান 'মদীনা সনদ' এ সামাজিক উৎপত্তি, জন্ম ও অন্যান্য মর্যাদাসহ সকলের জন্য অনেকগুলো অধিকারের কথা বলা হয়েছে।[৪১]

ইসলামের খিলাফত ব্যবস্থার অধীন আফ্রো-এশীয় বহু রাষ্ট্র ও জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত আন্ত-মহাদেশীয় রাষ্ট্রের আপমর জনসাধারণ বহু শতাব্দী ধরে কোরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত মানবাধিকারসমূহ চর্চা করেছেন।[৪২]

ইসলামী আইনে সংযোজিত মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের নীতিসমূহই বর্তমানকালে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে পরিলক্ষিত হচ্ছে।[৪৩] ইসলামে মানবাধিকার প্রসঙ্গটি গভীরতার ও ব্যাপকতার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সূক্ষ্মতর ব্যাঘাত হবার দাবী রাখে।[৪৪]

মানবজাতি সমকালীন মানবাধিকার মতবাদের উন্নয়ন ও এর এ সম্পর্কিত উৎস ইসলামী ধারণা থেকেই প্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমান পাশ্চাত্য ধারার মানবাধিকারের সাথে ইসলাম ধর্মে বর্ণিত মানবাধিকার পরিধি ও তাৎপর্যগত দিক দিয়ে পার্থক্য পূর্ণ হলেও বর্তমানে মানবাধিকার হিসেবে চিহ্নিত বিভিন্ন অধিকারসমূহ অধিকতর অর্থবহভাবে ইসলামে ঘোষিত হয়েছে।[৪৫]

আল-কোরআনে পেশকৃত মানবাধিকারের এ ইতিহাস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম মৌলিক অধিকারের ধারণা সর্বপ্রথম মানুষের সৃষ্টির দিন থেকেই বিদ্যমান। ইসলামী আইনে বর্ণিত মানবাধিকারসমূহ যেহেতু আল্লাহ প্রদত্ত সেহেতু কোন প্রয়োজনীয় মুহূর্তে এগুলো স্থগিত রাখা যাবে এমন কোন বিধান নেই। এতে কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা যায় না এবং এ অধিকারগুলো পৃথিবীর সকল মানব সম্প্রদায়ের জন্য ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। কোরআন ও হাদীসে যে সমস্ত মানবাধিকারের কথা বলা হয়েছে। তা নিম্নরূপ:

১। আইনের দৃষ্টিতে সমতা,

২। জীবনধারণ, সম্পদ ও মর্যাদার অধিকার,

৩। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার,

৪। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা,

৫। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার,

৬। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার,

৭। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার,

৮। মত প্রকাশের স্বাধীনতা,

৯। বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা,

১০। সমান অধিকার,

১১। ন্যায়বিচার লাভের অধিকার,

১২। পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার অধিকার,

১৩। রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অধিকার,

১৪। স্থানান্তর গমণ ও বসবাসের স্বাধীনতার অধিকার,

১৫। পরিতোষক ও বিনিময় লাভের অধিকার,

১৬। শিশু অধিকার,

১৭। নারীর অধিকার ইত্যাদি।

অতএব, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলাম ধর্ম প্রথম স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট আকারে কতিপয় মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে এবং সহজেই অনুধাবণ করা যায় যে, মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের উন্নয়নে ইসলামের অবদান অনস্বীকার্য।

একথা অনস্বীকার্য যে, আদর্শ পরিবার, সমাজ, জাতি ও দেশ গঠনে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকা অপরিসীম। নারী পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টার ফসল এ মানব সভ্যতা। মানব সভ্যতার সুবিস্তৃত পথ পরিক্রমায় পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবস্থান তত অনস্বীকার্য এবং একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজনকে কল্পনা করা যায় না। উভয়ের প্রতিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল, পবিত্র এবং ভারসাম্যপূর্ণ শান্তিময় সহাবস্থানের বদৌলতে পরিবার তথা সমাজ হয়ে উঠে কল্যাণময় সমৃদ্ধ এবং দুনিয়া ও আখিরাতের যথার্থ কামিয়াবীর স্বর্গক্ষেত্র।[৪৬]

পবিত্র কোরআন ও হাদীসে আমরা দেখতে পাই, চৌদ্দশত বছর আগে ইসলামিক আইন দ্বারা মানবাধিকার বাস্তব সম্মত রূপ লাভ করেছিল। এ ইসলামই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে। ইসলাম বিশ্বাস করে যে,

১। রব কেবল একজনই, অবশিষ্ট সকলে তার বান্দা। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে এক জায়গায় বলেন- 'সাবধান, বৃষ্টি তাঁরই এবং হুকুমও চলবে তাঁর।

২। তাঁর ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বে কোন অংশীদার নেই এবং তাঁর কোন সমকক্ষও নেই।

৩। এই শাসন কর্তৃত্ব চিরস্থায়ী এবং সর্বব্যাপক বিশ্ব জাহানের একটি অণুও তাঁর কর্তৃত্বের বাইরে নয়।

৪। আমাদের এই পৃথিবী এবং এর বাইরের গোটা বিশ্বজগৎ একই রাজ্য একই রাজত্বের অধীনে।

৫। মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি এবং এই হিসেবে সে স্রষ্টার পর এই বিশ্বের সর্বাপেক্ষা মহান ও সম্মানিত সত্তা। যেহেতু চুক্তিটি মানুষ ও স্রষ্টার মধ্যকার এবং এতে যেহেতু স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে যে রব কেবল একজনই, অবশিষ্ট সকলে তার বান্দা এবং গোটা বিশ্বজগৎকে একজনই রাজা ও রাজত্বরূপে সনাক্ত ও তা চিরস্থায়ী ও সর্বব্যাপক রূপে চিহ্নিত করার পর কোন দেশের শাসক গোষ্ঠী এবং নাগরিকগণ সবাই আল্লাহ বা সেই মহান স্রষ্টার প্রজায় পরিণত হয়েছে। সমগোত্রীয়রূপে সকল মানুষ সমান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। তাই এখানে বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও আঞ্চলিকতার অহংকার এবং এ সম্পর্কিত স্বাতন্ত্রবোধ বিলীন হয়ে গিয়েছে। ফলে মানুষ গোত্রীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয়তাবাদী এবং সংকীর্ণ তাত্ত্বিক গোঁড়ামীর দোষে দুষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে। এ উন্নত নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মতাদর্শ তাই স্বার্থের সংঘাত, শ্রেণী বৈষম্যের অস্তিত্ব এবং ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনে দ্বন্দ্ব সংঘাতের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ খতম করে দিয়েছে এবং মানুষের মধ্যে পূর্ণ মানসিক ঐক্য ও বাস্তব সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে।

**৩.৬. ইসলামে নারীর মর্যাদার নানা দিক ঃ**

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক আবরণ। বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সা.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন, নারীর প্রতি পুরুষের যেমন অধিকার আছে, তেমনি রয়েছে পুরুষের প্রতি নারীর অধিকার। সর্বোপরি ইসলামই নারীকে সর্বোচ্চ সিংহাসনে বসিয়েছে। ইসলাম ঘোষণা করেছে, 'হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃষ্টি করেন, যিনি তাহাদের দুই জন হইতে বহু নর-নারী ছড়াইয়া দেন এবং আল্লাহকে ভয় কর যাহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট ঝঞ্জা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ম সৃষ্টি রাখেন।

ইসলামের এ এক ঘোষণায় ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল নারী-পুরুষের মধ্যকার আবাসময় ব্যবধান। যুগ যুগ থেকে নারী-পুরুষের মধ্যে গড়ে ওঠে লৌহ প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে ইসলাম ঘোষণা করল, 'নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাহাদের উপর পুরুষদের, কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে।[৪৭]

ইসলামই সর্বপ্রথম নারীকে মনুষত্বের মর্যাদা দিয়েছে। তাদেরকে দিয়েছে নাগরিক, সামাজিক অর্থনৈতিক মর্যাদা যা ছিল অন্যান্য সমাজে অচিন্তনীয়। মুসলিম নারীর রয়েছে একটি স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র সত্ত্বা, ধর্মীয় আচার-আচরণ, শিক্ষার অধিকার, স্বীয় কর্মফলের পুরস্কার এবং নিজস্ব বিশ্বাস প্রতিরক্ষায় নারী-পুরুষের সঙ্গে সম-অধিকার প্রাপ্য। ইসলামে নারীর যে অধিকার রয়েছে কোন পুরুষ, সমাজ বা রাষ্ট্রের তা হতে বঞ্চিত করার কোন বৈধ ক্ষমতা নেই।[৪৮]

নর-নারী প্রত্যেকে নিজ যোগ্যতা ও পারিপার্শ্বিকতার উপর ভিত্তি করে সামাজিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে। আল্লাহর পক্ষ হতে সর্বশেষ আসমানী কিতাব যা মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তি এবং সমৃদ্ধির একমাত্র পথ, আমাদেরকে বলছে যে যাবতীয় সামাজিক, নিয়মনীতি এবং আইন-কানুন অবশ্যই মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।[৪৯]

তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। ইহাই সরল দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। [৫০]

ইসলামে নারীর পদ-মর্যাদা কিছুটা অনুপম, কিছুটা অভিনব ও কিছুটা অনন্য। অন্য কোন সমাজ ব্যবস্থায় এর সমতুল্য নেই। আমরা প্রাচ্যেরও কমুনিষ্ট জগৎ কিংবা গণতান্ত্রিক সমাজগুলোর দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, নারী বাস্তবিকই কোথাও সুখকর অবস্থায় নেই। তার সামাজিক পদ-মর্যাদা বাঞ্চনীয় নয়। তাকে বেঁচে থাকার জন্য অনেক কঠোর পরিশ্রম করতে হয়; কখনও কখনও সে পুরুষের ন্যায় একই কাজ সম্পাদন করে, কিন্তু তাকে পারিশ্রমিক দেয়া হয় পুরুষের চেয়ে কম। আজকে নারী যেখানে অবস্থান করছে সেখানে পৌছার জন্যে সে যুগ যুগ ধরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সংগ্রাম করেছে। জ্ঞানার্জনের অধিকার এবং কাজও উপার্জনের স্বাধীনতা লাভের জন্যে তাকে অনেক কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে এবং তার অনেক স্বাভাবিক অধিকার বর্জন করতে হয়েছে। একটি আত্মা বিশিষ্ট মানবসত্ত্বা রূপে স্বীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যে সে অনেক মূল্য দিয়েছে। এই সব ব্যয়সাধ্য ত্যাগ ও কষ্টকর সংগ্রাম সত্যেও নারী সেই অধিকার লাভ করেনি। যা ইসলাম তার জন্যে একটি মাত্র ঐশী ঘোষণা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে।[৫১]

ইসলাম নারীকে যা দিয়েছে, তা তার প্রকৃতির সাথে সংগতি রক্ষা করছে, তাকে পুরোপুরি নিরাপত্তা দিচ্ছে এবং অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ও অনিশ্চিত জীবন ধারার মোকাবেলায় তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছে। নারী তথাকথিত অধিকারের পরিনামে যেসব দুঃখ কষ্ট ও বাধা বিঘ্নে সে জড়িয়ে পড়েছে। আমরা কারও সন্ধান নেবার প্রয়োজন বোধ করি না।[৫২] ইসলাম মহান আদর্শের মূর্ত প্রতীক যা সর্বকালে এবং সর্বযুগে গ্রহণীয়, অনুকরণীয়। ইসলামে নারীর মূল্যায়ন করা হয়েছে অত্যন্ত সম্মানের সাথে। নারীর মর্যাদাকে স্থান দিয়েছে অনেক উচ্চে।[৫৩]

নারীদের দিয়েছে সম্মান, মর্যাদা, দিয়েছে মৌলিক ও নাগরিক অধিকার। নারীর মানবিক মর্যাদা প্রদান ও আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে নারীকে সংসার, সমাজ ও সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সর্বপ্রথম স্বীকৃত প্রদান করেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)।[৫৪]

ইসলাম সব অমানবিক ও প্রহসনমূলক অবস্থা থেকে নারী জাতিকে মুক্তি দিয়ে, তাদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক মানদন্ড ও মর্যাদা-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে, সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেককে তাদের অবস্থান মর্যাদা-সম্পর্ক-অধিকার অনুযায়ী আচরণ করতে মুসলমানদেরকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছে। এভাবেই ইসলামে নারীর মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে। ইসলাম নারীকে প্রথমত মর্যাদা দিয়েছে কন্যারূপে। দ্বিতীয় মর্যাদা দিয়েছে সমাজ সংস্কার রূপে, তৃতীয় মর্যাদা দিয়েছে মা রূপে এবং চতুর্থ মর্যাদা দিয়েছে সমাজ সংস্কারে সমান গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রূপে।[৫৫]

বর্তমান সমাজে ইসলাম প্রদত্ত অধিকার পুরুষরা যতটুকু ভোগ করছে নারীরা তাদের অধিকার অনেক ক্ষেত্রেই ততটুকু ভোগ করতে পারছেনা নিজেদের অসর্তকতার কারণে। কিন্তু যেখানে ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে নারীরা সেখানেই তা সংরক্ষণের জন্য বুদ্ধিমত্তার সাথে চেষ্টা চালিয়েছেন; এ ব্যাপারেইসলামই সর্বপ্রথম বাস্তব ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ইসলাম নারীকে সর্বব্যাপী যে অধিকার দিয়েছে আমরা তা সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে পারি।

ক. **নারীর স্বার্থক জীবন ও ইসলাম ঃ**

একমাত্র ইসলামই নারী জীবনকে যথার্থ সার্থকতা প্রদান করেছে তা অনস্বীকার্য পবিত্র কোরআন মাজীদের সূরা আর-রূম এর ২১নং আয়াতে তিনি স্পষ্টই ঘোষণা করেন- "আর তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে অপর একটি নিদর্শন এই, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের সঙ্গীনিদেরকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে।"[৫৬]

সূরা আর-রূম-এর ২১নং আয়াত থেকে স্পষ্টই প্রকাশ পায় যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি অন্যতম নিদর্শন হলো আদম জাতির সৃষ্টি। তদুপরি আল্লাহ তায়ালার আরও একটি অনুগ্রহ এই যে, তিনি বৈবাহিক অধিকারকে কেবল আইনগত রাখেননি; বরং মানুষের স্বভাবগত ও প্রবৃত্তিগত ব্যাপার করে দিয়েছেন। পিতামাতা ও সন্তানের পারস্পরিক অধিকারের বেলায়ও তদ্রুপ করা হয়েছে। তাদের অন্তরে স্বভাবগত পর্যায়ে এমন এক ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, পিতামাতা নিজেদের প্রাণের চেয়েও অধিক গুরুত্ব সহকারে সন্তানের দেখাশোনা করতে বাধ্য। এমনিভাবে সন্তানের অন্তরেও পিতামাতার প্রতি একটি স্বভাবগত ভালবাসা রেখে দেয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে। এজন্য ইরশাদ হয়েছে- "আল্লাহতায়ালা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেবল আইনগত সম্পর্ক রাখেননি, বরং তাদের অন্তরে সম্প্রীতি ও দয়া গ্রথিত করে দিয়েছেন।[৫৭]

উক্ত আয়াত থেকে একথা অনুধাবন করাও কষ্টকর নয় যে, সেই আদমজাতির শান্তির জন্যই তাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও নারীজাতি যাতে পূর্ণ মর্যাদা পেতে পারে সেজন্য করুণাময় নারী-পুরুষের মধ্যে পারস্পারিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছে।

কোরআন পাকের সূরা-তাওবার ৭১নং আয়াতে, যাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা দেন- "আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন-যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহতায়ালা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।" [৫৮]

ইসলামী বিধানাবলীতেই যে নারী জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতা নিহিত সে বিষয়ে আরও স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায় কোরআন মজীদের সূরা আন্-নিসার ৩২নং আয়াতকে কেন্দ্র করে তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআনের বিশদ আলোচনা থেকে। আয়াতটিকে আল্লাহ পাক ঘোষণা দেন- "আর তোমরা আকাঙ্খা করো না এমন বিষয়ে, যাতে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ। আর আল্লাহর কাছে তার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নি:সন্দেহে আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।"[৫৯]

আলোচ্য এ আয়াতে বলা হয়েছে- "পুরুষরা যা কিছু সাধনার মাধ্যমে অর্জন করবে তারা তার অংশ পাবে এবং নারীরা যা কিছু অর্জন করবে তার অংশও তারা পাবে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গুণ ও বৈশষ্ট্য এবং কর্মে দক্ষতাই অর্জনের মাধ্যমে বৈশষ্ট্য লাভ করার চেষ্টা ব্যর্থ হবে না। প্রত্যেকেই তার প্রচেষ্টার ফল অবশ্যই লাভ করবে। আয়াতের মর্ম দ্বারা আরও জানা ভাল যে, কারো জ্ঞান-গরিমা এবং চারিত্রিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য দেখে সেরকম করার আকাঙ্খা করা এবং সে আকাঙ্খা পূর্ণ করার জন্য চেষ্টা ও সাধনা করা বাঞ্ছনীয় এবং প্রশংসনীয় কাজ।[৬০]

আলোচ্য শিরোনামের বিশদ আলোচনায় কোরআন মজীদের যে তিনটি আয়াত উদ্বৃত্ত হয়েছে তার প্রথমটি অর্থাৎ সূরা-রূমের ২১নং আয়াতের সারাংশ দাঁড়ায় নরের শান্তির জন্য তাদের মধ্য থেকেই তাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে পারস্পারিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসাও সৃষ্টি করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে অর্থাৎ সূরা-তাওবার ৭১নং আয়াতে ঈমানদার নর-নারী উভয়কে উভয়ের সহায়কের মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে এবং উভয়ের প্রতি আল্লাহ তায়ালা দয়া করবেন বলেও ঘোষিত হয়েছে। আলোচিত তিনটি আয়াতের সর্বশেষটিতে অর্থাৎ সূরা আন-নিসার ৩২নং আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় সাধাতীত

বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের আকাঙ্খা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং নর-নারী নিজেদের প্রচেষ্টায় যা কিছু (পূণ্য) অর্জন করে সেটা যার যারটা তার তার অংশ বলে ঘোষিত হয়েছে শুধু তাই নয় এ আয়াতে প্রচ্ছন্নভাবে একথারও আভাস দেয়া হয়েছে যে, নর-নারীর মধ্যে সৃষ্টিকর্তা আলাদা আলাদাভাবে যেসব গুণাবলীত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছেন সেগুলো লাভের অপচেষ্টা না করে বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে সাধ্যায়ত্ব বিষয়গুলোর মধ্যেই অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে হবে। আর সৃষ্টিকর্তা সর্ববিষয়ে জ্ঞাত বিধায় তার সৃষ্টির সাধ্যায়ত্ব বিষয়গুলোর উপর কেন্দ্র করেই তার উপযুক্ত ফল প্রদান করবেন।

নরের মনোতুষ্টির জন্য নারীকে সৃষ্টি করা হলেও দয়াময় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারীকে দুনিয়া ও আখিরাতে অসামান্য মর্যাদা দানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন; এর একাট্য প্রমাণ রয়েছে পবিত্র কোরআন মাজীদের সূরা-নাহ্‌ল এর ৯৭নং আয়াতে; যাতে আল্লাহ তায়ালা এই বলে অঙ্গীকার করেন- "ঈমানদার অবস্থায় যে কেউ সৎকর্ম সম্পাদন করবে, পুরুষ হোক বা নারী হোক, তাকে আমি অবশ্যই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাদেরকে দিব।"[৬১]

**খ. নারীর মানবিক মর্যাদা ঃ**

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সমগ্র মাখলুকাতের মধ্যে মানুষ আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। যে মানুষ সৃষ্টির সেরা, সে মানুষ হচ্ছে নারী ও পুরুষের সমন্বিত রূপ। নর ও নারীর সমন্বিত রূপই হচ্ছে মানুষ। সমাজে মানুষ বলতে একমাত্র পুরুষকে বুঝায় না আবার শুধুমাত্র নারীকেও বুঝায় না। নারী ও পুরুষকে নিয়েই সমাজে মানুষের উদ্ভব ও বিকাশ। পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা যেদিন মানুষকে পাঠান সেদিন নর ও নারী দু'জনকে একই সাথেই পাঠিয়েছেন। হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) কে পৃথিবীতে পাঠিয়ে আল্লাহ তায়ালা মানব বংশের সূচনা করেন। একজন নর ও একজন নারী নিয়েই প্রথমে পৃথিবীতে মানব জাতির পদচারনা শুরু হয়। [৬২]

আজকের পৃথিবীর এ বিশাল মানব সভ্যতার মূলে রয়েছে নারী ও পুরুষের সম্মিলিত অবস্থান। পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি বনি আদম শুধুমাত্র আদমেরই সন্তান নয় হাওয়ারও সন্তান। আবার শুধুমাত্র হাওয়ার সন্তান নয়, আদমেরও সন্তান। এক আদম ও এক হাওয়া থেকে সবাই জন্ম লাভ করেন, বংশ বিস্তার করেন। বর্তমানেও নর ও নারীর সম্মিলিত অবস্থানেই মানব সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তার ঘটছে। এ পৃথিবীর যা কিছু কল্যাণকর, যা কিছু অস্তিত্বশীল তার সবই নর ও নারীর সম্মিলিত চেষ্টার ফসল। এতে নারী-পুরুষ দু'জনেরই সমান কৃতিত্ব রয়েছে, কারো অবদান কোনো অংশেই কম নয়।

নর ও নারী মানব সমাজের এক অখণ্ড সত্ত্বা। খণ্ডিত কোনো অংশ হিসেবে দুটোর কোনটিকে দেখা যায় না। একটি অপরটির পরিপূরক এবং পূর্ণতা বিধায়ক। আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করেই তার বক্তব্য পবিত্র কোরআনে উপস্থাপন করেছেন। সমগ্র মানবজাতিকে আহ্বান করেছেন ইসলামের দিকে, কোরআনের দিকে। নিম্নোক্ত আয়াত ও উদ্বৃতি দ্বারা বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ফুটে আল-কোরআনে উল্লেখ রয়েছে ঃ "মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, সে কোন জিনিস থেকে সৃষ্টি হয়েছে? সে সৃষ্টি হয়েছে সবেগে নির্গত এক ফোঁটা পানি থেকে, যা পিঠ ও বক্ষ অস্থির মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসে। "[৬৩]

কালামে হাকিমে ঘোষণা করেন ঃ "মহান আল্লাহ্ মানুষের সৃষ্টির সূচনা করেছেন মাটি থেকে, অত:পর মাটির নির্যাস থেকে, যা এক অপবিত্র পানি তার বংশধারা চালিয়েছে, অত:পর তার কঠিন কার্য ঠিক করেছেন এবং তার ভিতরে আপন রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। "[৬৪]

কোরআনে পাকে ঘোষণা হচ্ছে ঃ "মানুষ কি লক্ষ্য করে না যে, আমি তাঁকে এক বিন্দু পানি থেকে সৃষ্টি করেছি? এখন সে খোলাখুলি দুশমনে পরিণত হয়েছে।"[৬৫]

কোরআন কারিমে ঘোষণা করেন ঃ "আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে, তারপর পানিবিন্দু থেকে, তারপর জমাটবদ্ধ রক্ত থেকে, তারপর পূর্ণ বা অপূর্ণ মাংসপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছি। যেন তোমাদেরকে আপন কুদরত দেখাতে পারি। আর আমি যে শুক্রবিন্দু ইচ্ছা করি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাতৃগর্ভে রেখে দিই। অতপর তোমাদের শিশু বানিয়ে বের করি। অত:পর তোমাদেরকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে যৌবন পর্যন্ত পৌছে দিই। তোমাদের মধ্যে হতে কেউ মৃত্যুবরণ করে আর কেউ নিস্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌছে যে, বোধশক্তি লাভ করার পর আবার অবুঝ হয়ে যায়। "[৬৬]

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেট থেকে বের করেন। যখন তোমরা বের হলে তখন এমন অবস্থায় ছিলে যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের শ্রবণ শক্তি বিয়েছেন, দর্শন শক্তি দিয়েছেন, বোধশক্তি দিয়েছেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। "[৬৭]

আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন, "হে মানবজাতি! তোমরা সেই দয়ালু প্রভু সম্পর্কে কোন জিনিস তোমাকে প্রতারিত করে রেখেছে? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক করেছেন, তোমার শক্তি ও ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন এবং তিনি যে আকৃতিতে ইচ্ছা করেছেন তোমাদের উপাদানসমূহ সংযোজিত করেছেন। "[৬৮]

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, "হে মানুষ! তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি তা থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে অনেক নারী ও পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন। " [৬৯]

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, "হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। "[৭০]

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, "তোমরা কি দেখ না, আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব নিয়ামত তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। "[৭১]

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, "তিনি সেই আল্লাহ যিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেণ। "[৭২]

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, "আসমান ও জমিনের সার্বভৌম রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা তাঁকে তিনি কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে পুত্র সন্তান দান করেন। আবার যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তান উভয়ই দান করেন, আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। তিনি মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান।"[৭৩]

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, "নিশ্চয়ই আমি নষ্ট করে দেই না তোমাদের আমলকারীর আমল, সে পুরুষ হউক বা নারী হউক। তোমরা পরস্পর থেকে পরস্পর জন্মগ্রহণ করেছ। "[৭৪]

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, "আমি বনি আদমকে অতীব সম্মান দান করেছি এবং স্থলে ও জলে মওয়ারির ব্যবস্থা করে দিয়েছে এবং তাঁকে পবিত্র জিনিস দ্বারা রিজিক দান করেছি। আর বহু জিনিসের উপর তাঁকে আমি শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব দান করেছি, যা আমি সৃষ্টি করেছি। "[৭৫]

আল্লাহ তায়ালা ঘোষান করেন, "আমি মানব জাতিকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি। "[৭৬]

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে গঠন কাঠামো, খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান, বিবেক ইত্যাদি দিয়ে মর্যাদাবান করেছেন। তাঁকে সুন্দর দেহাবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। অঙ্গ-প্রতঙ্গ, হাত-পা, চোখ, কান, নাক, মুখ সব কিছুকে যথোপযুক্ত করে সৃষ্টি করে যথাস্থানে সংযোজন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তোমাকে সুঠাম দেহের অধিকারী করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। "[৭৭]

উপরোক্ত আয়াতসমূহ একটি সত্যই প্রতিভাত হয়ে উঠেছে যে, দুনিয়ায় যা কিছু আছে, তার সবই আশরাফুল মাখলুকাত মানবের জন্য সৃজিত। এভাবে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য অসীম সম্ভাবনাময় উৎকৃষ্ট মেধা, চিন্তা-কল্পনা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, সভ্যতা, সামাজিকতা ও মানবীয় সংস্কৃতি দিয়ে, আর বিশ্বব্যাপী এক উদার জাতীয়তা গঠন করেন সীমাহীনতা ও বিশ্বজনীনতার মানসিকতা সৃষ্টি করে, যার মধ্যে বর্ণ-গোত্র-ভাষা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষই যেন অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এ মর্যাদাবান মানব যেন এক নির্ভুল সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে পারে এবং এক সত্য ও পবিত্র জনসমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। সমাজের লোকদের মধ্যে সততা, বিশ্বস্ততা, সচ্চরিত্রতা, সত্যপ্রীতি, আত্মসংযম, সংগঠন, বদান্যতা, উদারতা, আত্মসম্ভ্রম, বিনয়-নম্রতা, উচ্চাভিলাস, সৎসাহস, আত্মত্যাগ, কর্তব্যবোধ, ধৈর্য্যশীলতা, দৃঢ়তা, বীর্যতা, আত্মতৃপ্তি, নেতানুগত্য, আইনানুবর্তিতা, আত্মসচেতনতা ইত্যাকার উৎকৃষ্ট গুণাবলী তাঁর মধ্যে দেয়া হয়েছে। মানুষের মধ্যে তাঁদের কর্মশক্তিকে সুসংহত করার এবং তাঁকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করার মতো প্রচণ্ড শক্তিও বর্তমান রয়েছে।[৭৮]

খিলাফত প্রতিষ্ঠার সঠিক দায়িত্ব পালন এবং কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমে খলিফা হিসেবে যে মর্যাদাবোধ, তা মানুষেরই। খলিফার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে উল্লেখিত গুণাবলী অর্জন ও লালন কেবলমাত্র মানুষের জন্যই যথার্থ ও যথোপযুক্ত। এসব ক্ষেত্রে মানুষ বলতে যা বুঝায় তা মূলত নর-নারী উভয়েরই সমন্বিত রূপ। এককভাবে পুরুষকে নয় আবার নারীকেও নয় উভয়কেই বুঝানো হয়েছে।

**গ. ইসলামে নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা ঃ**

ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতে ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও মতামত প্রকাশের অধিকারকে বুঝায়। ব্যক্তির রুচি, মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা প্রকাশের ইচ্ছা কোন প্রকার বাধাগ্রস্থ না হওয়াই ব্যক্তি স্বাধীনতা। কোন সমাজে নারী তার মতামত, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চিন্তা-চেতনা, দ্বিধাহীনচিত্তে প্রকাশ করতে পারলে এবং এক্ষেত্রে কোন প্রকার বাঁধার সম্মুখীন না হলে বুঝা যাবে যে সমাজে নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে।[৭৯]

বিভিন্ন সমাজ-সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্মে নারীর অবস্থান ছিল যুগে যুগে দেশে দেশে নারী ছিল পরাধীন। বিভিন্ন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্ম নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করেছে। নারীর কোন ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে তোয়াক্কা করা হয়নি। তাঁর মতামতের কোন মূল্য ছিল না। তাঁর চিন্তা-ভাবনাকে শুধুমাত্র অবমূল্যায়নই করা হয়নি সে সাথে চরমভাবে দলিত-মথিত করা হয়েছে। তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশের স্বপ্ন সাধনাকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তাঁর আশা-আকঙ্খার গুড়ে বালি দিয়ে পুরুষেরা তাঁদের স্বপ্ন চরিতার্থ করেছে। তাঁর ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়েছে। নারী শত নির্যাতন ভোগ করেছে কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহসও পায়নি। কোন নারী প্রতিবাদ জানাবার দুঃসাহস কখনো দেখাতে পারেনি। পুরুষের সুখ-সম্ভোগের বলি হতে হয়েছে নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা।

ইসলাম নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। তাঁর এ স্বাধীনতা কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠি, জাতি, সম্প্রদায় বা রাষ্ট্রশক্তি খর্ব করতে পারবে না। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে নারী তাঁর নিজস্ব মতামতের অধিকারী। পূর্ণ বয়স্কা নারীর অনুমতি ও সম্মতি ব্যতীত তাঁকে বিবাহ দেয়া সম্পূর্ণ বে-আইনি। এক্ষেত্রে কারো জোর জবরদস্তি চলবে না। নারীর নিজস্ব মতামত, ইচ্ছা শক্তি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে নারী সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁর স্বাধীন সত্ত্বাকে ইসলাম স্বীকৃতি দিয়েছে। নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণে ইসলামি আইন, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা একান্ত বদ্ধপরিকর। ইসলামের কাছেই রয়েছে নারীর প্রকৃত ব্যক্তি স্বাধীনতা। ইসলামে রয়েছে নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত আইন-কানুন ও নিয়ম পদ্ধতি। ইসলামে রয়েছে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা। সুতরাং ইসলামই পারে নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে।

রাষ্ট্র, সমাজ ও মানব সভ্যতার কল্যাণের উদ্দেশ্যে ইসলাম মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে একটি মৌলিক মানবাধিকার ও ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করে। তবে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ ও অবাধ হবে। কেননা, যে মতামত ও প্রকাশনা সমাজ ও সভ্যতার জন্য চিন্তা করার এবং এর অগ্রগতি ও উন্নয়নের অবদান রাখার অধিকারের উপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করে বলা হয়েছে- 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উন্নত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎকাজে নিষেধ কর।'[৮০]

আল-কোরআনের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত মদিনা প্রজাতন্ত্রে রাসূলুল্লাহ (স.) কর্তৃক মদিনার জনসাধারণকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রণয়ণে ভিন্নমত পোষণ করার স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সাহাবীদেরকে এমন নির্ভীক মানসিকতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলেছিলেন যে, তারা নির্দ্বিধায় তাদের মতামত প্রকাশ করতেন, তিনি তার সাহাবীগণকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হবার আদেশ দিতেন। স্বেচ্ছাচারী শাসকদের অন্যায় কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধের প্রতিবাদ করাকে অভিনন্দিত করে তিনি বলেছেন- 'সবচেয়ে সম্মানীয় জিহাদ হচ্ছে এমন ব্যক্তির জিহাদ যে একজন স্বেচ্ছাচারী শাসকের সামনে ন্যায়সঙ্গত মতামত প্রকাশ করে।'[৮১]

স্বেচ্ছাচারী শাসকদেরকে সমর্থনকারী ও সহযোগিতা দানকারী লোকদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে তিনি বলেছেন- 'আমার পরে যারা শাসকদের অন্যায় কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করবে তারা আমার অনুসারী নয়।'[৮২]

সমাজের সামগ্রিক পরিবেশে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাক স্বাধীনতার চর্চা সম্পর্কে তিনি বলেছেন- 'তোমাদের কেউ কোন অন্যায় হতে দেখলে তা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করা উচিত। প্রথমত হস্ত দ্বারা অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। তাতে সমর্থ না হলে মুখের ভাষা দ্বারা অর্থাৎ স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমে। তাতেও সমর্থ না হলে তৃতীয় পর্যায়ে অন্তরে ঘৃণা করা উচিত। তবে শেষোক্ত পদ্ধতিটি দুর্বল ঈমানের পরিচয় বহন করে।'[৮৩]

ইসলাম নারীদের স্বীকৃতি, মতামত, অভিযোগকে সব সময়ই গুরুত্ব দেয়। কোরআনের ৫৮নং সূরার প্রথম কয়েক আয়াত রাসূল (স.)-এর কাছে একজন নারীর আনীত অভিযোগ প্রসঙ্গে নাজিল হয়। আল্লাহ সেই মহিলার কথা শুনেছেন ও গ্রহণ করেছেন-'আল্লাহ অবশ্যই সেই মহিলার কথা শুনেছেন যে, তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার কাছে আকুতি মিনতি করেছে এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ করছে। আল্লাহ তোমাদের দু'জনের কথা শুনেছেন তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখে থাকেন ।' [৮৪]

এছাড়া সম্পদ বন্টন সংক্রান্ত আলোচনা কোরআনে নাযিল হয়েছিল এক মহিলার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে। মহানবী (স.) তাঁর রাজনৈতিক জীবনের যেকোন জটিল মুহূর্তে তাঁর সহধর্মীনিদের পরামর্শ নিতেন হুদায়বিয়ার সন্ধির পরমুহূর্তে সন্ধির শর্তকে নিয়ে যখন সাহাবারা মনক্ষুন্ন, রাসূলের আনুগত্য উদাসীন, তখন তিনি তাদের কুরবানী করে মাথা মুন্ডন করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কেউ যেন তার নির্দেশ শুনছিলনা। মহানবী (স.) তার সহধর্মীনি উম্মে সালমার নিকট পরামর্শ চাইলেন। তিনি নবী (স.)-কে নিজেই নিজের কুরবাণী করে মাথা মুন্ডন করার পরামর্শ দিলেন। নবীজী তাই করলেন। তারপর সাহাবারা একে একে আনুগত্য করলেন। খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও মেয়েরা তাদের সামাজিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং কেউ একথা বলেননি যে, নারী হবার কারণে তারা কম গুরুত্বপূর্ণ। হযরত উমর (রা.) যখন মোহরানা সীমিত করে দিতে চাইলেন তখন একজন মহিলা কোরআনের আলোকে এর বিরোধিতা করেন। ওমর (রা.) মহিলা কথা মেনে নেন এবং বিরত থাকেন। নারী বলে তিনি তাকে অবজ্ঞা করেননি। বরং রাষ্ট্রীয় পলিমি নির্ধারণে তার ভূমিকাকে সম্মান দেখিয়েছেন।

হযরত ওসমান (রা.)-এর সময় হযরত আয়েশা (রা.) সরকারের কঠোর সমালোচনা করতেন। তখন কেউ বলেননি নারী হবার কারণে তিনি এ অধিকার সংরক্ষণ করেন না। একবার ওসমান (রা.)-এর স্ত্রী রাজনৈতিক বিষয়ে বলতে চাইলে তার একজন সহযোগী বাঁধা দিলে তিনি বলেন- " 'তাকে বলতে দাও' সে তার উপদেশ প্রদানে তোমার চেয়েও আন্তরিক।"

উপর্যুক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসুলুল্লাহ (স.) তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মদিনা প্রজাতন্ত্রে বাক স্বাধীনতার এক সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলা হয়। খলিফাগণের শাসনামলেও জনসাধারণকে স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশের জন্য আহ্বান জানাতেন। তাঁরা প্রায়শই বলতেন- 'তোমাদের (জনসাধারণ) কল্যাণ নেই, যদি তোমরা আমাদের সমালোচনা না কর এবং আমাদের কল্যাণ নেই যদি তোমাদের মতামত গ্রহণ না করি ।

**ঘ. নারীর ইবাদত করার অধিকার ও মর্যাদা ঃ**

ইসলাম মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তি ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে স্ব স্ব ধর্ম পালন, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পাদনের নিমিত্তে উপাসনালয় নির্মাণ এবং ধর্মীয় আদর্শে প্রচারার্থে মিশনারী কার্যক্রম পরিচালনা করার স্বাধীনতা প্রদান করে। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) বায়তুল মাকদাস অধিকারের পর সেখানকার খ্রিষ্টান ধর্মালম্বীগণকে এসব অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করিছিলেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ঘোষণায় বলেছিলেন- 'ইসলামী সরকার তাদেরকে জীবন, সম্পদ ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ও নিরাপত্তা দিচ্ছে। তাদের গীর্জায় কেউ বসবাস করতে পারবে না। তাদের ক্রস ভাঙ্গতে পারবে না বা তাদেরকে ধর্মত্যাগে বাধ্য করতে পারবে না। [৮৫]

আল-কোরআনের দাবি অনুসারে ইসলামী মূল্যবোধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন মূল্যবোধ নেই। কোন ব্যক্তির কোন মতবাদে দীক্ষিত হওয়ার বা কোন মতবাদ বর্জনের ব্যাপারে ইসলাম আগ্রহ ও ইচ্ছাকে গুরুত্ব প্রদান করে। কিছুতেই প্রলোভন, আর্থ-সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপ, নির্যাতন, শক্তি প্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মান্তরিত বা ধর্মচ্যুত করার সমর্থন করে না। আল-কোরআনে বলা হয়েছে- 'তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা সকলেই অবশ্যই ঈমান আনিত, তবে কি তুমি মু'মিন হইবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে?' [৮৬]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- 'বল, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে, সুতরাং যাহার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যাহার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক।' [৮৭]

কোরআনের এসকল আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে প্রতিটি ব্যক্তির যেকোন ধর্মে বিশ্বাসী হওয়ার বা ধর্মহীন নাস্তিক থেকে যাওয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে। এ স্বাধীনতায় বল প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে- 'ধর্ম সম্পর্কে এল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিবিধানের ব্যবস্থার অবকাশ নেই।' [৮৮]

আল-কোরআনে বলা হয়েছে- 'দ্বীন গ্রহণে জোর জবরদস্তি নাই, সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হইতে সুস্পষ্ট হইয়াছে।'[৮৯]

একবার জনৈক সাহাবী স্নেহের বশীভূত হয়ে তার পুত্রকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করার প্রেক্ষাপটে আল-কোরআনের উপর্যুক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। ইসলাম সম্পর্কে এ অভিযোগ রয়েছে যে, ইসলাম তলোয়ারের জোরে প্রচারিত হয়েছে। বস্তুত ইসলামের যে জিহাদ বা ধর্ম যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে তা কাউকে বল প্রয়োগ করে ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য নয়, বরং আত্মরক্ষার পাশাপাশি অন্যায় অবিচার ও শৃঙ্খলা প্রতিরোধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) একজন বৃদ্ধা খ্রিষ্টান মহিলাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালে সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। হযরত উমর (রা.) তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য না করে বরং উপর্যুক্ত আয়াতটি পাঠ করে ধর্মের জন্য শক্তি প্রয়োগ না করার নীতিকে সমর্থন করেন।

ইসলাম যেমন ব্যক্তিকে ধর্মে বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী হবার স্বাধীনতা দেয় অনুরূপভাবে ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার নিরাপত্তাও নিশ্চিত করে। কারও ধর্মানুভূতিতে আহত করে এমন কোন কাজ, বক্তৃতা, বিবৃতি, সাহিত্য বা নেতিবাচক সমালোচনা বা সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে; ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। আল-কোরআনে অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে বলা হয়েছে- 'আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তাঁরা সীমালংঘন করে অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকেও গালি দিবে। এভাবে আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি, অত:পর তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। অনন্তর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকার্য সম্বন্ধে অবহিত করবেন।[৯০]

ইসলাম নারীকে ইবাদত করার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। ইমান আনার জন্য যেমন পুরুষকে আহ্বান করা হয়েছে তেমনি নারীর প্রতিও উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে। পাপ ও অন্যায় অপরাধের জন্য নারী যতটা দায়ী পুরুষও ঠিক ততটা দায়ী। যে কোন অপরাধের জন্য নারী-পুরুষ সমান শাস্তির উপযোগী। নারী ও পুরুষের শাস্তির মাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাবে না। ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার দণ্ডদানের ক্ষেত্রে সাম্যের বিধান রাখা হয়েছে। ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষভেদে তারতম্য করা হয়নি। নারী-পুরুষের সৎকর্মের গুরুত্ব সমান। কারো ব্যাপারে গুরুত্বহীন বা অবমূল্যায়ণ আবার কারো ব্যাপারে অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মহামূল্যবান বলে তারতম্য করা হয়নি। জান্নাতের জন্য নারী-পুরুষ উভয়েই সুসংবাদ প্রাপ্ত। জাহান্নামের জন্য নারী-পুরুষ উভয়কেই ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে। উভয়ের পরকালের ঠিকানা এক ও অভিন্ন। আর তা হলো জান্নাত বা জাহান্নাম। জান্নাতের সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ, নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই নির্ধারিত। পক্ষান্তরে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি উভয়ের জন্য নির্ধারিত। ইবাদতের প্রতিদান, উপাসনার আহ্বান ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধান নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমান। নারী পুরুষভেদে দায়িত্ব এড়াবার সুযোগ নেই। কাউকে খাটো করা হয়নি আবার কাউকে অতিমাত্রায় সুউচ্চে তুলে ধরা হয়নি।[৯১]

ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে পরম করুণাময়ের সান্নিধ্য লাভ করার অধিকার পরস্পরের সমান। এক্ষেত্রে কোন ধরনের তারতম্য করা হয় নি। ধর্ম-কর্ম পালনের ক্ষেত্রে ইসলাম নারীর যে অধিকার দিয়েছে পৃথিবীর কোন ধর্ম, দর্শন ও মতবাদ তা দেয়নি, দিতে পারেনি বরং নারীকে বঞ্চিত করেছে। ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রেও নারীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। ইসলাম গ্রহণ করা না করার ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব স্বাধীনতা ও ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। নারী স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ না করলে কেউ তাঁকে জবরদস্তি করতে পারবে না। আবার কোন নারীর স্বামী কিংবা পিতা-মাতা ইসলাম গ্রহণ করলে সেই বয়ঃপ্রাপ্ত নারী যদি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ না করে সে ক্ষেত্রে তাঁদের সবার ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমেও সেই নারী মুসলমান বলে গণ্য হবে না। যদিও তাঁর পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী এবং অধঃস্তনের ছেলে-মেয়ে মুসলমান হয়। জন্ম, বংশ এবং স্থানভেদে মুসলমান হতে পারে না, যদি সে স্বেচ্ছায় কালিমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ না করে। তাই একজন কাফির মুশরিকের ঘরে জন্ম নিয়েও একজন নারী কালিমা পড়ে মুসলমান হতে পারে আবার একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েও একজন নারী ইসলামের আকিদা ও মুলনীতিকে অস্বীকার করে মুরতাদ, মুশরিক বা কাফির হয়ে যেতে পারে। এখানেই মূলত নারীর ধর্মীয় মর্যাদার মূল কথা  রয়েছে।

ইসলাম পুরুষের ন্যায় নারীকেও সমানভাবে ধর্মীয় কার্যাবলি সম্পাদন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-উৎকর্ষতা সাধনের পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করা যেমন পুরুষের কর্তব্য, তেমনি নারীরও কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনের ফল লাভের অধিকারও উভয়ের সম্পূর্ণ সমান। ইসলাম এ ব্যাপারে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করেনি। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন- "নিশ্চয় আমি নষ্ট করে দেই না তোমাদের মধ্য থেকে কোন আমলকারীর আমলকে, সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক, তোমরা পরস্পর পরস্পর থেকে আসলে এক ও অভিন্ন।"[৯২]

এ আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে ইমাম ইবনে কাছির (র.) বলেন- "অত:পর তাঁদের প্রতিপালক তাঁদের ডাকে সাড়া দিবেন অর্থাৎ তাঁদের রব তাঁদের দাবি পূরণ করবেন, যেমন- হযরত উম্মে সালমা (র.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হিজরতকারী মহিলাদের ডাকে কি আল্লাহ সাড়া দিবেন না? এ কথা বলার পর আল্লাহ তা'য়ালা অত্র আয়াত নাযিল করেন- 'অত:পর আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের ডাকে সাড়া দিবেন যখন বান্দা ডাকে। নিশ্চয়ই আমি নারী এবং পুরুষ কারো আমল বরবাদ করে দেইনা। আর এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে নিশ্চয়ই মুমেনগণ হচ্ছে জ্ঞানী তাঁদেরকে কোন আদেশ করলে তাঁরা শুনে। তাঁরা আল্লাহর কাছে যা চায় আল্লাহ তাঁদের ডাকে সাড়া দেন সে পুরুষ হোক বা মহিলা। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- 'যখন আমার বান্দা আমার কাছে চায় আমি তাঁদের ডাকে সাড়া দেই যখন সে ডাকে তখনই সাড়া দেই, অতএব সে আমাকে ডাকে এবং আমার উপর পূর্ণ আস্থা রাখে সম্ভবত তাঁরা সঠিক পথ পাবে।"[৯৩]

এটা হচ্ছে তাফসিরে ইজাবাহ অর্থাৎ তিনি বলেন- তাঁদের জবাবে নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের আমলকে নষ্ট করেন না বরং নারী এবং পুরুষের প্রত্যেকের আমল অনুযায়ী পূর্ণ সাওয়াব দান করেন। সাওয়াবের দিক থেকে নারী পুরুষ উভয়েই সমান। অতএব যারা হিজরত করেছে অর্থাৎ পুরুষ হোক বা নারী যারা মুশরিকদের গোত্র ছেড়ে মোমেনদের গোত্রে আগমন করেছে, নিজেদের মহব্বতের লোকদেরকে ছেড়েছে, বাচ্ছাদের ছেড়েছে, ভাইবোনদের ছেড়েছে প্রতিবেশীকে ছেড়েছে তাঁদের প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান দেয়া হবে। নারী হোক বা পুরুষ।"[৯৪]

মহান আল্লাহ বলেন-

'পুরুষ বা স্ত্রী যে লোকই নেক আমল করবে ইমানদার হয়ে সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং এদের কারও উপর একবিন্দুও অবিচার করা হবে না।'

মহান আল্লাহ আরো বলেন-

'মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফিরদের জন্য আল্লাহ জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যাতে তাঁর চিরদিন অবস্থান করবে। তাঁদের জন্য সেটাই উপযুক্ত স্থান, তাঁদের উপর আল্লাহর লানত রয়েছে এবং তাঁদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।

ধর্ম-কর্মের ব্যাপারে নারীর পূর্ণ অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। ধর্ম গ্রহণ, ধর্মের বিধি-বিধান পালনের পূর্ণ অধিকার রয়েছে নারীর। ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। ধর্ম বর্জনের ব্যাপারেও তাঁর অধিকার রয়েছে। সে ধর্মকে বর্জন করলে যে কোন সময় মুরতাদ, কাফির, মুশরিক বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে তাঁর ইচ্ছা, মতামত, চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে। ইসলামের এই অধিকার বলে হযরত মরিয়ম (আ.) হযরত আসিয়া, হযরত খাদিজাতু কুবরা (র.), হযরত রাবেয়া বসরি প্রমুখ মুসলিম মহিলাগণ বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন।

**ঙ. বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা ঃ**

ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের বিবেক ও ধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান রাব্বুল আলামীনের সিদ্ধান্ত- 'দীনের ব্যাপারে কোর জবরদস্তি নেই। সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।[৯৫]

অর্থাৎ সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে, সত্য পথ যে ইসলাম, তা ইসলাম সনাক্ত করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, সত্য পথ অবলম্বন করলে কি পুরস্কার এবং ভ্রান্ত পথে গেলে কি শাস্তি ভোগ করতে হবে তাও ইসলাম বলে দিয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে ইসলাম কোন বল প্রয়োগ করেননি এবং বল প্রয়োগের অবকাশও রাখেনি। যার মনে চায় সে যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে তা গ্রহণ করবে এবং যার মন চাইবে না তাকে তা গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা যাবে না। কোরআন মজীদ এ প্রসঙ্গে রাসূল (স.) যিনি ছিলেন এ ধর্মের প্রবর্তক তাকে বলেন- 'অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো একজন উপদেশ দাতা। তুমি তো ওদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও।[৯৬]

রাসূলে কারীম (স.) কে সম্বোধন করে আরো বলা হয়েছে- 'অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমার দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া।' পবিত্র কোরআনের বহু সূরায় এ ধরনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইসলাম ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কারও উপর বল প্রয়োগ করতে বলেনি বরং এ নির্দেশনা দিয়েছে যে, কারো মনে কষ্ট না দিতে, তাদের উপাস্য দেব-দেবীকে গালমন্দ না করতে, 'আল্লাহ ছাড়া তারা যাদের পূজা করে তাদের গালমন্দ কর না।'[৯৭]

ইসলাম আরও নির্দেশ দিয়েছে যে- 'তর্ক-বিতর্ক কালে যেন কেউই প্রতিপক্ষের আকীদা বিশ্বাসকে তিরস্কার এর লক্ষ্য বস্তু না বানায়। তাদের উপাস্য এবং তাদের সম্মানিত ব্যক্তিদের গালমন্দ না করে সে ব্যাপরে মুসলমানদের কঠোরভাবে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কোরআনুল কারীমে বলা হয়েছে- 'তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাব ধারীদের সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হবে না।'[৯৮]

এই উত্তম পন্থার মধ্যে সরাফত, ভদ্রতা, নম্রতা, শালীনতা, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা ইত্যাদি যাবতীয় গুণাবলী অন্তর্ভূক্ত। এই নির্দেশ শুধুমাত্র কিতাবধারী বা আহলে কিতাবের জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়নি বরং সমস্ত ধর্ম বিশ্বাসীদের বেলায়ই প্রযোজ্য।

**চ. স্বামী নির্বাচনে নারীর অধিকার ঃ**

বিবাহ বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে নারী-পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে বয়ঃপ্রাপ্ত কোন পুরুষের অমতে অসম্মতিতে তাঁর অপছন্দের কোন নারীকে বিবাহে বাধ্য করা যাবে না। আবার বয়ঃপ্রাপ্ত কোন নারীকেও তাঁর অমতে ও অসম্মতিতে তাঁর অপছন্দের কোন পুরুষকে বিবাহ করতে বাধা করা যাবে না। এটিই ইসলামের বৈবাহিক সম্পর্কের অন্যতম মূলনীতি।

স্বামী নির্বাচনের অধিকার নারীরই। ইসলাম নারীকে এ অধিকার দিয়েছে। নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়াকে হুজুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবৈধ ও অন্যায় বলে ঘোষণা করেছেন। ইসলামি শরিয়তে বিবাহের উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্তা নারীকে তাঁর স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে নারী সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোন অভিভাবক-অভিভাবিকা, মাতা-পিতা, ভাই-বোন তাঁর এ স্বাধীনতা এবং অধিকারকে ক্ষুন্ন করতে পারবে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

'স্বামী দর্শনকারী নারীকে তাঁর অনুমতি ছাড়া বিয়ে করা যাবে না। আর কুমারি মেয়েকে তাঁর সম্মতি ছাড়া বিয়ে করা যাবে না। সাহাবায়ে কিরামগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাঁর সম্মতি কিরূপ? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জিজ্ঞাসান্তে তাঁর নিশ্চুপ হয়ে যাওয়া তার সম্মতি বুঝা যাবে।'[৯৯]

এ হাদিসের উপর ভিত্তি করে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন-

'অভিভাবক পূর্ব বিবাহিতা ও অবিবাহিতা মেয়েকে কোন নির্দিষ্ট ছেলেকে বিয়ে করতে বাধ্য করতে পারবে না। অতএব পূর্বে বিবাহিতা মেয়ের কাছ থেকে বিয়ের জন্য রীতিমত আদেশ পেতে হবে এবং অবিবাহিতা বালেগা মেয়ের কাছ থেকে যথারীতি অনুমতি নিতে হবে।'[১০০]

হাদিস শরিফে এসেছে :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র.) হতে বর্ণিত রাসূল (সা.) বলেছেন- 'বালেগা নারী তাঁর বিবাহের ব্যাপারে তাঁর অভিভাবকের চেয়ে নিজের পছন্দে বেশি হকদার, আর বয়স্করা বা নাবালিকা নারীর কাছ থেকে অনুমোদনক্রমেতাঁর বিবাহ হবে। জিজ্ঞাসার জবাবে যদি সে চুপ থাকে তবে এটাই তাঁর অনুমতি।'[১০১]

হাদিস শরিফে এসেছে:

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এবং মুজাম্মা ইবনে আনসারি হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা খানসা বিনতে খেয়াম আল-আনসারীর প্রসঙ্গে বলেন, খানসা একজন বালেগা নারী সাইয়্যেবা তাঁর বাবা তাঁকে একজনের সাথে বিবাহ দিল। খানসা সে বিবাহ পছন্দ করে না। খানসা সে ব্যাপারটি গিয়ে রাসূল (স.) এর দরবারে এসে ঘটনাটি বললেন, রাসূল (স.) সে বিবাহ ভঙ্গ করে দিলেন।[১০২]

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর এ অধিকার স্বীকৃত ছিল না। নারীর কোন ইচ্ছা ও সম্মতির গুরুত্ব ছিল না। নারীকে মনে করা হত ভোগ্য পণ্য-সামগ্রী। পুরুষের মনোরঞ্জণ ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাঁদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কোন মূল্য ছিল না। ইসলামই সর্বপ্রথম নারীর এ অধিকার নিশ্চিত করেছে। নারী তাঁর স্বামী নির্বাচনে পূর্ণ স্বাধীন ও কর্তৃত্বশীল। এ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার কারো কোন অধিকার নেই।[১০৩]

হাদিস শরিফে এসেছে:

একদিন হুজুর (স.) কিছু সংখ্যক মহিলাদেরকে পাঠালেন ঐ লোকদের সাথে তোমাদের বিবাহের কথা চলছে তোমরা ওদের সম্পর্কে দেখে আস যে, তাঁদের মুখের লাবণ্যতা কি রকম, বোগলগুলো কি রকম, ভালভাবে দেখবে তাঁদের স্মার্টনেস কি রকম? এ সব কিছু দেখে তাঁরা আল্লাহর নবীর কাছে রিপোর্ট করলেন।[১০৪]

আব্দুল আযিয বিন নাসের বলেন:

বিবাহের জন্য প্রত্যেক প্রস্তাবকের দায়িত্ব হচ্ছে প্রস্তাবিতা মহিলার গুণাবলী সম্পর্কে জেনে নেয়া। কনের কোন দোষত্রুটি আছে কিনা? তাঁর চরিত্র কেমন, তাঁর গুণাবলী কি কি এবং তাঁর বৈশিষ্ঠাবলী কি কি? অনুরূপভাবে কনেরও বর সম্পর্কে জেনে নেয়া আবশ্যক যে, তাঁর গুণাবলী কেমন, চরিত্র কেমন, দোষত্রুটি আছে কিনা? ঐদিন বরের গুণাবলীতে সে সন্তুষ্ট হয় তবে বিবাহ করবে অন্যথায় বিবাহ করবে না। বর নির্বাচনে কনের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।[১০৫]

এক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, অন্যান্য ধর্মে নারীর কোন স্বাধীনতাই ছিল না। মনমত বিয়ে করার দুরের কথা। এ ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (স.) এর বিধান কত সুন্দর কত কল্যাণকর লক্ষ্য করলেই বুঝা যায়।

**ছ. পুনরায় বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার ঃ**

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পুন:বিবাহের অধিকার নারী ও পুরুষের সমান। নারী প্রয়োজনে পুন:বিবাহ করতে পারবে। নারীর এ অধিকার কেউ খর্ব করতে পারবে না, কোনরূপ বাঁধার সৃষ্টি করতে পারবে না। হিন্দুধর্মে নারীর পুন:বিবাহের কোন অধিকার নেই। প্রথমবার বিবাহ হলে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সেই সংসার করতে নারী একান্ত বাধ্য। পুরুষ সেই নারীকে প্রয়োজন হলেও কোনভাবে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না। স্বামীর কোন প্রকার অযোগ্যতা ও অসামর্থ্যতার পরেও নারী বাধ্যগতভাবে সেই স্বামীর সংসার করতে হবে। কোন অবস্থাতে কোনভাবেই স্বামী ত্যাগ করতে পারবে না, বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না। এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী অন্যত্র বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না ।

এমন এক সময় ছিল হিন্দুদের সতীদাহ প্রথার মত জঘন্য কাজে প্রাণ বিসর্জন দিতে হত। স্বামীর মৃত্যুর পর সেই বিধবা স্ত্রী জীবিত থাকলে তাঁর উপর পর পরুষের নজর পড়বে, তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতা নষ্ট হবে অথবা ক্ষুন্ন হবে, এ কারণে স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে জলন্ত আগুনে আত্মহুতি দিতে হতো। মৃত স্বামীকে পোড়ানোর সাথে সাথে স্ত্রীও সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে জীবন্ত পুড়ে মরতে হতো। সেই অবলা নারীকে জীবন্ত পোড়ানোর করুণ দৃশ্য দেখেও হিন্দু সমাজের কোন লোকের অন্তরে সামান্য করুণার উদ্রেক হত না।[১০৬]

ধর্মের নামে ঢাকঢোল পেটান হত। আর তাতেই হারিয়ে যেত সেই অবলা নারীর আর্ত-চিৎকার ধ্বনী। এটি ছিল হিন্দু ধর্মের রীতি, ধর্মীয় বিশ্বাসের অঙ্গ। এছাড়া কুমারি বলি, দেবীর বেদীমূলে কুমারির গর্দান উড়িয়ে দিত। সাগর মাতার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সাগরে কুমারি বলি দিত। অবলা অসহায় নারীরা এসব ঘৃণিত, কুসংস্কার ও লোমহর্ষক কার্যাবলির শিকার ছিল। কত সহস্র নারী, লক্ষ লক্ষ কুমারি এভাবে জীবন দিতে হয়েছে তার কোন হিসেবে নেই।[১০৭]

স্বামীর চিতায় ক্রন্দনরতা স্ত্রীকে সাজিয়ে আনা হত সহমরনের জন্য। একজন মৃতব্যক্তিকে পোড়ান হচ্ছে আবার তাঁর সাথে বেদনা দগ্ধ এক অবলা নারীকে ধরে নিয়ে আসা হয় জীবন্ত পুড়িয়ে মারার জন্য। একটু হৃদয় ব্যথিত হত না ধর্মীয় পুরোহিত ঠাকুরদের। সম্রাট আকবর, সেলিম জাহাঙ্গীর, আওরঙ্গজেব প্রমুখ রাজা-বাদশাহগণ এ কুসংস্কারের মূলোৎপাটনের জন্য আইন করলেন। ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন ঘটে। সামাজিকভাবে সংস্কার কাজ চালালেন। তাঁরা এ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জোর প্রচারণা চালান। মুসলিম শাসকবৃন্দ কঠোর আইন প্রণয়ন করেন। সতীদাহ প্রথা, কুমারি বলিদান, স্বামীর চিতায় সহমরণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। বিধবা বিবাহ প্রচলন করেন। এসবের বিরুদ্ধে প্রণীত আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে লাগলেন। এ আন্দোলনের সাথে প্রগতিশীল শিক্ষিত হিন্দু যুবকগণও সমর্থন জানালেন। এক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইসলাম একটি প্রগতিশীল জীবন ব্যবস্থা। যুগধর্ম বিবেচনায় ইসলামই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, যা মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে। ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার সব বিধি-বিধান সর্বকালের, সর্বজনের, সর্বক্ষেত্রের জন্য সামগ্রিক কল্যাণকর ব্যবস্থা। তাই ইসলাম

সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন আদর্শ। নারীর পুন:বিবাহ এবং বিধবাদের পুন:বিবাহ ইসলামেরই স্বীকৃত ব্যবস্থা। বিশ্বব্যাপী এ ব্যবস্থা প্রচলিত হচ্ছে। নারীর অধিকার ও কল্যাণ ইসলামের পুন:বিবাহ এবং বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা মানবজাতির জন্য অপরিহার্য অবদান। বিশেষত নারীর এ অধিকার বিশ্বব্যাপী অস্বীকৃত ছিল।

আর এক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সুন্দর দিক নির্দেশনা দিয়েছেন-

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র.) হতে বর্ণিত রাসূল (সা.) বলেছেন, বালেগা (আল আইম্মু) নারী তার বিবাহের ব্যাপারে তার অভিভাবকের চেয়ে নিজের পছন্দে বেশি হকদার, আর বাকেরা বা নাবালেগা নারীর কাছ থেকে অনুমোদনক্রমে তাঁর বিবাহ হবে। জিজ্ঞাসার জবাবে যদি সে চুপ থাকে তবে এটাই তাঁর অনুমতি।[১০৮]

রাসুল (সা.) বলেন- 'হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এবং মুজাম্মা ইবনে আনসারি হতে বর্ণিত আছে যে, তারা খানসা বিনতে খেযাম আল-আনসারির প্রসঙ্গে বলেন, খানসা একজন বালেগা নারী (সাইয়্যেবা) তাঁর বাবা তাঁকে একজনের সাথে বিবাহ দিল। খানসা সে বিবাহ পছন্দ করল না। খানসা সে ব্যাপারটি নিয়ে রাসুল (সা.) এর দরবারে এসে ঘটনাটি বললেন, রাসূল (সা.) সে বিবাহ ভঙ্গ করে দিলেন।'[১০৯]

এখানে দেখা যায় যে, নারীর বৈবাহিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও ইসলাম অগ্রসর কোন সন্দেহ নাই।

এখানে একটি কথা বলা দরকার, যেসব সমাজ ও ধর্মে নারীর একাধিক বিবাহ, পুন:বিবাহ এবং বিধবা বিবাহ অনুমোদন করে না, সেসব ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের পুন:বিবাহ একাধিক বিবাহ অনুমোদন করে।[১১০]

বিষয়টি একপেশে এবং পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। এ নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্বের মাধ্যমে নারীর অধিকার চরমভাবে খর্ব করা হয়েছে। নারীকে আরও বেশি নিরাপত্তাহীন করে তুলেছে। পুরুষের যদি পুন:বিবাহের অধিকার থাকে, নারীর পুন:বিবাহের অধিকার থাকবেনা কেন? কেন এমন স্বার্থপরতা? যেসব অল্প বয়স্কা যুবতীর স্বামী মারা যায় তাঁরা অসহায় হয়ে পড়ে। কারন :

**প্রথমত:** তাঁরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলে গণ্য হয় না। পিতা-মাতা সব সম্পত্তি পুত্র সন্তানরাই পায়। বিবাহিতা নারী তার পিতা-মাতার সম্পত্তির মালিক হয় না।

**দ্বিতীয়ত:** স্বামী মারা যাওয়ার কারণে এ হতভাগ্যা নারী অসহায়ত্বের গ্লানি নিয়ে একাকিত্ব বরণ করে থাকতে হয়। এতে তাঁর আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয়। ফলে আর্থিক নিরাপত্তা, সামাজি নিরাপত্তাহীনতার কারনে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়া ছাড়া গত্যান্তর থাকে না। ভারতে সতিদাহ প্রথা বিলুপ্ত হবার পরও এসব নারীরা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। যার কারণে ভারতে নারীর আত্মহত্যার সংখ্যা অনেক গুণ বেশি। অনেক সময় নারী স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হয়েও আত্মহত্যা করে থাকে। কারন, সে সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের সুসংবদ্ধ কোনো নিয়ম নেই।

একমাত্র ইসলামই নারীর এসব সমস্যার সুষ্ঠ সমাধন দিয়েছে। বিধবা নারীর পুন:বিবাহের বিধান ইসলামেরই সোনালী বিধান। কোন সংসারে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রয়োজন হয়ে পড়লে স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে। স্ত্রীর নির্যাতিত অবস্থায় চোখ বুজে সব সহ্য করার প্রয়োজন নেই, সেও বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার রাখে। কোনক্রমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে গেলে কিংবা স্বামী মারা গেলে, আর্থিক, সামাজিক ও জৈবিক সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে। আর্থিক নিরাপত্তার জন্য তাঁর স্বামী প্রদত্ত দেনমোহরের সম্পদ, স্বামীর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার সম্পদ, পিতা-মাতার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার সম্পদ তাঁর জন্য সুনির্দিষ্ট আছে। যৌন চাহিদার জন্য তাঁর পছন্দমতো যে কোন স্বামী গ্রহণ করার অধিকার আছে। ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে নারীর এসব অধিকার সংরক্ষণ ও সুনিশ্চিত করবে।

**জ. বিবাহ বিচ্ছেদ ঃ**

ইসলামে বিবাহ বন্ধন একটি অত্যন্ত পবিত্র বন্ধন। যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া যা ছিন্ন হবার নয়। ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসেও ইসলাম স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাঝে সমঝোতায় বিশ্বাসী। সমঝোতার সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে শুধুমাত্র তখনই ইসলাম সর্বশেষ অবলম্বন হিসেবে তালাকের বৈধতা দেয়। তালাকের পর নারীকে প্রদত্ত সম্পদ ফেরত নেয়া সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন-

আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থানে অন্য স্ত্রীকে পরিবর্তন করতে চাও এবং তাদের একজনকে প্রচুর পরিমাণ সম্পদ দিয়ে থাক তবে তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না। তোমরা কি তা অন্যায় ভাবে ও প্রকাশ্যে গুনাহের মাধ্যমে গ্রহণ করতে চাও?[১১১]

আর যদি স্ত্রী তার বিবাহকে ছিন্ন করতে চায় তাহলে সে তার গৃহীত উপহার সামগ্রী স্বামীকে ফিরিয়ে দেবে। সম্পদ ফিরিয়ে দেয়াটা ন্যায় সঙ্গত বিনিময় হিসেবে বিবেচিত হবে; কেননা স্ত্রী চায় বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে। কোরআন শরীফে বর্ণিত আছে যে, স্ত্রী যদি বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে চায়, তখন ছাড়া

অন্য কোন সময় স্বামীর জন্য বৈধ হবে না তার দেওয়া প্রদত্ত সম্পদ ফিরিয়ে নেয়া। আল্লাহ বলেন- তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে যা কিছু প্রদান করেছ তা থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ভয় করে যে তারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা বজায় রাখতে পারবে না। সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নেয় তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন পাপ নেই। এটা হল আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা। কাজেই এ সীমা অতিক্রম করো না। মূলত: যারা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করবে তারাই জালেম।[১১২]

ইসলামের দৃষ্টিতে তালাক; এ সম্পর্কে রাসূল (সা:) বলেন-

আল্লাহ তায়ালার কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় বৈধ কাজ হচ্ছে তালাক। (আবু দাউদ) নিছক অপছন্দের কারণে স্বামীর অধিকার নেই স্ত্রীকে তালাক দেবার। অপছন্দ হলেও ইসলাম স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে।

আল্লাহ বলেন-

স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অত:পর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা এমন জিনিসকে অপছন্দ করছো যাতে আল্লাহ তায়ালা অনেক কল্যাণ রেখে দিয়েছেন।[১১৩]

রাসূল (সা:) বলেন-

"কোন মুমিন যেন কোন মুমিনা নারীকে উপহাস না করে। যদি তার একটি আচরণ পছন্দ না হয়, তাহলে আরেকটি আচরণে হয়ত সে সন্তুষ্ট হবে।[১১৪]

তিনি জোর দিয়ে বলেন-

"ঐ ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার যার আচরণ উত্তম। আর যার আচার-আচরণ স্ত্রীদের কাছে উত্তম, সেই উত্তম ব্যক্তি।[১১৫]

ইসলাম একটি বাস্তব ধর্ম। মানব জীবন ব্যবস্থা ইসলামের ছক রূপে চলে। কিছু কিছু উদ্ভুত পরিস্থিতিতে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মীমাংসা করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় স্বামীর করণীয় সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন-

পুরুষেরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক; কেননা আল্লাহ তাদের একজনকে আরেকজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং পুরুষেরা তাদের সম্পদ থেকে নারীদের জন্য ব্যয় করে থাকে। এ জন্যই ন্যায় নিষ্ঠা নারীরা স্বামীদের অনুগত হয় এবং স্বামীদের অনুপস্থিতিতেও আল্লাহ যা রক্ষা করতে বলেছেন নিজেদের সতীত্ব, স্বামীদের সম্পত্তি ইত্যাদি তারা রক্ষা করে। আর সে নারীদের মধ্যে তোমরা অবাধ্যকতার আশঙ্কা কর প্রথমে তাদেরকে উপদেশ দাও। তাতে কাজ না হলে বিছানায় তাদেরকে বর্জন কর এবং তাতেও কোন ফল না হলে তাদেরকে মৃদু প্রহার কর। এতে যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অনেক উঁচু। অনেক বড়। যদি এতে স্ত্রী সংশোধিত হয়ে যায় তবে তাকে পূর্বেকার কাজের জন্য তিরস্কার করো না। বরং স্বামীর পরিবার থেকে একজন সালিশ এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন নিযুক্ত কর। তারা যদি মীমাংসা চায় তাহলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিলসাধন করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সবকিছু সম্পর্কে অবগত।[১১৬]

রাসূল (সা:) কোন কারণ ছাড়া স্ত্রীকে প্রহার করতে নিষেধ করেছেন। রাসূল (সা:) ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা:) নাম্নী মহিলাকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, যে লোক স্ত্রীকে প্রহার করে বলে সমাজে পরিচিত লাভ করেছে তাদেরকে যেন বিবাহ না করে।

রাসূল (সা:) বলেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার পরিবারের নিকট উত্তম।[১১৭]

অপর দিকে, স্বামীর আচরণ খারাপ হওয়ার আশংকা দেখা দিলে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে- যদি কোন নারী তার স্বামীর কাছ থেকে দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে তাহলে তারা নিজেদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করে নিলে কারো কোন দোষ হবে না। আর সমঝোতাই ভাল। মানুষের মনে তো সর্বদা স্বার্থচিন্তা বর্তমান থাকে। তবে তোমরা যদি ভাল কাজ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তাহলে জেনে রেখো, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার খবর রাখেন।[১১৮]

সূরা আল নিসা ৩নং আয়াতে বলা হয়েছে- আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতিম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও, দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এমন আশংকা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে একটিই; অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা।

উল্লেখিত আয়াত থেকে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে,

*Dhaka University Institutional Repository*

আমরা যদি এ আয়াতের প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য বিষয়ে আদ্যপান্ত বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক সূক্ষ্ম চিন্তা ভাবনা করি তাহলে বহু বিবাহ বিষয়ে মতবিরোধের আশংকা থাকার অবকাশ থাকে না। এ লক্ষ্যেই তাফসীরে মা আরেফুল কুরআনে আলোচিত "বহু বিবাহ" বিষয়ক আলোচনাটি এখানে তুলে ধরা হলো:-

আয়াতটি নাযিলের পেক্ষাপটঃ জাহেলিয়াত যুগে এতিম মেয়েদের অধিকার চরমভাবে ক্ষুন্ন করা হত। যদি কোন অভিভাবকের অধীনে কোন এতিম মেয়ে থাকত আর তারা যদি সুন্দরী হত এবং তাদের কিছু ধন-সম্পত্তি থাকত, তাহলে তাদের অভিভাবকরা নামমাত্র মোহর দিয়ে তাদেরকে বিয়ে করে নিত অথবা তাদের সন্তানদের সাথে বিয়ে দিয়ে সম্পত্তি আত্মাসাৎ করার ফিকির করত। এসব অসহায় মেয়েদের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণে ব্যবস্থার কথা তারা চিন্তাও করত না। বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীকী (রা:) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (রা:) এর যুগে ঠিক এ ধরনের একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। জনৈক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একটি এতিম মেয়ে ছিল। সেই ব্যক্তির একটি বাগান ছিল, যার মধ্যে উক্ত এতিম মেয়েটিরও অংশ ছিল। সেই ব্যক্তি উক্ত মেয়েটিকে বিয়ে করে নিল এবং নিজের পক্ষ থেকে "দেনমোহর" আদায় তো করল না, বরং বাগানে মেয়েটির যে অংশ ছিল তাও সে আত্মসাৎ করে নিল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় ।

উক্ত আয়াতে এতিম মেয়েদের বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সাধারণ আইন কানুনের মত তা শুধু প্রশাসনের উপর ন্যস্ত করার পরিবর্তে জনসাধারণের মধ্যে আল্লাহ ভীতির অনুভূতি জাগ্রত করা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে যে, যদি ইনসাফ করতে পারবে না বলে মনে কর, তাহলে এতিম মেয়েদের বিয়ে করবে না; বরং সে ক্ষেত্রে অন্য মেয়েকেই বিয়ে করে নেবে।

কোরআন বহু বিবাহের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিধি নিষেধ জারি করেছে; এই সামাজিক অনাচার এবং জুলুমের প্রতিরোধ করেছে। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর গায়লান বিন আসলামা সাকাফী নামে এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন; তখন তার দশজন স্ত্রী ছিল; তার স্ত্রীরাও তার সাথে মুসলমান হয়ে গেল। মহানবী (সা:) নির্দেশ দিলেন এ দশজন স্ত্রীর মধ্য থেকে যে কোন চারজনকে রেখে বাকি সবাইকে যেন তালাক দিয়ে দেয় হয়। গায়লান বিন আসলামা সাকাফী রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নির্দেশ মোতাবেক তাই করলেন। অর্থাৎ চারজন স্ত্রী রেখে আর সবাইকে তালাক দিয়ে বিদায় করে দিলেন।[১১৯]

মাসনাদে আহমাদে এই ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে- গায়লান বিন আসলামা শরিয়তের হুকুম মোতাবেক চারজন স্ত্রী রেখেছিলেন। কিন্তু হযরত উমার ফারুক (রা:) এর যুগে তিনি চারজন স্ত্রীকেও তালাক দিয়ে দেন এবং তার সমস্ত ধনসম্পদ তার ছেলে মেয়েদের মধ্যে ভাগ বণ্টন করে দেন। এ ব্যাপারটি হযরত উমার ফারুক (রা:)- এর গোচরে এলে তিনি তাকে ডাকলেন এবং বললেন, "তুমি স্ত্রীদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্যই এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছ যা একান্তই জুলুম। অতএব তুমি শীঘ্রই তাদেরকে পুনরায় গ্রহণ কর এবং তোমার সে ধনসম্পদ তোমরা ছেলেদের কাছ থেকে ফেরত নিয়ে তাদেরকে দিয়ে দাও। আর যদি এ ব্যবস্থা না কর তাহলে মনে রাখবে যে, এজন্য তোমাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।"[১২০]

আলোচ্য আয়াতে চারটি পর্যন্ত বিয়ের অনুমতি দেয়ার পর বলা হয়েছে- "যদি আশংকা কর যে, স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে এক স্ত্রীতেই তৃপ্ত থাকে।"

অর্থাৎ পবিত্র কোরআনে চারজন স্ত্রীর কথা বৈধ ঘোষনা করা হয়েছে এবং সাথে সাথে এও বলে দেয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা তাদের মধ্যে সমতা বিধান তথা ন্যায়বিচার করতে না পার, তাহলে এক স্ত্রীর উপরেই নির্ভর কর। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, একাধিক বিয়ে ঠিক তখনই বৈধ হতে পারে, যখন শরিয়ত মোতাবেক সবার সাথে সমান আচরন করা হবে এবং তাদের সবার অধিকার সমভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপার অপারগতা হলে এক স্ত্রীর উপরই নির্ভর করতে হবে এবং এটাই ইসলামের নির্দেশ। কোরআনে কারীম স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিচ্ছে যে, যদি সদ্ব্যবহার বজায় রাখতে না পার তবে এক স্ত্রী নিয়েই তৃপ্ত থাকতে হবে অথবা ক্রীতদাসী নিয়ে সংসার ধর্ম পালন করবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, আয়াতে যে ক্রীতদাসীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা শরিয়তের বিধি নিষেধ সাপেক্ষ হতে হবে আজকালকার যুগে যেহেতু যেসব বিধানুযায়ী দাসীর অস্তিত্ব নেই, সেহেতু এ যুগে বিবাহ বন্ধন ছাড়া কোন স্ত্রীলোক নিয়ে সংসার ধর্ম পালন করা সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম।

মোট কথা, কোরআন যদিও চারজন পর্যন্ত স্ত্রীলোককে একসাথে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে এবং কেউ এমন করলে তা শুদ্ধও হবে, তবে একাধিক বিয়ের বেলায় স্ত্রীদের সবার সাথে সমতাপূর্ণ ব্যবহার করা ওয়াজিব করা হয়েছে। এ নিয়মের অন্যথা করা কঠিন গুনাহর কাজ। সুতরাং কেউ একের বেশি বিয়ে করতে চাইলে তাকে প্রথমে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, প্রত্যেক স্ত্রীর হক আদায় করার মত সামর্থ তার রয়েছে কি না। যদি এমন সামর্থ না থাকে, তাহলে একের বেশি বিয়ে করতে যাওয়া ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে একটি কঠিন পাপে নিমজ্জিত করায়ই নামান্তর। এমনি গুনাহর আশংকা থেকে বিরত থাকা এবং এক স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট থাকা তার পক্ষে বিধেয়।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে তৎকালীন সামাজিক প্রথা অধিক নারীর সংখ্যা এবং যুদ্ধঘটিত কারণে অনেক লোকের মৃত্যুর ফলে বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি ও দাসীর সংখ্যা গরিষ্ঠতা ইত্যাদি করনে এক সাথে চার স্ত্রী গ্রহণ করা ইসলামী বিধান বলে গণ্য করা হয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোনআনে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে- 'যদি ইয়াতিমদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে না পার, তবে তোমার পছন্দ মত স্ত্রী-লোকদের মধ্য থেকে দুই, তিন বা চার জনকে বিবাহ

কর। তবে তোমাদের মনে যদি আশঙ্কা হয় যে তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ করতে পারবেনা। তবে একটি মাত্র স্ত্রী গ্রহন কর। অবিচার করা থেকে দূরে থাকার এটাই হল উত্তম পন্থা।'[১২১]

এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত চারটি বিয়ে পর্যন্ত অনুমতি দেয়া হয়েছে তবে শর্ত সাপেক্ষে। শর্তটি অত্যন্ত মারাত্মক। যদি আশঙ্কা হয় সব স্ত্রীর মধ্যে সুবিচার করা যাবে না, তবে একজন স্ত্রী গ্রহন করতে বলা হয়েছে আফো, অনুরাগ, ভাল-মন্দ মিলিয়ে মানুষ। অধিকাংশ মানুষের পক্ষে স্ত্রীদের সাথে একেবারে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব নয়। আর যদি তাই না হয় তবে এক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে লংঘন করা হয়। আল্লাহ বলেন, তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন, তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান করতে কখনই পারবে না। তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না এবং অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রেখো না, যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু।' [১২২]

সুতরাং ইসলামের জোর কিন্তু একজন স্ত্রী গ্রহণ করার পক্ষেই। দ্বিতীয়ত দুই, তিন বা চার স্ত্রী গ্রহণের বিধান কোন শান্তিপূর্ণ অবস্থার জন্য প্রযোজ্য নয়। সুস্থ সবল কর্মক্ষম স্ত্রী থাকতে শুধুমাত্র খেয়াল খুশি বা ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে কোন বৈধকরণ ছাড়া এরূপ বিবাহ বিধিসম্মত নয়। মুসলমানদের সংখ্যা তেমন ছিলনা তৃতীয় হিজরীর সময়।[১২৩]

সেই সময় ওহুদের যুদ্ধে ৭০ জন মুসলমান মৃত্যুবরণ করেন। ফলে ক্ষুদ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর পিতৃহারা এতিম সন্তানদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সৃষ্টি করে। উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছিল ঠিক সে সময়ই। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে এতিমদের বিবাহ করে তাদের আইনগত স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে যত্নের সঙ্গে ইনসাফের সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ করতে বলা হয়েছে। এমন অস্বাভাবিক অবস্থা যে কোন যুগেই ঘটা সম্ভব। কেবলমাত্র সেক্ষেত্রে ইসলাম একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়। দ্বিতীয় বিবাহের অন্যান্য কারণও হতে পারে, যেমন-স্ত্রী যদি সন্তান দিতে অক্ষম হয়। উত্তরাধিকারী রেখে যাবার দূর্নিবার কামনা মানুষের মধ্যে রয়েছে। সেক্ষেত্রে স্ত্রী তালাক না দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার যৌক্তিকতা আছে। তাছাড়া স্ত্রী যদি খুব অসুস্থ থাকে, তখন পতিতালয়ে যাবার চেয়ে উত্তম দ্বিতীয় বিবাহ করা। এক্ষেত্রে অসহায় অসুস্থ স্ত্রীকে তালাক দিতে হয় না এবং পুরুষের নৈতিকতাও রক্ষা পায়। তবে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ইসলামে বহুবিবাহ স্বাভাবিক নিয়ম নয়, এটা ব্যতিক্রম নিয়ম। নবী কারীম (স.) সময় তার কন্যা ফাতেমার স্বামী হযরত আলী (রা.) দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে চাইলে নবী (স.) তীব্রভাবে এর প্রতিবাদ করেন এবং মীনারে উঠে ঘোষণা করলেন যে, স্বাভাবিক অবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহ সিদ্ধ নয়।[১২৪]

সাময়িক যৌন বাসনা পূরণ কিংবা কোন উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে মুতআ বিবাহ করে, নারীকে উপভোগ করে নির্দিষ্ট সময়ের পর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নারীকে সমাজে অপমানিত-অবহেলিত, অপদস্ত করা ইসলাম পরে অবৈধ ঘোষণা করেছে। মুতআ বিবাহ মক্কা বিজয়ের পূর্বে জায়েয ছিল। মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (স.) এ ধরনের বিবাহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তাছাড়া আল্লাহ ও তার রাসূল (স.) এই ধরনের বিবাহকে হারাম করেছেন।[১২৫]

**ঝ. ভরণ-পোষণ প্রাপ্তির অধিকার ঃ**

বিবাহের পর নারীরা যেমন বহুবিধ অধিকার ও মর্যাদা পেয়ে থাকে তেমনি ইসলামী জীবন আদর্শ দ্বারা উজ্জীবিত দাম্পত্যযুগল অনাবিল শান্তিময় জীবন লাভ করে। বিবাহোত্তর জীবনে নারীরা সর্বোত্তম প্রাপ্তি স্বামীর ভালবাসা এবং তাকে ও তার পরিবারকে দেখাশুনার দায়িত্ব দেয়ায় নারীর ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। স্বামী-গৃহে রাজ্যের সম্রাঙ্গীরূপে স্বামীর সহধর্মিনী ও অর্ধাঙ্গিনীরূপে ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন- 'তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করে চলবে।[১২৬]

আল্লাহ আরো বলেন- 'স্ত্রীদেরও তেমনি অধিকার রয়েছে যেমন স্বামীদের রয়েছে তাদের উপর এবং যথাযথভাবে আদায় করতে হবে।'[১২৭] অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই আল্লাহর নিকট সমান। আল্লাহ বলেছেন- 'তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের ভূষণ আর তোমরা তাদের ভূষণ।'[১২৮]

স্বামীর কাছ থেকে সে পূর্ণাঙ্গ ভরণ-পোষণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান লাভের অধিকারী। কন্যাও ভগ্নী হিসেবে সে পিতা ও ভ্রাতার কাছ থেকে নিরাপত্তা ও ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকারী। ভরণ-পোষণের প্রাপ্তি বিবাহিত নারীর মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে অন্যতম। ভরণ-পোষণ বলতে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। তবে ভরণ-পোষণের মান নির্ধারণ পিতা বা স্বামীর সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। পবিত্র কোরআনে এ ব্যাপারে নীতি হল- 'স্বচ্ছল ব্যক্তির উপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী (এবং তুলনামূলক) কম স্বচ্ছল ব্যক্তির উপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী।[১২৯]

বিয়ের পূর্বে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করবেন মেয়ের পিতা। আল্লাহ বলেন- 'যথাযথভাবে মেয়ের খাদ্য ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা পিতার জন্য অপরিহার্য।[১৩০]

বিয়ের পর নারী তার এ অধিকার আদায় করবে স্বামীর কাছ থেকে। বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (স.) বলেছেন- 'যথাযথ ভাবে তাদের (নারীদের) পানাহার ও পোশাকের ব্যবস্থা করা তোমাদের উপর অপরিহার্য।[১৩১]

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও স্বামী যদি এ দায়িত্ব পালন না করে, আইন তাকে এ দায়িত্ব পালনে বাধ্য করবে। এমন কি স্ত্রীর ভরণ-পোষণে ব্যর্থ হলে স্ত্রী যদি বিয়ে বিচ্ছেদের দাবি করে, তা হলে ইমাম মালিক, শাফিকী ও আহমাদ ইবনে হাম্বলি (র.)-এর মত অনুযায়ী বিয়ে বিচ্ছেদ করে দেয়া হবে। এক্ষেত্রে ইমাম মালিক (র.) স্বামী এক, দুই, তিন মাস বা একটা উপযুক্ত সময় পর্যন্ত অবকাশ অনুমোদন করেছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালি (র.)-এর মতে এই যে, অবিলম্বে স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ করে দিতে হবে। উভয়ের মধ্যে দাম্পত্য জীবন অটুট রাখা না যায় সেক্ষেত্রে আল্লাহ বলেন- 'যদি তাদের উভয়ের আশঙ্কা হয় যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিস্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই।[১৩২]

তালাক প্রাপ্ত মহিলারা যেন তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যে নিপতিত না হয় সেজন্য তাদের সম্মানজনক ভাবে বেঁচে থাকার মত ভরণ-পোষণের ব্যবস্থার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন- 'তালাকপ্রাপ্ত নারীদেরকে সম্মানজনক ভাবে বেঁচে থাকার মত ভরণ-পোষণ দিতে হবে। পূন্যবানদের জন্য এটা কর্তব্য।[১৩৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ থেকে বর্ণিত রাসূল (স.) বলেন- 'হে যুবকগণ তোমাদের যাদের স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ করার ক্ষমতা আছে তারা বিবাহ করে নাও। অর্থাৎ ভরণ-পোষণে অসমর্থ যুবকদের বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।

**ঞ. নারীর সদাচরণ পাবার অধিকার ঃ**

সদাচরণ সাধারণভাবে মহৎ গুণাবলির অন্যতম বলে পরিগণিত হলেও, এটি নারীর আইনগত অধিকার। ইসলাম নারীকে স্বামীর পক্ষ থেকে সদাচরণ পাবার আইনগত অধিকার দান করেছে। স্বামী তাঁর স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করতে আইনগতভাবে বাধ্য। স্বেচ্ছাচারী কোন স্বামীর অধীনে আজীবন নিগৃহীত ও নির্যাতিত হতে বলেনি ইসলাম। স্ত্রীর সঙ্গে স্বেচ্ছাচারিতা, যথেচ্ছা ব্যবহার, অন্যায় আচরণ, কথায় কথায় জুলুম-অত্যাচার করা সম্পূর্ণ শরিয়ত পরিপন্থি কাজ।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর নির্দেশ হল -

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে এ আদেশ দিচ্ছেন যে, আমানতকে যথাস্থানে রাখ। আর যখন তোমাদেরকে মানুষের মাঝে (পুরুষ ও নারী) কোন ফায়সালা করতে বলা হয় ন্যায়পরায়নতার সাথে ফায়সালা কর। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা কত সুন্দর ফায়সালা দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা সবকিছু শুনেন।[১৩৪]

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

'তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর।'[১৩৫]

বুঝা গেল, স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা আল্লাহ তা'য়ালার বিধান। আর আল্লাহ তা'য়ালার বিধান লংঘন করার ব্যাপারে বলা হয়েছে-

' যে আল্লাহর বিধান লংঘন করে সে নিজেরই অনিষ্ট করে।'[১৩৬]

স্ত্রীদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-

'তাঁরা তোমাদের ভূষণ স্বরূপ এবং তোমরাও তাঁদের ভূষণ স্বরূপ।'[১৩৭]

স্ত্রী যেমন স্বামীর মুখাপেক্ষী ঠিক স্বামীও স্ত্রীর মুখাপেক্ষী। এ জন্য সদাচরণ পাবার ক্ষেত্রে উভয়েই সমান। স্বামী যদি অসদাচরণ করে তাহলে ইসলামের বিধান হল স্ত্রী তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে বিচার প্রার্থী হতে পারবে। আদালতে স্বামীকে সে বিষয়ে বিজ্ঞাসাবাদ করবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি একজন আদর্শ স্বামী ছিলেন। স্ত্রীদের সাথে কখনো তিনি দুর্ব্যবহার করেন নি। তাঁদেরকে প্রহার করেন নি। কোন স্ত্রী কখনো তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি যা খেতেন স্ত্রীদেরও তা খাওয়াতেন। তিনি যে মানের বস্ত্র পরিধান করতেন স্ত্রীদেরকেও সে মানের বস্ত্র পরিধান করাতেন। যে যুগে নারীদের কোন সম্মান ছিলনা, সে জাহেলিয়া যুগে স্ত্রীদের মর্যাদা ও নারী জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার যে ঘোষণা তিনি দিয়েছেন, তা মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত। বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে এসে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ অদ্যাবধি যা চিন্তাও করতে পারেননি, শত সহস্র বছর পূর্বে তা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করে দিয়েছেন। নারী জাতির সকল সমস্যাকে চিহ্নিত করে তাঁর সমাধানের পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

'তোমাদের মধ্যে তাঁরাই উত্তম ব্যক্তি যারা তাঁদের স্ত্রীর নিকট উত্তম।' [১৩৮]

হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেন-

'হযরত আনাস (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স.) বলেছেন, আমার কাছে দুনিয়ার তিনটি জিনিস প্রিয়- নারী, সুগন্ধি ও নামাজে আমার চোখের শীতলতা।[১৩৯] হযরত আয়েশা (র.) বলেন-

'হযরত আয়শা (র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, তিনি মেয়েদের সাথে রাসূল (স.) এর সামনে খেলাধুলা করতেন, হযরত আয়শা (র.) বলেন, আমার সঙ্গীনিগণ যখন আমার কাছে আসতেন তাঁরা রাসূল (স.) কে দেখে আতংকিত হতেন, হুজুর (স.) আমার সঙ্গীনিদেরকে আমার সাথে খেলতে উৎসাহিত করতেন। হযরত জাবির (র.) বলেন, হযরত আয়শা (র.) বলেন, আমি মেয়েদের সাথে খেলাধুলা করতাম আর আল্লাহর রাসূল (স.) সে খেলা উপভোগ করতেন।[১৪০]

হাদিস শরিফে এসছে:

হযরত আয়শা (র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি কোন এক সফরে রাসূল (স.) এর সাথী হলাম। রাসূল (স.) বললেন হে আয়শা! এসো তোমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করি। প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম হলাম। বেশ কিছু দিন পর আল্লাহর রাসূল বললেন হে আয়শা! আস তোমার সাথে আমি প্রতিযোগিতা করি, এতে তিনি প্রথম হলেন, তখন আমার শরীর বেশ মোটা হয়েছিল। যার কারণে আমি হেরেগেলাম। তিনি বললেন কেমন হল এবারের প্রতিযোগিতা? [১৪১]

স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক। অন্যথায় একজন অমনপূত, অত্যাচারী এবং অকর্মণ্য স্বামী থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পূর্ণ অধিকার রাখে। ইসলাম তাঁকে এ অধিকার দিয়েছে। বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্ত নারী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলে তার পূর্বোক্ত স্বামী কিংবা তাঁর আত্মীয়-স্বজন তাঁর জীবন পথের বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। তাঁকে কোনরূপ বাঁধা দিতে পারবে না। স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যাবার পর পূর্ব স্বামী তাঁর পূর্ব সম্পর্কের জের ধরে স্ত্রীকে দ্বিতীয় বিবাহে বাঁধা দিতে পারবে না।

ইসলামের প্রথম যুগে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের গায়ে হাত তোলা কিংবা প্রহার করতে নিষেধ করেন। পরে হযরত ওমর (র.) একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেন, নারীরা বড়ই উদ্ধত হয়ে পড়েছে, তাঁদের প্রহার করার অনুমতি থাকা প্রয়োজন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু প্রহারের অনুমতি দেন। অনুমতি পাওয়ার পর দিনই সত্তর জন নারী স্বামী কর্তৃক প্রহৃত হল। পুরুষগণ যেন এতদিন এ বিষয়টির জন্যই অপেক্ষায় ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরদিন সকলকে ডেকে বললেন-

'আজ রাতে সত্তরজন নারী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবার-পরিজনকে ঘিরে ধরেছে। তাঁরা প্রত্যেকে স্ব স্ব স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিল। যারা এ ধরনের কাজ করেছে তাঁরা তোমাদের মধ্যে ভাল লোক নয়।'[১৪২]

আল্লাহ ত'য়ালা কালামে হাকিম ঘোষণা করেন-

'তোমরা যে সকল স্ত্রীদের অবাধ্যতার ব্যাপারে ভয় কর তাঁদেরকে প্রাথমিকভাবে নসিহত করবে, তাতে যদি কোন কাজ না হয়, তবে বিছানা আলগা করে দিবে, তাতেও যদি কাজ না হয়, তবে তাঁদেরকে মৃদু প্রহার করবে। যদি এতে করে তাঁদের মধ্যে আনুগত্যের লক্ষণ দেখা যায় তাহলে তাঁদের ব্যাপারে কোন কঠিন ব্যবস্থা নিবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন সর্ববৃহৎ সর্বজ্ঞা।'[১৪৩]

আল্লাহপাক আরো ঘোষণা করে-

'তোমরা নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। যদি তাঁদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।[১৪৪]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট বুঝা যাচেছ যে, স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা যতটুকু জরুরী। যেহেতু আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ দিয়েছেন, নবী মুহাম্মদ (স.) অনুপ্রাণিত করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম তাবিয়িনদের দিকে তাকালেও দেখা যাবে নারীর সাথে সুন্দর আচরণের কত উৎসাহ পাওয়া যায়। তাছাড়া যদি দুনিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে তাকালেও দেখা যাবে, এ পৃথিবীর অর্ধেক পুরুষ আর অর্ধেক নারী। এ নারীকে অবজ্ঞা করে কোন কিছুই সম্ভব নয়। এ জগতে মা ব্যতীত কোন বংশ বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব নয়। তাই নারীর সাথে সদ্ব্যবহার তাঁদের প্রতি করুণা নয় এটা নারীর পাওনা। যদি পুরুষ তা আদায় করে শান্তি পাবে আর যদি আদায় না করে তবে অশান্তির আগুনে জ্বলতে হবে।

**ট . নারী শিক্ষার মাধ্যমে বুদ্ধি-বৃত্তিক মর্যাদা ঃ**

ইসলাম পুরুষ ও নারীর জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা উপলব্ধি ও শিক্ষাদানের স্বীকৃতি দিয়েছে। জ্ঞান আহরণের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হওয়া। ইসলামের দৃষ্টিতে পুরুষ বা নারী যিনি সৃষ্টি সম্বন্ধে যত বেশি চিন্তাভাবনা করেন, মহান সৃষ্টিকর্তা ও পালনকারী আল্লাহ তায়ালা সম্বন্ধে তিনি তত বেশি সচেতন। ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম সবিখ্যাত নারী হচ্ছেন নবীজী-পত্নী হযরত আয়েশা (র.)। তিনি তত বেশি সচেতন। তিনি

প্রধানত যে কারণে স্মরণীয় তা হচ্ছে তাঁর মেধা ও বিশিষ্ট স্মৃতিশক্তি। এসব গুণের জন্য তিনি হাদিসের অন্যতম নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে সমাদৃত। এক হাজারের বেশি হাদিস তিনি বর্ণনা করেছেন। তাঁকে হাদীসের অন্যতম প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে সমাদৃত করা হয়।

ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সূচনাকালে মুসলিম নারীর অবদান ও ত্যাগ তিতীক্ষা অসাধারণ ও বিপুল। হযরত উমরের বোন ও হযরত আবু বকরের মেয়ে আসমা প্রমুখের দৃষ্টান্তও ক্ষেত্র সবিশেষে উল্লেখের দাবী রাখে। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সমাজের সংস্কার ও সংশোধনে নারীর বিপুল প্রভাব রয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে যথাসাধ্য অবদান রাখা তাদের কর্তব্য। এ কর্তব্য এখানো বহাল রয়েছে।

নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ইসলাম জ্ঞান অর্জনের প্রতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। হাদীসের ভাষায় জ্ঞানার্জন প্রতিটি মুসলমান নারী ও পুরুষের জন্য ফরয। নারী হন, পুরুষ হন তাঁকে সাধ্যানুসারে জ্ঞানার্জন করতে হবে। তবে তাকে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আল্লাহ তায়ালার বাণী স্মরণ রাখতে হবে। যেমন আল্লহর বাণী: "জ্ঞানীরাই সত্যিকারভাবে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করেন।"[১৪৫]

কোরআন ও হাদীসে শিক্ষা তথা জ্ঞান অর্জনের প্রতি অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বস্তুত সমগ্র বিশ্বে যখন অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার আর অজ্ঞানতার তিমিরে নিমগ্ন ছিল ইসলাম এমন সময় জ্ঞান চর্চাকে মানবজাতির জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছিল। জ্ঞান ব্যতীত ব্যক্তিসত্ত্বার পূর্ণতা আসে না। এই পূর্ণতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে মৌলিক অধিকার হিসেবে ইসলাম নারীকে শিক্ষার অধিকার দিয়েছে, শুধু অধিকার নয় অগ্রাধিকার দিয়েছে। নারীকে আত্মিক ও নৈতিক গুণাবলীর চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য হিসেবেই নারীর দৈহিক সত্ত্বার বিকাশের পাশাপাশি তার বিবেকী এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের উপর ইসলাম এমন বিরাট গুরুত্ব দিয়েছে।[১৪৬]

কারণ নারী তার জ্ঞানের এই উৎকর্ষ দ্বারা পুরুষের চেয়ে সমাজে বেশি অবদান রাখতে পারে। সন্তানের প্রথম শিক্ষকই তার মাতা। তাই পিতার চেয়ে মাতার প্রভাব সন্তানের উপর বেশি পড়ে। প্রথম সামাজিকীকরণ শিশু তার মায়ের মাধ্যমেই পেয়ে থাকে। সামগ্রিকভাবে সুশিক্ষিত মাতা স্বভাবতই জ্ঞানী, চরিত্রবান, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, নিষ্ঠাবর্তী, ভদ্র ও নম্র। শিক্ষিত মাতার এসব গুণ আপনা আপনি সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। একজন শিক্ষিত নারী তাঁর প্রতিবেশীর উপরও যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারে। পারস্পারিক ভাব-বিনিময়, ভদ্রতা, নম্রতা, আচরণ দিয়ে একজন শিক্ষিত মহিলা তার প্রতিবেশীদের আকৃষ্ট করে পুরো পরিবেশকেই সুখবর করে তুলতে পারেন। প্রয়োজনের সময় শিক্ষিত নারী অর্থ উপার্জান করে পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনতে পারেন। এ কারণেই ইসলাম নারী শিক্ষাকে সীমিত করে দেয়নি। শিল্প, সাহিত্য, বাণিজ্য, কলা, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের যে কোন শাখায় নারীরা বিচরণ করতে পারবে। শিক্ষিত নারী শুধু পরিবার বা প্রতিবেশীকে নয়, সমগ্র সমাজকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম।[১৪৭]

পুরুষের পাশাপাশি নারীর উপরও জ্ঞানার্জন করা ফরয। জ্ঞানের কোন শাখাতেই ইসলাম নারীদের নিরুৎসাহিত করে না। ইসলামে যা ফরয তা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ফরজ। যেমন- আবশ্যক ধর্মীয় জ্ঞান। যা নিষিদ্ধ তা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ। যেমন- জ্যোতিবির্দ্যা, বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্যসহ সকল বিষয়ে জ্ঞানার্জনের সুযোগ উভয়ের জন্য সমান।[১৪৮]

মৌলিক ও অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞান বিদ্বানদের কেবল চরম সত্য ও বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতেই সাহায্য করে না, তাদেরকে ইসলামী সমাজ ও সংস্কৃতিতে মর্যাদার উচ্চতর আসনেও অধিষ্ঠিত করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন- 'যারা প্রকৃত জ্ঞানী ও বিদ্বান তারা বলেন- আমরা উহার (কোরআন) প্রতি ঈমান এনেছি। এবং সত্য কথা এই যে, জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল পবিত্র কোরআন শরীফ হতে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।'[১৪৯]

সুতরাং কোরআনকে বুঝার জন্যও ইসলামের অনুসারীদের জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জন করতে হবে। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কোন পার্থক্য নেই। কোরআনে আরও বলা হয়েছে- 'তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী এবং জ্ঞানী, আল্লাহ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আর যা কিছু তোমরা বার আল্লাহ সে বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে অবহিত।[১৫০]

এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ ভেদে যারাই বিশ্বাসী ও জ্ঞানী হতেন, আল্লাহ তাদেরকেই উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আল্লাহ আরও নির্দেশ দিয়েছেন- 'প্রত্যেক নর-নারী যেন তাদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রতিপালকের নিকট দোয়া প্রার্থনা করে।'[১৫১]

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম শুধু পুরুষের জন্য নয় নারীর জন্যও শিক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে নির্দেশ দিয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স.) মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন- 'দরকার হলে চীন দেশে গিয়েও জ্ঞান অন্বেষণ কর।'[১৫২]

এখানে শুধু মুসলমান পুরুষের উদ্দেশ্য করে এ কথা বলা হয়নি, জ্ঞান পিপাসু নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য এ বাণী প্রযোজ্য। সুতরাং কোরআন ও সুন্নাহর এসব আদেশ-নির্দেশের মধ্য দিয়ে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নারী শিক্ষার উপর ইসলাম অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলাম নারীকে সুউচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছে এ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমেই। কারণ বিশ্বাসী ও জ্ঞানীদের উচ্চ আসন দেবেন বলে আল্লাহ নিজেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন- 'যারা ঈমান (বিশ্বাস) এনেছে এবং বিশেষত: ইসলাম হাসিল করেছেন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অনেক উচ্চাসনের অধিকারী করবেন।[১৫৩]

ইমানের পূর্বশর্তই হল জ্ঞান ও শিক্ষা। আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর সৃষ্ট জগতকে জানা, বুঝার নামই শিক্ষা। আর এ জানা বুঝার মাধ্যমেই মানুষের মনে আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর একত্ব, অংশীদারহীনতা, তাঁর শক্তি, ক্ষমতা ও কুদরত ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক উপলব্ধি হবে। অত:পর সেই উপলব্ধির মাধ্যমেই ইমানের প্রতি মানুষের বিবেক তাড়িত করে। এ উপলব্ধি জ্ঞান এবং শিক্ষা ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং ইমান আকিদার মূলেই রয়েছে শিক্ষা। তাই ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধি ব্যবস্থার মধ্যে একটি অপরিহার্য ব্যবস্থা হল শিক্ষা। শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে ইসলাম। শিক্ষার প্রতি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

পৃথিবীর অর্ধেক জনশক্তি হল নারী। নারী হল মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের একটি অপরিহার্য উপাদান। শুধু তাই নয়, নারী ও পুরুষ মিলে মানব সভ্যতা এবং জগত সংসার রচিত হয়েছে। অত:পর মানব সভ্যতার নির্মাণ কার্যের অর্ধেক নারী। তাই নারীকে উপেক্ষা করার মানে হবে অর্ধেক জনশক্তিকে উপেক্ষা ও অকেজো করে দেয়া। নারী শিক্ষার গুরুত্ব সর্বাধিক। শিশু মাতৃগর্ভে আসে, মাতৃকোলে লালিত-পালিত হয়। শিশুর প্রথম শিক্ষা শুরু হয় মায়ের কাছে। তাই নারী শিক্ষার গুরুত্ব সর্বাধিক।

ইসলাম কখনো নারী শিক্ষাকে বিরুৎসাহিত করেনি; বরং নারী শিক্ষার ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে ইসলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

'প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।'[১৫৪]

আল্লামা সিন্দি (রহ.) 'মুসলিম' শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন-

'উপরোক্ত হাদিসে মুসলমান শব্দে নারী-পুরুষ উভয়েই শামিল।'[১৫৫]

যারা দাসী তাঁদের শিক্ষার ব্যাপারেও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

'যার নিকট কোন দাসী আছে আছে সে তাঁকে ভালভাবে বিদ্যা শিক্ষা দান করে, ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা দেয়, অত:পর তাঁকে স্বাধীন করে দিয়ে বিবাহ করে, তবে তাঁর জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে।'[১৫৬]

উপরোক্ত হাদিসে দাসীকে শিক্ষা-দীক্ষা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। যে সমাজে দাসীর শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে, সে সমাজে সম্ভ্রান্ত নারীদের শিক্ষার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে এরূপ চিন্তা চেতনা অদ্যাবধি জাগ্রত হয়নি। আধুনিকতার ধৈয্যধারীরা আজও এতটা উদার চিন্তার অধিকারী হতে পারেনি। উদার ও মুক্ত চিন্তার দাবীদারগণ বর্ণ, আভিজাত্য, গর্ব, মান-মর্যাদা ইত্যাদি ভেদ-বৈষম্য ভুলে গিয়ে এমন একটি দৃষ্টান্ত অদ্যাবধি পেশ করতে পারবে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র মুখে বলেননি, তিনি বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। তাঁর একাধিক দাসী স্ত্রী ছিল, যাদেরকে তিনি দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে স্ত্রীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন।

এভাবে ইসলাম নারীর চিন্তাজগত মান বৃদ্ধিও জন্য দ্বীনি অধিকার অর্থাৎ জ্ঞান বৃদ্ধিও জন্য সব রকমের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছে, তার বুদ্ধিবৃত্তি, প্রকৃতি প্রদত্ত সুপ্ত প্রতিভা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে। তাইতো দেখা যায় হযরত আয়েশা (রা.), হযরত উম্মে সালমা (রা.), হযরত জয়নব (রা.) প্রমুখ মহিলাকে সাহিত্য, কাব্য ফিকাহ শাস্ত্রে পান্ডিত্যপূর্ণ ও প্রতিভাময় অবদান রাখতে।

**ঠ. আইনগত সমান অধিকার ঃ**

ইসলাম মানব জাতিতে জন্মগতভাবে সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। কোরআনুল কারীম এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেছে- 'হে মানবজাতি! আমরা তোমাদের সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি। পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন গোত্র ও বংশে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। আর তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী।'[১৫৭]

বিদায় হজ্বের ভাষণে মহানবী (স.) বলেন- 'কোন অনারবের উপর কোন আরবের শ্রেষ্ঠত্ব, কোন কালোর উপর কোন সাদার শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আর না আছে সাদার উপর কোন কালোর শ্রেষ্ঠত্ব- তাকওয়া ছাড়া।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কোরআন মজীদ ও রসূল কারীম (স.) এর বাণী ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানায় বসবাসকারী সকল মানুষকে আইনের চোখে সমান মর্যাদার অধকারী করেছে। একমাত্র তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি ব্যতিরেকে এ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের অন্য কোন মানদণ্ড রাখা হয়নি। সাম্যের এ দৃষ্টান্ত আমরা নবীযুগে, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ এবং এর পরবর্তীকালেও দেখতে পাই। যেখানে দেখা যায় মনিব, গোলাম, শাসক, শাসিত, আমীর, ফকির, মুসলিম-অমুসলিম সকলের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে সাম্যনীতি। স্বয়ং নবী করীম (স.) সকল সময় নিজেকে অন্যের সমতুল্য মনে করতেন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে, একবার ফাতেমা নাম্মী এক কুরাইশ মহিলা চুরির দায়ে ধরা পড়ল। হযরত উসামা (রা.) নামক এক সাহাবী উক্ত অভিজাত মহিলাকে মাফ করে দেয়ার জন্য মহানবী (স.) এর নিকট সুপারিশ করেন। এতে মহানবী (স.) তাঁকে কঠোর ভাষায় বলেন-'হে উসামা!

আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করে অনধিকার চর্চা করছ? সাবধান! আর কখনও এরূপ ভুল করবে না। এরপর তিনি মসজিদে মুসলমানদের সমবেত করে তাদের উদ্দেশ্যে বলেন- 'তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ এ জন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তারা সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী শাস্তি কার্যকর করত, কিন্তু বিশিষ্ট লোকদের কোন শাস্তি দিত না। সেই মহান সত্তার শপথ! যার মুঠোয় আমার জীবন! যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও এরূপ করত, তবে আমি তারও হাত কাটতাম।' মহান রাব্বুল আলামীন এ সম্পর্কে বলেন- 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়পরায়নতা অবলম্বন করবে। এটা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত।'[১৫৮]

হযরত সাওয়াদ ইবনে উমার (রা.) নামক একজন সাহাবীর কাছ থেকে জানা যায়,. একবার তিনি রঙ্গীন পোষাক পরে মহানবী (স.) এর খেদমতে হাজীর হয়েছিলেন। মহানবী (স.) তাঁকে দূর হও দূর হও বলে ছড়ি দিয়ে টোকা দিলেন। তখন তিনি এর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চান বলে মহানবী (স.) তৎক্ষণাৎ তাঁর পেট মুবারক তাঁর সামনে খুলে দিলেন। সুতরাং স্বয়ং মহানবী (স.) তাকওয়াকে পৃথিবীর সবকিছুর উপর গুরুত্ব দিয়ে সাহাবীগণের সামনে নিজেকেও সমতার কাতারে দাঁড় করেছিলেন। হযরত উমর (রা.) কে দেখা যায় হযরত আবু মুসা আশারী (রা.), হযরত আমর ইবনুল আস (র.), তাঁর পুত্র মুহাম্মদ হিমসের গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে কুয়ত (র.) এবং বাহরাইনের গভর্নর কুদামা ইবনে মাযউল (রা.) এর বিরুদ্ধে যে শাস্তি কার্যকর রেখেছেন এবং তাঁর নিজ পুত্র আব্দুর রহমানের উপর হদ্দের শরঈ শাস্তি কার্যকর করে আইনের চোখে সাম্যের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বিশ্বের ইতিহাসে যার নজীর বিরল। কোরআনুল কারীম ফিরাউনের যে হীন অপকর্মের কথা উল্লেখ করেছে তার একটি উল্লেখযোগ্য প্রকার ছিল এই যে, সে তার জাতিকে উঁচু নিচু ও আশরাফ-আতরাফের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিল।

এ থেকে বুঝা যায় সাম্যের মহান নীতি সংরক্ষণ ও অসাম্যের ব্যাপারে ইসলাম কত জোরালোভাবে সোচ্চার। সাম্যের নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলাম ধনী-দরিদ্র, উচু-নীচু ও প্রভু-দাসের সম্পর্ককে বিলীন করে। যোগ্যতার মাপকাঠিরূপে একমাত্র তাকওয়াকে নির্ধারণ করেছে। সাম্যের এমন নজীর বিশ্বের অপর কোন মতবাদ বা মানব রচিত মতবাদে দেখা যায় না। এখানে আরেকটি দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। হযরত উমার (রা.)-কে মক্কার গভর্নর নাফে ইবনুস হারিস জানান, 'আমি মুক্তদাস ইবনুল বারাকে আমার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে এসেছি।' তখন উমর (রা.) তার যোগ্যতা ও গুণাবলীর কথা শুনে অত্যন্ত খুশী হয়ে বললেন, 'কেন হবে না। আমাদের নবী (সা.) বলে গেছেন যে, আল্লাহ তাঁর এই কিতাবের বদৌলতে কতককে উপরে উঠাবেন এবং কতককে নীচে নামিয়ে দিবেন।' যা আধুনিক বিশ্বে ধনী-দরিদ্র, উচু-নিচু সম্প্রদায় এমনকি অর্থের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থায় হেরফের তথা সাম্যের নীতিতে দেখা যায় অসাম্য। এর ফলে আধুনিক বিশ্বের সাম্য নীতিকে দেখা যায় ভুলুণ্ঠিত হতে।

**ড. নারীর নিরাপত্তার অধিকার ঃ**

ইসলামের বিধি-বিধান মানুষের কল্যাণ, সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার বিধান করে থাকে। একজন মুসলমানের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে দু'টি হক বা কর্তব্য রয়েছে। এর একটি আল্লাহর হক অন্যটি বান্দার হক। বান্দার হক সমূহের মূল কথা হল, একজন মুসলমান প্রথমতঃ আল্লাহর বান্দা হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে পারবে অন্যদিকে মানুষের অধিকার সংরক্ষণের কারণে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, মানুষ লাভ করবে কল্যাণ।

মানব জীবন সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য, এটি অত্যন্ত পুত ও পবিত্র এবং নিতান্তই সম্মানের বস্তু। এ কারণে কোন ব্যক্তির জানমাল ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতকে ইসলামে মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের গুরুত্ব এত বেশি যে, একটি জীবনের হত্যা বা সংহারকে সমগ্র মানব জাতির হত্যা বা সংহারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মানব জীবনের নিরাপত্তার বিষয়ে ইসলাম এতখানি গুরুত্ব দিয়েছে যে, পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম, মতবাদ ও বিধানে আর এরূপ নেই।

এ বিষয়ে পবিত্র কালামে পাকে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন-

'নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে হত্যা করল, আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে প্রাণে রক্ষা করল।'

পবিত্র কুরআনের আলোচ্য আয়াতের স্পষ্ট বক্তব্য হল, কোন অবস্থায় অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যাবে না। তবে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় আইনে কাউকে অভিযুক্ত করা হলে তাকে হত্যা করা বৈধ। ইসলামের মৌল উদ্দেশ্য হল, মানব হত্যা বন্ধ করা। যাতে সমাজের শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। এক একটি হত্যা আরো বহু সংখ্যক হত্যাকে জন্ম দেয় এবং সমাজকে নিশ্চিত বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায়। তাই হত্যা অবশ্যই নিষিদ্ধ করতে হবে।

পবিত্র কুরআনে অন্য আরেকটি আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

'আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না।'

ইসলামে হত্যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হলেও কেবলমাত্র ৬টি সংগত কারণে হত্যার বিধান বৈধ রাখা হয়েছে। এ হত্যার কারণ সামাজিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা, এটি মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্তেই করা হয়েছে। সংগত কারণসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার অপরাধীকে তার অপরাধের প্রতিশোধ স্বরূপ হত্যা করা। কুরআনের পরিভাষায় তাকে কিলাস বলা হয়, যার অর্থ রক্তমূল্যও বটে।

(খ) জিহাদের ময়দানে সত্য দ্বীনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের হত্যা করা।

(গ) ইসলামের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পতনের চেষ্টায় লিপ্তদের অপরাধের শাস্তিস্বরূপ হত্যা করা।

(ঘ) বিবাহিত নারী-পুরুষকে ব্যভিচারের অপরাধে হত্যা করা।

বেঁচে থাকার অধিকার হল সব গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের মধ্যে একটি মৌলিক অধিকার। এ অধিকারটি নিশ্চিত হলেই কেবল নারী বা পুরুষ তার জন্য বরাদ্দ অন্যান্য অধিকার উপভোগ করতে সক্ষম হবে। আল-কোরআনে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে- 'হে মুমিনগণ! আল্লহকে ভয় কর, তাহার নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁহার পথে সংগ্রাম কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।'[১৫৯]

প্রাক ইসলাম যুগে বহু জায়গায় মেয়ে শিশুকে হত্যা করা হত বা কোন কোন জায়গায় পুঁতে ফেলা হত। ইসলাম কন্যা শিশুর হত্যার এ প্রথাকে প্রচণ্ডভাবে নিন্দা করেছেন। আল-কোরআনে বলা হয়েছে- 'তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্য ভয়ে হত্যা করো না। তাহাদেরকে ও আমিই রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয়ই তাহাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।'[১৬০]

ইসলামে নারীর প্রতি মানবতাবিরোধী আচরণে প্রতিবাদ করে আল-কোরআনে আরও বলা হয়েছে- 'যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, কী অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল?'[১৬১]

কন্যা সন্তানদের প্রতি সুবিচার করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন- 'যদি একটি পরিবারে একের পর এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং পিতা মাতা যদি কন্যাদের যত্ন ও স্নেহের সঙ্গে প্রতিপালন করে তবে কন্যারা তাদের পিতামাতাকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবে।'[১৬২]

এভাবে ইসলাম কন্যাদের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারটি সর্বাগ্রে নিশ্চিত করে যাতে মানুষ হিসেবে প্রাপ্য সব অধিকার সে ভোগ করতে পারে। পৃথিবীর সাধারণ আইনে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে প্রাণের নিরাপত্তার অধিকার কার্যকর হয়। কিন্তু আল্লাহর আইনে মাতৃ উদরে গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পর হতেই প্রাণের মর্যাদা স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এ কারণে মহানবী (স.) গমেদ গোত্রের এক নারীকে ব্যভিচারের সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও হত্যার নির্দেশ প্রদান করেননি। কেননা সে তার জবানবন্দীতে নিজেকে গর্ভবতী ব্যক্ত করে। অত:পর সন্তান প্রসব ও দুগ্ধ পানের সময়সীমা অতিক্রম হওয়ার পর তার মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেয়া হয়েছিল। তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি কার্যকর করলে অন্যায়ভাবে সন্তানের প্রাণনাশের আশংকা ছিল। সুতরাং ইসলামী আইন বিশারদগণ সন্তান গর্ভধারণের একশত বিশ দিনের মাথায় প্রাণের নিরাপত্তার অধিকার ধার্য করেছেন। কেননা এ সময়সীমা গর্ভ সঞ্চার গোশত পিণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে মানুষের আকৃতি ধারণ করতে শুরু করে এবং তার উপর মানুষ পরিভাষা প্রযোজ্য হয়। ইসলামের এ অভিমত শত সহস্র বছর পর আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীও স্বীকার করেছে।[১৬৩]

আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট (র) বনাম ওয়েভ এর বিখ্যাত মামলায় আধুনিক চিকিৎসা বিষয়ক তথ্যের রায় দিয়েছে যে, 'মাতৃগর্ভে- মানব অস্তিত্বকে গর্ভ ধারণের তিনমাস পরে আইনগত স্বীকার করে নিতে হবে।' [১৬৪]

ইসলাম কখনই কন্যা সন্তানদের পুত্র সন্তান থেকে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন করেনি, বরং সন্তান লালন-পালন করা অধিক মর্যাদাপূর্ণ হিসেবে অবহিত করেছে। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তি তিন কন্যা সন্তান বা তিন বোনের লালন-পালন করবে, তারা (কন্যা বা বোন) সেই ব্যক্তির দোযখে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হবে।[১৬৫]

রাসূল (স.) বলেছেন- 'যে ব্যক্তি তার দুই কন্যাকে তাদের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত লালন-পালন করবে, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি এবং আমি একসাথে থাকবো। এই বলে তিনি হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিত দেখালেন।[১৬৬]

**ঢ. সাক্ষী ও বিচারক হিসেবে নারী ঃ**

পবিত্র কোরআনের সাত জায়গায় আল্লাহ তায়ালা সাক্ষ্য সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে এক জায়গায় আর্থিক বিষয়ে দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর কথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করেন- 'তারপর নিজেদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুই

ব্যক্তিকে তার সাক্ষী রাখো। আর যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী হবে, যাতে একজন ভুলে গেলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।[১৬৭]

সাক্ষ্য সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করেন- 'আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের অভিযোগ দেয় এবং তাদের কাছে তারা নিজেরা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন সাক্ষী থাকে না, তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য হচ্ছে- চার বার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে সাক্ষ্য দেবে যে, সে সত্যবাদী এবং পঞ্চম বার বলবে তার প্রতি আল্লাহ লা'নত হোক যদি সে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে। আর স্ত্রীর শাস্তি এভাবে রহিত পারে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে, তার নিজের উপর আল্লাহর গযব নেমে আসুক যদি এ ব্যক্তি সত্যবাদী হয়।'[১৬৮]

অন্য এক স্থানে দেখা যায় নারীর সাক্ষ্য পুরুষের সমান মানের। এ ছাড়া বাকি ৫ জায়গায় নারী-পুরুষ নির্ধারণ করে কিছু বলা হয়নি। আর্থিক লেনদেন ও চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে একজন পুরুষের সাক্ষ্য দুইজন নারীর সাক্ষ্যের সমান-এর অর্থ এই নয় যে, নারীর মান পুরুষের অর্ধেক মনে রাখতে হবে, তখন মেয়েরা আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে বেশি জড়িত হতেন না। এখানে এমন বলা হয়নি যে, তাদের স্মরণ শক্তি কম। বরং সাংসারিক ব্যস্ততায় আর্থিক চুক্তির ধারাগুলো সব মনে না থাকাই স্বাভাবিক। সে কারণে, একজন যদি ভুলে যায় তবে আর একজন স্মরণ করে দিতে পারবে।[১৬৯]

সাক্ষ্য ব্যাপারে এ আয়াতটির সঙ্গে 'মুমিন পুরুষ ও মুমিন স্ত্রীলোকেরা পরস্পরের বন্ধু ও সাথী। এরা যাবতীয় ভাল কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন যাদের প্রতি আল্লাহর রহমত অবশ্যই নাযিল হবে। নি:সন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সুবিজ্ঞ ও জ্ঞানী।[১৭০]

যেহেতু নারীদের সাক্ষ্য দেয়ার অধিকার আছে, সেহেতু নারীরা বিচারকও হতে পারেন। এ ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআনে কোন বিরোধিতা করা হয়নি। সাক্ষীর ক্ষেত্রেও তেমনি কোরআনের ও হাদীসের বিভিন্ন নির্দেশনা বিবেচনা করা প্রয়োজন। হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজে কখনও মেয়েদের মেধা ও যুক্তিকে ছোট করে দেখতেন না। জিব্রাইলের মাধ্যমে কোরআনের কোন আয়াত তাঁর উপর নাযিল হলে তিনি তা নারী ও পুরুষ সাহাবা উভয়কেই শিক্ষা দিতেন। মহানবী (স.)-এর সময় বহু নারী হাফেজ ছিলেন, যাদের মাধ্যমে কোরআনকে সংরক্ষিত করা হতো। হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতের সময় তিনি যখন কোরআনের লিখিত রূপ দিতে চাইলেন তখন কোরআনের মূল কপি ছিল হযরত ওমর (রা.)-এর মেয়ে হাফসা (রা.)-এর নিকট।[১৭১]

ইসলামের মূল উৎস কোরআন, তারপর হাদীস। মুসলমানদের হাদীসেও বিশ্বাস করতে হবে। অবশ্যই হাদীসের সত্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করতে হবে। এমন এক হাদীস হযরত আয়েশা (রা.) রাসূলের সুন্নাহর অন্যতম উৎস ছিলেন। সুতরাং, একজন নারী যদি মূল কোরআনের হেফাজতকারী হতে পারে। একজন নারী বর্ণিত হাদীস যদি গ্রহনযোগ্য হতে পারে, তবে একজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ না করার কোন যুক্তিই থাকতে পারেনা।[১৭২]

মহিলাদের সাক্ষ্য রায়ের জন্য পরিপূর্ণ সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য নয়। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে সচেতন নিরীক্ষণ অপরিহার্য বলেই সাক্ষ্য গ্রহণের সময় একজন বা দুইজন পুরুষের সাক্ষ্য যথেষ্ট নয়, বরং ৪ জন সাক্ষী অবশ্যই প্রয়োজন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করেন- 'যারা সাধবী রমনীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে।[১৭৩]

তাই আদালতে ন্যায়পরায়নতার সংরক্ষণের জন্য মহিলার সাক্ষ্য পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক গ্রহণ করাতে কোরআনের বিধান সমালোচিত হতে পারে না। বিশেষ করে পবিত্র কোরআনে এ বিষয়ের প্রতি কঠোর দৃষ্টি নিবন্ধ করে রেখেছে, যাতে কারো অধিকার ক্ষুন্ন না হয়।

**ণ. ন্যায় বিচার লাভের অধিকার ঃ**

ইসলামে ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক, সামাজিক, পেশাগত মর্যাদা নির্বিশেষে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক একটি নিরপেক্ষ, অবাধ ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অধীনে স্বাভাবিক ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার লাভ করে থাকে ন্যায়বিচারের ধারণার উপর ইসলামে ব্যাপক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ কোরআনে বলা হয়েছে- 'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষিস্বরূপ, যদিও তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাপ কাটাইয়া যাও তবে তোমরা যাহা কর আল্লাহ তো তাহার সম্যক খবর রাখেন।'[১৭৪]

রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, ব্যক্তিগত বা দলগত প্রভাব কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থ বা আবেগ যেমন- আনুকূল্য, দয়া ঘৃণা, ক্ষোভ ইত্যাদির বিচারকদের জন্য সুবিধামত আইনের ব্যাখ্যা দান ও রায় প্রদানের ন্যূনতম সুযোগ ইসলামে নেই। আল-কোরআনে বিচারকের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ নিয়েছেন আমানত উহার হকদারকে প্রত্যাপর্ণ করিতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তাহা কত উৎকৃষ্ট! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।'[১৭৫]

**ত. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার ঃ**

নাগরিকগণের ব্যক্তিগত, পারিবারক, বাসস্থান বা সংবাদ আদান-প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াদিতে রাষ্ট্রে কিংবা রাষ্ট্রীয় কোন সংস্থা, কোন ব্যক্তি সমষ্টির অবৈধ, অযাচিত ও নিবর্তনমূলক হস্তক্ষেপ তাদের (নাগরিকগণের) শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে বিধায় এ থেকে রেহাই পাওয়ার অধিকার অন্যতম মূল্যবান মানবিক অধিকার। ইসলামে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জন্য এ অধিকারের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে। আল-কোরআনে মানুষের এ অধিকারের হস্তক্ষেপ করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। বলা হয়েছে- 'হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক, কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করোনা এবং অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেহ তাহার মৃত ভ্রাতার গোশত খাইতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো ইহাকে ঘৃণাই মনে কর। তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর, আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।'[১৭৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কাহারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। [১৭৭]

মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়ে না বলে নজরদারি কিংবা খবরদারি করা শান্তি, স্থিতিশীলতা ও স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করে। তাই ইসলামে এ বিষয়ে চুড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এ সকল কাজে জড়িত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলেছেন- 'যারা মৌখিকভাবে ঈমান এনেছে বলে দাবি করে, প্রকৃতপক্ষে তাদের হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করেনি। তারা জেনে রাখ যে, তোমরা মানুষের গুপ্ত তথ্যাদি অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে গোয়েন্দা তৎপরতা চালাবেনা। কেননা যে ব্যক্তি মানুষের গুপ্ত তথ্যাদি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তার গুপ্ত তথ্যাদি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাকে চুড়ান্তভাবে অপমানিত করেন।

বিনা অনুমতিতে কারও বাসগৃহে প্রবেশ করে তার ব্যক্তিগত বিষয় জানার প্রচেষ্টা চালানো ইসলামে অত্যন্ত গর্হিত কার্য হিসেবে বিবেচিত। আবাসস্থলে মানুষ ক্লান্তি শেষে বিশ্রাম গ্রহণ এবং অবসাদ দূর করে। অযাচিতভাবে বাসস্থানে প্রবেশ মানুষের শান্তি ও স্বাধীনতাকে বিঘ্নিত করে। গৃহের অভ্যন্তরে নারী, পুরুষ ও অসতর্কাবস্থায় থাকে বিধায় অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করলে গৃহবাসীর বিরক্তি উৎপাদন ও অশ্লীলতার ব্যাপ্তি ঘটার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। ইসলামে বাসগৃহে প্রবেশ সম্পর্কিত উপর্যুক্ত নীতিমালা কেবলমাত্র অপরের গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং ব্যক্তির নিজস্ব এমন গৃহের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য যেখানে তার পিতামাতা ভাই-বোন, পুত্র-কন্যা বা মুহরিমা (বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ) নারীগণের বসবাসের ব্যবস্থা থাকে।

**থ. রাজনৈতিক আশ্রয় ও নাগরিকত্ব লাভের অধিকার ঃ**

ইসলাম ধর্ম, বর্ণ, মতাদর্শ নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তিকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবে না এ শর্ত সাপেক্ষে ইসলামী রাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় ও নাগরিকত্ব লাভের অধিকার দেয়। এ পর্যায়ে রাজনৈতিক বা অন্য কোন কারণে পররাষ্ট্র থেকে স্বেচ্ছায় আগত, নির্বাসিত বা বিতাড়িত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিকে ইসলামী রাষ্ট্রে আশ্রয় প্রদানের পাশাপাশি তাদের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা, ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করাও ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে পরিগণিত হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনা প্রজাতন্ত্রে মক্কা থেকে হিজরতকারী মুজাহির জনগনকে আশ্রয় ও নাগরিকত্ব প্রদানসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করা হয়েছিল। মুসলিম আশ্রয় প্রার্থীগণের প্রতি ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ও জনসাধারণের মনোভাব বর্ণনা করে আল-কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে- 'আর তাহার জন্যও মুজাহিদেরকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহার জন্য তাহারা অন্তরে আকাঙ্খা পোষণ করে না, আর তাহার তাহাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্থ হইলেও। যাহাদেরকে অন্তরের কার্পন্য হইতে মুক্ত রাখা হইয়াছে, তাহারাই সফলকাম।'[১৭৮]

আশ্রয় প্রার্থীদের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরনার্থে রাষ্ট্রীয় সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দপূর্বক তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে মদিনা প্রজাতন্ত্রে। আল-কোরআনে এরূপ সম্পদ সম্পর্কে বলা হয়েছে- 'এই সম্পদ অভাবগ্রস্থ মুজাহিরগণের জন্য যাহারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি হইতে উৎখাত হইয়াছে। তাহারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সাহায্য করে। উহারাই তো সত্যাশ্রয়ী।'[১৭৯]

আল-কোরআনের এ আয়াতের ইসলামী রাষ্ট্রে আশ্রয় লাভের পর আশ্রয় প্রার্থীগণকে অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করার কথা বলা হয়েছে।

**দ. জাতীয়তার অধিকার ঃ**

ইসলাম প্রতিটি ব্যক্তিকে কোন জাতির (কোরআনের পরিভাষায় কাওম বা উম্মাহ) অন্তর্ভূক্ত হওয়ার এবং তার দ্বারা পরিচিতি লাভের অধিকার প্রদান করে। তবে অধূনা জাতীয়তা বলতে যা বোঝায়, ইসলামে জাতীয়তার ধারণা তা থেকে পৃথক। আধুনিক জাতীয়তার ধারণা ভৌগোলিক সীমারেখা ভিত্তিতে মানবজাতির ভূখণ্ডগত বিভক্তির ফলমাত্র। এরূপ জাতীয়তা কোন বিশেষ অঞ্চলে বসবাসকারী জনসাধারণের মধ্যে চরম স্বদেশিকতা এবং অন্য অঞ্চলের মানুষের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অতিরিক্ত প্রত্যয় সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠত্বের এ প্রত্যয় সর্বব্যাপী ঘৃণা ও অবজ্ঞার জন্ম দেয়। হে আল-

কোরআনে আধুনিক জাতীয়তাবাদ উপজাতে মনোভাবকে প্রত্যাখ্যান করে বলা হয়েছে- 'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হইতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন। আল-কোরআনের এ আয়াতের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গভেদে শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার মনোভাবকে প্রত্যাখ্যান করে ব্যক্তি মানুষের ন্যায়পরায়নতা ও মহৎ অর্জনকে শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ইসলামী অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয়তার চেয়ে বরং আদর্শগত জাতীয়তার ধারণাকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। ইসলামের এ জাতীয়তার ধারণা অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর প্রতি বিশ্বস্ততা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং ভালবাসার নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

**ধ. নারীর কর্মসংস্থান লাভের অধিকার ঃ**

ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী নয় এমন সকল কাজ মেয়েরা করতে পারে এবং কর্মস্থলে পুরুষের মতো হারেই মজুরি লাভের অধিকার রাখে। নারী বলে কম পারিশ্রমিক প্রদান করা ইসলামে জুলুম হিসেবে পরিগণিত। যোগ্যতাসম্পন্ন এবং সুযোগপ্রাপ্ত মেয়েদের নানাবিধ পেশায় আত্মনিয়োগ করা শুধু জায়েজ নয় এবং কর্তব্য হিসেবে বিবেচ্য।[১৮০]

নারী প্রয়োজনে কাজ করবে, ইসলাম-এ অধিকার দিয়েছে। আল্লাহ বলেন-

(ক) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যে কাউকে অপরের তুলনায় বেশি দান করেছেন, তার প্রতি তোমরা লোভ করা না। পুরুষ যদি কিছু অর্জন করে সেই অনুযায়ী তাদের অংশ নির্দিষ্ট আর নারীরা যা অর্জন করেছে সেই অনুযায়ী তাদের অংশও নির্দিষ্ট আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানতে হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব বিষয় জ্ঞানী।[১৮১]

(খ) হযরত আয়েশা (রা.)-এর বোন, হযরত আবু বকরের কন্যা আসমা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আসমা (রা.) নিজে নয় মাইল হেঁটে কর্মক্ষেত্রে যেতেন, আবার বোঝা (শুকনো খেজুরের বিচি) মাথায় করে নয় মাইল পথ ফিরে আসতেন। অথচ তিনি ছিলেন সে যুগের অন্যতম সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি যুবায়েরের স্ত্রী।[১৮২]

(গ) একজন তালাক প্রাপ্তা মহিলা বাইরে কাজে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে লোকেরা তাকে গালমন্দ করলেন। মহিলাটি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর কাছে গেলে তিনি তাকে বাইরে যাবার অনুমতি দেন এবং পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, মহিলাটি যদি তার অর্থনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখে তবে সে তার সংগৃহীত অর্থ সৎকাজে ব্যয় করতে পারবে এবং মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করতে পারবে।

উপরোক্ত কোরআনের আয়াত ও হাদীস দুটি থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, নারী কেবল ধর্মকর্ম ও অধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডেই নিয়োজিত থাকবে না, নিজ নিজ জীবিকা অর্জন ও উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহন করবে। এটা নারীর খোদাপ্রদত্ত অধিকার এবং এসব কর্ম নিজেই নারী পরিপূর্ণ মানব সভা হিসেবে নিজেকে বিকশিত করতে পারবে। লিঙ্গ কোন বিচার্য বিষয় নয়, বরং সমাজে পুরুষ ও নারী কিভাবে সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখতে পারে সেটাই ইসলাম বিবেচনা করে। সমাজ পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ইসলাম কতগুলো কর্তব্য নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছে, আর কতগুলো শুধুমাত্র নারীদের জন্য অবশ্যই পালনীয় এবং কিছু কিছু পুরুষের জন্য অবশ্য পালনীয় করে নির্দেশ দিয়েছে।[১৮৩]

খলিফা উমর ফারুক (রা.) শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ নামক মহিলাকে রাজধানী মদীনায় বাজার পরিদর্শক নিযুক্ত করেছিলেন। এভাবে নারীদের এমন স্থানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, যেখানে তাদের সম্মান ও ইজ্জত সংরক্ষিত হয়। বর্তমান জটিল সামাজিক অবস্থান পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম নারীদের ঘরের বাইরে যাবার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি। যেহেতু ইসলাম নারী শিক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে, সেহেতু শিক্ষিত নারীরা সমাজে তাদের মেধা ও শিক্ষার অবদান রাখবেন একথা অনস্বীকার্য। সুতরাং নারীর নিজের প্রয়োজনে, সমাজের প্রয়োজনে, শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনে সম্পদ ও সম্পত্তির ব্যবস্থাপনাসহ অর্থ উপার্জন করবেন।[১৮৪]

নারীদের চাকরির ব্যাপারে ইসলাম উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। প্রয়োজনে নারী চাকরি করতে পারে, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে, কিন্তু সব সময় তাঁকে তাঁর গৃহাভ্যন্তরীণ দায়িত্ব পালনে সতর্ক থাকতে হবে এবং ঘরের বাইরে পর্দা মেনে চলতে হবে। কোন অবস্থাতেই নির্দিষ্ট সীমালংঘন করা যাবে না। সীমালংঘন করলে তাঁকে বিপর্যস্ত হতে হবে। [১৮৫]

অর্থনৈতিক পরনির্ভরশলীতা নারী নির্যাতনের একটি অন্যতম কারণ। নারীর পরনির্ভরশীলতা নারী নির্যাতনের একটি কারণ বলে মেনে নিলেও এজন্য ইসলামকে দায়ী করা মূলত ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা যার নেই সে যা ইচ্ছা বলতে পারে। তবে ইসলাম সম্পর্কে যার যথাযথ ধারণা আছে সে কখনও এরূপ কথা মেনে নিতে পারে না। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার যথাযথ উদ্যোগ ও পরিকল্পনা রয়েছে ইসলামি জীবন ব্যবস্থায়। নারীরা যেসব অধিকার প্রাপ্য বলে ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় স্বীকৃত তার কিয়দাংশও বর্তমানে আদায় করা হয়না। অমুসলিম রাষ্ট্র

ব্যবস্থায় তো নয়ই, ইসলামি রাষ্ট্র ও দেশসমূহেও ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা না থাকায় ইসলামে স্বীকৃত নারীর প্রাপ্য অধিকারসমূহের কিয়দাংশও আদায় করা হয় না। দেনমোহরের অর্থ ও সম্পদে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় নারীর প্রাপ্য অধিকার।

ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় নারীর প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। ইসলামি জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না থাকায় এসব অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা নেই। ইসলামি জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করে ইসলামি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করলে নারীর অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতাও থাকবে না, নারী নির্যাতনের সম্ভাব্য সব কারণ তিরোহিত হবে। কেবল মাত্র ইসলামি জীবন ব্যবস্থাই তা নিশ্চিত করতে পারে, অন্য কোন ব্যবস্থায় নয়।

নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ হল ইসলামের বিধি-বিধান লঙ্ঘন। ইসলামের বিধি-বিধান লঙ্ঘন করার কারণে নৈতিক অধঃপতন নেমে আসে। নৈতিক অধঃপতনের কারণ সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে যায়। ফলে সমাজে নানা অপরাধ-বিশৃঙ্খলা এবং আইন লঙ্ঘনের মতো নানা অপকর্ম ঘটতে থাকে।

নারীর প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাবার এবং চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। সে কথার প্রমাণ হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীস পেশ করা হল। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

'পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ।' [১৮৬]

একবার যহরত সাওদা (র.) কোন প্রয়োজনে বাইরে যেতে চাইলে হযরত ওমর (র.) তাঁকে বাধা প্রদান করেন। পরে হযরত সাওদা (র.) এ বিষয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে অভিযোগ পেশ করলে তিনি বললেন-

'আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন।' [১৮৭]

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে বাত্তাল বলেন-

এ হাদিস দ্বারা মহিলাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি সহ সকল প্রয়োজনীয় বৈধকাজে ঘর থেকে বের হবার অনুমতিকে প্রমাণিত করে।[১৮৮]

ইসলামে সোনালী যুগ ছিল খিলাফতকাল। খিলাফতের ২৭ বছর এবং তৎপরবর্তী আরও সাতশত বছর ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। সে সময়ে নারীদের যে ইজ্জত ও সম্মান ছিল, তাঁরা যে মর্যাদার আসনে সমাসীন ছিলেন আধুনিক বিশ্বের কোথাও সেই মর্যাদা অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। সে সময়ের নারীরা জগতের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রেখেছিলেন। হযরত আয়েশা (র.) হাদিসে অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি, ইবনেমাজাহ, নাসাঈ, আবু দাউদসহ বিখ্যাত মুহাদ্দিসিন তাঁদের গ্রন্থাবলীতে হযরত আয়েশা (র.), আসমা (র.), উম্মে সালমা (র.) প্রমুখের বর্ণিত হাদিস সংকলন করেন। হযরত আয়েশা (র.) তাফসির শাস্ত্রের বিজ্ঞ ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) এর স্ত্রী শিল্প ও কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি দক্ষতার সাথে কারিগরী বিদ্যা কাজে লাগিয়ে সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতেন। বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করতেন এবং সেগুলো বাজারে বিক্রয় করে উপার্জিত অর্থে সংসার চালাতেন। হযরত আবু বকর (র.) এর কন্যা এবং হযরত জুবায়ের (র.) এর স্ত্রী হযরত আসমা (র.) বাড়ি থেকে দু'মাইল দূরের খেজুর বাগান থেকে খেজুরের আটি বহন করে আনতেন।

**ন. সম্পত্তির মালিকানার অধিকার ঃ**

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তির জন্য সম্পত্তির অপকৃত মালিকানা স্বীকৃত। তবে তা এতটাই নিয়ন্ত্রিত যে, ব্যক্তি এখানে সম্পদ উপার্জনের লাগামহীন স্বাধীনতা লাভ করে না। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানা এ শর্ত সাপেক্ষে স্বীকৃত যে, সকল সম্পদে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের অংশ ও অধিকার থাকবে এবং পুঁজিপতি ও শ্রমিকের সম্পর্ক শোষণ বা সংঘর্ষ নির্ভর নয় বরং পারস্পরিক কল্যাণমূলক ও ভ্রাতৃসুলভ। এখানে একজন পুঁজিপতি যতক্ষণ না নিজের কল্যাণের অনুরূপ কল্যাণ শ্রমিকের জন্য কামনা করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুমিন হিসেবে গণ্য হয় না। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন- 'যে সত্তার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মাত্রায় মুমিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্য ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করে'।[১৮৯]

ইসলামে সকল সম্পদের প্রকৃত মালিকানা আল্লাহর। মানুষ দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে এর অর্জন, ভোগ, ও বণ্টনের অধিকার লাভ করে। এখানে যেমন কাউকে আল্লাহর দান (সম্পদ অর্জনের অধিকার) থেকে বঞ্চিত করা যায় না তেমনি কারও অধিকার থেকে সম্পদকে দখলচ্যুতও করা যায় না। প্রতারণা, চৌর্যবৃত্তি, ডাকাতি ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পদ হস্তগতকরণ, বাজারে একচেটিয়া অধিকার লাভ, সংকট সৃষ্টি কিংবা ব্যতিক্রমভাবে মূল্যবৃদ্ধির জন্য পণ্যদ্রব্য মজুদকরণ, সুদের ভিত্তিতে ঋণ দান বা লোকসানের চুক্তি ব্যতীত লভ্যাংশ গ্রহণ ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

অসংখ্য আয়াতে এভাবে একটি সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনা আওতায় ইসলাম প্রতিটি ব্যক্তিকে সম্পত্তি অর্জন ও ভোগের অধিকার প্রদান করেছে। ইসলাম প্রদত্ত এ অপ্রকৃত ব্যক্তির মালিকানায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার ইসলামী রাষ্ট্র বা সরকারের নেই। ইসলাম প্রতিটি নাগরিকের উত্তরাধিকার আইনের মাধ্যমে সম্পদ লাভ কিংবা স্থানান্তরিত করার অধিকার প্রদান করেছে। আল-কোরআনে বলা হয়েছে- 'আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেছেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান, কিন্তু কেবল কন্যা দুই এর অধিক থাকলে তাহাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তাহার জন্য অর্ধাংশ। তাহার সন্তান থাকলে তাহার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ, সে নি:সন্তান হইলে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হইলে তাহার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ তাহার ভাই-বোন থাকলে মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ, এসবই সে যাহা ওসিয়াত করে তাহা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তাহা তোমরা অবগত নও। নিশ্চয়ই ইহা আল্লাহর বিধান, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'[১৯০]

নারীর ব্যক্তিগত সম্পদ ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সংরক্ষণের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। নারীর ব্যক্তিগত সম্পদ যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োগকৃত অর্থ অথবা নিজ পরিশ্রমের অর্থ ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত যাবতীয় অর্থে তাঁরই একান্ত মালিকানা। স্ত্রী যদি তাঁর ধন-সম্পদ আইনগত ভাবে ব্যয় করতে চায় কেউ বাধা দিতে পারবে না। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

'পুরুষগণ যা উপার্জন করে তা তাঁদের প্রাপ্য আর নারীরাও যা উপার্জন করে তা তাদেরই প্রাপ্য।'[১৯১]

তাফসিরে ইবনে কাছিরে এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেন এভাবে:

'পুরুষগণ যা উপার্জন করে তা তাঁদের প্রাপ্য আর নারীরাও যা উপার্জন করে তা তাঁদেরই প্রাপ্য। অর্থাৎ প্রত্যেকেই তাঁর কাজ অনুপাতে প্রতিদান পাবে। যদি ভাল করে থাকেন ভাল পাবেন আর যদি খারাপ করে থাকেন তবে খারাপ পাবেন। আর তা হচ্ছেন ইবনে জারিকের মতামত। আর বলা হয় এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তারাধিকার অর্থাৎ তাদের বংশের নির্ধারিত মিরাছ পাবে।'[১৯২]

আল্লামা কুরতুবি (রহ.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

'(পুরুষগণ যা অর্জন করবে তাই পাবে) ভাল কাজের জন্য সাওয়াব আর মন্দ কাজের জন্য শাস্তি (এবং নারীদের জন্যও) অনরুপভাবে নারীগণও ভাল কাজের জন্য সাওয়াব এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি পাবে। হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, পুরুষগণ যেমনিভাবে একটি ভাল কাজের জন্য দশটি সাওয়াব পাবে নারীগণও একটি ভাল কাজের জন্য দশটি সাওয়াব পাবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র.) বলেন, এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ।'[১৯৩]

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারীর এ অধিকার পদদলিত করা হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামের অনুশাসন ও ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা না থাকায় নারী তাঁর এ ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থায় মনে করা হয়, নারী নিজেই নিজের ব্যয়; তাই নারীর নিজস্ব বলতে কিছু থাকতে পারে বলে তাঁরা বিশ্বাস করে না। তাঁদের মতে নারীর জন্ম ও জীবন পুরুষের ভোগ-বিলাস, সেবা-যত্ন, তৃপ্তি ও আনন্দ দানের জন্য। নারীর নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি, কর্মশক্তি, অর্থ-সম্পদ, পুঁজি থাকতে পারবে না। আর যদি কিছু থাকেও তাঁর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব যেন পুরুষেরই। নারীকে প্রদত্ত দেনমোহর ও দেনমোহর হিসেবে প্রদত্ত স্বর্ণালংকার ও বিভিন্ন সামগ্রী আমাদের দেশে নারীরা তাঁদের নিজস্ব ইচ্ছেমত ব্যয় করতে পারে না। এমনকি নারী তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত অর্থ ও সম্পত্তি স্বামী কিংবা স্বামী পক্ষ নির্বিবাদে ভোগ করে যায়। স্ত্রীর তাতে কিছুই করার থাকে না। এসব নারী জাতির প্রতি অবমাননা, অসম্মান, অমর্যাদা নারীকে উপেক্ষা ও বঞ্চিত করারই নামান্তর। আর নারীকে বঞ্চিত ও অবহেলিত রেখে সমাজের উন্নয়ন কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এগুলো ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অবৈধ, অনধিকার চর্চা এবং আত্মসাৎ। ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কঠোর হস্তে আইন প্রয়োগ করে এসব অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী জাতির উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধন করবে, নারীর সর্বপ্রথম অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করবে।

ইসলামের আগে এমনকি ইসলামের পরে অর্থাৎ বর্তমান শতাব্দীর মাত্র অল্প কিছু দিন আগ পর্যন্ত নারীরা যে অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ইসলাম নারীদেরকে স্বাধীন মালিকানার সে অধিকার প্রদান করে।[১৯৪]

ইসলামই নারীকে সর্ব প্রথম অর্থনৈতিক মর্যাদ ও অধিকার দান করেছে। কোরআনে আল্লাহ বলেছেন- 'পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ।'[১৯৫]

নারীর ব্যক্তিগত সম্পদ যথা ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োগকৃত অর্থ অথবা নিজ পরিশ্রমের অর্থ বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত যাবতীয় অর্থ তারই একান্ত মালিকানা। স্ত্রী যদি তার ধন-সম্পদ আইনগত ভাবে ব্যয়-ব্যবহার করতে চায় কেউ তাকে বাঁধা দিতে পারবে না।

আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন- 'যে লোককে স্বচ্ছলতা দান করা হয়েছে তাঁর কর্তব্য সে হিসেবেই তার স্ত্রী পরিজনের জন্য ব্যয় করা। আর যার আয় স্বল্প তার সেভাবেই আল্লাহর দান থেকে খরচ করা কর্তব্য।'[১৯৬]

ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে গতিশীল করার অধিকার নারীর রয়েছে। মহানবী (স.)-কে এক মহিলা সাহাবী বললেন- 'আমি একজন মহিলা নানা প্রকার জিনিজ ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি। অর্থাৎ আমি একজন ব্যবসায়ী। পরে তিনি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে জেনে নিলেন। নারী তার সকল সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধক বা ইজারা দেয়ার পূর্ণ অধিকার ভোগ করবে। কোরআনে কোথাও নেই যে, সে নারী হওয়ার কারণে পুরুষ অপেক্ষা নগন্য হিসেবে বিবেচিত হবে।[১৯৭]

ইসলামী শরীয়াহ মতে নারী বিয়ের আগে বা পরে যে কোন পরিমাণ সম্পদ অর্জন করতে পারেন। তবে তা হতে হবে হালাল পন্থায়। তিনি তার সম্পদ কারো পরামর্শ ছাড়া ইচ্ছামত বিক্রি করতে, ভাড়া দিতে, ঋণ দিতে, দান করতে পারেন। তবে সম্পদ, ধ্বংস করার অধিকার ইসলাম কাউকে দেয় না। উত্তরাধিকার সূত্রে নারী একটি নির্ধারিত অংশের সম্পদের মালিক হয়, কোন প্রকার আর্থিক দায়-দায়িত্ব ছাড়াই।[১৯৮]

নারী যদি কাজ করতে বা আত্মনির্ভরশীল হতে কিংবা পারিবারিক দায়-দায়িত্ব পালনে অংশ নিতে চায়, তবে সে তা নির্বাধে করতে পারে। তবে সে জন্যে শর্ত এই যে তার সম্মান ও শুচিন্তা যেন নিরাপদ থাকে।[১৯৯]

যেহেতু ইসলাম নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছে, সেহেতু স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেনদেনের জন্য তাকে বাইরে যাবারও অনুমদি দিয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও অনেক নারী ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কাজে নিয়োজিত ছিল। নবী (স.)-এর স্ত্রী খাদিজা একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী নারী ছিলেন। এমনকি সেই সময়ে নারীরা গৃহস্থালী জিনিসপত্র কেনার জন্য বাজারে যেতেন। হযরত ওমর (রা.), হযরত শিফা (রা.) নামক এক নারী সাহাবী বাজার ব্যবস্থাপনায় কতিপয় দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন।

ইসলাম তার বিধিবিধানে গোটা মানব জাতির কল্যাণকে বিবেচনায় রেখেছে। সৃষ্টিকর্তা ক্ষমতাশালী দক্ষ হতে যে প্রাকৃতিক নিয়ম ও বিধানের অধীনে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তার কল্যাণে পৌঁছতে হলে সেগুলো উপেক্ষা করা যাবে না বলে ইসলাম বিশ্বাস করে। সেই আইন বিধানগুলো নারী পুরুষ সবাইকে মেনে চলার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

*Dhaka University Institutional Repository*

## তথ্য নির্দেশিকা

১. আল-কোরআন, ৪২ : ১৭

২. আল-কোরআন: ২:১২

৩. আল-কোরআন, ২:১১.

৪. Syed Amir Ali, The spirit of Islam, Delhi, 1947 : P-168. বুখারী শরীফ (২য় খণ্ড), ৩য় বার।

৫. আল-কোরআন, ৩১৮।

৬. পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৭৬।

৭. প্রাগুক্ত।

৮. বাংলাদেশের সমাজে ধর্মের ব্যবহার, অপব্যবহার, অসদ্ব্যবহার (১৯৯১-২০০১) ঃ ফাতওয়ার একটি রাজনৈতিক সমাজ তাত্ত্বিক; মুহাম্মদ আবু ইউসুফ, পৃ-১,২।

৯. আল-কোরআন, সূরা নিসা, আয়াত-৩৪।

১০. পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৭৬।

১১. পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৭৬।

১২. পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৭৭।

১৩. পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৭৭।

১৪. শরহে বেকায়া, পূর্বোক্ত, পৃ-১৪৮

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ-১৪৮।

১৬. আল-কুরআন, সূরা-বাকারা, আয়াত-২২৯।

১৭। সূরা-বাকারা, আয়াত-২৩০।

১৮। সূরা-বাকারা ।

১৯। সূরা-বাকারা, আয়াত-২২৮।

২০. সূরা-বাকারা, আয়াত-২২৯।

২১. সূরা-বাকারা, আয়াত-২৩০।

২২. মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, অনুবাদক- আনু মোহাম্মদ: ইসলাম মানবাধিকার।

২৩. অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, সাংবিধানিক আইন,(জলিল ল'বুক সেন্টার, ঢাকা, ৪র্থ সংস্করণ (২০০২), পৃ-৬৬।

২৪. শহীদ আয়াতুল্লাহ ড. মুর্তাজা মোতাহহারি, নিযামে হুকুকেযনদর ইসলাম, আলহুদা আন্তর্জাতিক সংস্থা, ঢাকা ঃ ২০০৭, পৃ-২৩৮।

২৫. গাজী শামসুর রহমান, প্রগুক্ত, পৃ-ভূমিকা।

২৬. অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, প্রগুক্ত, পৃ-৬৭ ।

২৭. গাজী শামসুর রহমান, 'মানবাধিকার ভাষ্য', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ-৯১০।

২৮. The New Encyclopedia Britannica Founded 1968, 15th edition, printed in USA, vols, p-200।

২৯. Encylopedia of social work, NASW press, washington, D.C, vol.2, 1995, p.1406.

৩০. শহীদ আয়াতুল্লাহ ড. মুর্তাজা মোতাহহারি, নিযামে হুকুকেযনদর ইসলাম, আলহুদা আন্তর্জাতিক সংস্থা, ঢাকা ঃ ২০০৭, পৃ-১৩৮।

৩১. আল-কোরআন, সূরা: আল-বাকারা, আয়াত-১৭৯ (অংশ বিশেষ) ।

৩২. সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুদ দিয়াত, বাবু আফুউন নিসা মিনাদ্দাম।

৩৩. সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুদ দিয়াত, বাবু আফুউন নিসা মিনাদ্দাম।

৩৪. সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, অনুবাদক: মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ঢাকা-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৬৭।

৩৫. আল-কোরআন, সূরা-বাকারা, আয়াত-২২৮ (অংশবিশেষ) ।

৩৬. আল-কোরআন, সূরা আল আহযাব, আয়াত-৭২-৭৩।

৩৭. প্রাগুক্ত: ৩৫।

৩৮. মুহাম্মদ গোলাম মুস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৫-১১৬।

৩৯. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ-২২।

৪০. আবুল কাশেম, 'মানবাধিকার সংরক্ষন বাস্তবায়নে মানবাধিকার কর্মীর ভূমিকা', বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯০।

৪১. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মোস্তফা চরিত্র, ৪র্থ সংস্কারণ, ঢাকা, পৃ-৫৭০-৫৭২।

৪২. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ-২২।

৪৩. ড. এ.বি.এম. মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ-৩।

৪৪. F.K.M. Munim, Rights of the citizen under constitution and law', Bangladesh Institute of law and International Affairs Dhaka, 1975. p-2।

৪৫. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজকল্যাণ, রোহেল পাবলিকেশনস, ঢাকা, ২০০৫, পৃ-৬৮।

৪৬. আব্দুল মালেক, নারী ও সমাজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ-৩৪।

৪৭. আল-কোরআন, ৬২-২২৮।

৪৮. Abdel Rahim Umran, Family Planing in the legacy of Islam, New Yourk and London, 1992. P-62।

৪৯. হজ্জোতুল ইসলাম মোহাম্মদ তাকী মেসবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ-৯।

৫০. আল-কোরআন, সূরা রুম-৩০ ঃ ৩০।

৫১. Hummudah Abdusati, op-cit, p-302-303.

৫২. Hummudah Abdulati, op-cit, p-303.

৫৩. নারী ও সমাজ, আব্দুল খালেক, পৃ-১৯।

৫৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা ঃ ৪৪ বর্ষ; ৩য় সংখ্যা, পৃ ঃ ২০০।

৫৫. পরিবার ও পারিবারিক জীবন ঃ মোঃ আব্দুর রহীম, খায়রুন প্রকাশনী, ১৩ কারকুন বাড়ি লেন, ঢাকা, প্রকাশ কাল- জুলাই, ১৯৯৬, পৃ-৬৬।

৫৬. সূরা আর-রূম; আয়াত: ২১।

- ইয়াসমিন নূর -ইসলামে নারীর মর্যাদা ও কর্তব্য; পৃ-১৪৫,জানুযারী-২০০৫,আল হিকমাহ পাবলিকেশনস,৬৬,প্যারিদ্যাস রোড,বাংলাবাজার।

৫৭ ইয়াসমিন নূর- ইসলামে নারীর মর্যাদা ও কর্তব্য; পৃ: ২-১৪৬, জানুযারী-২০০৫,আল হিকমাহ পাবলিকেশনস,৬৬,প্যারিদ্যাস রোড,বাংলাবাজার।

৫৮. ইয়াসমিন নূর- ইসলাম নারীর মর্যাদা ও কর্তব্য; পৃ: ১৪৭, জানুযারী-২০০৫,আল হিকমাহ পাবলিকেশনস,৬৬,প্যারিদ্যাস রোড,বাংলাবাজার।

৫৯. ইয়াসমিন নূর- ইলামে নারীর মর্যাদা ও কর্তব্য; পৃ-১৪৮, জানুযারী-২০০৫,আল হিকমাহ পাবলিকেশনস,৬৬,প্যারিদ্যাস রোড,বাংলাবাজার।

৬০. ইয়াসমিন নূর- ইসলামে নারীর মর্যাদা ও কর্তব্য; পৃ-১৫০, জানুযারী-২০০৫,আল হিকমাহ পাবলিকেশনস,৬৬,প্যারিদ্যাস রোড,বাংলাবাজার।

৬১. ইয়াসমিন নূর- ইসলামে নারীর মর্যাদা ও কর্তব্য; পৃ: ১৫১, জানুযারী-২০০৫,আল হিকমাহ পাবলিকেশনস,৬৬,প্যারিদ্যাস রোড,বাংলাবাজার।

৬২. মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন জিহাদি, ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-তা.বি. পৃ-৫৫।

৬৩. আল-কোরআন, ৮৬ ঃ ৫-৭।

৬৪. আল-কোরআন, ৩২ ঃ ৭-৮।

৬৫. আল-কোরআন, ৩৬ ঃ ৭৭।

৬৬. আল-কোরআন, ২২ ঃ ৫।

৬৭. আল-কোরআন, ১৬ ঃ ৭৮।

৬৮. আল-কোরআন, ৮২ ঃ ৬-৭।

৬৯. আল-কোরআন, ৪ ঃ ১।

৭০. আল-কোরআন, ৫১ ঃ ১৩ ।

৭১. আল-কোরআন, ৩১ ঃ ২০।

৭২. আল-কোরআন, ২ ঃ ২৯।

৭৩. আল-কোরআন, ৪২ ঃ ৪৯-৫০।

৭৪. আল-কোরআন, ৩ ঃ ১৯৫।

৭৫. আল-কোরআন, ১৭ ঃ ৭০।

৭৬. আল-কোরআন, ৯৫ ঃ ৪।

৭৭. আল-কোরআন ৮৩ ঃ ৭-৮।

৭৮. মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন জিহাদী, ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ-৬৬।

৭৯. মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন জিহাদী, ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ-৬৬।

৮০. আল-কোরআন, ০৩ ঃ ১১০।

৮১. আল-কোরআন, আল-হাদীস, এম.আরশাদুল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ-২৬।

৮২. আল-হাদীস, আব্দুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, পৃ-৬।

৮৩. আল-হাদীস, ওলী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, বাবই আল আমর বিন মা'রুফ, পৃ–৪৩৬।

৮৪. আল-কোরআন- সূরা আল মুজদালাহ, আয়াত- ১।

৮৫. সাইয়্যেদ কুতুব, বিশ্বশান্তি ও ইসলাম, গোলাম সোবহান সিদ্দিক অনুদিত, শতদল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ.২১৮-২১৯।

৮৬. আল-কোরআন, ১০ ঃ ৯৯।

৮৭. আল-কোরআন, ১৮ ঃ ২৯।

৮৮. আল-কোরআন, ১০৯ ঃ ৩৬।

৮৯. আল-কোরআন, ২ ঃ ২৫৬।

৯০. আল-কোরআন, ০৬ ঃ ১০৮।

৯১. মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন জিহাদী, ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ-৮৬।

**৯২.** আল-কোরআন, **৩ ঃ ১৯৫**।

৯৩. সূরা আল বাকারা, আয়াত-১৮৬।

৯৪. আবুল ফেদা ইসমাইল বিন উমর বিন কাছির, তাফসীরুল কোরআন ও আযীম, দারুততাইয়্যিবা লিননাশরি তাওযি, মক্কা, সৌদিআরবঃ ১৪২০-খ.২, পৃ-১৯০।

৯৫. আল-কোরআন, সূরা বারাকা, আয়াত নং-২৫৬।

৯৬. আল-কোরআন, সূরা গাশিরাহ, আয়াত নং-২১-২২।

৯৭. আল-কোরআন, সূরা আননাম, আয়াত নং-১০৮।

৯৮. আল-কোরআন, সূরা হুজরাত, আয়াত নং-১৩।

৯৯. মোঃ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, সহিহুল বুখারী, মাসকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি.খ ১৬, পৃ-১০০; আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, সহিহ মুসলিম, মাসকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব, তা.বি.খ. ৭, পৃ-২২৯।

১০০. আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ বিন মুসা আল আইনি, উমদাতুল কারি শরহে সহিহুল বুখারী, (আইনী) মুলতাফা উরুদে মান মুলতাকা আহলে হাদীস, মাসকাউল ইসলাম, মদীনা, সৌদিআরবঃ ২০০৬, খ. ২৯, পৃ-৩১৪।

১০১. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আসয়াস বিন ইসহাক, সুনানে আবু দাউদ মাসকাউল ইসলাম, মদীনা, সৌদিআরবঃ খ, ৫, পৃ. ৪৯৪।

১০২. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আসয়াস বিন ইসহাক, সুনানে আবু দাউদ মাসকাউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৯৬।

১০৩. মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দিন জিহাদি, প্রাগুক্ত, পৃ-৯২।

১০৪. আব্দুল আজিজ বিন নাসের বিন সাউদ আল আব্দুল্লাহ, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, মাতবায়য়ে নরজিস আততুজ্জারি, রিয়াদ, সৌদিআরবঃ ১৪২৫, পৃ-২০।

১০৫. আব্দুল আজিজ বিন নাসের বিন সাউদ আল আব্দুল্লাহ, আযযাওয়ু অয়াযযাওযাতু মালাহুমা অমাআলাইহিমা, মাতবায়য়ে নরজিস আততুজ্জারি, রিয়াদ, সৌদিআরবঃ ১৪২৫, পৃ-২০।

১০৬. মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দিন জিহাদি, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৫।

১০৭. ড. মারুফ দাওয়ালিবী, গ্রীসের নারী, রোমান সমাজে নারী, ড. মাহমুদ সালাম জান্নাটি দ্রষ্টব্য, ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, (অনুবাদ- আকরাম ফারুক) ইসলাম ও পাশ্চত্য সমাজে নারী, বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার, ঢাকাঃ ৩য় প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০০৯, পৃ-৯-১৪।

১০৮. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আসয়াস বিন ইসহাক, সুনানে আবু দাউদ মাসকাউল ইসলাম, মদীনা, সৌদিআরবঃ তা.বি. পৃ-৪৯৯।

১০৯. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আসয়াস বিন ইসহাক, সুনানে আবু দাউদ মাসকাউল ইসলাম, মদীনা, সৌদিআরবঃ তা.বি. পৃ-৪৯৯।

১১০. ড. মারুফ দাওয়ালিবী, গ্রীসের নারী, রোমান সমাজে নারী, ড. মাহমুদ সালাম জান্নাটি দ্রষ্টব্য, ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, (অনুবাদ- আকরাম ফারুক) ইসলাম ও পাশ্চত্য সমাজে নারী, বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার, ঢাকাঃ ৩য় প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০০৯, পৃ-১৪।

১১১. সূরা নিসাঃ ২০

১১২. সূরা বাকারাঃ ২২৯।

১১৩. সূরা নিসাঃ ১৯।

১১৪. মুসলিম শরীফ।

১১৫. তিরমিযী শরীফ।

১১৬. সূরা নিসাঃ ৩৪-৩৫।

১১৭. তিরমীজী শরীফ।

১১৮. সূরা নিসাঃ ১২৮।

১১৯. মিশকাত, পৃঃ ২৭৪, তিরমিযি ও ইবনে মাযাহ।

১২০. তাঃ মাঃকুঃ ঘঃ- ২ পৃঃ ২৬৭-২৭১।

১২১. আল-কোরআন, ৪ ঃ ৩।

১২২. আল-কোরআন, ৪ ঃ ১২৯।

১২৩. জি.এ পারভেজ ঃ Islam : A Challege to Religion, লাহোর ১৯৬৮, পৃ-৩৪৪।

১২৪. ইউ.এ.বি. রাজিয়া আক্তার বানু, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৩।

১২৫. নারীর প্রকৃত মর্যাদা একটি প্রমান্য আলোচনা, হাফেয মাসউদ আহমাদ মাসুম, মাসিক মদীনা, জুন ২০০২, সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা, পৃ-৪৯-৫০।

১২৬. আল-কোরআন ।

১২৭. আল-কোরআন, সূরা বাকারা-২২৮।

১২৮. আল-কোরআন, সূরা বাকারা ঃ ১৮৭।

১২৯. আল-কোরআন, ৫ ঃ ৬৬ ।

১৩০. আল-কোরআন, ২ ঃ ২৫৩।

১৩১. আল-কোরআন ।

১৩২. আল-কোরআন, ১ ঃ ২২৯ ।

১৩৩. আল-কোরআন, ২ ঃ ২৪১।

১৩৪. আল-কোরআন, ৪ : ২২।

১৩৫. আল-কোরআন, ৪ : ১৯।

১৩৬. আল-কোরআন, ৬৫ : ১।

১৩৭. আল-কোরআন, ৪ : ৯১৭।

১৩৮. আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকি, সুনানে কুসরা, মাসকাউল, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি.খ.১৮, পৃ-২৩২, তাবারী, তাহযীবুল আছার, মাসকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব, তা.বি.খ. ২, পৃ-১৬৭।

১৩৯. আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে আশায়াস, নাসায়ী, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ-২৮৫।

১৪০. আবুল হোসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ বিন কোসায আল কুসাইরি, সহিত মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ-১২, পৃ-১৮৮।

১৪১. আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশয়াস, সুনানে আবু দাউদ, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদি আরব: ১৪১৫, খন্ড-৭, পৃ-১৪০।

১৪২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, সুনানে ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, খ-৬, পৃ-১২৮, আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, সুনানে আবি দাউদ, প্রাগুক্ত, খ-৬, পৃ-৫০; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলবায়হাকী, প্রাগুক্ত, খ-৭, পৃ-৩০৪।

১৪৩. আল-কোরআন ৪ ঃ ৩৪।

১৪৪. আল-কোরআন ৪ ঃ ১৯।

১৪৫. মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল খতীব আততিবরীযী, শিকাতুল মাসাবীহ: কিতাবুল ইলম, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, পৃ-৭৬ ।

১৪৬. আল-কোরআন, সূরা-আল ফাতর, আয়াত-২৮ (অংশ বিশেষ)।

১৪৭. কুতুব মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ-২২ ।

১৪৮. ইউ.এ.বি. রাজিয়া আক্তার বাণু, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৮।

১৪৯. ইসলাম ও নারীর সামাজিক অধিকার, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৯ জুলাই ২০০৫, ঢাকা।

১৫০. আল-কোরআন, ৩ ঃ ৭ ।

১৫১. আল-কোরআন, ৫৮ ঃ ১১ ।

১৫২. আল-কোরআন, ২০ ঃ ১১৪ ।

১৫৩. হাদীস উদ্বৃত: সাইয়্যিদ আমীর আলী, (অনুবাদ অধ্যাপক দরবেশ আলী খান) 'দি স্পিরিট অব ইসরাম', ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ-৩৭৯-৩৮০।

১৫৪. আল-কোরআন, ২৮ ঃ ২।

১৫৫. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ ইবনু মাজহ, হাশিয়াতুস সিন্দি, সুনানে ইবনে মাজাহ, মাসকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি.খ. ১, পৃ-২০৮।

১৫৬. মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, সহীহুল বুখারী, মাসকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি.খ. ১৬, পৃ-২৩।

১৫৭. আল-কোরআন, সূরা হুজরাত, আয়াত নং-১৩।

১৫৮. আল-কোরআন, সূরা আল মায়েদা, আয়াত নং-৮।

১৫৯. আল-কোরআন, ৫ ঃ ৩৫।

১৬০. আল-কোরআন, ১৭-৩১ ।

১৬১. আল-কোরআন, ৮১ ঃ ৮-৯।

১৬২. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদে আহমাদ, দারুল মা'আরিফ, বৈরুত, ১৪০৩ হিজরী, হাদীস নং-১৯৫৭, পৃ:৮৮।

১৬৩. মুহাম্মদ সালাহদ্দীন, ইসলামে মানবাধিকা, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০, পৃ-২২৫।

১৬৪. আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের প্রতিবেদন, অক্টোবর, ১৯৭২ খ্রঃ নিউইয়র্ক, ১৯৭৪ খৃঃ, পৃ-১৪৭।

১৬৫. রাসূল (স.) যুগে নারী স্বাধীনতা, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭১।

১৬৬. সহীহ মুসলিম, সদাচারণ ও শিষ্টাচার, অধ্যায়, ৮ খণ্ড, পৃ-৩৮।

১৬৭. আল-কোরআন, সূরা আল বারাকাহ, আয়াত-২৮২ম (অংশ)।

১৬৮. আল-কোরআন, সূরা-আন নূর, আয়াত-৬-৮।

১৬৯. ইসলাম ও নারীর সামাজিক অধিকার, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৯ জুলাই, ২০০৫, ঢাকা।

১৭০. আল-কোরআন, তাওবা-৭১ ।

১৭১. Kaudab Siddique, 'The Struggle of Muslim Women,অনুবাদক, ২৪ ইসকাটন গার্ডেন, ঢাকা-১৯৯২, পৃ-৮১ ।

১৭২. রাজিয়া আক্তার বাণু, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৫ ।

১৭৩. আল-কোরআন, সূরা-আন নূর, আয়াত-৪।

১৭৪. আল-কোরআন, ০৪ ঃ ১৩৫।

১৭৫. আল-কোরআন, ০৪ ঃ ৫৮।

১৭৬. আল-কোরআন, ৪৯ ঃ ১২।

১৭৭. আল-কোরআন ।

১৭৮. আল-কোরআন, ৫৯ ঃ ৯।

১৭৯. আল-কোরআন, ৫৯ ঃ ৮।

১৮০. ইসলাম ও নারীর সামাজিক অধিকার, দৈনিক নয়া-দিগন্ত, ১৯ জুলাই ২০০৫, ঢাকা।

১৮১. আল-কোরআন, ৪ ঃ ৩২ ।

১৮২. সহী বুখারী, কিতাবুল নিকাহ, দ্রষ্টব্য রাজিয়া আক্তার বানু, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৫।

১৮৩. রাজিয়া আক্তার বানু, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৫।

১৮৪. মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন জিহাদি, ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা, প্রাগুক্ত, পৃ-৮৬।

১৮৫. শহিদ আয়তুল্লাহ্ ড. মুর্তাজা মোতাহ্হারি, ইসলামে নারী অধিকার, প্রাগুক্ত, পৃ-১৪৯।

১৮৬. আল-কোরআন ৪ ঃ ৩২।

১৮৭. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, সহিহুল বুখারী, মাসকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব, তা.বি.খ. ১৬, পৃ-২৬৬; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়কী, সুনানে কুবরা, মাসকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরব; তা.বি.খ. ৭, পৃ-৮৮।

১৮৮. আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ বিন মুসা আল আইনি, উমদাতুল কারী শরহে সহীহুল বুখারী, (আইনী) মুলতাকা উরুদে মান মুলতাকা আহলে হাদীস, মাসকাউল ইসলাম, মদীনা, সৌদিআরব, ২০০৬, খ. ২৫, পৃ-২৮।

১৮৯. আল হাদীস, বুখারী ও মুসলিম, মোঃ আতাউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ-৫২।

১৯০. আল-কোরআন, ৩৪ ঃ ১১।

১৯১. আল-কোরআন ৪ ঃ ৩৩।

১৯২. আবুল ফেদা ইসমাইল বিন কাছির, তাফসিরুল কোরআনুল আযীম দারুততাইয়্যিবা লিননাশরি তাওযী, মক্কা, সৌদিআরব: ১৪২০ খ. ২, পৃ-২৮৭।

১৯৩. আবু আব্দুল্লা মুহাম্মদ বিন আবু বকর আল কুরতুবি, আল জামেউলি আহকামিল কুরআন বা তাফসিরে কুরতুবি, দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যা, মিশর: ১৯৬৪, খ. ৫, পৃ-১৬৪।

১৯৪. মুস্তাফা আল সিবাই।

১৯৫. আল-কোরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত-৩২।

১৯৬. আল-কোরআন, ৫৬ ঃ ৭।

১৯৭. মুহাম্মদ তাহের হোসেন, ইসলামে নারী, হৃদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০০, ঢাকা, পৃ- ১০৩-১০৪ ।

১৯৮. ইসলাম ও নারীর সামাজিক অধিকার, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৯শে জুলাই ২০০৫, ঢাকা ।

১৯৯. Hummudah Abdalati, op-cit, p-319 ।

*Dhaka University Institutional Repository*

# চতুর্থত অধ্যায়

# বাংলাদেশে মুসলিম নারীদের আইনগত মর্যাদা

**৪.১. নারী সম্পর্কে ইসলামের নীতিমালা ঃ**

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলামে নারী সম্পর্কে যে সংস্কারমূলক নীতিমালা ঘোষণা করেছেন, তার সার সংক্ষেপ নিম্নে বর্ণনা করছি।

**প্রথমত :** মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পরিপূর্ণ সাম্যের কথা এবং সবরকমের ভেদাভেদ ও বৈষম্য প্রত্যাখ্যানের কথা ঘোষণা করা হয়। আল-কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

হে মানব তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃষ্টি করেন যিনি তাহাদের দুই জন হইতে বহু নর-নারী ছড়াইয়া দেন; এবং আল্লাহকে ভয় কর যাহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা কর এবং সতর্ক থাক জাতি বন্ধন সম্পর্কে নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্নদৃষ্টি রাখেন।[১]

আর রাসূল (স.) ঘোষণা করলেন, 'নারীগণ পুরুষদেরই সহোদরা।'

**দ্বিতীয়ত :** পূর্ববর্তী ধর্মমতের অনুসারীরা নারীকে যে একটা অভিশাপ স্বরূপ এবং সকল পাপের উৎস ও সমাজের গলগ্রহ বলে চিহ্নিত করত, সে মানসিকতাকে ইসলাম প্রতিহত করল। অন্যান্য ধর্মমতের ন্যায় ইসলাম আদম (আ.) এর জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হওয়ার শাস্তির জন্য এককভাবে হাওয়াকে দায়ী করেনি বরং উভয়কে সমানভাবে দায়ী করেছে। আদম (আ.) এর ঘটনা বর্ণনাকালে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'কিন্তু শয়তান উহা হইতে তাহাদের পদস্থলন ঘটাইল এবং তাহারা যেখানে ছিল সেখানে হইতে তাহাদেরকে বহিস্কার করিল। আমি বলিলাম, 'তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নামিয়া যাও, পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রহিল।'[২]

অত:পর তোমাদের লজ্জাস্থান, যাহা তাহাদের নিকট গোপন করা হইয়াছিল তাহা তাহাদের নিকট প্রকাশ করিবার জন্য শয়তান তাহাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলিল, 'আগে তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হইয়া যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এই জন্যই তোমাদের প্রতিপালনক এই বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করিয়াছেন।'[৩]

এমনকি আল-কোরআনের কোন কোন আয়াত এ পাপটির জন্য এককভাবে শুধু আদমকে দায়ী করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,

'অত:পর তাহারা উভয়ে উহা হইতে ভক্ষণ করিল; তখন তাহাদের লজ্জাস্থান তাহার নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করিতে লাগিল। আদম তাহার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করিল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হইল।'[৪]

আল্লাহতায়ালা তাওবার ব্যাপারেও তাদের উভয়কে সমভাবে অংশীদার করেছে, যেমন বলা হয়েছে, 'তাহারা বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করিয়াছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হইব।'[৫]

**তৃতীয়ত :** পুরুষের মত নারী যদি সৎ কর্মশীল হয় তবে সে জান্নাতে যেতে পারবে এবং তার ধর্মপালন ও ইবাদত করার পূর্ণ যোগ্যতা ও অধিকার রয়েছে বলে ঘোষণা করা হল। পক্ষান্তরে সে অসৎকর্মশীলা হলে জাহান্নামে যাবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'মুমিন হইয়া পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করিবে তাহাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করিব এবং তাহাদেরকে তাহাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করিব।[৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'অত:পর তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের ডাকে সাড়া দিয়া বলেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে কর্মনিষ্ঠ কোন নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না, তোমরা একে অপরের অংশ।[৭]

আল-কোরআন নিম্নের আয়াতে নারী ও পুরুষ উভয়ের সমমর্যাদার উপর এভাবে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, 'অবশ্যই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমপর্ণকারী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, যৌন অংগ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌন অংগ হিফাযতকারী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সাওম

পালনকারী পুরুষ ও সাওম পালনকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী, ইহাদের জন্য আল্লাহ রাখিয়াছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান'।[৮]

চতুর্থত ঃ ইসলাম নারীকে অপয়া ও অশুভ মনে করা ও মেয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হওয়ার মানসিকতাকে প্রতিহত করেছে। এ মানসিকতা শুধু যে তৎকালীন আরব সমাজেই ছিল তা নয়, বরং আজও বহু জাতির মধ্যে বিরাজমান, এমনকি কিছু কিছু পাশ্চাত্যবাসীর মধ্যেও এ মানসিকতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা যায়। এ জঘন্য অভ্যাসের নিন্দা করে আল্লাহ বলেছেন, 'উহাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তাহার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হইতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে উহাকে রাখিয়া দিবে, না মাটিতে পুঁতিয়া দিবে। সাবধান ! উহারা যাহা সিদ্ধান্ত নেয় তাহা কত নিকৃষ্ট।'[৯]

পঞ্চমত ঃ ইসলাম মেয়ে সন্তানকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলার ঘৃণ্য প্রথাকে নিষিদ্ধ করে এবং এর বিরুদ্ধে চরম ধিক্কার ও নিন্দাবাদ উচ্চারণ করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, কী অপরাধে উহাকে হত্যা করা হয়েছিল?"[১০]

ষষ্ঠত ঃ ইসলাম নারীকে সম্মান করতে ও মর্যাদা দিতে নির্দেশ দিয়েছে মেয়ে হিসেবেও, স্ত্রী হিসেবেও এবং মা হিসেবেও। মেয়ে হিসেবে তাকে মর্যাদা দিতে কিভাবে শিক্ষা দিয়েছে। তার নমুনা নিম্নের হাদীস থেকে পাই-

'যে ব্যক্তির কোন কন্যা সন্তান থাকে এবং তাকে সে উত্তম বিদ্যা ও উত্তম উচরণ শেখায়, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।' নারীকে স্ত্রী হিসেবেও মর্যাদা দেয়ার ব্যাপারে বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। যেমন- আর তার নির্দেশনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাহাতে তোমরা উহাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।'[১১]

রাসূল (সা.) বলেছেন, 'পৃথিবীতে যত সম্পদ আছে, তার মধ্যে উৎকৃষ্ট সম্পদ হল সৎকর্মশীলা স্ত্রী। যার দিকে তাকালে স্বামী আনন্দিত হয় এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে স্বামীর মর্যাদা ও সুমান সংরক্ষণ করে।' নারীকে মা হিসেবে মর্যাদা দেয়ার ব্যাপারেও বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি মানুষকে তাহার মাতা পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি। তাহার জননী তাহাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সঙ্গে এবং প্রসব করে কষ্টের সঙ্গে। '[১২]

হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল যে, আমার সেবা পাওয়ার অধিকার সবচেয়ে কার বেশি? রাসূল (সা.) বলেন, তোমার মায়ের। লোকটি বললঃ তারপর কার? তিনি বললেন, তোমার মায়ের। লোকটি আবার বলল, তারপর কার? তিনি বললেন, তোমার মায়ের। লোকটি পুনরায় বলল তারপর কার? তিনি বললেন, তোমার বাবার।

সপ্তমত ঃ নারীকে শিক্ষাদানে ইসলাম প্রবলভাবে উৎসাহ দিয়েছে। এ ব্যাপারে একটি হাদীস তো ইতোপূর্বেই এ মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কন্যা সন্তানকে ভাল বিদ্যা ও সদাচার শিক্ষা দিলে জান্নাত অবধারিত। এছাড়া অন্য এক হাদীসে রাসূল বলেন, 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নরনারীর উপর ফরয।'

অষ্টমত ঃ ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকারের অংশীদার করেছে, তা সে মাতা, স্ত্রী অথবা কন্যা যাই হোক না কেন, এমনকি মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ও সে উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে।

নবমত ঃ স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য সমান অধিকার বিধিবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করেছে এবং পুরুষকে পরিবার প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত করলেও তাকে স্বেচ্ছাচারী বা অত্যাচারী হবার অনুমতি দেয়নি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাহাদের উপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে।'[১৩]

দশমত ঃ তালাকের সমস্যাকে এমনভাবে বিধিবদ্ধ করেছে, যাতে স্বামী কোন রকমের স্বেচ্ছাচারমূলক বা অত্যাচারমূলক আচরণ করতে না পারে। এজন্য তালাকের সীমা নির্ধারণ করেছে এভাবে যে, তা সর্বোচ্চ তিনটের বেশি হতে পারবে না। আরবদের সমাজে তালাকের কোন সীমা সংখ্যা ছিলনা। তাছাড়া তালাক কার্যকর করার জন্য সময় নির্ধারন করে দেয়া হয়েছে। আর এরপর একটা ইদ্দতের মেয়াদ নির্ধারণ করেছে, যা স্বামী স্ত্রী উভয়কে পরস্পরকে প্রতি সমঝোতায় প্রত্যাবর্তন করার সুযোগ এনে দেয়।

**একাদশ** ঃ ইসলাম স্ত্রীর সংখ্যা সীমিত করে চারে নামিয়ে এনেছে। অথচ সমকালীন আরবে ও অন্যান্য দেশে এ ব্যাপারে কোন সীমা সংখ্যার বালাই ছিলনা।

**দ্বাদশ** ঃ নারীকে প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অভিভাবকদের কর্তৃত্বে ন্যস্ত করেছে এবং এ অভিভাবকসূলভ কর্তৃত্ব কেবল তার রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা দীক্ষা তদারকি ও তার কোন সম্পদ থাকলে তার তত্ত্বাবধান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। অভিভাবকত্বের নামে তার দন্ডমুন্ডের মালিক হতে বা তার উপর স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন চালাতে ইসলাম কাউকে অনুমতি দেয়নি। আর বয়োপ্রাপ্তির পর আর্থিক দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে তাকে পুরোপুরিভাবে পুরুষের সমান অদিকার ও কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলামী ফিকহ্ শাস্ত্র অধ্যায়ন করলে কেউ ক্রয়-বিক্রয়, দান, ওয়াকফ, বন্ধক, ইজারা, শরীকী, ব্যবসায় ইত্যাকায় যাবতীয় আর্থিক ও বাণিজ্যিক কার্যকান্ডে পুরুষ ও নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকারে আদৌ কোন পার্থক্য খুঁজে পাবে না।

উল্লেখিত **১২**টি মূলনীতি থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইসলাম জীবনের তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে নারীকে ঠিক যে মর্যাদা দান করেছে যা তার জন্য সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত ও মানানসই। সে প্রতিটি ক্ষেত্র হল-

**১। মানবিক ক্ষেত্র** ঃ এ ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে পুরুষের ন্যায় পূর্ণ মানবিক মর্যাদা ও অধিকার তার মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি দান করেছে। অথচ অতীতের অধিবাংলা সভ্য জাতি হয় এ ব্যাপারে সন্দিগ্ধ ও দ্বিধাগ্রস্থ ছিল, নতুবা এটা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

**২। সামাজিক ক্ষেত্র** ঃ ইসলাম নারীর সামনে শিক্ষার দ্বার খুলে দিয়েছে এবং তার জন্য জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্মানজনক অবস্থান নির্ধারন করেছে। শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তার বয়স যত বাড়ে, তার সম্মানও তত বৃদ্ধি পায়। শিশু থেকে স্ত্রী এবং স্ত্রী থেকে মায়ে পরিণত হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ধাপে বিশেষত: বার্ধক্যে তার জন্য বাড়তি প্রীতি, ভালবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

**৩। আইনগত ক্ষেত্রে ঃ** আইনগত ক্ষেত্র প্রসঙ্গে ড. মুস্তফা আসসিবারী বলেন, 'বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই ইসলাম নারীকে তার সকল কর্মকান্ডে পরিপূর্ণ আর্থিক ক্ষমতা ও কর্তৃক দান করেছে। পিতা, স্বামী বা পরিবার প্রধানের কোন কর্তৃত্ব তার উপর চাপিয়ে দেয়নি।'[১৪]

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তার প্রবর্তিত ধর্মই মানুষের মনের দরজা চোখের দরজা খুলে দিয়েছে- মানুষকে মানুষের মর্যদা দান করতে শিক্ষা দিয়েছে, ন্যায়-নীতির প্রবর্তন করেছে এবং নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষণ পুরুষের উপর ফরজ করেছে।

**৪.২. নারী পুরুষের সম অধিকারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ঃ**

ইসলাম নারীকে যেসব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, তা অন্যান্য ধর্মীয় ও সাংবিধানিক ব্যবস্থায় সে কখনো ভোগ করেনি। বিষয়টিকে আংশিকভাবে না নিয়ে যদি সামগ্রিকভাবেও তুলনামূলক ধারায় পর্যালোচনা করা হয়, তবে একে উপলব্ধি করা খুব সহজ হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর অধিকার ও দায়-দায়িত্ব পুরুষের মতই সমান, তবে তা অনিবার্যরূপে পুরুষের মত অভিন্নরূপ নয়। পুরুষ ও নারী অভিন্ন সত্তা নয়, তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে সমানভাবে। সমতা ও অভিন্নতার মধ্যবর্তী পার্থক্য খুবই গুরুত্ববহ। সমতা আকাঙ্খিত, যথার্থ, ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু অভিন্নতা নয়। নারীর অধিকার ও কর্তব্য পুরুষের মত অভিন্ন নয়, শুধুমাত্র এ অজুহাতেই তার ভূমিকাকে গুরুত্বহীন মনে করার কোন ভিত্তি নেই। নারীর পদমর্যদা যদি পুরুষের মত অভিন্নরূপ হত, তাহলে সে হত অবিকল পুরুষের একটি প্রতিরূপ, যেটি সে নয়। ইসলাম অভিন্নরূপে নয় বরং সমান অধিকার দিয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জাতির প্রজনন ক্রিয়ায় নারী পুরুষের তুল্যরূপ সঙ্গীনী হিসেবে স্বীকৃত। পুরুষ হলো জনক, নারী হলো জননী আর জীবনের জন্য উভয়েই হলো অপরিহার্য। এই ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা পুরুষের তুলনায় কিছুমাত্র কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই অংশীদারিত্বের কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীর রয়েছে সমান অংশ, প্রতিটি ব্যাপারেই সে সমান অধিকার লাভের যোগ্য; কেননা পুরুষ সঙ্গীর মতই সে সমান দায়-দায়িত্ব পালন করছে। তার মধ্যে ঠিক ততগুলো গুণাবলী ও ততখানি মুনষ্যত্ব রয়েছে, যতটা রয়েছে তার পুরুষ সঙ্গীর মধ্যে।[১৫] মানব জাতির প্রজনন ক্রিয়ায় তার এই সমান অংশীদারিত্ব প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

কুরআন পাকের ভাষায় ঃ

"হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে। যাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।[১৬]

সে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ব বহনে এবং নিজেকে কর্মকান্ডের পুরস্কার গ্রহণের ব্যাপারে পুরুষের সমকক্ষ। সে মানবের গুণাবলী ও আধ্যাত্মিক উচ্ছাকাঙ্খার যোগ্যতার বিচারে একটি স্বাধীন ব্যক্তিত্বরূপে স্বীকৃত। তার মানবীয় প্রকৃতি মানুষের চেয়ে তুচ্ছ নয় কিংবা ভিন্নও নয়। তারা উভয়ই একে অপরের পরিপূরক।[১৭] আল্লাহ বলেছেন ঃ

"অতঃপর তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের ডাকে সাড়া দিয়া বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কর্মে নিষ্ঠ কোন নর অথবা কোন নারীর কর্ম বিফল করি না; তোমরা একে অপরের অংশ। সুতরাং যাহারা হিযরত করিয়াছে, নিজ গৃহ হইতে উৎখাত হইয়াছে, আমার পথে নির্যাতিত হইয়াছে এবং যুদ্ধ করিয়াছে ও নিহত হয়েছে আমি তাহাদে পাপ কার্যগুলি অবশ্যই দূরীভূত করিব এবং অবশ্যই তাহাদিগকে দাখিল করিব জান্নাতে, যাহার পাশে নদী প্রবাহিত ইহা আল্লাহর নিকট হইতে পুরস্কার; উত্তম পুরস্কার আল্লাহরই নিকট।"[১৮]

মুমিন নর ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু, ইহারা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কার্যের নিষেধ করে। সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে, ইহাদিগকে আল্লাহ কৃপা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[১৯]

আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকিবে না। কেহ আল্লাহ এবং তাহার রাসূলকে অমান্য করিলে সে-তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হইবে।[২০]

কোরআন শরীফ নিজেই বলেছে- "নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোজাপালনকারী পুরুষ ও রোজা পালনকারী নারী, লজ্জাস্থান হেফাজতকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থান হেফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক জিকিরকারী পুরুষ ও আল্লাহর অধিক জিকিরকারী নারীদের জন্য আল্লাহ তায়ালা প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও পুরস্কার।[২১]

আর ঈমানদার নারী ও ঈমানদার পুরুষ একে অপরের সহায়ক বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দেয়। নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে আর আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে। অচিরেই আল্লাহ তায়ালা এদের উপর দয়া পরবশ হবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।[২২]

যে নীচ মনোবৃত্তি নারীকে শয়তানের সৃষ্টি বা সংস্কৃতির উৎস রূপে আখ্যায়িত করেছে, তা ইসলামের নয়। অথবা পবিত্র কুরআন নারীর স্বেচ্ছাচারী প্রভু হিসেবেও পুরুষকে-যেখানে তার স্বেচ্ছাচারিতার সামনে আত্মসমর্পন করা ছাড়া নারীর আর কোন স্বাধীনতা নেই-কোন মর্যাদা দেয়নি; কিংবা নারীর মধ্যে কোন আত্মা আছে কিনা এ প্রশ্নের অবতারণা ইসলাম করেনি। ইসলামের ইতিহাস কখনো কোন মুসলিম নারীর মানবীয় পদমর্যাদা তার মধ্যে আত্মার উপস্থিতি এবং তার অন্যান্য সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক গুণাবলী সম্পর্কে কোনরূপ সংশয় প্রকাশ করেনি। অন্যান্য প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের মত ইসলাম 'আদিপাপের' জন্যে শুধুমাত্র হাওয়াকেই দোষারোপ করে না। পবিত্র কুরআনে পরিষ্কারভাবে বলেছে যে, আদম ও হাওয়া উভয়েই সমানভাবে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা উভয়ে সমানভাবে পাপ করেছিল, তাঁরা অনুতপ্ত হওয়ার পর উভয়ের প্রতি আল্লাহর অনুকম্পা মঞ্জুর হয়েছিল।[২৩] তাঁদের উভয়কে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেছিলেন-

"এবং আমি বলিলাম, হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না; হইলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

"অতঃপর তাহাদের লজ্জাস্থান যাহা তাহাদের নিকটে গোপন রাখা হইয়াছিল তাহা তাহাদের কাছে প্রকাশ করিবার জন্য শয়তান তাহাদিগকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলিল, পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হইয়া যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এই জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদিগকে নিষধ করিয়াছেন।"

"সে (শয়তান) তাহাদের উভয়ের নিকট শপথ করিয়া বলিল, আমি তো তোমাদের হিতাকাঙ্খীদের একজন।"

এইভাবে সে তাহাদিগকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করিল। তৎপর যখন তাহারা সেই বৃক্ষ ফলের আস্বাদন গ্রহণ করিল, তখন তাহাদের লজ্জাস্থান তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা জান্নাতের পাতা দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করিতে লাগিল। তখন তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে

সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইতে বারণ করি নাই এবং আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, শয়তান তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

তাহারা বলিল, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করিয়াছি, যদি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হইব।"

তিনি বলিলেন, "তোমরা নামিয়া যাও, তোমরা একে অন্যের শত্রু এবং পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রহিল।"[২৪]

তিনি বলিলেন, "সেখানেই তোমরা জীবন-যাপন করিবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হইবে এবং তথা হইতেই তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনা হইবে।"

হে বনি আদম! তোমাদেরও লজ্জাস্থান ঢাকিবার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদিগকে পরিচ্ছদ দিয়াছি এবং তাকওয়ার পরিচ্ছদ, ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম, যাহাতে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে। হে বনী আদম, শয়তান যেন কিছুতেই তোমাদিগকে প্রলুব্ধ না করে- যেভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে সে জান্নাত হইতে বহিস্কৃত করিয়াছিল, তাহাদিগকে তাহাদের লজ্জাস্থান দেখাইবার জন্য বিবস্ত্র করিয়াছিল। সে নিজে এবং তাহার দিল তোমাদিগকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাহাদিককে দেখিতে পাও না। যাহারা ঈমান আনে না, শয়তানকে আমি তাহাদের অভিভাবক করিয়াছি।[২৫]

অতঃপর আমি বলিলাম, হে আদম, নিশ্চয়ই এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদিগকে জান্নাত হইতে বাহির করিয়া না দিয়ে দিলে তোমরা দুঃখ কষ্ট পাইবে।

"তোমার জন্য ইহাই রহিল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হইবে না লগ্নও হইবে না; এবং সেথায় পিপাসার্ত হইবে না এবং রৌদ্র ক্লিষ্টও হইবে না।"

অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বলিল হে আদম! আমি কি তোমাকে বলিয়া দিব অনন্ত জীবন প্রদবৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?

অতঃপর তাহার উভয়েই উহা হইতে ভক্ষণ করিল; তখন তাহাদের লজ্জাস্থান তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা জান্নাতের বৃক্ষ পত্র দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করিতে লাগিল। আদম তাহার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করিল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হইল।

ইহার পর তাহার প্রতিপালক তাহাকে মনোনীত করিলেন, তাহার তওবা কবুল করিলেন ও তাহাকে পথ নির্দেশ করিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা উভয়েই একই সংগে জান্নাত হইতে নামিয়া যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। পরে আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ আসিলে, যে আমার পথ অনুসরণ করিবে সে বিপথগামী হইবে না ও দুঃখ-কষ্ট পাইবে না।[২৬]

অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া এ বলে কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন আমলকারীর আমল নষ্ট করি না। সে পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন। তোমরা পরস্পর এক। অতঃপর এর যারা হিযরত করেছে তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে এবং মৃত্যু বরণ করেছে অবশ্যই আমি তাদের উপর থেকে অকল্যাণকে অপসারণ করব আর তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতে যার নিচ দিয়ে নদী-সমূহ প্রবাহমান। এ হলে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বিনিময়। আর আল্লাহ তায়ালার নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়।[২৭]

যে মন্দ কাজ করে সে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে, আর যে পুরুষ অথবা নারী মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে বেহিসাব রিজিক দেয়া হবে।[২৮]

যে সৎকর্ম করে এবং যে ঈমানদার পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের কাজের বিনিময় উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করব।[২৯]

আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোরআনে পুরুষ ও নারীর মাঝে কোন বৈষম্য রাখা হয়নি। ইসলামে নারীর অবস্থান কিছুটা অনুপম, কিছুটা অভিনব ও কিছুটা অনন্য। ইসলাম নারীকে যা দিয়েছে, তা তার প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করছে, তাকে পুরোপুরি নিরাপত্তা দিচ্ছে এবং অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ও অনিশ্চিত জীবন ধারার মোকাবেলায় তার সংরক্ষনের ব্যবস্থা করছে। প্রকৃতপক্ষে কোরআন এই ধারণাই দিচ্ছে যে, আদিপাপ থেকে নারীর প্রতি বিদ্বেষ এবং তার কাজকর্ম সম্পর্কে সন্দেহের অনুভব হয়েছে, তার জন্য আদমই অধিকতর দোষারোপের উপযোগী। কিন্তু ইসলাম এ ধরনের দোষারোপও সন্দেহ পোষণকে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করে না। কেননা, আদম ও হাওয়া উভয়ই সমানভাবে ভূল-ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং আমাদের যদি হাওয়াকে দোষারোপ করতে হয়, তাহলে আদমকেও তদানুরূপ, এমনকি তদঅপেক্ষা বেশি দোষারোপ করা উচিত।[৩০]

**৪.৩. আল-কুরআনে নারী ঃ**

নিম্নবর্ণিত মহীয়সী নারীরা তাঁদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। আল-কুরআনে যাঁদের কথা উল্লেখ রয়েছে তাদের কয়েক জন সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হলো।

**ক. হযরত আদম (আ.) এবং বিবি হাওয়া (আ.) ঃ**

মানব বংশ বৃদ্ধিতে হযরত আদম অপেক্ষা বিবি হাওয়ার অবদান কম নয়। আল্লাহ সৃষ্টির যে প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাতে নারীর অবদান ছাড়া বংশ বিস্তার সম্ভব নয়। সন্তান ধারণ এবং প্রসবে পুরুষের চেয়ে নারীর ব্যথা-বেদনা, যাতনা এবং ত্যাগ অনেক বেশী।

মুসলিমগণ বিশ্বাস করে না যে, নিষিদ্ধ ফল খেতে বিবি হাওয়া হযরত আদমকে প্ররোচিত করেছিল। যদিও কোন কোন ধর্মমতে হযরত আদমকে বেহেশত থেকে বিতারণের জন্য বিবি হাওয়াকে দায়ী করা হয়। শয়তান হযরত আদমকেই নিষিদ্ধ ফল খেতে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল।[৩১]

আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

"অতঃপর শয়তান তাহাকে কুমন্ত্রণা দিল, সে বলিল, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলিয়া দিব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা? অতঃপর তারা উভয়ে উহা হতে ভক্ষণ করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়িল এবং তারা জান্নাতের পক্ষপত্র দ্বারা নিজদিককে আবৃত করতে লাগল। আদম তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হল। ইহার পর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করল, তার তওবা কবুল করলেন ও তাকে পথ নির্দেশ করলেন।"[৩২]

সূরা ত্ব-হা-র ১২২নং আয়াতে দেখা যায় আল্লাহ দু'জনকে বেহেশত হতে বিতাড়িত করার পূর্বে তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহর বাণী বহনের জন্য নবী হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। হযরত আদম এবং বিবি হাওয়া নিষ্পাপ হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন। আদি পাপের কোন ধারণা ইসলামে নেই এবং আদি পাপ আদম সন্তানের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে এরূপ ধারণা ইসলামে নেই। সকল আদম সন্তান নিষ্পাপ অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে। [৩৩]

**খ. হযরত মূসা (আ.) ঃ**

হযরত মূসা (আ.) এর জীবনে ৪ জন নারীর উল্লেখ বিশেষভাবে দেখা যায়। তাঁরা হলেন হযরত মূসা (আ.)-এর মা, তার ভগ্নী, ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া এবং সোয়াইব (আ.)-এর বিবাহযোগ্য কন্যা। যার সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর বিবাহ হয়েছিল।৩৪ আল-কুরআনে বর্ণিত আছে-

"মূসা জননীর অন্তরে আমি ইংগিতে নির্দেশ করিলাম, শিশুটিকে স্তন্যদান করিতে থাক। যখন তুমি তাহার সম্পর্কে কোন আশংকা করিবে তখন ইহাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করিও এবং ভয় করিও না, দুঃখও করিও না। আমি অবশ্যই ইহাকে তোমার নিকট ফিরাইয়া দিব এবং ইহাকে রাসূলদের একজন করিব।"[৩৪]

**গ. বিবি মরিয়ম (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.) ঃ**

বিবি মরিয়ম (আ.)-এর কাহিনী অত্যন্ত সুন্দর এবং তাদের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে আল-কুরআনে। যদিও তার গর্ভধারণ ছিল সম্পূর্ণ নিষ্পাপ তবুও তাঁর মনে যে ভীতি ও শঙ্কা ছিল, তাও প্রতিফলিত হয়েছে। যদিও তিনি জানতেন যে, তিনি নিষ্পাপ, তথাপিও মানুষের ভুল বুঝাবুঝির ভয়ে তিনি ছিলেন শঙ্কিত। আল্লাহ তার শঙ্কা দূর করেছেন, তাঁর শিশু সন্তানকে নব্যুওয়াত দানের সুসংবাদের মাধ্যমে।[৩৫]

আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"অতঃপর সে সন্তানকে লইয়া তাহার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইল, উহারা বলিল, হে মারইয়াস! তুমি তো এক অদ্ভুত কান্ড করিয়া বসিয়াছ। হে হারুন ভগ্নি! তোমরা পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিনী। অতঃপর মারইয়াম সন্তানের প্রতি ইঙ্গিত করিল। উহারা বলিল, দিয়ে কোলের শিশু তাহার সহিত আমরা কেমন করিয়া কথা বলিব? সে বলিল, আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়াছেন; আমাকে নবী করিয়াছেন।"[৩৬]

হযরত ঈসা (আ.)-এর উল্লেখ কুরআনে বহুবার আছে। তাঁকে মরিয়ামের পুত্র হিসেবে পরিচয় করে দেয়া হয়েছে। তাঁকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে কোথাও পরিচয় দেয়া হয়নি।[৩৭]

**ঘ. হযরত মুহাম্মদ (স.) ঃ**

নবী মাহাম্মাদ (স.) এর জীবনে দু'জন মহিলার অবদান ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তারা হলেন সাইয়েদা খাদিজা (রা.) এবং সাইয়েদান আয়েশা (রা.)। সাইয়েদা খাদিজা ছিলেন রাসূল (স.) এর প্রথম স্ত্রী এবং বয়সে ছিলেন ১৫ বছর বেশি বয়স্ক। নবুওয়াতী জিন্দেগীর মধ্যে তাঁর ন্যায় একজন অনুগত এবং পরিণত বুদ্ধি সম্পন্ন মহিলার অবদান ছিল অত্যধিক।

আল্লাহ ও রাসূল (স.) যখন প্রথম নব্যুওয়াত লাভ করলেন, তিনি ভীত শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। হযরত জিব্রাইল (আ.) চারিদিক আবৃত করে এসেছিলেন এবং বার বারই বলছিলেন পড়ুন। তিনি জবাবে বলেছিলেন, আমি পড়তে জানি না। এ অবস্থায় রাসূল (স.) হরবুদ্ধি হয়েছিলেন এবং কি যে হয়েছিলেন এবং কি যে হয়েছে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারছিলেন না।

নব্যুয়াতের প্রথম আলোর ঝলকানির পর তিনি কম্পিত পায়ে সাইয়েদা খাদিজার কাছে হাজির হন। তিনি (খাদিজা) তাঁকে সান্তনা দেন এবং আশ্বস্ত করেন তাঁর কোন ক্ষতি হতে পারে না। অতঃপর তিনি তাঁকে তাঁর বংশীয় ভ্রাতা ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল-এর নিকট নিয়ে যান।

ওয়ারাকা ছিলেন একজন ঈসাই আলেম। তিনি রাসূল (স.)-কে বললেন, তিনি যা দেখেছেন তা হতে পারে একজন ফিরিশতা, যিনি এসেছিলেন হযরত মূসা (আ.) এবং অন্যান্য নবীদেরও নিকট। নব্যুওয়াতের ১০ বছর পরেই সাইয়েদা খাদিজা (রা.) মৃত্যুবরণ করেন।

নবী (স.)-এর ওহী নাযিল সংক্রান্ত ঘটনাসহ আরও অনেক বিপদের বন্ধু হযরত খাদিজা (রা.)। নবীপত্নী সাইয়েদা আয়েশা (রা.) ছিলেন বহু গুণসম্পন্না। তাঁর ছিল হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আরেক পত্নী সাইয়েদা আয়শা (রা.) ছিলেন বহুগুণ সম্পন্না। তাঁর ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা সম্পন্ন মন। দ্বীনের প্রচারের শেষ পর্যায়ে তিনি মহানবী (স.)-কে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছিলেন। স্ত্রী হিসেবে সর্বগুণে গুণান্বিত হওয়া ছাড়াও তিনি দ্বীন প্রচারের ব্যাপারেও খুবই সহায়ক ছিলেন। ধর্ম, সামাজিক সম্পর্ক, ইতিহাস, ভাষা, কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যায় তিনি বহু অবদান রেখেছেন।

হযরত আয়েশা (রা.) নবী জীবনের খুঁটি-নাটি অনেক বিষয় প্রত্যক্ষ করেছেন। আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন, তোমাদের দ্বীনের অর্ধেক এই মহিলা হতে গ্রহণ করো। রাসূল (স.)-এর মৃত্যুর পর ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি ছিলেন একজন অসামান্য ব্যক্তিত্ব। সম্মানিত সাহাবীগণ অত্যন্ত জটিল বিষয় নিয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন।[৩৮]

রাসূল (স.)-এর বিয়ের ব্যাপারে একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর জীবনকাল ৬৩ বছর বয়সের মধ্যে ৫০ বছর ছিলেন এককভাবে অথবা এক স্ত্রী নিয়ে। তিনি ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছর বয়স্কা এক বিশিষ্ট মহিলাকে বিয়ে করেন এবং তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছেন ২৫ বছর। পরবর্তী ১২ বছরের মধ্যে ৬ বছর ধর্মীয় ও অন্যান্য কারণে তিনি বহু সংখ্যক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

**৪.৪. ইসলাম ও বর্হি বিশ্বে নারী ঃ**

ইউরোপে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মানবাধিকারের নামে গুঞ্জন শুরু হয় এবং পরবর্তীতে তা অব্যাহত থাকে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় লেখক ও চিন্তাবিদগণ বিস্ময়কর দৃঢ়তার সাথে মানুষের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ও অলঙ্ঘনীয় অধিকার সম্পর্কে কথা বলেন ও মানুষের মাঝে তা প্রচার করেন। এ ধরনের লেখক ও চিন্তাবিদগণের মধ্যে জাঁ জ্যাক রুশো, ভলতেয়ার ও মতেস্কু অন্যতম। মানুষের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক অধিকারের প্রবক্তাদের চিন্তাধারা প্রচারের প্রথম কার্যত প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই যে, বৃটেনে ক্ষমতাসীন সরকার ও জনগণের মধ্যে এক দীর্ঘ স্থায়ী সংঘাতের সৃষ্টি হল। বৃটিশ জনগণ ১৬৮৮ সালে একটি ঘোষণাপত্রের আকারে তাদের কতক সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারকে প্রস্তাব আকারে উপস্থাপনে সফল হয় এবং তা তাদেরকে প্রত্যার্পণ করা হয়।

এ চিন্তাধারা প্রচারিত হবার আরেকটি সুস্পষ্ট কার্যত প্রতিক্রিয়া বৃটেনের বিরুদ্ধে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধসমূহে প্রকাশ পায়। বৃটিশ সরকারের চাপ ও তার চাপিয়ে দেয়া নীতির কারণে উত্তর আমেরিকার তেরটি বৃটিশ উপনিবেশ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা অর্জন করে।[৩৯]

১৭৭৬ সালে ফিলাডেলফিয়ার একটি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় যাতে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় এবং এ সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়। এ ঘোষণাপত্রের ভূমিকায় বলা হয়, "সৃষ্টি প্রকৃতির দিক থেকে সমস্ত মানুষ অভিন্ন ধরনের এবং সৃষ্টিকর্তা প্রতিটি ব্যক্তিকে স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় অধিকার প্রদান করেছে যেমন, জীবনের অধিকার ও স্বাধীনতার অধিকার। রাষ্ট্র গঠনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে উপরোক্ত অধিকারসমূহ রক্ষা করা এবং রাষ্ট্রীয় শক্তি ও তার কথার কার্যকারিতা জাতির সন্তুষ্টির ওপর নির্ভরশীল।[৪০]

কিন্তু বর্তমানে যা মানবাধিকারের ঘোষণা নামে সুপরিচিত তা হচ্ছে ফ্রান্সের মহাবিপ্লবের পরে "অধিকারের ঘোষণা" নামে প্রকাশিত ঘোষণা। এ ঘোষণা মূলত কতগুলো সাধারণ মূলনীতি যা ফ্রান্সের সংবিধানের শুরুতে লেখা হয়েছে এবং উক্ত সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিগণিত। এ ঘোষণার প্রথম ধারায় বলা হয়েছে, "মানব জাতির সদস্যরা স্বাধীন হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে ও সারা জীবন স্বাধীন থাকবে এবং অধিকারের ক্ষেত্রে তারা পরস্পরে সমান।"

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক পর্যন্ত মানবাধিকার সম্বন্ধে যা কিছু আলোচনা হয়েছে এবং কেন্দ্রবিন্দু ছিল সরকারগুলোর মোকাবিলায় জাতিসমূহের অধিকার এবং মালিক ও কার্যে নিয়োগকারীদের মোকাবিলায় মেহনতি শ্রেণীসমূহের অধিকার।

বিশ শতাব্দীতে প্রথম বারের মত পুরুষের অধিকার মোকাবেলায় "নারীর অধিকার" এ বিষয়টি আলোচনায় আসে। বিশ্বের প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পরিগণিত বৃটেনে কেবল বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে নারী ও পুরুষকে সমানাধিকার দেয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তার স্বাধীনতার ঘোষণায় সার্বজনীন অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করে তথাপি কেবল ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে এসে রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের আইন পাশ করে। একইভাবে ফ্রান্সও কেবল বিংশ শতাব্দীতে এসেই এ বিষয়টি মেনে নেয়।

সে যাই হোক, বিংশ শতাব্দীতে সারা বিশ্বে আইন ও দায়িত্ব-কর্তব্যের দৃষ্টিকোন থেকে নারী ও পুরুষের সম্পর্কে গভীর পরিবর্তন সমর্থক অনেকগুলো গোষ্ঠী দাঁড়িয়ে যায়। তাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সংশোধন করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জাতিসমূহ ও সরকারগুলোর মধ্যকার সম্পর্কে, আর মেহনতি শ্রেণীসমূহ এবং মালিক ও পুঁজিপতিদের মধ্যকার সম্পর্কে যে কোন ধরনের পরিবর্তন ও ওলট-পালটই করা হোক না কেন, তার ফলে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হবে না। এ হলো ইউরোপে মানবাধিকার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। আমরা যেমন জানি, যে মানবাধিকারের ঘোষণার সকল বিষয়বস্তুই ইউরোপীয়দের জন্য নতুনত্বের অধিকারী ছিল, চৌদ্দশ বছর পূর্বে ইসলাম তার সবই পেশ করে গেছে। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টির সময় বলেন, "স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বলিলেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিতেছি।"

আল্লাহ তায়ালা বলেননি যে, নারী পাঠাবেন না পুরুষ পাঠাচ্ছেন। এমনকি তিনি বলেননি যে, তিনি মানুষ পাঠাচ্ছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তিনি খলিফা পাঠাচ্ছেন।' মানুষকে তিনি খলিফা বলে অবিহিত করলেন। খলিফা মানে প্রতিনিধি। পুরো মানব জাতি হচ্ছে আল্লাহর প্রতিনিধি। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকে আল্লাহর প্রতিনিধি। তবে একথা ঠিক যারা গুনাহ্ করে, অত্যচার করে, জুলুম করে তারা ঈমান হারিয়ে ফেলে, ফলে তাদের খলিফা মর্যাদা থাকে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করিয়াছেন। সুতরাং কেহ কুফরী করলে তাহার কুফুরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হইবে। ফাসিকদের কুফরী কেবল উহাদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফরী উহাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।'[৪১]

কিন্তু মূলত সবাই আল্লাহ তায়ালার খলিফা। এ খলিফার মধ্যে রয়েছে সকল ক্ষমতায়ন। ক্ষমতা ছাড়া কেউ কোন দায়িত্ব পালন করতে পারে না। খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে হলে প্রত্যেক নারী ও পুরুষের কিছু ক্ষমতা থাকতে হবে। নারীর ক্ষমতায়নের ভিত্তি এ খিলাফতের মধ্যে রয়েছে। শুধু নারী নয় 'খিলাফত' শব্দের মধ্যে নারী, পুরুষ, গরীব, দুর্বল সকলের ক্ষমতায়নের ভিত্তি রয়েছে। সুতরাং নারী পুরুষ মৌলিক সাম্যের সমতা রয়েছে।[৪২]

ইসলামের মর্ম কথা হল ন্যায়বিচার এবং খোদাভীতি বা 'তাকওয়া'। ইসলাম একটি মাত্র ধর্ম নয়, এটা একটা সামাজিক ব্যবস্থার নাম, যা মানবজাতির সর্বক্ষেত্রে কার্যকারী।

শুধু মুসলমানদের জন্য নয় সকল মানবজাতির জন্য শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠাই হল ইসলামের লক্ষ্য। কোরআনে বলা হয়েছে তারাই আদর্শ মানুষ যারা ভাল কাজের জন্য নির্দেশ দেয় এবং খারাপ কাজ হতে বিরত থাকতে বলে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উন্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হইয়াছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ কর, অসৎ কাজে নিষেধ কর, আল্লাহর উপর বিশ্বাস কর।'

এখানে পুরুষ নয়, নারী নয়, বর্ণ বা জাতি নয় সমগ্র মানবজাতিকে বুঝানো হয়েছে। এ উদাহরণ হতেই ইসলাম নারীর অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠে। একজন মানুষ হিসেবে ইসলামে নারীর অবস্থান শুধুমাত্র পুরুষের সমানই নয়, বরং মাতৃত্ব, সম্মান এ সম্মানের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের চেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ।

ইসলাম কোনো অসম্পূর্ণ জীবন বিধানের নাম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ভারসাম্য মূলক ইসলামী জীবন বিধানের জন্য সকল নীতিমালা দিয়ে ইসলাম পরিপূর্ণ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ। বৈষয়িক উপায়-উপকরণ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সমরশক্তি ও অর্থনৈতিক শক্তির দিক থেকে যারা বলীয়ান হয় বিশ্বনেতৃত্বের আসনে তারাই আসীন হয় এবং তাদেরই সভ্যতা-সংস্কৃতি সারা দুনিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে, এটাই হলো প্রাকৃতিক নিয়ম। এসব দিক থেকে মুসলমানরা বিগত শতাব্দীসমূহের যে যুগ পর্যন্ত অগ্রগামী ছিলো, ঠিক সে যুগ পর্যন্তই মুসলমানরাই বিশ্বনেতৃত্বের আসনে আসীন ছিলো এবং ইসলামী সভ্যতাই পৃথিবীতে বিজয়ীর আসনে আসীন ছিলো। এ সময় পর্যন্ত গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নারী অধিকারের সাথে পাশ্চাত্য জগৎ ছিলো সম্পূর্ণ অপরিচিত। কারণ পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মের নামে যেসব মত ও মানব রচিত মতবাদ রয়েছে, এসব ধর্ম এবং মতবাদ নারীকে তাঁর প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। অপরদিকে ইসলামই নারীকে সম্মানের সহিত সুউচ্চ আসনে আসীন করেছে। ইসলাম নারীকে শুধু মানুষই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় তিনগুণ বেশি অধিকার দিয়েছে, নারীর সতীত্ব সম্ভ্রম নিরাপত্তা করার লক্ষ্যে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। গ্রিক প্রভাবিত জীবন দর্শনের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠা সভ্যতা-সংস্কৃতি নারী উন্নয়নের নামে নারীকে ব্যবসার পণ্য এবং যৌনদাসীতে পরিণত করেছে। আর সেই পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সভ্যতার অনুসারী ও পূজারীগণ ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ মুসলিম নারী-পুরুষকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে ইসলাম নারীকে পুরুষের তুলনায় কম মর্যাদা দিয়েছে, ইসলাম নারীকে ঠকিয়েছে পিতার সম্পত্তিতে সমধিকার দেয়নি, স্বাধীনতা থেকে নারীকে বঞ্চিত করেছে, ইসলাম নারীকে পিতা, স্বামী ও সন্তানের দাসীতে পরিণত করেছে, ইসলাম নারীকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ বা আত্মনির্ভরশীল হতে দেয় না ইত্যাদি ধরনের ঘৃণ্য প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে একথা সর্বজনবিদিত যে, ইতিহাসের যে পর্যায়ে আল্লাহর কোরআন অবতীর্ণ হচ্ছি যে, সে সময় কন্যা সন্তান ছিল অসম্মান ও অমর্যাদার প্রতীক। এ জন্য কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তারা নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে হত্যা করত। তেমনিভাবে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মে নারীর কোন সম্মান ও মর্যাদাই প্রদান করা হয়নি। পুরুষ একাধিক বিয়ে বা স্ত্রী বিয়োগের পরে পুনরায় বিয়ে করার অধিকার লাভ করবে কিন্তু নারীর সেই অধিকার নেই। সতীদাহ তথা স্বামীর মৃত্যুর সাতে সাথে স্ত্রীকেও জীবন্ত পুড়িয়ে মারাবার অমানবিক ব্যবস্থা চালু ছিল হিন্দু ধর্মে। বর্তমানে অবশ্য আইন করে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অহিংসা পরম ধর্ম, জীব হত্যা মহাপাপ এটা হল বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি। সেই বৌদ্ধ ধর্ম নারী সম্পর্কে বলেছে- নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া মানবীয় পবিত্রতার পরিপন্থী। নারীর সাথে কোনরূপ মেলামেশা বা তাদের প্রতি কোনো অনুরাগ রেখোনো। তাদের সাথে কোন ধরনের কথা বলবে না। পুরুষের জন্য নারী ভয়ঙ্কর বিপদ স্বরূপ। নারী তাঁর মনোহর কমনীয় ভঙ্গী দ্বারা পুরুষের বিশ্বাস ভেঙ্গে দেয়। নারী এক ছলনা বৈ কিছুই নয়। নারী থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করো। ধন সম্পদে নারীর কোন অধিকার নেই। নারী সম্পর্কে ইহুদী ধমের বক্তব্য হলো-নারী পাপের প্রসবন। কোনো ভাল কাজ করার যোগ্যতা নারীর নেই। এ কারণে সে সম্মান পেতে পারে না। নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধুমাত্র ভোগ করার জন্যে। নারী জাতি সৃষ্টির আদি থেকে পাপের উস্কানি দিয়ে আসছে। নারীকে সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করা যাবে না। কোনো নারীর স্বামীর সাথে যদি কোন পুরুষের ঝগড়া শুরু হয়, আর নারী যদি তাঁর স্বামীকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়ায়, এটা তাঁর ক্ষমাহীন অপরাধ। এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে নারীর উভয় হাত কেটে দিতে হবে। নারীকে যে কোন সময় যে কোন কারণে বা কারণ ব্যতীত তালাক দেয়া যেতে পারে। পারমিক ধর্মেও নারীর কোনো মর্যাদা রাখা হয়নি। যেসব বিধান রাখা হয়েছে তা নারীর জন্য চরম অমানাবক। যরথুষ্ট্র নারী সম্পর্কে বলেছেন, যে নারীর সন্তান নেই সে নারী পুলসিরাত পার হয়ে বেহেশতে যেতে পারবে না।

খ্রিষ্ট ধর্মে নারীর অবস্থা আরো শোচনীয়। নারী মানুষ কিনা বা নারীর আত্মা বলে কিছু আছে কিনা তাই নিয়েই এ ধর্ম সন্দেহ পোষণ করে। নারী হল সকল পাপের প্রতীক, নারীর রক্ত অপবিত্র, নারী ছলনার প্রতীক, নারী থেকে দূরে থাকো, নারী শয়তানের শক্তি চরিত্র ধ্বংসের মূল শক্তি নারী, সে শয়তানের বাদ্যযন্ত্র।

১৯১৯ সালের পূর্বে অষ্ট্রেলিয়ার নারী সমাজ কোন প্রকার সম্পদের অধিকারী হয়নি। ১৯০৭ সন পর্যন্ত সুইজারল্যান্ডেও ঐ একই অবস্থা ছিল নারীর ক্ষেত্রে। বৃটেনে ১৮৭০ সনে এবং জার্মানে ১৯০০ সনের পূর্ব পর্যন্ত নারীর অধিকার ছিল না। আর বিশ্ব আধিপত্যকারী আমেরিকা নারীকে সীমিত আকারে অধিকার দেয়া শুরু করেছে ১৯৮১ সাল থেকে। ১৮৩৫ সালে আমেরিকার মেয়েরা সর্বপ্রথম স্কুলে যাবার তথা লেখাপড়া করার সুযোগ পায়। অন্যদিকে ইসলাম ১৪'শ বছর পূর্বেই মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। ১৮৮৪ সালে আমেরিকার মেয়েরা সম্পত্তি ভোগের অধিকার লাভ করে। আর ইসলাম ১৪'শ বছর পূর্বেই পিতা, স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়ের সম্পত্তির নারীর অধিকার সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। আমেরিকার মেয়েরা ১৯২০ সালে ভোটের অধিকার লাভ করে। অপরদিকে মুসলিম নারীরা তাদের এই রাজনৈতিক অধিকার পুরুষদের সাথে সাথেই পেয়েছে। আমেরিকায় নারীদেরকেই সর্বাধিক দাসী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। সেখানে দাস প্রথা বন্ধ হয় ১৮৬৩ সালে এবং এ দাস প্রথা বন্ধ করতে গিয়ে আমেরিকায় যে গৃহযুদ্ধ হয়েছিলো, তাতে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ মানুষ নিহত হয়। অথচ ইসলাম ১৪'শ বছর পূর্বেই দাস প্রথা বিলুপ্ত করার ঘোষণা দিয়েছিলো, একজন দাস মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তার আহার ও পরিদেয় বস্ত্র ইত্যাদি সংক্রান্ত অধিকার তার মালিকের সমপর্যায়ে হবে। অথচ আমেরিকা তথা পাশ্চাত্যের নগ্ন সভ্যতার পূজারীরাই আজ মুসলমানদেরকে নারীর অধিকার শেখাতে চায়।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় পাশবিক উত্তেজনা ও যৌন লালসার পরিতৃপ্তিই হচ্ছে সাধারণ নারী পুরুষের সম্পর্কের একমাত্র ভিত্তি। আর ঠিক এ কারণেই পশ্চিমা দেশসমূহ নারী একজন পুরুষকে স্বামী হিসেবে বরণ করে প্রেম-ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে জীবনে শেষ দিনটি পর্যন্ত যেমন একত্রে বসবাস করা কল্পনাও করা যায় না, তেমনি একজন পুরুষও একজন নারীকে স্ত্রী হিসেবে সুখ-দুঃখ তথা সমব্যাথার সঙ্গিনী বানিয়ে জীবন অতিবাহিত করার কথা চিন্তাও করে না। ফলে পশ্চিমা দেশসমূহে পারিবারিক প্রথা ও বিয়ে প্রথা বিলুপ্ত প্রায়। বিয়ের বন্ধনে যারা আবদ্ধ হয়, স্বল্প দিনের মধ্যেই দাম্পত্য জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে তালাক তথা বিচ্ছেদের মাধ্যমে। সাধারণত নারী-পুরুষের পারস্পারিক সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে ওঠে যে প্রেম-ভালবাসাকে কেন্দ্র করে, এর পরিবর্তে তারা নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি রচিত করেছে যৌন লালসা তথা পাশবিকতার ওপরে।

অপরদিকে ইসলামী নারী-পুরুষের সম্পর্ক মাটির গভীরে প্রোথিত শক্তিশালী বৃক্ষের সাথে তুলনা করছে। আর এ সম্পর্কের ভিত্তি রচিত হয়েছে প্রেম-ভালবাসার ও মায়া-মমতার ওপরে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের কারণে। আর ঠিক এ কারণেই মানুষ হিসেবে ইসলাম নারী ও পুরুষে কোনো ব্যবধান করেনি, উভয়কেই সমমর্যাদার আসনে আসীন করেছে। আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবী সৃষ্টি করে এর মধ্যে মানুষের প্রয়োজনে যে সকল উপকরণ দান করেছেন, তা মানুষ হিসেবে শুধুমাত্র পুরুষকেই ভোগ করার অধিকার দেননি। বরং মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষ উভয়কেই এ ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার দিয়েছেন।

প্রকৃত সম্মান-মর্যাদা লাভের মানদন্ড কি এবং নারী-পুরুষের মধ্যে কোন নারী বা পুরুষ প্রকৃত সম্মান মর্যাদার অধিকারী তা মহান আল্লাহ তায়ালা নিরুপণ করে দিয়েছেন। এ সম্মান-মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে ধনী-গরীব, সুন্দর-কুৎসিত, সাদা-কালো, বংশ ইত্যাদি কোনো পার্থক্য করা হয়নি। মহান আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে পৃথিবীর সকল মানুষই সমান, কেউ ছোট বা কেউ বড় অথবা কেউ উচ্চ বা নিচুও নয়। সৃষ্টিগত ভাবেও কেউ উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট নয়। দুনিয়ার সকল নারী-পুরুষই একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোনো পুরুষ নেই যার সৃষ্টি ও জন্মের ক্ষেত্রে কোনো নারীর প্রত্যক্ষ অবদান নেই। অপরদিকে দুনিয়ার এমন কোনো নারী নেই, যার জন্মের ক্ষেত্রে কোনো পুরুষের প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। ঠিক এ কারণেই নারী-পুরুষ কেউ কারো উপর কোনো ধরনের মৌলিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে না এবং কেউ কাউকে জন্মগত কারণে নীচ, হীন, ক্ষুদ্র ও নগন্য বলেও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পারে না এবং এসব বিষয় ইসলাম ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে ঘোষণা করেছে- 'মানব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যেসব নারী বা পুরুষ তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনে এবং ঈমানের দাবী অনুসারে জীবন পরিচালিত করে, তারাই দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান-মর্যাদার অধিকারী।

ইসলাম নারী-পুরুষের পারস্পারিক সম্পর্ককে প্রশান্তি লাভের মাধ্যমে হিসেবে গণ্য করে। সৃষ্টিগতভাবে পুরুষকে নারীর এবং নারীকে পুরুষের জুড়ি বানানো হয়েছে এবং ইসলাম ঘোষণা করেছে, এই জুড়ি একে অপরের কাছ থেকে পরম প্রশান্তি লাভ করবে। একে অপরের প্রতি প্রবল আকর্ষণবোধ, প্রেম-ভালবাসা ও গভীর মায়া-মমতা না থাকলে সেখানে পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে প্রশান্তি লাভের প্রশ্নই আসে না। নারীর প্রতি পুরুষ সঙ্গীর এবং পুরুষের প্রতি নারী সঙ্গীর হৃদয়ে প্রেম-প্রীতি ভালবাসা ও মায়া-মমতা তথা প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এটিই হলো নারী-পুরুষের স্থায়ী সম্পর্কের মূল ভিত্তি। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী পুরুষের দাম্পত্য জীবনের দর্শনই হচ্ছে প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, আন্তরিকতা ও হৃদ্যতা। অর্থাৎ নারী-পুরুষ দাম্পত্য জীবনে তাদের হৃদয় ও আত্মা একে অপরের সাথে যুক্ত থাকবে। একে অপরের সম্মান-মর্যাদা, স্বাস্থ্য, মন-

*Dhaka University Institutional Repository*

মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, পরস্পরের চরিত্র ও সম্ভমকে কলঙ্কের কালিমা থেকে হেফাজত করবে এসবই হল নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রাণবন্ত এবং এই প্রাণবন্ত না থাকায় পাশ্চত্য পরিবার প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক নেই, সন্তানের সাথে পিতামাতার সম্পর্কের ইতি ঘটেছে। পরিবারিক জীবনের শান্তি ও স্বস্তির শেষ রেশটুকুও বলতে গেলে আর দেখা যায় না। এর স্বাভাবিক পরিণতিতে পাশ্চাত্যের অধিকাংশ নাগরিকের মন-মানসিকতা হয়েছে অস্থির প্রকৃতির এবং বহির্মূখী। মানসিক শান্তির অন্বেষার জন্য ছুটে যায় ক্লাব, পার্ক, বার, লটারী, জুয়া, নৃত্য ও পানশালায়। সময়ের ব্যবধানে চিত্তবিনোদনের এসব মাধ্যমও তাদের কাছে মহাবিরক্তির উকরণে পরিণত হয়। মুক্তি লাভের আশায় তখন তারা বাধ্য হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। বস্তুবাদ এবং নাস্তিকবাদী জীবন দর্শন এবং এভাবেই মানুষের থেকে মানবীয় সুকুমার বৃত্তিসমূহ নিঃশেষ করে দেয়। ফলে মানুষ মননশীলতার দিকে তারা সম্পূর্ণ পাশবিকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে যায়। বর্তমানে পুঁজিবাদী দুনিয়ার নারীর যৌবনকে যেমন ব্যবসার পণ্যে পরিণত করা হয়েছে, তেমনি সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় নারীকে 'জনগণের সম্পদ' এ পরিণত করা হয়েছিলো। ইসলাম নারীকে তাঁর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে যথাযথ অধিকার প্রদান করে উচ্চসম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন করেছে। মানব জাতির অর্ধেক ও গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হলো নারী। তাকে অবহেলা ও উপেক্ষা করে মানব সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব নয়। ইসলামের ইতিহাস ও মুসলমানদের ইতিহাসে যেমন আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে তেমনি ব্যবধান রয়েছে নারীকে মুসলমানদের ও ইসলামের দেয়া অধিকারে। ইসলামী রাষ্ট্র সমাজ এবং পারিবারিক ব্যবস্থায় নারীর মর্যাদা পুরুষের তুলনায় অনেকগুণ বেশি। প্রাচীন আরবে কন্যা সন্তান হত্যার নির্মম নিষ্ঠুর প্রথা ইসলামই উৎখাত করেছে। সেখানে কন্যা সন্তানের হাত চুম্বন করা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হতো, কন্যা সন্তান ছিল অকল্যাণ ও অগৌরবের প্রতীক। নবী কারীম (স.) স্বয়ং এসব ব্যবস্থা উৎখাত করলেন। কন্যার হাতে তিনি চুম্বন করতেন। ইসলাম ছেলেদের উপার্জনে যেমন বাধ্য করেছে কন্যাদেরকে তা করেনি। ইসলাম বলেছে, কন্যাকে লালন-পালন তার যাবতীয় ব্যয়ভার বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত সন্তুষ্টির সাথে বহন করবে পিতা। পিতার অবর্তমানে করবে পরিবারের অভিভাবক। বিজ্ঞান বলে পুত্র সন্তান হোক বা কন্যা সন্তানই হোক জন্মদানের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা নেই। পুরুষের নিকট হতেই নারীর গর্ভে কন্যা বা পুত্র সন্তানের ভ্রণ প্রবেশ করে। কন্যা সন্তানের অধিকারী কে হবে আর কে পুত্র সন্তানের অধিকারী হবে, এ ব্যাপারে মানুষের কোন ক্ষমতা নেই। এটা মহান আল্লাহই ভালো জানেন। পুত্র বা কন্যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য পুরস্কার। পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাজ হলো সে দানের মূল্য দেবে এবং দানকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আল্লাহর দানের মুল্য না দেয়া এবং অকৃতজ্ঞ হওয়া কখনই মানুষের পকেষ শোভা পায় না। আল্লাহই ভালো জানেন, কাকে কোন নিয়ামত দিতে হবে এবং তিনিই জ্ঞান ও কুদরতের অধীন বিজ্ঞতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাকেই নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করা মানুষের কর্তব্য। শুধু কন্যা সন্তান নয়, বধু এবং মা তথা সকল স্তরের নারীই বর্তমান বিশ্বে চরম নির্যাতনের শিকার। জাহেলী সমাজে বধূর সম্মান বা মর্যাদা ও কোনো প্রকার অধিকার স্বীকৃত ছিলো না। বধূ হিসেবে একজন নারীকে চরম অমর্যাদা ও অপমান ভোগ করতে হতো এবং তার সাথে নিতান্তই দাসী-বাঁদীর ন্যায় আচরণ করা হত। মানুষ হিসেবে স্বামী জীবন ধারণের জন্যে যেসব উপকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতো, স্ত্রীর জন্যেও তা প্রয়োজন করতো, স্ত্রীর জন্যেও তা প্রয়োজন একথা স্বামী চিন্তাও করতো না। এ পৃথিবীতে কেবলমাত্র ইসলামই নারীকে তাঁর প্রকৃতি অনুযায়ী সঠিক প্রাপ্য ও মর্যাদা দান করেছে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে অধিকার রয়েছে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীরও সমপর্যায়ের অধিকার রয়েছে। স্ত্রীর সাথে যদি বনিবনা না হয়, তাহলে সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বনে তার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যেতে হবে। মতের মিল না হলে তার ওপরে কোনো ধরনের নির্যাতন করা যাবে না, তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, তার প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দিয়ে পৃথক হতে হবে।

যেকোন বিচার বিশ্লেষণে, মানদন্ডে অথবা যুক্তিতে একজন মানুষের কাছে সবচেয়ে সম্মান-মর্যাদার ব্যক্তিত্ব হলেন তার জন্মদাতা মাতা-পিতা। মহান আল্লাহর পরেই মাতাপিতার স্থান। সন্তানের পক্ষে মাতাপিতার ত্যাগ-তীতিক্ষার বিনিময় দেয়া কখনো সম্ভব নয়। পৃথিবীতে এমন কোন আমল নেই, যে আমল করলে আল্লাহর সন্তুষ্টির অত্যন্ত দ্রুত অর্জন করা যায়। কিন্তু একমাত্র মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার এবং প্রাণভরে তার খেদমত করলে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি দ্রুত অর্জন করা যায়। পিতা-মাতা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পদ সন্তানের জন্য ব্যয় করেছেন। এখন সন্তান বড় হয়ে যে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করেছে, সে সম্পদ প্রয়োজনে অবশ্যই মাতাপিতার জন্যে ব্যয় করতে হবে। অথচ ইউরোপ-আমেরিকার তথা পাশ্চাত্য দেশসমূহে সন্তান তার পিতামাতার প্রতি কোনো দায়িত্ব অনুভব করে না। ১৮ বছর পূর্ণ হলে বা তার পূর্বেই সন্তান-সন্ততি বন্ধু-বান্ধব নিয়ে পৃথবভাবে বসবাস করতে থাকে। বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতা আশ্রয় গ্রহণ করে বৃদ্ধাশ্রমে। যা পিতামাতার জন্য চরম অপমানজনক বিষয়। এতে তাঁরা অসহায়বোধ করে। নিঃসঙ্গতা হয় তাদের জীবন সঙ্গী।

পিতা ও মাতা এ উভয়ের মাধ্যমেই মহান আল্লাহ পৃতিবীতে সন্তান প্রেরণ করেন। পিতা যেমন সন্তানের কল্পনা করা যায় না তেমনি মাতা ব্যতীতও সন্তানের আশা করা যায় না। সন্তানের জন্যে সব থেকে বেশি কষ্ট স্বীকার করে মা। এ কারণেই মায়ের কষ্টের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে ইসলাম পিতার তুলনায় মায়ের অধিকার বেশি প্রদান করেছে। মায়ের মর্যাদার কারণে মায়ের বোন খালার মর্যাদাও মহান আল্লাহ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। মায়ের সম্মান মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কোরআন-হাদীস যত কথা বলেছে, তা একত্রিত করলে গেলে বড় ধরনের গ্রন্থ হবে। কারণ নারী মায়ের জাতি, তাদের সম্মান-মর্যাদা সর্বাধিক। তাদের উচ্চ মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি দিয়েই ইসলাম ঘোষণা করেছে- 'মায়ের পায়ের নীচেই জান্নাত।' ইসলাম নারীকে পরাধীনতার অন্ধকার গহ্বর থেকে বের করে দাসত্বের নাগপাশা থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করিয়াছে। কন্যা হিসেবে, বধূ হিসেবে এবং মা হিসেবে নারীকে সম্মান মর্যাদার উচ্চ সোপানে আসীন করেছে। নারী জীবনের সকল স্তরে কোন একটি স্তরেও নারীকে পরাধীন করা হয়নি, করা হয়নি দয়া-দাক্ষিণ্যের মুখাপেক্ষী। প্রত্যেক স্তরেই নারীকে তাঁর প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দেয়ার জন্য পুরুষের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পাশ্চাত্য সমাজে নারীকে পরিণত করা হয়েছে পুরুষের দাসী, ভোগের সামগ্রী, চিত্তবিনোদন ও যৌন কামনা পূরণের উপকরণ হিসেবে। শয়তানের সহচরী হিসেবে আখ্যায়িত করে নারীর আত্মা বলে কিছুই নেই বলে অপবাদ দেয়া হয়। নারীর মৌলিক অধিকার হরণ করে তাকে পণ্য সামগ্রীতে পরিণত করেছেলো। নারীকে সম্মানজনক স্বাধীনতা ইসলাম দিয়েছে, তাঁর সকল অধিকার ইসলামই সংরক্ষণ করে তাকে তাঁর ইজ্জত আব্রুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পুরুষকে বাধ্য করেছে। নারী কোন উপকরণের সামগ্রী নয় বরং নারীই আদর্শ ও সুনাগরিক গড়ার কারিগর- এ কথা সর্বপ্রথম ইসলামই ঘোষণা করে তাকে স্বামী তথা পুরুষের কর্মে সহযোগিতা, স্বামীকে উৎসাহ, উদ্দীপনা, সাহস দান, পরামর্শ দোয়া এবং সন্তানকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ার দায়িত্ব ও অধিকার দিয়েছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ পূজারীদের কাছে নারী সমাজ ভোগ উপকরণের সামগ্রী হলেও ইসলামের দৃষ্টিতে তাঁরা মানবমন্ডলীর সম্মানিত মর্যাদার অধিকারিনী মায়ের জাতি। এ জন্যেই ইসলাম পুরুষদের পাশাপাশি নারী কেউ চিন্তাবিদ, গবেষক, শিক্ষাবিদ, সমাজবিদ, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, রাজনীতিবিদ ইত্যাদি হয়ে মানব সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার কাজে উৎসাহিত করেছে। ইসলামের বিধানে নারী পুরুষ সকলের জন্যেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের দায়িত্বও সকল শ্রেণীর মানুষের। ইসলাম নারীকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখার অধিকার দিয়েছে জীবন সাথী নির্বাচনে নারীকে মতামত জ্ঞাপনের অধিকার ইসলামই দিয়েছে এবং তাদের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ এবং স্বাধীন মত প্রকাশের স্বাধীনতাও ইসলাম দিয়েছে। নারীর অমতে তাকে জোরপূর্বক কারো সাথে বিয়ে দেয়া ইসলামী জীবন বিধানে বৈধ নয়।

ইসলাম মোহরানা ব্যতীত কোনো নারীকে বিয়ে করা পুরুষদের জন্য হারাম ঘোষণা করেছে। মোহরানা কম বেশি যাই হোক, তাতে যদি পাত্রী রাজী থাকে তাহলে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে, নতুবা নয়। কারণ মোহরানা নারীর অধিকার এবং এ অধিকার সামর্থ্য অনুযায়ী পুরুষদেরকে অবশ্যই নারীর প্রাপ্ত অধিকার বুঝিয়ে দিতে হবে। মোহরানা নারীর নিরাপত্তার অধিকার বা প্রতিক ভবিষ্যতের আশ্রয়স্থল। কোনো কারণে স্বামী যদি তাঁর স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটায় তাহলে তালাকপ্রাপ্তা নারী মোহরানার অর্থ-সম্পদ দিয়ে নিজের জীবন-ধারণের খরচ যোগাতে পারে। ইসলাম মোহরানা আদায়ের নির্দেশ দিয়ে নারীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছে এবং অন্যের মুখাপেক্ষীতা ও পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়েছে। মোহরানার অর্থ-সম্পদ একান্তভাবেই নারীর তথা পাত্রীর। এতে অন্য কারোর কোন অংশ নেই। নারীকে গড়ে তুলতে তার পেছনে অনেক খরচ হয়েছে, এ কথা বলে অভিভাবকগণ নারীর কাছ থেকে প্রাপ্ত মোহরানার অর্থ-সম্পদ কাউকে সম্পূর্ণ অংশ বা কিছু অংশ দেয়, তাহলে তা ভিন্ন কথা। স্ত্রী মোহরানার অর্থ-সম্পদ হালাল পন্থায় স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারবে। এ ব্যাপারে কেউ-ই হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। নারী ইচ্ছে করলে উক্ত অর্থ-সম্পদ দিয়ে ব্যবসাও করতে পারে অথবা নিজের কাছে যে কোন স্থানে গচ্ছিত রাখতে পারে। স্ত্রীর মোহরানার অর্থ-সম্পদে স্বামীর কোনো অধিকার নেই। এ অর্থ-সম্পদ কাজে লাগিয়ে স্ত্রীর যদি বিশাল-বিপুল অর্থ-সম্পদের মালিকও হয়, তবু এতে স্বামীর কোনো অংশ ধার্য্য হবে না।

স্বামীর জন্য অবশ্য কর্তব্য স্ত্রীকে উপহার তথা মোহরানা পরিশোধ করা। এ মোহরানার সম্পদের পরিপূর্ণ মালিকানা স্ত্রীর নিজের, স্বামী বা পরিবারের সদস্য বা অন্য কারো এতে অধিকার নেই। কিছু কিছু মুসলিম সমাজে এ মোহরানার পরিমাণ হয়ে থাকে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) ডলারের সমপরিমাণ পর্যন্ত হীরা।

তালীম হয়ে গেলেও তার সে সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হয় না। স্ত্রী স্বেচ্ছায় না দিলে তার মালিকানাধীন সম্পত্তিতে স্বামীর বিন্দু মাত্রও অধিকার নেই।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

"তোমরা খুশি মনে তোমাদের স্ত্রীদেরকে মোহরানা দিয়ে দাও। তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে কোন অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা স্বাচ্ছন্দে ভোগ কর।"[৪৩] স্ত্রী তার নিজস্ব সম্পদে ইচ্ছামত হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে। কেননা তার নিজের ও তার সন্তানদের জীবন পরিচালনা করার দায়িত্ব স্বামীর উপর ন্যস্ত।

স্ত্রী যতই ধনী হউক না কেন পরিবারের কোন খরচ পরিচালনা করা তার জন্য আবশ্যক নয় তবে যদি সে করে তা ভিন্ন কথা। স্বামী মারা গেলে সে যেমন তার উত্তরাধিকারী সম্পদে অংশীদার হবে তেমনি স্ত্রী মারা গেলেও স্বামী তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। ইসলামে বিবাহের পরেও স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা ও বংশগত ঐতিহ্য অবশিষ্ট থাকে।

একবার এক আমেরিকান বিচারক বলেছিলেন, "মুসলিম নারীরা সূর্যের মতই স্বাধীন। দশবারও যদি এরা বিবাহ করে তবুও তারা তাদের স্বাধীনতা ও বংশ পরিচয় ধরে রাখতে পারে।"

ইউরোপীয়রা এগুলো শেখার কয়েকশত বছর আগে থেকেই মুসলিম মা, স্ত্রী, কন্যা ও বোনেরা তাদের আত্মীয় স্বজনের সম্পত্তিতে অধিকার ভোগ করে আসছে। কোরআন শরীফে ওয়ারিসদের অংশ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে বিস্তারিতভাবে সূরা নিসা- ৭, ১১, ১২ ও ১৭৬ নং আয়াতে, কয়েকটা অবস্থা ব্যতীত নারীর সে অংশ হচ্ছে পুরষের অর্ধেক।[৪৪]

স্বামী তার স্ত্রীকে যে উপহার দিয়ে তালাক দিলেও সে উপহারের একচ্ছত্র অধিকার থাকবে স্ত্রীর। স্ত্রীর জন্য স্বামীকে উপহার দেয়ার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ইসলামে সন্তান সন্ততি ও স্ত্রীর খরচ বহন করা স্বামীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। স্ত্রীর উপর এ সমস্ত খরচের কোন দায় দায়িত্ব নেই। তবে নিজে করতে চাইলে আলাদা কথা। তার মালিকানাধীন সমস্ত সম্পদে রয়েছে তার একচ্ছত্র মালিকানা। ইসলাম বিবাহকে পবিত্র বন্ধন হিসেবে আখ্যা দিয়ে যুবকদেরকে বিবাহের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে এবং তালাকের প্রতি বিতৃষ্ণা সঞ্চার করে দিয়েছে। নারীদের চেয়ে পুরুষের অর্থনৈতিক দায়িত্ব অনেক বেশী। তাই সমস্ত মত বিরোধ থেকে বেরিয়ে এসে উত্তরাধিকারী সম্পদের বিধানে সমতা স্থাপন করা হয়েছে। এক ইংরেজ মুসলিম মহিলা বলেছিলেন ইসলাম শুধু নারীর প্রতি ইনসাফ করে নি, বরং তাকে সম্মানের আসনে বসিয়েছে।

ইসলাম পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পাল্লা ভারী করে দিয়েছে। সংসারের যাবতীয় ব্যয় তার পুরুষের উপর অর্পন করা হয়েছে। আবার বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর চেয়ে পুরুষের স্বাধীনতা বেশী। নারী একই সময়ে বহু বিবাহ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্তাকারে কিন্তু স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় তাফসীরের মা আরেফুল কোরআনের সূরা আল-নিসার ২৪নং আয়াতের প্রথম অংশটুকুকে কেন্দ্র করে। আয়াতটিকে ইরশাদ হয়েছে- এবং তোমাদের অধিকারভূক্ত ক্রীতদাসীরা ব্যতীত সধবা (অন্যের বিবাহাধীন) নারীদেরকেও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটা তোমাদের জন্যে আল্লাহর বিধান। উল্লেখিত কয়েক প্রকার নারী ব্যতীত অন্য সব নারীকে অর্থ ব্যয় করে বিয়ে করার জন্য পেতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে; তবে অবৈধ যৌন কর্মের জন্য নয়। অতএব এদের মধ্য থেকে যাদের সাথে তোমরা (বিয়ের পর) যৌন সম্ভোগ করবে তাদেরকে তাদের নির্ধারিত পাওনা (মোহরানা) দিয়ে দিবে। (মোহরানা) নির্ধারণের পর পারস্পরিক সম্মতিতে কোন হ্রাস বৃদ্ধি করলে তোমাদের কোন পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রাজ্ঞ।

এর মমার্থ হচ্ছে এই যে, যেসব মেয়ে প্রকৃতিগতভাবে তোমাদের মনঃ পূত এবং শরিয়তের দৃষ্টিকোন থেকে বৈধ হয় কেবল তাদেরকেই বিয়ে করতে পার।

অর্থনৈতিক দায়িত্ব সম্পূর্ণতই পুরুষের কাঁধে অর্পিত। বিয়ের পর স্বামীর উপরই নারীর ভরণ- পোষণের দায়িত্ব বর্তায়। ভরণ-পোষণ কার্য পরিচালনার জন্য যে উপার্জনের প্রয়োজন হয় তা যদিও পুরুষ বা স্বামীর দায়িত্বে হওয়াই বাঞ্চনীয় বা শরিয়তের বিধান; কিন্তু তারপরও তাতে স্ত্রীর অধিকার থাকে উল্লেখযোগ্য। এর যথাযোগ্য প্রমান মেলে রাসূলুল্লাহ (সা:) বর্ণিত বাণীর আলোকে। বুখারী শরীফে সংকলিত একটি হাদিসে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত বাণীর আলোকে। বুখারী শরীফে সংকলিত একটি হাদিসে আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত আছে, নবী করিম (সা:) বলেছেন- যখন কোন স্ত্রী নিজের স্বামীর ঘর থেকে গরীব দু:খীকে অন্ন দান (বা অর্থ দান) করে, অনিষ্ট ও ক্ষতিসাধন পর্যায়ে নয়, তখন সেই স্ত্রী নিজের দান কার্যের সওয়াবের অধিকারিনী হয় এবং স্বামীও নিজের অর্জিত অন্ন বা ধন খরচ হওয়ার সওয়াব লাভ করে। এমনকি সেই ধনের কোষাধ্যক্ষও সওয়াব লাভ করে।

হাদিসটি যদিও প্রত্যক্ষভাবে দান খয়রাতের মাহাত্ম বর্ণনা করে তথাপি পরোক্ষভাবে এতে স্বামীর সম্পদের বা ধনের উপর স্ত্রীর অধিকারের বিষয়টিও প্রস্ফুটিত হয়।[৪৫]

ইসলাম নারী জাতির সার্বিক কল্যাণের স্বার্থেই একদিকে যেমন পুরুষকে দিয়েছে নারীর কর্তৃত্ব; অপর দিকে তেমনি তার সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ তথা সুশাসন থেকে নায্য চাহিদা পূরণের সমস্ত দায়ভারও পুরুষের কাঁধেই অর্পণ করেছে। এ সম্পর্ক বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল করিম (সা:) তার উম্মতদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ প্রদান করেন যে, পুরুষ নারীদের উপর কর্তৃত্বপ্রাপ্ত, অতএব, হে পুরুষগণ! নারীদের সম্পর্কে আল্লাহতায়ালার ভয় অন্তরে জাগ্রত রেখ। তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের হক আছে, স্ত্রীদেরও হক তোমাদের উপর রয়েছে। তোমাদের বড় হক তাদের উপর এই যে, তারা তোমাদের বিছানায় অন্যকে স্থান দেবে না; যা তোমাদের অগ্রহণীয় (নিজের সত্বীত্ব সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করবে) এবং এই হক যে, তারা এমন কোন কাজ করবে না যা সুস্পষ্ট নির্লজ্জতা, ফাহেশা ও বেহায়াপনা; যদি এমন কাজ করে তাহলে তোমাদের জন্য অনুমতি আছে শয্যায় তাদের থেকে বিমুখ বিরাগী হয়ে থাকা; আরও প্রয়োজন হলে শাস্তিও দিতে পার, কিন্তু আঘাতজনিত প্রহার করতে পারবে না। শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় যদি নিলর্জ্জ কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়ে যায়, তবে ভদ্রোচিত খোরপোষের পূর্ণ অধিকার তাদের জন্য প্রকৃতিতে থাকবে। নারীদের সম্পর্কে আমার বিশেষ নির্দেশ পালন কারো যে, তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার বজায় রাখবে, তারা তোমাদের স্বামীত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে, স্বেচ্ছাধীন তোমাদেরকে পরিত্যাগ করে নিজের পথ নিজে গ্রহণ করার সুযোগ তাদের নেই। তোমরা তাদেরকে লাভ করেছ আল্লাহর আমানত হিসেবে এবং তাদের সতীত্বকে নিজের জন্য হালাল করতে পেরেছ আল্লাহর বিধানের অধীনে। সেই আল্লাহর রাসুল আমি তাদের সম্পর্কে তোমাদের এসব নির্দেশ দিলাম।[৪৬]

উপরোক্ত কোরআন সুন্নাহ ভিত্তিক আলোচনায় নারী-পুরুষের পারস্পরিক দায় দায়িত্ব ও অধিকারের যে প্রকৃত রূপটি পরিদৃষ্ট হয়, তাতে একথা দ্বার্থহীনভাবে বলা যায় যে,বাস্তবিক চিত্রপটে আমরা নারী-পুরুষের মধ্যে যতই অমানবিক ব্যবধান অবলোকন করি না কেন ইসলামের ভূমিকা সেখানে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী।[৪৭]

সমাজ, সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ার ক্ষেত্রে এককভাবে পুরুষকে ক্ষমতা দেয়া হয়নি। মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের যৌথ প্রচেষ্টায়, শ্রম ও মেধায় পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি বিনির্মাণ করবে। দেশ ও জাতিকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং এ কাজ করতে গিয়ে যা কিছু শুভ সুন্দর তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে উভয়ে যৌথভাবে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করবে। আর যা কিছু অশুভ অসুন্দর তা সমাজ ও দেশ থেকে মূলোৎপাটন করার কাজেও অনুরূপ ভূমিকা পালন করবে।

নর-নারী উভয়ের প্রত্যক্ষ অবদানে এই পৃথিবীর মানব সভ্যতা সচল রয়েছে। মানব বংশবৃদ্ধিকরণে একা নর বা নারী কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে উভয়েরই অবদান রয়েছে এবং সর্বাধিক ত্যাগ-তিতীক্ষা বরন করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে নারী। নারী বৃদ্ধি করেছে মানব সম্প্রদায়ের সম্মান-মর্যাদা। এ জন্যে সমগ্র মানবতাই নারীর কাছে চিরকালেই জন্য ঋণী। নারীকে ঘৃণা করে বা তাকে অবহেলিত দৃষ্টিতে রেখে কোনো সমাজ উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারেনি। দেশ ও জাতির উন্নয়নের নামে নারীকে তার যোগ্যস্থান থেকে বের করে এনে পুরুষদের কামনা-বাসনা পূরণের উপকরণে পরিণত করার পথও ইসলাম রুদ্ধ করে দিয়েছে। ইসলামের নারী সাহাবীগণ শালীনতা বজায় রেখে সমাজ ও জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। নারী তার অর্জিত জ্ঞান ও যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে তা কিভাবে ব্যবহার করেছে, সর্বোপরি আদর্শ নাগরিক গড়ার ব্যাপারে তারা কি ভূমিকা পালন করেছে, এ ব্যাপারে তাদেরকে অবশ্যই আখিরাতের আদালতে জবাবদিহি করতে হবে। তবে নারী তার নিরাপদ স্থান থেকে ভূমিকা পালন করবে এবং পুরুষও তার জন্য নির্ধারিত স্থান থেকে ভূমিকা পালন করবে।

ইসলামের সোনালী যুগ ছিল খিলাফতকাল। খিলাফতের ২৭ বছর এবং তৎপরবর্তী আরও সাতশত বছর ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। সে সময়ে নারীদের যে ইজ্জত ও সম্মান ছিল, তাঁরা যে মর্যাদার আসনে ক্ষমাসীন ছিলেন আধুনিক বিশ্বের কোথাও সেই মর্যাদা অদ্যবধি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। সে সময়ের নারীরা জগতের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রেখেছিলেন। হযরত আয়েশা (র.) হাদীস অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, ইবনে মেজাহ, নাসাঈ, আবুদাউদসহ বিখ্যাত মুহাদ্দিসিন তাঁদের গ্রন্থাবলীতে হযরত আয়েশা (র.), আসমা (র.), উম্মে সালমা (র.) প্রমুখের বর্ণিত হাদিস সংকলন করেছে। হযরত আয়েশা (র.) তাফসির শাস্ত্রের বিজ্ঞ ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) এর স্ত্রী শিল্প ও কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি দক্ষতার সাথে কারিগরী বিদ্যা কাজে লাগিয়ে সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতেন। বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করতেন এবং সেগুলো বাজারে বিক্রয়

করে উপার্জিত অর্থে সংসার চালাতেন। হযরত আবু বকর (র.)-এর কন্যা এবং হযরত জুবায়ের (র.)-এর স্ত্রী হযরত আসমা (র.) বাড়ি থেকে দু'মাইল দূরের খেজুর বাগান থেকে খেজুরের আটি বহন করে আনতেন।

**৪.৫. বাংলাদেশের সংবিধানে প্রদত্ত নারীর সাংবিধানিক মর্যাদা ঃ**

ভারত, পাকিস্তান এবং নারী বিষয়ক আইন প্রায় একই রকম। কারন বাংলাদেশের জনগন একটি সাধারন ঐতিহাসিক অধিকার ঐতিহ্যর অধিকারী নারীদের আইনগত মর্যাদাকে সামাজিক উন্নয়ন হিসেবে চিন্তা করলে চলবে না। একজন নারী দেশের সার্বিক উন্নয়নে কতটুকু সমঅধিকার লাভ করবে তা দেখতে হবে। আমাদের দেশের মোট জনগোষ্ঠির প্রায় অর্ধেক নারী । প্রথমত, তারা জীবনে কারো না কারো নিয়ন্ত্রণে থাকে। দ্বিতীয়ত, সম্পত্তির মালিক হলেও অজ্ঞতা ও মানবিক কারণে আলাদাভাবে তারা প্রাপ্ত সম্পত্তি ভোগ করতে চায় না। একজন নারী স্বামীর নির্যাতনের শিকার হলে তার মুখের কথার কোনো ভিত্তি নেই। নিরপেক্ষ এক বা একধিক স্বাক্ষীর প্রয়োজন । এছাড়া আমাদের দেশের অধিকাংশ নারী অশিক্ষিত এবং গ্রামে জীবন যাপন করে বলে তারা তাদের সংবিধানিক এবং প্রথাগত ধর্মীয় অধিকার সম্পর্কে অবিহত নন। তারা তাদের অধিকারসমূহ হতে বঞ্চিত হলে সেই অধিকরসমূহ লাভ করার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেনা। কারণ নারীরা আর্থিকভাবে দুর্বল এবং ব্যক্তিভাবে দুর্বল ও অসহায়।

অর্ধেক জনগোষ্ঠিকে উন্নয়নে ব্যবহার না করলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব না। নারীর আইনগত মর্যাদা বলতে আমার সেই সমস্ত অধিকারকে বুঝবো যা একজন নারী সাংবিধানিক, সামাজিক, ধর্মীয় প্রথাগত আইনের মাধ্যমে লাভ করছে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা বাংলাদেশর নারীদের আইনগত মর্যাদাকে সামাজিক আইন এবং ব্যক্তিগত আইন এই দুভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় অঙ্গীকার করা হয়েছে যে, এই সংবিধান এমন একটি দেশ ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে। সংবিধানে নাগরিক বলতে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী এবং আইনানুগ নাগরিকত্বপ্রাপ্ত সকল নারী এবং পুরুষকে বুঝানো হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অধিকার সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ সমূহ বর্ণনা করা হলো।

**অনুচ্ছেদ ১০ ঃ জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ ঃ**

জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

**অনুচ্ছেদ ১৫ ঃ মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা ঃ**

ঘ. সামাজিক নিরাপত্তা অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃ-পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাব গ্রস্থতার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার।

**অনুচ্ছেদ ১৭ ঃ অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ঃ**

(ক) রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গনমুখি ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা_নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

**অনুচ্ছেদ ১৮ ঃ জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা ঃ**

(২) গনিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

**অনুচ্ছেদ ১৯ ঃ সুযোগের সমতা ঃ**

(১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবেন।

**অনুচ্ছেদ ২৭ ঃ আইনের দৃষ্টিতে সমতা ঃ**

সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমতা আশ্রয় লাভের অধিকারী।

**অনুচ্ছেদ ২৮ ঃ ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য ঃ**

(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবেন না।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা করা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।

(৪) নারী বা শিশুর অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যেকোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।

**অনুচ্ছেদ ২৯ ঃ সরকারী নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা ঃ**

(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক পজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবে না কিংবা সেই সেই ক্ষেত্রে তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।

**৬৫ নং অনুচ্ছেদ ঃ সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন ঃ**

**ধারা-৩ ঃ**

সংসদে মহিলাদের জন্য ১৫ টি আসন ১০ বছরের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। এ ১৫টি আসনে মহিলা সাংসদগণ সংসদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ৩০০ সদস্য দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন। ১৯৭৮ সালে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বাড়িয়ে ১৫ থেকে ৩০ করা হয় এবং মেয়াকাল ১০ বছর থেকে ১৫ বছর করা হয়। ১৯৮৮ সালে চতুর্থ সংসদে কোনো মহিলা সাংসদ ছিলেন না। কারণ ৬৫ ধারার এই উপধারা ১৯৮৭ এর ডিসেম্বরে স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৯০ সালে ১০ম সংশোধনীর সামধ্যমে সংবিধানে ব্যবস্থাটি পুনরায় বলবৎ করা হয়। ২০০৪ সালের প্রস্তাবিত চতুদর্শ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদে নারী আসন সংখ্যা ৪৫ এ উন্নীত করা হয়। এ সাংসদ সদস্যগণ"সংসদের ৪৫ সেট অলংকার" নামে পরিচিত।

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭, ২৮ (১), ২৮(২), ২৮(৩), ২৮(৪), ২৯(১), ২৯(২) এবং ৬৫(৩) নং ধারা অনুযায়ী নারী পুরুষদের মধ্যে কোনো ধরনের বৈষম্য রাখা হয়নি। তারপরও দেখা যায় রাজনীতিতে নারী পুরুষের অবস্থান সমপর্যায়ে নেই। এক্ষেত্রে পুরুষরা অগ্রগামী ও নারীরা পশ্চাতপদ। এ চিত্রটি, বাংলাদেশের সকল পর্যায়েই নারীর অবস্থান এরূপ। সংসদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের নামে নারীদেরকে জিম্মি করে রেখেছে রাজনৈতিক নেতারা। নারীরা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত না হয়ে সংসদ সদস্যদের হাতের পুতুল হয়ে থাকেন।

**জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব ঃ**

আমাদের দেশে এমন অনেক আইন প্রচলিত আছে যেগুলোর দ্বারা স্বামীর সাথে স্ত্রীকে এক করে দেখা হয়। স্ত্রীরা স্বামীর পরিচয়ে পরিচিত হয়। নাগরিকত্ব আইন (১৯৫১) অনুযায়ী স্বামীর নাগরিকত্ব অনুযায়ী স্ত্রীর নাগরিকত্ব নির্ধারণ হবে। দন্ডবিধি আইন (১৯৫৬) অনুযায়ী ঋণখেলাপীর কারণে নারীদের গ্রেফতার হতে অব্যাহত প্রদানের কথা বলা হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী স্বীকৃত অধিকারসমূহ পর্যালোচনা করে আমরা বলতে পারি, উপরোক্ত বিধানদ্বয়ে নারীদের অগ্রসরতার লক্ষ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের পক্ষে আইনগত ও সাংবিধানিক ছত্রছায়া প্রদান করা হলেও নারীদের মর্যাদাকে নিম্নগামী করে দেখা হয়েছে। নারীদের মর্যাদার ক্ষেত্রে যে বৈষম্য তা মৌনভাবে হলেও সংবিধান প্রণেতাগণ দিয়েছেন। আমাদের মোট জনসংখ্যায় ৪৮ শতাংশ নারী হওয়া সত্ত্বেও সংবিধানে পুরুষ প্রাধান্য বজায় রাখা হয়েছে। নারীদের জন্য "সংরক্ষিত আসন" এবং এই আসনে পরোক্ষ নির্বাচন বা মনোনয়ন দান তাদের সম্পদ অসংরক্ষিত এই উক্তিগুলো এর পরিচয় বহন করে।

সংবিধানে সমতার কথা বলা হলেও বাংলাদশের নাগরিকত্ব সম্পর্কিত আইনগুলো নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক।[৪৮] বাবার নাগরিকত্ব স্বাভাবিক নিয়মে সন্তানের উপর অর্পিত হওয়ার বিধান থাকলেও মায়ের নাগরিকত্ব সন্তানের উপর অর্পিত হয় না, নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য খুবই অবমাননাকর। উপরন্তু বাংলাদেশে পুরুষের বিদেশী স্ত্রীকে নাগরিকত্ব দেয়া গেলে বাংলাদেশী নারীর বিদেশী স্বামীকে নাগরিকত্ব দেয়ার কোন বিধান নেই। নাগরিকত্ব সম্পর্কিত বর্তমান বৈষম্য দূরীকরণের জন্য বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন ১৯৫১ এর ধারা ৫ এবং বাংলাদেশ নাগরিকত্ব

(অস্থায়ীবিধান) আদেশ ১৯৭২-এর সংশোধন প্রয়োজন। ১৯৯৭ সালে সিডো কমিটির কাছে দেয়া প্রতিবেদনে এই আইন সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিলে সরকার তা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে।[৪৯] চতুর্থ প্রতিবেদনে সরকার বলেছে যে, নাগরিকত্ব অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা বিধানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এই আইনগুলো উপনিবেশিক যুগের এবং সাম্প্রতিক সময়ে তা পর্যালোচনা বা পরিবর্তন করা হয় নি।[৫০]

১৯৯৭ সালের এই প্রতিবেদন পেশের পর সুপ্রীম কোর্টে এ সংক্রান্ত একটি পিটিশন দাখিল করা হয়। যেখানে বলা হয় যে, সংবিধানে বর্ণিত সকলের সমান অধিকার এবং নারী-পুরুষের সমনাধিকার সংক্রান্ত বিধানগুলোর নাগরিকত্ব বিষয়ক অন্যান্য আইনের উপর স্থান পাওয়া উচিত। যেখানে কিনা শিশুর শুধু পিতা কিংবা পিতামহের নাগরিকত্ব নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে।[৫১]

**অভিভাবকত্ব এবং হেফাজতকারী ঃ**

ইসলামে অভিভাবকত্ব এবং হেফাতকারী বা হেফাজত রাখার মধ্যে পার্থক্য আছে। ইসলামী আইন অনুযায়ী মা কখনো তার সন্তানদের অভিভাবক হতে পারে না। সন্তানদের অভিভাবক হচ্ছে বাবা। মা ছেলেদের সাত বছর পর্যন্ত এবং মেয়েদের সাবালিকা না হওয়া পর্যন্ত নিজ হেফাজতে রাখতে পারে। মা যদি অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে বা নিজ ছেলেমেয়েদের সুষ্ঠভাবে লালনপালন না করে তাহলে মা ছেলেমেয়েদের হেফাজতে রাখতে অধিকার হারাবেন।

১৯৮০ সালের পৌষ্য আইনে এ উপরোক্ত প্রচলিত নিয়মনীতির পরিবর্তন করে তালাকপ্রাপ্ত মা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও মা তার ছেলেমেয়েদের কাছে রাখতে পারবে। আদালত যদি এ মর্মে উপলিব্ধ করে যে, বাবার অধীনে ছেলেমেয়েরা থাকলে তাদের অবহেলা হবে। কিন্তু এখানে ছেলেমেয়েদের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকবে। মায়ের কাছে ছেলেমেয়েরা থাকলেও তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব হলো পিতার । এমনকি যদি পিতা ছেলেমেয়েদের মায়ের কাছে থেকে জোরপূর্বক নিয়ে যায় তাহলে মা ছেলেমেয়েদের তার হেফাজতে রাখার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবে। এতদসত্ত্বেও মা তার ছেলেমেয়েদের অভিভাবকত্ব দাবি করতে পারবে না বা অভিভাবক করতে পারবে না। ছেলের সম্পত্তির উপর মায়ের কোনো দখল নেই। এমনকি নাবালকের সম্পত্তিও মা বিক্রি করতে পারবে না।

নারীর সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেছে উন্নয়নে নারীর সক্রিয় অংশ গ্রহণের পরিকল্পনা- যার অধীনে রয়েছে "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি", "নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা" প্রভৃতি। এছাড়া স্থানীয় সরকার শাসন ব্যবস্থায় নারীদের করা হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য। মেধাবী ছাত্রীদের জন্য দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ দেয়া হয়েছে। বিধবা-অসহায় বয়স্ক মহিলাদের দেয়া হচ্ছে বয়স্ক ভাতা।

**বাংলাদেশে প্রচলিত পারিবারিক আইনে নারীর আইনী অধিকার ঃ**

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক হচ্ছে নারী সমাজ। অথচ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তারা কেবল পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে নেই- অর্থনৈতিক সামাজিক ও পারিবারিক কারণে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল। নানা রকম নির্যাতন, অত্যাচার, বৈষম্য মুখ বুজে নীরবে সহ্য করে যায় এই দেশের বেশীর ভাগ নারী। যৌতুকের নির্মম অত্যাচারে বিয়ে হচ্ছে না অসংখ্য মেয়ের। আবার বিবাহিত মেয়েরা প্রতিনিয়ত নিহত হচ্ছে। অত্যাচারিত হয়েও অসংখ্য মেয়ে মুখ বুজে স্বামীর সংসারে আঁকড়ে আছে কেবল আশ্রয় হারাবার ভয়ে আর সন্তানের মায়ায়। নিজের স্বার্থ, সুখ ও স্বাচ্ছন্দের জন্য পুরুষ অনেক ক্ষেত্রে নারীর প্রতি নির্বিচারে অত্যাচার চালিয়ে যায়।

বাংলাদেশে এ নারী সমাজ এই অবস্থায় কোন রকম প্রতিকার-প্রতিবাদ প্রতিরোধ করতে পারে না। নীরব হয়ে থাকতে হয়। কারন আইনে কি কি অধিকার পেয়েছে তা সে জানে না। যদি জানেও কিভাবে এই সব অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হয় সে বিষয়ে সে একেবারে অজ্ঞ এবং অসহায়। বাংলাদেশ স্বাধীনতার আগে থেকেই পারিবারিক সামাজিক নির্যাতন বন্ধের জন্য এদেশের নারী সমাজ ও নারী সংগঠনগুলো নারীর স্বার্থে পারিবারিক আইন সংশোধনের জন্য সংগ্রাম করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে এদেশের নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল জনগণ অংশ নিয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের নতুন সংবিধান রচিত হলো ১৯৭২ সালে। অনেক আইনে বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধিত হয়েছে। আজ পর্যন্ত এদেশের নারী সমাজ যে সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবাকি নির্যাতন ভোগ করছে প্রতিটি ক্ষেত্রেই আন্দোলন, সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে এবং বাংলাদেশ সরকার এই দেশের শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত নারীদেও কিছু আইন সংশোধন ও প্রণয়নের কথা বলেছেন। বর্তমানে যে সকল আইন নারী সমাজে স্বার্থে রচিত বলে প্রচলিত রয়েছে সেগুলো এখানে তুলে ধরা হলো।

**বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যক্তিগত আইনের অবস্থান ঃ**

এ প্রসঙ্গে বলতে গেলে প্রথমেই ব্যক্তিগত আইন বলতে কি বুঝায় সে বিষয়ে পরিস্কার ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। ব্যক্তিগত আইন মূলত সেই সকল আইন যার সৃষ্টির কোন সমষ্টির মধ্যে প্রচলিত ধর্মীয় বিধান হতে এবং যা কেবল ঐ ব্যক্তি সমষ্টির জন্য প্রযোজ্য।

সাধারণ দেখা যায় ব্যক্তিগত আইনে ব্যক্তির জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় বিধি-বিধান থাকে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি সমষ্টির ব্যক্তিদেরকে ঐ বিধা-বিধানের নিয়ন্ত্রণে রেখে ঐ বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ব্যক্তির জীবনাচার জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, সম্পত্তি অধিকার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা। তাই সাধারণ দেখা যায়, ব্যক্তিগত আইনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে-

১। ব্যক্তির একান্ত বিষয় (যেমন- বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি) সম্পর্কিত আইন।

২। ব্যক্তির সম্পত্তি বিষয়ক আইন।

৩। সম্পত্তি রক্ষা দান, উইল, বিক্রয় বিষয়ক আইন।

৪। ব্যক্তি সমষ্টির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কিত আইন (যেমন-স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, পিতা দত্তক পুত্র সম্পর্ক ইত্যাদি)।

**বাংলাদেশের প্রধানত তিন ধরনের ব্যক্তিগত আইন প্রচলিত ঃ**

(ক) প্রচলিত মুসলিম পারিবারিক আইন এর জন্য

(খ) প্রচলিত হিন্দু পারিবারিক আইন এর জন্য

(গ) প্রচলিত খ্রিষ্টান পারিবারিক আইন এর জন্য।

বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজাতীয়দের জন্য কোন আইন নেই। ঐ সকল উপজাতীয় সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ব্যক্তিগত বিষয়ে সম্পর্কিত কার্যাদি এ সমস্যাদি সমাধান করে। বাংলাদেশে মোটামুটি ১৫টির মতো উপজাতি সম্প্রদায়ের অবস্থান রয়েছে। এর মধ্যে চাকমা, মগ, মুরং ও খুমী সম্প্রদায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শাওতাল, রাজবংশী, খাসিয়া, গারো, হাজং, সিন্ধা, হাদি, পাপিয়া, মণিপুরী ও ত্রিপুরা সম্প্রদায় মূলত হিন্দু ধর্মাবলম্বী, পরে এদের কেউ কেউ ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এই উপজাতিগুলোর কোন বাধা পারিবারিক আইন নেই। নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রথা, সংস্কৃতি ও গোত্র প্রধানের উপর ভিত্তি করেই তাদের পারিবারিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্যও প্রয়োজন লিখিত সংবিধিবদ্ধ আইন। এই ধরনের আইনগত বৈচিত্র একটি আধুনিক রাষ্ট্রের শুধুমাত্র অপ্রয়োজনীয় নয়- অপ্রযোজ্য ও অপ্রয়োগযোগ্য। কেননা এ ধরনের আইন সমূহ মানুষকে সম্প্রদায়িক করে তোলে। ফলে সমাজে বড় ধরনের শ্রেণী বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। ফলে কোন কোন আইনের জন্য একটি সম্প্রদায় সামাজিকভাবে এগিয়ে যায়, আবার অন্যরা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে শোষিত হয়।

**(ক) বাংলাদেশে প্রচলিত মুসলিম পারিবারিক আইন ঃ**

**বিবাহ ঃ** মুসলিম আইন অনুযায়ী বিয়ে হল একটি আইনগত বিধান ও দেওয়ানী চুক্তি। মুসলিম পারিবারিক আইনে পুরুষের ক্ষেত্রে ২১ বৎসর ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ বৎসর বয়স পূর্ণ হলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে মুসলিম আইনে বিয়ে তিন প্রকার-

**(১) বৈধ বা সহি বিয়ে ঃ**

বৈধ বিয়ের ফলে স্ত্রী মহর, ভরণপোষণ ও স্বামীগৃহে বসবাসের অধিকারী হন। এ সঙ্গে বিশ্বস্ত ও স্বামীর বাধ্য থাকা, স্বামীর সঙ্গে যৌন মিলনে সম্মতি দেয়া ও ইদ্দত পালনের কর্তব্য স্ত্রীর উপর ন্যস্ত হয়। এর ফলে পক্ষগণের মধ্যে নিষিদ্ধ পর্যায়ভুক্ত সম্পর্ক (Prohibited degrees of relationship) সৃষ্ট হয় ও পারস্পরিক ওয়ারিশত্বের অধিকার জন্মে। তবে বিয়ের ফলেই স্ত্রীর সম্পত্তিতে মুসলিম স্বামীর কোন স্বার্থ (Interest) সৃষ্টি হয় না।

**বৈধ বিয়ের বৈশিষ্ট্য ঃ**

১. সন্তান বৈধ হবে,

২. স্ত্রী দেনমোহর, খোরপোষ ও ভরণ-পোষণ পাবার অধিকারী হবে,

৩. সন্তান পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে,

৪. স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে।

৫. স্বামী বা স্ত্রী কেউই পরস্পরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না।

প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া স্বামী যদি দ্বিতীয় বিয়ে করে তবে প্রথম স্ত্রী আদালতের শরণাপন্ন হয়ে স্বামীকে শাস্তি দিতে হবে।

স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের অভিযোগ প্রমাণিত হলে স্বামীর এক বৎসর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হতে পারে।

আইনগতভাবে একটি মুসলিম বিয়েকে বৈধতা দান করতে হলে উপরের প্রতিটি শর্ত অবশ্যই পালনীয়। কারণ বিয়ের সময় বা বিয়ের পরে যে কোন সময় বিয়ে বিচ্ছেদের ফলে/স্বামীর মৃত্যুর পর বিয়ে নিয়ে নানা সমস্যার শুরু হয়। এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্যই একটি বৈধ বিয়ে সকল শর্ত পালন করা অবশ্যই কর্তব্য।

(২) **অবৈধ বা বাতিল বিয়ে ঃ**

বাতিল বিয়ে কোন বিয়েই নয় বিধায় এর ফলে পক্ষগণের মধ্যে কোনরূপ দেওয়ানী অধিকার বা কর্তব্যেও সৃষ্টি হয় না। এরূপ বিয়ের সন্তান-সন্ততি অবৈধ।

যে ধরনের বিয়ে আইনের দৃষ্টিতে একদমই গ্রহণযোগ্য নয় তাদের বাতিল বা অবৈধ বিয়ে বলে, এমন কিছু সম্পর্ক আছে যাদের মধ্যে বিয়ে মুসলিম আইনে নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ সম্পর্ক আছে এমন কারো সাথে বিয়ে হলে সে বিয়ে অবৈধ এবং বাতিল হকে। যেমন-

(ক) রক্তের সম্পর্ক আছে এমন কাউকে বিয়ে করলে, অর্থাৎ ছেলেদের ক্ষেত্রে-

১। মা-নানী-দাদী-সৎমা।

২। কন্যা-নিজ কন্যা-কন্যার কন্যা-পুত্রের কন্যা (নাতনী)।

৩। সহোদর বোন-পিতা বা মাতার দিক দিয়ে সৎ বোন।

৪। ভাতিজী বা ভাগ্নী।

৫। ফুফু-আপন ফুফু-পিতার সৎবোন (সৎ ফুফু)। একইভাবে পিতা বা পিতামহের আপন ফুফু ও মাতা ও মাতামহের আপন ফুফু ও মাতা ও মাতামহীর আপন ফুফু।

৬। খালা-আপন খালা-সৎ খালা এবং পিতা ও মাতার খালাগণ।

কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় বিয়ে করতে গেলে আত্মীয়তার কারণে কিছু সম্পর্কের ব্যক্তিদের বিয়ে করতে পারবে না। এরা হলো-

১। স্ত্রীর কন্যারা বা নাতনীরা যত নিচের দিকেই হোক।

২। পুত্রবধূ, পুত্রের পুত্রবধূ বা কন্যার পুত্রবধূর মত নিচের দিকেই হোক।

৩। পিতা বা মাতা উভয় দিক দিয়ে তাদের পিতা বা পিতামহের স্ত্রীগণ যত উপরের দিকেই হোক (দাদী শ্বাশুড়ী/নানী শ্বাশুড়ী প্রভৃতি) ।

৪। স্ত্রীর মাতা (শ্বাশুড়ী) ও তার পিতা ও মাতার দিকে মাতামহিগণ (শ্বাশুড়ীর দাদী/নানী)।

(খ) মেয়েদের ক্ষেত্রে একইভাবে বিবাহ নিষিদ্ধ সম্পর্কগুলো হচ্ছে-

১। বাবা-দাদা-নানা-সৎবাবা।

২। পুত্র-নিজপুত্র-পুত্রের পুত্র-কন্যার পুত্র।

৩। সহোদর ভাই-পিতা ও মাতার দিক দিয়ে সৎভাই।

৪। ভাতিজা ও ভাগিনা।

৫। চাচা-আপন চাচা-সৎচাচা একইভাবে পিতা ও পিতামহের আপন চাচা এবং মাতা ও মাতামহীর আপন চাচা।

৬। মামা-আপন মামা-সৎমামা এবং পিতা ও মার মামাগণ।

*Dhaka University Institutional Repository*

**(গ) ধাত্রীমাতা সম্পর্কীয় বাধা ঃ**

কোন শিশু নিজের মা ভিন্ন অন্য কোন বিবাহিতা মহিলার দুধ পান কওে লালিত পালিত হলে তাদেও মধ্যে দুধ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। রক্ত বা বৈবাহিক সম্পর্কেও কারণে নিষিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ, কতিপয় ক্ষেত্র ব্যতীত, ধাত্রীমাতাজনিত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নিষিদ্ধ পর্যায়ভুক্ত বিধায় তাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ।

**(ঘ) অন্যান্য বাধানিষধ ঃ**

(১) একজন মুসলমান এক সাথে চারটির বেশি স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন না।

(২) কোন মুসলমান পুরুষ কোন মূর্তি উপাসক বা অগ্নি উপাসক স্ত্রীলোককে ধর্মান্তরিত না করে বিয়ে করতে পারেন না।

(৩) কোন মুসলমান স্ত্রীলোক ইদ্দত পালনকালে বিয়ে করতে পারেন না।

(৪) একজন মুসলমান পুরুষ একসাথে এমন দু'জন মেয়েকে বিয়ে করতে পারবেন না যাদের একজন পুরুষ হলে একে অপরকে বিয়ে করতে পারতেন না।

নিষিদ্ধ পর্যায়ের আত্মীয়স্বজনকে বিয়ে করতে আইনের দৃষ্টিতে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এমন বিয়ের ফলে কোন পক্ষেও কোন দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি হয় না। এরূপ বিয়ের সন্তানাদি অবৈধ। তবে এদেশের প্রচলিত মুসলিম আইন মোতাবেক উপরে (ঘ) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ক্ষেত্রে বিয়েটি বাতিল না হয়ে ফাসিদ (অনিয়মিত) বলে গণ্য হবে।

**(৩) অনিয়মিত বা ফাসিদ বিয়ে ঃ**

ফাসিদ বিয়ে নিজ থেকে বা স্থায়ীভাবে অবৈধ নয়। এটি কোন কারণবশত: সাময়িকভাবে বাতিল বলে গণ্য হয়। উক্ত কারণটি দূরীভূত হলেই বিয়েটি বৈধ বিয়ের সমান মর্যাদা পায়। সহবাস না হওয়া ফাসিদ বিয়ে কার্যকর হয় না। অনিয়মিত বিয়ের যে কোন পক্ষ সহবাসের পূর্বে বা পরে কথা বা আচরণের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন। বিচ্ছেদের ইচ্ছাসূচক কোন কথা বা আচরণ যেমন, "আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম"– এক্ষেত্রে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে (মুসাম্মৎ বখ বিবি বনাম কাইম দীন)।

**এর ফলাফলঃ**

ক. স্ত্রী নির্দিষ্ট বা যুক্তিসঙ্গত মহরের অধিকারী হন।

খ. এরূপ বিয়ের ফলে স্ত্রী ইদ্দত পালন করতে বাল্য। তবে তালাক বা স্বামীর মৃত্যু উভয় ক্ষেত্রেই এরূপ ইদ্দতের মেয়াদ তিনটি মাসিক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

গ. এরূপ বিয়ের সন্তানাদি বৈধ। তবে এর ফলে স্বামী ও স্ত্রী মধ্যে পারস্পারিক উত্তরাধিকারের কোন সম্পর্ক সৃষ্টি হয় না।

নিম্নলিখিত বিয়েসমূহ অনিয়মিত বিয়ে বলে গণ্য ঃ

১। সাক্ষীবিহীন বিয়ে ঃ কারণ এটি একটি দুর্ঘটনাপ্রসূত অনিয়ম মাত্র।

২। চার স্ত্রী বর্তমানে পঞ্চমা স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে কারণ এক্ষেত্রে চার স্ত্রীর যে কোন একজনকে তালাক প্রদানের মাধ্যমে অনিয়মটি দূরীভূত করা যেতে পারে।

৩। ইদ্দত পালনরতা মহিলার সঙ্গে বিয়ে, কারণ এক্ষেত্রে ইদ্দতের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনিয়মটির বিলুপ্তি ঘটে।

৪। অন্য ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে বিয়ে। কারণ এক্ষেত্রে স্ত্রী ইসলাম, খ্রীষ্ট বা ইহুদী ধর্ম বা স্বামী ইসলাম ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে অনিয়মটি দূরীভূত করতে পারেন।

৫। বিয়ের মাধ্যমে বে-আইনী সংযোজন ঘটালে। একজন পুরুষ হলে অপর জনকে বিয়ে করার অধিকারী নন, এরূপ দু'মহিলাকে এক সঙ্গে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলে বে-আইনী সংযোজন ঘটে থাকে। স্ত্রী বর্তমানে স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করা হলে তা বে-আইনী সংযোজনের পর্যায়ভুক্ত হবে। বে-আইনী সংযোজনের ফলে বিয়ে ফাসিদ বলে গণ্য হয়, কারণ এক্ষেত্রে প্রথমা স্ত্রীকে তালাক দানের মাধ্যমে দ্বিতীয়টিকে বৈধ করা যেতে পারে।

**বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯ ঃ**

**ধারা-২ ঃ**

(ক) 'শিশু' বা 'নাবালক' বলিতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাহার বয়স পুরুষ হইলে একুশ বৎসরের নীচে এবং স্ত্রী হইলে আঠারো বৎসরের নীচে হইবে।

**ধারা-৪ ঃ শিশু বিবাহকারীর শাস্তি ঃ**

একুশ বছরের অধিক বয়স্ক কোন পুরুষ বা আঠার বছরের অধিক বয়স্কা কোন মহিলা কোন শিশুর সহিত বিবাহের চুক্তি সম্পাদন করিলে তাহার এক মাস মেয়াদ পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ড কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দন্ডই হইতে পারে।

**ধারা-৫ ঃ বিবাহ সম্পন্নকারীর শাস্তি ঃ**

যে কোন ব্যক্তি নাবালকের বিবাহ সম্পন্ন করিলে কিংবা উক্ত বিবাহ পরিচালনা করিলে অথবা উহা অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করিলে, যদি সে ব্যক্তি প্রমাণ করিতে না পারে যে বিবাহটি নাবালকের বিবাহ ছিল না বলিয়া বিশ্বাস করিবার মত তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির একমাস মেয়াদ পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড কিংবা জরিমানা যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত অথবা উভয় প্রকারের শাস্তিই হইতে পারে।

**ধারা-৬ ঃ অভিভাবকের শাস্তিঃ ঃ**

১) যেখানে কোন নাবালক বাল্য বিবাহ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে এবং পিতামাতা কিংবা আইনানুগ অথবা বেআইনী যে কোন ক্ষমতাবলেই হউক না কেন, কোন ব্যক্তি এ নাবালকের উপর কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা সম্পন্ন হইয়া উক্ত বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিবার পথে কোন কার্য করিতে কিংবা সম্পন্ন করিবার ব্যাপারে গাফিলতির দরুণ ব্যর্থ হইয়াছে এমন প্রমাণ পাওয়া গেলে, তাহার একমাস মেয়াদ পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড কিংবা কেবল জরিমানা যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে অথবা উভয় প্রকারের দণ্ডই হইতে পারে। তবে অবশ্য কোন স্ত্রী লোককে কারাদণ্ড দেয়া হইবে না।

২) অত্র ধারার ব্যবস্থাবলী কার্যকরী করিবার নিমিত্ত যেখানে কোন নাবালক বাল্য বিবাহের চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে, সেখানে যতক্ষণ পর্যন্ত বিপরীতটি প্রমাণিত না হয়, উক্ত নাবালকের উপর কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি গাফিলতির কারণে বিবাহটি বন্ধ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।

**ধারা-৭ ঃ অনাদায়ে কারাদণ্ড হইবে না ঃ**

১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজেজ এ্যাক্ট এর ২৫ ধারা কিংবা বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৬৫ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, অত্র আইনের ৩ ধারা বলে কোন আদালত কোন অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করিলে, এমন কোন নির্দেশ প্রদান করিতে পরিবেন না যে, তাহার উপর আরোপিত জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাহাকে যে কোন মেয়াদের কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়।

**ধারা-১২ ঃ নিষেধাজ্ঞার ক্ষমতা ঃ**

১) অত্র আইনে বিপরীত কোন কিছু থাকিলেও, আদালতের নিকট কোন অভিযোগ কিংবা অন্য কোন উপায়ে এই মর্মে তথ্য পেশ হইলে যে, উক্ত আইনের বিধানের লংঘন কোন নাবালকের বাল্য বিবাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে কিংবা বাল্য বিবাহ অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে তাহা হইলে আদালত সেক্ষেত্রে উক্ত বিবাহ অনুষ্ঠানটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করত অত্র আইনের ৪, ৫ ও ৬ ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের যে কোন এক জনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিতে পারেন।

২) পূর্বাহ্ন আদালত ঐ ধরনের ব্যক্তিকে নোটিশ না দিয়া এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর জন্য তাহাকে কোন সুযোগ দান না করিয়া (১) উপধারা অনুযায়ী ঐ জাতীয় কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবেন না।

৩) উপধারা (১) অনুযায়ী প্রদত্ত কোন নির্দেশ আদালত স্বীয় উদ্যোগে অথবা কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনে নাকচ কিংবা পরিবর্তন করিতে পারেন।

৪) এই জাতীয় কোন দরখাস্ত পাইলে, আদালত আবেদনকারীকে স্বয়ং অথবা উকিলের মাধ্যমে আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য সুযোগ প্রদান করিবেন এবং আদালত যদি দরখাস্ত খানা সামগ্রিক কিংবা আংশিকভাবে নাকচ করিয়া দেন, তাহা হইলে উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

৫) অত্র ধারা (১) উপধারা বলে কোন ব্যক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত করা হইয়াছে জানিতে পারিয়া যদি সে ব্যক্তি উহা অমান্য করে তাহা হইলে তাহাকে সশ্রম কিংবা বিনাশ্রম যে কোন প্রকারের তিন মাস মেয়াদ পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা কেবল এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকারের দণ্ডই দেওয়া যাইতে পারে।

তবে অবশ্য কোন মহিলাকে কারাদণ্ড দেওয়া যাইবে না।

যে ব্যক্তি কোন নাবালককে বিবাহ করে তার একমাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হতে পারে।

নাবালাকের বিবাহ সম্পন্নকারী এবং অভিভাবকের শাস্তি হচ্ছে একমাস মেয়াদ পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দণ্ড।

**বাংলাদেশ দণ্ডবিধি, ১৮৬০ ঃ**

**ধারা-৩৬৬ ঃ**

যে ব্যক্তি কোন নারীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে এইরূপ উদ্দেশ্যে বা তাহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে বাধ্য করার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া কিংবা তাহাকে অবৈধ যৌন সহবাস করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করার উদ্দ্যেশে অথবা তাহাকে অবৈধ যৌন সহবাস করিতে বাধ্য বা প্রলব্ধ করার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া অপহরণ বা হরণ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে- যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে- দণ্ডিত এবং তদুপরি অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

**মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১ ঃ**

**ধারা-১০ ঃ দেনমোহর**

নিকাহনামায় বা বিবাহের চুক্তিতে দেনমোহর ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকিলে, দেনমোহরের সমগ্র অর্থ চাহিবামাত্র দেয় বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

**মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন, ১৯৭৪ ঃ**

**ধারা-৩ ঃ বিবাহ রেজিষ্ট্রিকরণ ঃ**

অন্য যে কোন আইন, রেওয়াজ বা প্রথায় যাহাই থাকুক না কেন, মুসলিম আইন অনুযায়ী সম্পন্ন প্রতিটি বিবাহ এই আইনের বিধান অনুসারে রেজিষ্ট্রি করিতে হইবে।

**ধারা-৫ ঃ নিকাহ্ রেজিষ্ট্রারগণ কর্তৃক সম্পন্ন হয় নাই এমন প্রতিটি বিবাহ সম্পর্কে তাহাদের নিকট প্রতিবেদন দিতে হইবে ঃ**

(১) নিকাহ্ রেজিষ্টার কর্তৃক সম্পন্ন হয় নাই এমন প্রতিটি বিবাহ এই আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রি করার জন যিনি বিবাহ সম্পন্ন করিয়াছেন তৎকর্তৃক নিকাহ্ রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রতিবেদন পেশ করিতে হইবে।

(২) উপধারা (১) এর বিধান যে কোন ব্যক্তি লংঘন করিবে, সে তিন মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় প্রকারে দণ্ডনীয় হইবে।

**দেহমোহর ঃ**

দেনমোহর আদায়। মুসলিম পারিবারিক আইন

**ধারা-১০ ঃ দেনমোহর।**

নিকহ্নামায় বা বিবাহের চুক্তিতে দেনমোহর ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত না থাকিলে দেনমোহরের সমগ্র অর্থ চাহিবা মাত্র দেয় বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। দেনমোহর দুই অংশে বিভক্তঃ

(ক) 'আশু' বা 'তাৎক্ষণিক' দেনমোহর– যা চাওয়া মাত্র পরিশোধ করিতে হয়, এবং অপরটি

(খ) 'বিলম্বিত' দেনমোহর– যা মৃত্যু বা তালাকের ফলে বিবাহ বিচ্ছেদের পর পরিশোধযোগ্য।

বিয়ের চুক্তিতে সাধারণত দেনমোহরের পরিমান এবং তাৎক্ষণিক ও বিলম্বিত দেনমোহর নির্ধারিত বা লিখিত থাকে। সাধারণত দেনমোহরের কিছু পরিমাণ বিয়ের সময়ই তাৎক্ষণিক দেনমোহর হিসাবে দেয়া হয় এবং তা কাবিননামায় লিখিত থাকে এবং বাকি অংশ বিলম্বিত দেনমোহর হিসেবে ধরা হয়।

**দেনমোহর প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলির যে কোন একটি অবশ্যই পূরণীয়-**

ক) দাম্পত্য মিলন দ্বারা, অথবা

খ) বৈধ অবসর (খালাওয়াত-ই-ছাহিহ) দ্বারা,

গ) স্বামী অথবা স্ত্রীর মৃত্যু দ্বারা,

স্বামী, দাম্পত্য মিলনের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিলে দেনমোহরের পরিমাণ অর্ধেক হবে। কিন্তু দাম্পত্য মিলনের আগে মৃত্যু হলে স্ত্রী সম্পূর্ণ দেনমোহর পাওয়ার অধিকারী হবে।

স্ত্রী ইচ্ছা করলে তার স্বামী অথবা স্বামীর উত্তরাধিকারীগণের পক্ষে সমগ্র দেনমোহর অথবা এর অংশবিশেষ মওকুফ করতে পারে। কোন প্রতিবাদ ছাড়া মওকুফ করলেও তা বৈধ হবে। মওকুফটি অবশ্যই পূর্ণ সম্মতিতে হবে। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী যখন দুঃখ ভারাক্রান্ত তখন দেনমোহর মাফ চাইলে তা আইনত অবাধ সম্মতিসূচক ধরা হয় না এবং এতে স্ত্রী বাধ্য হবে না। স্ত্রী তার দেনমোহরের টাকা না পেলে, সে এবং তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীগণ এর জন্য মামলা দায়ের করতে পারে।

'আশু' বা 'তাৎক্ষণিক' দেনমোহর আদায়ের জন্য মামলা করার সময়সীমা হলো দেনমোহর দাবি ও তা প্রদানে অস্বীকৃতির তারিখ হতে তিন বৎসর অথবা যেখানে বৈবাহিক সম্পর্ক থাকাকালে এ জাতীয় কোন দাবি করা হয়নি সেখানে মৃত্যু কিংবা তালাকের ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে তখন পর্যন্ত।

'বিলম্বিত' দেনমোহর আদায়ের সময়সীমা হলো মৃত্যু অথবা তালাকের ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে ঐ তারিখ হতে তিন বৎসর।

**স্বামী কর্তৃক দেনমোহর প্রদান ঃ**

স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে দেনমোহর পাওয়ার ন্যায্য দাবীদার। স্বামী জীবিতাবস্থায় স্ত্রীর দেনমোহরের পূর্ণ দাবী পূরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে দেনমোহর শোধ বাবদ স্বামী স্ত্রীকে স্থাবর অবস্থাবর যে কোন সম্পত্তি দিতে পারে। যেমন নগদ টাকা, গহনা অথবা বাড়ি, জমি প্রভৃতি। তবে এসব ক্ষেত্রে 'দেনমোহর প্রদান করা হচ্ছে' এ কথাটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। তবে এমনিতে বা কোন উপলক্ষ্যে স্বামী স্ত্রীকে কোন উপহার দিলে তা দেনমোহর হিসাবে গণ্য হবে না। এমন কি বিয়ের সময়কার শাড়ি, গহনা প্রভৃতিকে দেনমোহরের আংশিক উসুল হিসাবে দেখানো হয় যা কিনা আইনত গ্রহণযোগ্য নয়।

স্বামী দেনমোহর প্রদান করে না গেলে স্বামীর মৃত্যুর পর দেনমোহর স্ত্রীর কাছে স্বামীর ঋণ হিসাবে ধরা হয়। অন্যান্য ঋণের মতো এই ঋণও পরিশোধ করতে হয়। দাফন-কাফনের খরচ করার অবশিষ্ট সম্পত্তি থেকে দেনমোহর ও অন্যান্য ঋণ শোধ করতে হবে। এই দেনমোহর এর জন্য স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি দখলে রাখতে পারবে এমনকি স্বামীর উত্তরাধিকারীদের বিরুদ্ধে মামলাও করতে পারবে।

আর যদি স্বামীর আগে স্ত্রীর মৃত্যু হয় তবুও স্ত্রীর দেনমোহর স্বামীকে প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর উত্তরাধিকারীরা এই দেনমোহর পাওয়ার অধিকারী হয়।

স্বামী-স্ত্রীর তালাক হয়ে গেলে স্ত্রীর সম্পূর্ণ দেনমোহর স্বামীকে পরিশোধ করতে হয়। এবং সেই সঙ্গে ভরণ-পোষণও দিতে হয়। কারণ ভরণ-পোষণের সঙ্গে দেনমোহরের কোন সম্পর্ক নেই।

**ভরণ-পোষণ ঃ**

মুসলিম আইনে ভরণ-পোষণ বলতে জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থানকে বুঝায়। বিয়ের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরিক যেসব আইনগত অধিকার ও দায়িত্বের সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে ভরণ-পোষণ অন্যতম। একজন সক্ষম ও উপার্জনশীল ব্যক্তির তার স্ত্রী

ছাড়াও সন্তান-সন্ততি ও উত্তরসূরী, বাবা-মা ও পূর্বসূরী ও অন্যান্য দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ দেয়া কর্তব্য। অতএব আইনত যারা ভরণ-পোষণ পাওয়ার দাবীদার তারা হচ্ছে:

১। পুত্র সাবালক না হওয়া পর্যন্ত পিতা ভরণ-পোষণ করতে বাধ্য;

২। কন্যাদের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত পিতা তাদের ভরণ-পোষণ দিতে বাধ্য;

৩। একজন মুসলমান স্ত্রী সর্বাবস্থায় তার স্বামীর কাছ হতে ভরণ-পোষণ পাওয়ার বিশেষ অধিকারিণী।

**ভরণ-পোষণে স্ত্রীর অধিকার ঃ**

বিবাহিত জীবনের সব সময় স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে ভরণ-পোষণের দাবীদার। শরীয়া আইন, ১৯৩৭ এর ২৭৭ ধারা মতে ভরণ-পোষণ পেতে হলে স্ত্রীকে অবশ্যই স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে এবং স্বামীর যুক্তিসঙ্গত নির্দেশসমূহ পালন করতে হবে এবং যতদিন এরূপ থাকবে ততদিন স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করতে স্বামী বাধ্য। তবে স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া বসবাস করতে অস্বীকৃতি জানায় অথবা অন্যভাবে স্বামীর অবাধ্য হয় তবে স্বামী ভরণ-পোষণ দিতে বাধ্য নয়। যুক্তি সঙ্গত কারণ হচ্ছে :

১। স্ত্রীর আশু দেনমোহর প্রদানে অস্বীকৃতি,

২। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর নিষ্ঠুর আচরণ,

৩। স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ,

৪। স্বামীর চারিত্রিক অধঃপতন, ব্যভিচার বা বহুগামিতা।

আইন সঙ্গত কারণ ছাড়া স্বামী স্ত্রীকে অবহেলা করলে অথবা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দিতে অস্বীকার করলে স্ত্রী নিজ ভরণ-পোষণ আদায়ের জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ ব্যক্তিকে তার স্ত্রীর ভরণ-পোষণের জন্য নির্দিষ্ট হারে মাসিক অর্থ দেওয়ার আদেশ দিতে পারেন। এরূপ কেন নির্দেশ দেয়া হলে আদেশের তারিখ থেকে ঐ অর্থ দিতে হয়।

**ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৯০৮ ঃ**

**ধারা ৪৮৮ :**

**স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণ-পোষণের আদেশ ঃ**

(১) পর্যাপ্ত সঙ্গতি থাক সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি তাহার স্ত্রীকে বা তাহার বৈধ বা অবৈধ সন্তান, যে নিজের ভরণ-পোষণে অক্ষম, তাহাকে ভরণ-পোষণ করিতে অবহেলা বা অস্বীকার করে তাহা হইলে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বা কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট এইরূপ অবহেলা বা অস্বীকৃতি প্রমাণিত হওয়ার পর যেইরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ মাসিক সর্বমোট অনধিক চার শত টাকা উক্ত স্ত্রী বা উক্ত সন্তানকে মাসিক ভাতা দেওয়ার এবং তিনি বিভিন্ন সময়ে যে ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করিয়া দেন সেই ব্যক্তির নিকট উহা প্রদানের জন্য উক্ত ব্যক্তিকে আদেশ দিতে পারিবেন।

(২) আদেশের তারিখ হইতে অথবা সেইরূপ আদেশ দেওয়া হইলে খোরপোষের জন্য কৃত আবদন পত্রের তারিখ হইতে এরূপ ভাতা প্রদানযোগ্য হইবে।

(৩) উক্তরূপে আদিষ্ট কোন ব্যক্তি যদি পর্যপ্ত কারণ ব্যতীত আদেশ অনুসারে কাজ করিতে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে উপরোক্ত যে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশের প্রত্যেকটি লংঘনের জন্য ইতিপূর্বে বর্ণিত জরিমানা আদায়ের পদ্ধতিতে প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য ওয়ারেন্ট প্রদান করিতে পারিবেন এবং ওয়ারেন্ট কার্যকরী হওয়ার পর প্রত্যেক মাসের ভাতার সম্পূর্ণ বা কোন অংশ অপরিশোধিত থাকিলে তাহার জন্য উক্ত ব্যক্তিকে একমাস পর্যন্ত অথবা তৎপূর্বে পরিশোধ করা হইলে পরিশোধ না করা পর্যন্ত কারাদণ্ড দিতে পারিবেন :

এতে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি যদি তাহার স্ত্রীকে তাহার সহিত বসবাসের শর্তে তাহাকে ভরণ-পোষণের প্রস্তাব দেয় এবং তাহার সহিত বসবাস করিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার অস্বীকৃতির বিবৃত যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে তাহা হইলে উক্ত প্রস্তাব স্বত্বেও এই ধারা অনুসারে আদেশ দিতে পারিবেন।

আরও শর্ত থাকে যে, এই ধারা অনুসারে কোন অর্থ অপরিশোধিত থাকিলে এবং যে তারিখে উহা প্রাপ্ত হইয়াছে সেই তারিখ হইতে এক বৎসর সময়ের মধ্যে ইহা আদায়ের জন্য আদালতে আবেদন না করা হইলে উহা আদায়ের জন্য কোন ওয়ারেন্ট প্রদান করা হবে না।

৪। স্ত্রী যদি ব্যভিচারিনীর জীবন যাপন করে অথবা পর্যাপ্ত কারণ ব্যতিত স্বামীর সহিত বসবাস করিতে অস্বীকার করে অথবা উভয় যদি পারস্পরিক সম্মতিক্রমে স্বতন্ত্রভাবে বসবাস করে তাহা হইলে স্ত্রী এই ধারা অনুসারে স্বামীর নিকট হইতে কোন ভাতা পাওয়ার অধিকারী হইবেন না।

৫। যে স্ত্রীর পক্ষে এই ধারা অনুসারে আদেশ দেওয়া হইয়াছে সেই স্ত্রী ব্যভিচারিনীর জীবন যাপন করিতেছে অথবা পর্যাপ্ত কারণ ব্যতিত স্বামীর সহিত বসবাস করিতে অস্বীকার করিতেছে অথবা উভয়েই পারস্পরিক সম্মতিক্রমে স্বতন্ত্রভাবে বসবাস করিতেছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত আদেশ বাতিল করিবেন।

৬। এই অধ্যায় অনুসারে সমস্ত স্বাক্ষ্য স্বামী বা পিতা যেখানে যেরূপ প্রযোজ্য, উপস্থিতিতে অথবা তাহাকে ব্যক্তিগত উপস্থিত হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইলে তাহার উকিলের উপস্থিতিতে গ্রহণ করিতে হইবে এবং মামলার জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। তবে ম্যাজিষ্ট্রেট যদি সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত স্বামী বা পিতা ইচ্ছাকৃত ভাবে সমন এড়াইয়া চলিতেছে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে আদালতে হাজির হইতে অবহেলা করিতেছে, তাহা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট একতরফা শ্রবণ করিতে ও রায় দিতে পারিবেন। এইরূপ ভাবে প্রদত্ত কোন আদেশ উহার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করিয়া আবেদন করিতে বাতিল করা যাইবে।

৭। এই ধারা অনুসারে পেশকৃত আবেদনপত্র সম্পর্কে ব্যবস্থাগ্রহণের সময় মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে ন্যায়সঙ্গত আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা আদালতের থাকিবে।

৯। যে জিলা উক্ত ব্যক্তি তাহার স্ত্রী বা তাহার অবৈধ সন্তানের মাতার সহিত বসবাস করে বা করিতেছে বা সর্বশেষ বসবাস করিয়াছে, সেই জিলায় তাহার বিরুদ্ধে এই ধারা অনুসারে কার্যক্রম রুজ্জু করা যাইবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট নির্দেশিত ভরণ-পোষণ না দিলে ব্যর্থ হলে কারাদন্ড দেয়া যায়। এক মাসে খোরপোষের জন্য এক মাসের কারাদন্ড সশ্রম বা বিনাশ্রম যে কোন একটি হতে পারে।

১৯৮৫ সালে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ আইনে ৪(গ) ধারার অধিনে একজন মুসলিম স্ত্রীর তার ভরণ-পোষণ আদায়ের জন্য সরাসরি পারিবারিক আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন।

স্বামীর মৃত্যুর স্ত্রী আর ভরণ-পোষণ পাবে না। স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে স্ত্রী শুধু ইদ্দত চলাকালীন সময় পর্যন্ত ভরণ-পোষণ পাবেন।

১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের ২(খ) ধারা অনুযায়ী কোন স্বামী দুই বৎসর যাবৎ ভরণ-পোষণ দানে অবহেলা প্রদর্শন করলে অথবা ব্যর্থ হলে স্ত্রী আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করতে পারে এবং এই ভাবে স্বামীকে ভরণ-পোষণ প্রদানে বাধ্য করতে পারেন।

**অভিভাবকত্ব ঃ**

অভিভাবকত্ব হচ্ছে- এমন ব্যক্তির দেখাশুনা বা পরিচালনা করা যে নিজে তত্ত্বাবধান করতে অক্ষম।

**হিউম্যান এন্ড ওয়ার্ডস্ এ্যাক্ট, ১৮৯০,**

**ধারা-৪**

১। নাবালক অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যাহার বয়স আঠার বৎসর পূর্ণ হয় নাই।

মুসলিম আইন অনুযায়ী পিতা হলেন তার নাবালক সন্তানের দেহ ও সম্পদের স্বাভাবিক অভিভবাক। তাদের যে কোন স্বার্থ সংরক্ষণে পিতা আইনানুগভাবে তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

পিতা নাবালক সন্তানের অভিভাবক হলেও মুসলিম আইনে বৈবাহিক সম্পর্ক চালু থাকা অবস্থায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদের পরেও তত্ত্বাবধানে সর্বোত্তম অধিকারিনী হলেন মা। কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং ছেলে সন্তানের ক্ষেত্রে সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত মা তত্ত্বাবধান করার অধিকারী। এই ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তালাক হলেও মা এই অধিকার ভোগ করবে।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী দ্বিতীয় বিয়ে করলে সন্তানের তত্ত্বাবধান বা জিম্মা দায়িত্বের অধিকার হারায়।

সন্তানের স্বাভাবিক অভিভাক হচ্ছে তার পিতা। পিতার মৃত্যুতে বা অভিভাবকত্বের অধিকার নিয়ে মা-বাবা/মা-দাদা/নানী-বাবা প্রভৃতির মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হলে, ও সন্তানের অভিভাবকত্ব দাবী করে একাধিক আবেদনপত্র জমা হলে আদালত সবকিছু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে নাবালকের কল্যাণের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত ব্যক্তিকে অভিভাবক হিসাবে নিয়োগ করবে। কোন নাবালকের শরীর অথবা সম্পত্তি অথবা উভয়ের হেফাজতের জন্য অভিভাবক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় দরখাস্ত বা আবেদনপত্র ১৮৯০ সালের গার্ডিয়ান্স এক ওয়ার্ডস অ্যাক্ট অনুযায়ী পেশ করতে হবে।

**মায়ের অবর্তমানে নারীর জ্ঞাতির অধিকার ঃ**

মায়ের অনুপস্থিতিতে সাত বৎসরের কম বয়সের ছেলে এবং বয়ঃসন্ধিতে পদার্পণ করেনি এমন মেয়ের হেফাজতের অধিকার নিম্নে প্রদত্ত ক্রমানুযায়ী নিম্নলিখিত জাতির উপর ন্যস্ত রয়েছে ঃ

১। মায়ের মা-ক্রম যতই ঊর্ধ্বগামী হোক,

২। পিতার মা-ক্রম যতই ঊর্ধ্বগামী হোক,

৩। পূর্ণ ভগিনী,

৪। বৈপিত্রের ভগিনী,

৫। স্বগোত্রীয় বা বৈমাত্রেয় ভগিনী,

৬। পূর্ণ ভগিনীর কন্যা,

৭। বৈপিত্রের ভগিনীর কন্যা,

৮। স্বগোত্রীয় ভগিনীর কন্যা,

৯। খালা, ভগিনীর ন্যায় একই ক্রমানুসারে এবং

১০। ফুফু, ভগিনীর ন্যায় ক্রমানুসারে।

পালক মা যদি পুনরায় বিয়ে করে এবং তার হেফাজতের অধিকার হারায় তা হলে পিতার মা অপেক্ষা মাতার মা অভিভাবকত্বের অধিকারটি অগ্রাধিকার লাভ করবে। নাবালকের পিতার সৎমা অপেক্ষা উক্ত নাবালকের হেফাজতের প্রশ্নে খালার অধিকার প্রধান্য পাবে।

**গার্ডিয়ান্স এন্ড ওয়ার্ডস অ্যাক্ট, ১৮৯০ ঃ**

**ধারা ৭ ঃ** নাবালকের মঙ্গলের জন্য একটি নির্দেশ জারি করা দরকার এই মর্মে আদালত সন্তুষ্ট হইলে, আদালত (১) নাবালকের শরীর অথবা সম্পত্তি অথবা উভয়ই হেফাজতের জন্য একজন অভিভাবক ঘোষণা করিতে পারেন এবং আদালত সেই অনুযায়ী একটি নির্দেশ জারী করিতে পারেন।

**উত্তরাধিকার ঃ**

উত্তরাধিকার হচ্ছে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে তার জীবিত আত্মীয়-স্বজনদের অধিকার। মুসলিম উত্তরাধিকার আইন আল-কোরআন, হাদীস (সুন্নাহ), ইজমা ও কিয়াস অবলম্বনে পরিচালিত।

**উত্তরাধিকার বন্টনের নীতি ঃ** উত্তরাধিকারীরা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ওয়ারিশ হিসেবে সম্পত্তিপ্রাপ্ত হওয়ার আগে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো দেখতে হয়,

(ক) মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনের খরচ,

(খ) মৃত ব্যক্তির কোন ঋণ বা দেনা থাকলে তা পরিশোধ করা,

(গ) স্ত্রীর দেনমোহর পরেশোধ করা হয়েছে কি না,

(ঘ) মৃত ব্যক্তি কর্তৃক কোনো উইল করা থাকলে সেই উইলে উল্লিখিত সম্পত্তি প্রদানের পর যে সম্পত্তি থাকবে তা ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ হবে।

**প্রধান উত্তরাধিকারীগণ ঃ** মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি মূলতঃ পাঁচজন উত্তরাধিকারীর মাঝে ভাগ হয়,

(ক) পিতা

(খ) মাতা

(গ) স্ত্রী/স্বামী

(ঘ) মেয়ে

(ঙ) ছেলে

স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী ও স্ত্রীর অবর্তমানে স্বামী সম্পত্তি পাবে, বাকী চারজন সব সময়ই পাবে।

**সম্পত্তিতে নারীর অংশ ঃ**

(ক) স্ত্রী পাবে = ৮ ভাগের ১ অংশ (যখন এক সন্তান বা সন্তানের সন্তান থাকে যত নিম্নগামী হোক)। ৪ ভাগের ১ অংশ (যখন কোন সন্তান বা সন্তানের সন্তান থাকে না)। স্ত্রীরা সমষ্টিগতভাবে গ্রহণ করে ৮ ভাগের ১ অংশ (একই শর্তাবলীর অধীন)।

(খ) কন্যা পাবে = ২ ভাগের ১ অংশ (যখন কোন ছেলে থাকে না)। ৩ ভাগের ২ অংশ (দুই বা দুই বা ততোধিক কন্যা থাকলে এবং পুত্র না থাকলে)। পুত্র থাকলে কন্যা ২ ঃ ১ অনুপাতে সম্পত্তি পাবে, অর্থাৎ কন্যা এক পুত্রের অর্ধেক সম্পত্তি পাবে।

(গ) মা পাবে = ৬ ভাগের ১ অংশ (যখন একটি সন্তান, সন্তানের সন্তান যথ নিম্নগামী হোক বা দুই বা ততোধিক ভাই বা বোন বা এক ভাই বোন থাকে)। ৩ ভাগের ১ অংশ (যখন তেমন কোন আত্মীয় থাকে না)।

(ঘ) পূর্ণ বোন পাবে (আপন বোন) = ২ ভাগের ১ অংশ ও সমষ্টিগতভাবে ৩ ভাগের ১ অংশ (যখন ছেলে, ছেলের ছেলে, পিতা, পিতামহ বা পূর্ণ ভ্রাতা না থাকে)।

(ঙ) রক্ত সম্পর্কের বোন পাবে (সৎ বোন) = ২ ভাগের ১ অংশ ও সমষ্টিগতভাবে ৩ ভাগের ২ অংশ (যখন কোন ছেলে, ছেলের ছেলে, পিতা, মাতামহ, পূর্ণ ভ্রাতা, ভগ্নি বা রক্ত সম্পর্কের কোন ভাই না থাকে)।

(চ) ছেলের মেয়ে পাবে (ছেলের ঘরের নাতনী) = ২ ভাগের ১ অংশ (যখন কোন ছেলে, মেয়ে বা সমমানের ছেলের ছেলে না থাকে), যখন শুধুমাত্র এক কন্যা থাকে তখন সে সমগ্রটাই গ্রহণ করে অর্থাৎ ছেলে পিতার সম্পত্তির যে অংশ পেত ছেলের মেয়ে সেই পরিমাণ অংশই পাবে।

**তালাক ঃ**

মুসলিম আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ একটি বৈধ ও স্বীকৃত অধিকার। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক যদি এমন পর্যায়ে পৌছায় যে, একত্রে বসবাস করা উভয়ের পক্ষেই বা যে কোন এক পক্ষের সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে তারা নির্দিষ্ট কিছু উপায়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন।

**মুসলিম আইনে বিবাহ বিচ্ছেদের বিভিন্ন পদ্ধতি ঃ**

১। স্বামীর পক্ষ থেকে তালাক,

২। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাক-ই-তৌফিজ ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে,

৩। খুলার মাধ্যমে,

৪। মুবারাতের মাধ্যমে,

৫। আদালতের মাধ্যমে।

**মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ ঃ**

**ধারা ৭ ঃ তালাক**

(১) কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে তাহাকে যে কোন পদ্ধতির তালাক ঘোষণার পর যথাশীঘ্র সম্ভব চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে তালাকের নোটিশ দিতে হইবে এবং স্ত্রীকে উক্ত নোটিশের নকল প্রদান করতে হইবে।

(২) যে ব্যক্তি (১) উপধারার ব্যবস্থাবলী লংঘন করিবে, তাহাকে এক বৎসর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকার শাস্তি প্রদান করা যাইতে পারে।

(৩) নিম্নের (৫) উপধারার ব্যবস্থাবলীর মাধ্যম ব্যতীত প্রকাশ্য অথবা অন্যভাবে প্রদত্ত কোন তালাক, পূর্বাহ্নেই বাতিল না হইলে, (১) উপধারা অনুযায়ী চেয়ারম্যানের নিকট নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে নব্বই দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ হইবে না।

(৪) উপরোক্ত (১) উপধারা অনুযায়ী নোটিশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যানের সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আপোষ বা সমঝোতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সালিশ পরিষদ গঠন করিবেন এবং উক্ত সালিশ পরিষদ এই জাতীয় সমঝোতা (পুনর্মিলনের) জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করিবেন।

(৫) তালাক ঘোষণাকালে স্ত্রী গর্ভবতী বা অন্তঃসত্ত্বা থাকিলে উপরের ৯২) উপধারায় উল্লেখিত সময় অথবা গর্ভাবস্থা- এই দুইটির মধ্যে দীর্ঘতরটি অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তালাক বলবৎ হইবে না।

(৬) অত্র ধারা অনুযায়ী কার্যকরী তালাক দ্বারা যাহার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সেই স্ত্রী এই জাতীয় তালাক তিন বার কার্যকরী না হলে কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে বিবাহ না করিয়া পুনরায় একই স্বামীকে বিবাহ করিতে পারিবে।

তালাকের নোটিশ না দেওয়ার শাস্তি হচ্ছে এক বৎসর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকার শাস্তি।

**তালাক-ই-তৌফিজ ঃ**

স্বামী কাবিননামার ১৮নং ঘরে সম্মতি প্রদানের মাধ্যমে স্ত্রীকে তালাক প্রদানের যে ক্ষমতা দান করে তাকে তালাক-ই-তৌফিজ বলে। 'কাবিননামার বা ১৮নং ঘরে লিখা থাকে স্বামী-স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পন করেছে কিনা? করে থাকলে কি শর্তে?' যদি এই ঘরে উত্তর 'হ্যাঁ' লিখা থাকে তবেই স্ত্রী তালাক-ই-তৌফিজের ক্ষমতা পায়।

১৮৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইনে ৮ ধারা মোতাবেক তালাকের অর্পিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্ত্রী তালাক-ই-তৌফিজ স্বামীর ন্যায় তালাক দানে বিবাহ বিচ্ছেদ করিতে পারে এবং ৭ ধারা উল্লেখিত সমস্ত বিধান উক্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

**মুসলিম বিবাহ আইন ১৯৩৯ ঃ**

**ধারা-২** ঃ বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রির হেতুবাদ

নিম্নলিখিত যে কোন এক বা একাধিক হেতুবাদে মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহিত কোন মহিলা তার বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য ডিক্রি লাভের অধিকারিনী হইবেন ঃ যথা-

১। চার বৎসর যাবৎ স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে,

২। স্বামী দুই বৎসর যাবৎ স্ত্রীর ভরণ–পোষণ দানে অবহেলা প্রদর্শন করিলে অথবা ব্যর্থ হইলে, (২-ক) স্বামী ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ব্যবস্থা লংঘন করিয়া অতিরিক্ত স্ত্রী গ্রহণ করিলে,

৩। স্বামী সাত বৎসর বা তদুর্ধ্ব সময়ের জন্য কারাদন্ডে দন্ডিত হইলে,

৪। স্বামী কোন যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত তিন বৎসর যাবৎ তাহার দাম্পত্য দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে,

৫। বিবাহকালে স্বামীর পুরুষত্বহীনতা থাকিলে এবং উহা বর্তমানেও চলিতে থাকিলে,

৬। ২ বৎসর স্বামী পাগল হইয়া থাকিলে অথবা কুষ্ঠ ব্যাধিতে কিংবা ভয়ানক ধরনের উপদংশ রোগে ভুগিতে থাকিলে,

৭। ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তাহাকে তাহার পিতা অথবা অন্য অভিভাবক বিবাহ করাইয়া থাকিলে এবং আঠারো বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্বেই সে উক্ত বিবাহ অস্বীকার করিয়া থাকিলে; তবে, অবশ্যই ঐ সময়ের মধ্যে যদি দাম্পত্য মিলন অনুষ্ঠিত না হইয়া থাকে,

৮। স্বামী তাহার (স্ত্রী) সহিত নিষ্ঠুর আচরণ করিলে, অর্থাৎ-

ক. অভ্যাসগতভাবে তাহাকে আঘাত করিলে বা নিষ্ঠুর আচরণ দ্বারা, উক্ত আচরণ দৈহিক পীড়নের পর্যায়ে না পড়িলেও, তাহার জীবন শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে এমন হইলে,

খ স্বামীর দুর্নাম রহিয়াছে বা কলঙ্কিত জীবন যাপন করে এমন স্ত্রীলোকের সহিত মেলামেশা করিলে, অথবা

গ. তাহাকে দুর্নীতি জীবন-যাপনে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিলে,

ঘ. তাহার সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে অথবা উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান করিলে, অথবা

ঙ. তাহার ধর্মীয় কর্তব্য পালনে বাধা সৃষ্টি করিলে, অথবা

চ. একাধিক স্ত্রী থাকিলে, সে কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী ন্যায়পরায়ণতার সহিত তাহার সঙ্গে আচরণ না করিলে,

৯। মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য বৈধ হেতু হিসাবে স্বীকৃত অন্য যে কোন কারণে; তবে, অবশ্য

ক. কারাদণ্ডাদেশ চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত ৩নং হেতুবাদে কোন ডিক্রি প্রদান করা যাইবে না,

খ. ১নং হেতুবাদে প্রদত্ত ডিক্রিটি উহার প্রদানের তারিখ হইতে ৬ মাস পর্যন্ত কার্যকরী হইবে না এবং স্বামী উক্ত সময়ের মধ্যে স্বয়ং অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন এজেন্টের মাধ্যমে উপস্থিত হইয়া এই মর্মে যদি আদালতকে খুশি করিতে পারে যে, সে দাম্পত্য কর্তব্য পালনে প্রস্তুত রহিয়াছে, তাহা হইলে আদালত ডিক্রিটি রদ করিবেন, এবং

গ. ৫নং হেতুবাদে ডিক্রি প্রদানের পূর্বে, স্বামীর আবেদনক্রমে আদালতের আদেশের এক বৎসরের মধ্যে সে পুরুষত্বহীনতা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে বা তাহার পুরুষত্বহীনতার অবসান ঘটিয়াছে এই মর্মে আদালতকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আদালত তাহাকে আদেশ দান করিতে পারেন এবং যদি সে উক্ত সময়ের মধ্যে আদালতকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে পারে, তাহা হইলে উক্ত হেতুবাদ কোন ডিক্রি প্রদান করা যাইবে না।

**খুলা ঃ** 'খুলা হইল স্ত্রীর পক্ষ হইতে স্বামীর দাম্পত্য অধিকার হইতে মুক্তি পাওয়ার প্রস্তাবে, চুক্তি দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ'- অর্থাৎ যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার পারস্পরিক বনিবনা ভালো না থাকে, তবে স্ত্রী অর্থ বা সম্পত্তির বিনিময়ে স্বামীকে বিচ্ছেদ ঘটাতে রাজি করাতে পারে। এক্ষেত্রে স্ত্রী মোহরানা বা মোহরানার অংশবিশেষ প্রদান করে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। এ জাতীয় বিচ্ছেদের প্রধান শর্তই হচ্ছে বিচ্ছেদের ইচ্ছাটি স্ত্রীর পক্ষ থেকে আসতে হবে।

**মুবারাত ঃ** 'স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরিক চুক্তি দ্বারা সম্পন্নকৃত বিবাহ বিচ্ছেদকে মুবারাত বলা হয়।' যেখানে বিতৃষ্ণা ও বিচ্ছেদের ইচ্ছাটি পারস্পরিক অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই একে অন্যের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে এবং তারা চুক্তির মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায়। খুলা ও মুবারাতের পার্থক্য হচ্ছে খুলা বিচ্ছেদে বিচ্ছেদের ইচ্ছাটি আসে স্ত্রীর পক্ষ থেকে এবং স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে পৃথক হওয়ার জন্য প্রতিদান প্রদান করে, অপর পক্ষে মুবারাত- এ বিচ্ছেদের ইচ্ছাটি উভয়ের পক্ষ থেকে আসে এবং কোন দান প্রতিদান থাকে না।

**'হিল্লা' নিকাহ্ ঃ** 'স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়া থাকিলে, স্ত্রী অপর একজন পুরুষকে বিবাহ না করা পর্যন্ত এবং তাহার বিবাহের পর প্রকৃত দাম্পত্য মিলন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এবং ঐ ব্যক্তি তালাক না দেওয়া পর্যন্ত অথবা মারা না যাওয়া পর্যন্ত ঐ স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করা প্রথমোক্ত স্বামীর পক্ষে আইনসঙ্গত নহে।'

কিন্তু ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৭(৬) ধারা মোতাবেক 'তালাকে কোন বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিলে এবং উক্তরূপ বিবাহ বিচ্ছেদে তিনবার কার্যকরী না হইলে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে বিবাহ না করিয়া পুনরায় একই স্বামীকে বিবাহ করিতে পারিবে,' অর্থাৎ এ আইনে 'হিল্লা নিকাহ্' নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তা দুইবার তালাক হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, তৃতীয়বার তালাক হলে পূর্ববর্তী নিয়ম প্রযোজ্য হবে। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী 'হিল্লা নিকাহ্' বা মধ্যবর্তী বিয়ে নিষ্প্রয়োজন এবং উহা দইবার পর্যন্ত বৈধ করা হয়েছে। গর্ভবতী অবস্থায় তালাক দিলে সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তালাক কার্যকর হবে না। সন্তানের বৈধতা বা পিতৃত্ব নির্ধারণের জন্যই এ আইন রচিত/প্রণীত হয়েছে।

**খ. বাংলাদেশে প্রচলিত হিন্দু পারিবারিক আইন ঃ**

বাংলাদেশ প্রচলিত হিন্দু আইনের কথা যখন ভাবা যায় তখন উক্ত আইনের আওতায় আমরা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী লক্ষ্য করি, হিন্দু আইনে প্রধানত: দু'টি বিধান ও গোষ্ঠী আছে।

(ক) দায়ভাগ

(খ) মিতক্ষরা।

অবশ্যই আমাদের দেশের হিন্দুদের অধিকাংশই দায়ভাগ গোষ্ঠী এবং দায়ভাগ বিধানের আওতাভুক্ত। মিতক্ষরা এখতিয়ারও কিছু হিন্দু অধিবাসী রয়েছে তাছাড়া বাংলাদেশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সর্ববৃহৎ অংশ দায়ভাগের বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শ্রুতি, স্মৃতি ও উপনিষদ, বেদ-মনু-সংহিতা ইত্যাদি হিন্দু আইনের মূল উৎস। পরবর্তীতে আধুনিক যুগে বিধিবদ্ধ আইন ও আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ হিন্দু আইনের সংস্কার সাধন করে। বলা যায়, ওয়ারেন হেস্টিং ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং এ্যাক্ট পাস করে হিন্দু আইনকে আধুনিকীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এরপর ১৮৫৬ সালে হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন, ১৮৬৬ সালে ধর্মচ্যুত হিন্দুর বিবাহ রদ আইন, ১৯২৮ সালে শিশু বিবাহ নিরোধ আইন, ১৯৩৭ সালে সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর অধিকার সংক্রান্ত আইন উল্লেখযোগ্য আইন হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ভারত বিভাগের পর ভারতে হিন্দু আইনকে সংস্কার ও সংশোধন করে বিশেষ করে ১৯৫৬ সালে যুগোপযোগী আইন পাস হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দুদের ক্ষেত্রে সনাতন ও গতানুগতিক আইন এখনো প্রযোজ্য। বাংলাদেশে এর কোন সংস্কার বা সংশোধন হয়নি।

সমাজতত্ত্ববিদদের সৃষ্টি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি ইতিহাসের পটভূমিতে আমাদের দেশের হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা আলোচনা করি তবে দেখা যাবে যুগে যুগে তার পরিবর্তন ঘটেছে কালোপযোগী প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে। আমাদের দেশের পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে হিন্দু আইনেরও পরিবর্তন আজ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

**হিন্দু বিবাহ ঃ** প্রথমেই বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত বিবাহ বিধির উল্লেখ করতে হয়। হিন্দু পুরুষের বহু বিবাহ নিষিদ্ধ না থাকায় হিন্দু নারী সমাজে মধ্যযুগীয় বর্বরতা, নিপীড়ন ও পারিবারিক বিশৃঙ্খলার বহু কাহিনী এবং নির্মম ঘটনা ঘটে আসছে। বর্তমান সামাজিক অবস্থার বহু বিবাহ সচল, অব্যাহত অথবা সংরক্ষণের পক্ষে কোন নৈতিক বা সামাজিক যৌক্তিকতা নেই। এমতাবস্থায় এক বিবাহ (মনোগামী) বাধ্যতামূলক সামাজিক আচরণের আইন এবং বিধান একান্তই অপরিহার্য।

**অসবর্ণ বিবাহ ঃ** বিবর্তনমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার জন্য পুরাতন বর্ণনাভুক্ত সমাজের রূপ অনেকখানি পাল্টে গেছে। আমাদের অধিকাংশের জীবিকা বা জীবন বৃত্তি জন্মগত পারিবারিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করছে না। তা মূলতঃ নির্ভর করছে একটি বিশেষ পরিবারের আর্থিক অবস্থা, শিক্ষাগত মান এবং পরিবেশগত বিশেষ সুযোগের উপর। বিবাহ সম্পর্কে কার্যত অনেকক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে স্ববর্ণ বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। অথচ আইনগত দিক থেকে এরূপ বিবাহ আমাদের এখানকার প্রচলিত হিন্দু আইন বিরোধী এবং অসিদ্ধ। তাই বিবেচনার প্রয়োজনে স্ববর্ণ বিবাহের গণ্ডি ছাড়িয়ে অস্ববর্ণ বিবাহের যে আইনগত বাধা আমাদের এখানে বর্তমান তার অপসারণের ব্যবস্থার কথা।

**বিবাহের রেজিষ্ট্রেশন ঃ**

বিবাহ সম্পর্কে আর একটি অত্যাবশ্যকীয় বিধান হচ্ছে বিবাহের রেজিষ্ট্রেশন। আমাদের দেশের হিন্দু বিবাহের ক্ষেত্রে বিবাহের রেজিষ্ট্রেশনের কোন বিধান বা আইন না থাকায় কারণে এক্ষেত্রেও সমাজের অন্যান্য নারীর সঙ্গে হিন্দু নারীর নির্যাতনের কোনই তারতম্য নাই বিধায় হিন্দু নারীর বৈবাহিক নির্যাতন বৃদ্ধি লক্ষণীয়। শাস্ত্রীয় মতে বিবাহ অনুষ্ঠান সত্ত্বেও প্রত্যেক হিন্দু বিবাহ অবশ্য অবশ্যই নিবন্ধীকরণার্থে রেজিষ্ট্রেশন বাধ্যতামূলক হওয়ার আইন এবং বিধান প্রয়োজন। হিন্দু বিবাহের রেজিষ্ট্রেশনের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ, অবৈধ যৌতুক গ্রহণ, একাধিক বিবাহ ইত্যাদি নারী নির্যাতনমূলক অসামাজিক ক্রিয়াকেও অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়। ১৯৭২ সালে বিশেষ বিবাহ আইনে হিন্দু রেজিষ্ট্রারের মাধ্যমে করা যাবে বলে আইন পাস হয়েছে। এই আইন হিন্দু, শিখ, জৈন ধর্মের লোকদের উপর বলবৎ হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৮৭২ সালের বিশেষ বিবাহ আইনের রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতি স্বীকৃতি পায়নি।

**পৃথক বসবাসের বা বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার ঃ**

আমাদের দেশে হিন্দু বিবাহ অবিচ্ছেদ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। কোন কারণে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করা সম্ভব না হলেও বিচ্ছেদের কোন সহজতর ব্যবস্থা প্রচলিত হিন্দু আইনে নাই। যেমন মুসলিম আইনে আছে। এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের হিন্দুদের জন্যও আছে। সিভিল কোর্টে

বিবাহ বিচ্ছেদের যে ব্যবস্থা আছে তা খুবই জটিল সাধারণ ইচ্ছা এমনকি স্বেচ্ছায় উভয়পক্ষের সম্মতিতে যদি তেমন কারণ ঘটে। ছাড়াছাড়ির আইনত কোন ব্যবস্থা নেই। প্রবাদ আছে, 'প্রয়োজন আইন মানে না'। এখানে হয়ও তাই। এ ব্যাপারে সহজ বিচ্ছেদ প্রথা চালু করা প্রয়োজন।

**ভরণ-পোষণ ও অভিভাবকত্ব ঃ**

বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে স্ত্রীর স্বতন্ত্র বসবাসের এবং ভরণপোষণের দায় ও অধিকার এবং সন্তানাদির অভিভাবকত্ব সম্পর্কে উপযুক্ত বিধান প্রণয়ন আবশ্যক।

**নির্ভরশীলদের ভরণ-পোষণ ঃ**

স্ত্রী, শিশু, সন্তান, বৃদ্ধ পিতামাতা, বিধবা পুত্র বউ ইত্যাদির ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে উপযুক্ত বিধানের অভাব আছে। সেই সম্পর্কে উপযুক্ত বিধান প্রণয়নের প্রয়োজন আছে।

**মেয়েদের অধিকার ঃ**

দাম্পত্য জীবন সংক্রান্ত বিধি-বিধানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সম্পত্তিতে মেয়েদের উত্তরাধিকার। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীদের অবস্থা আরও নাজুক। কোন হিন্দু নারী তার পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে একচ্ছত্র আধিপত্য নাই। যা আছে তা হল জীবন স্বত্ব। জীবিত অবস্থায় ভোগ দখল করতে পারবে কিন্তু বিক্রি বা হস্তান্তর করতে পারবে না। স্ত্রী ধনের ওপর কেবল হিন্দু নারীর একচ্ছত্র অধিকার আছে। হিন্দু নারীগণ কেবলমাত্র এই সম্পত্তি তাদের ইচ্ছা অনুযাী ভোগ, দখল, বিক্রয়, দান, উইল ইত্যাদির যে কোন পদ্ধতিতে হস্তান্তর করতে পারে এবং কেউ এতে কোন আইনগত বাধা দিতে পারে না। ভারতে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের সংশোধন হয়েছে। আজ তাই প্রয়োজন প্রচলিত আইন বিধির নব মূল্যায়ণ এবং সমাজ বাস্তবতায় কালে চাহিদা অনুযায়ী তার আশু পরিবর্তন এবং সংশোধন।

**জীবনস্বত্ব পূর্ণ স্বত্ব রূপান্তর ঃ (নারী/পুরুষ) কন্যা-পুত্রের সমাধিকার**

নারীদের উত্তরাধিকার স্বত্বের এই প্রচলিত বিধান সম্পর্কে প্রথম বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য নারীর জীবন স্বত্বকে পুরুষ উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য পূর্ণ স্বত্বে মানে উন্নীত করা কিনা? আর দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় উত্তরাধিকার স্বত্বের উল্লেখিত ক্রমবিন্যাসে কন্যাকে পুত্রের সম পর্যায়ভুক্ত করা কিনা? হিন্দু সমাজে নারীর স্থান সনাতন ধর্মের মূলতত্ত্ব ও নীতি অনুসারে অতি উচ্চ ও সম্মানিত পর্যায়ের হলেও বহু শতাব্দীর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে বাস্তব ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত অবনতির অবস্থায় নেমে এসেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাম মোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ প্রগতিশীল দেশ-নেতার প্রচেষ্টার ফলে সতীদাহ প্রথা রহিত এবং

বিধবা প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে নারীদের সমাজে ন্যায্য অধিকারের দাবী ক্রমশ: শক্তিশালী হয়েছে। আমাদের সমাজের প্রাচীন ইতিহাসের পটভূমিতে এবং সাম্প্রতিক বিশ্ব ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত বিধানাবলীর প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পর্কে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ খুবই আবশ্যক বলে মনে হচ্ছে।

**দত্তক গ্রহণ ব্যবস্থা ঃ**

দত্তক সন্তান গ্রহণে বর্তমান বিধি ব্যবস্থার পূর্ণ মূল্যায়ন প্রয়োজন বলে মনে করি। বর্তমান প্রচলিত হিন্দু আইনে পুত্রহীন পিতা দত্তক পুত্র গ্রহণ করতে পারে এবং দত্তক পুত্র ঔরসজাত সন্তানের সমানাধিকার প্রাপ্য হয়। পরিবর্তিত সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে দত্তক পুত্র গ্রহণের মত দত্তক কন্যা গ্রহনের এবং অবিবাহিতা বা মৃত কর্তৃকা বা স্বামী সাহচর্যবিহীনা নারীর দত্তক পুত্র বা কন্যা গ্রহণের অধিকার সম্পর্কে উপযুক্ত বিধান প্রণয়নের আবশ্যকতা আছে বলে মনে হয়। পরিশেষে বলা যায় শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণ দেখিয়ে এবং এগুলি অলংঘনীয় হিসাবে প্রচার করে অনেক হিন্দু বুদ্ধিজীবী আইন সংশোধনের পক্ষপাতী নন। কিন্তু এই আইনশাস্ত্রটি বিশ্লেষণ করলে এবং বিভিন্ন উচ্চ আদালতের নজিরগুলো থেকে এই কথাই বেরিয়ে আসে যে, ধর্ম আগে সৃষ্টি হয়নি। মানুষ তার মঙ্গলের জন্য ধর্মীয় অনুশাসনগুলো তৈরি করেছে। কখনো কখনো আইন দ্বারা বদ করে কোন অনুশাসন বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ঐতিহাসিক একটি কাল সেকানে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। মানুষ প্রয়োজনে অনেক কিছু বাদ দিয়ে নতুন মঙ্গলকর নিয়ম-নীতিগুলি গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ- সতীদাহ প্রথা, গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন ইত্যাদি। আরো পুরোকালে নরবলি প্রথা, স্ত্রী স্বামীর অনুমতিতে পর পুরুষ দ্বারা

সন্তানবর্তী হওয়া প্রভৃতি। সবই শাস্ত্রীয় মতে সত্য আবার এ সত্য যে, এর কোনটিই আর এখন আমরা পালন করি না বা ধর্মীয় ব্যাপার বা পরলৌকিক মঙ্গল হবে এই আশাও পোষণ করি না। তাই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে শাস্ত্রীয় আইনের অনেক কিছু আজ পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। এই আইন সর্বজনগ্রাহ্য আধুনিক ও যুগোপযোগী হওয়া আবশ্যক।

**গ. বাংলাদেশে প্রচলিত খ্রিস্টান পারিবারিক আইন ঃ**

বৃটিশ রাজত্বকাল থেকে যে আইন ভারতবর্ষে খ্রিস্টান আইন হিসাবে প্রচলিত ছিল সেই আইনই এখনও বাংলাদেশের খ্রিস্টান আইন হিসেবে চালু রয়েছে। এইসব আইন-কানুন এক শতাব্দীরও বেশি পুরাতন এবং অনেক ক্ষেত্রেই সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন।

**বিবাহ ঃ**

১. দেশের আইন খ্রিস্টান ম্যারেজ অ্যাক্ট ১৮৭২ অনুসারে গীর্জায় সম্পাদিত খ্রিস্টান বিবাহ আইন সঙ্গত। কেবলমাত্র সরকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই খ্রিস্টান বিবাহ সম্পাদন করাতে পারে।

২. বিবাহ সম্পাদনের সাথে সাথেই বিবাহটি চার্চের রেজিস্টার বই-এ রেজিষ্ট্রি করা হয়। সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহের সার্টিফিকেট নব বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীকে দেওয়া হয়। এই খাতার যিনি বিবাহ সম্পাদন করলেন, তার বিবাহিত ব্যক্তিগণের এবং দুই জন সাক্ষীর সই থাকে। এই খাতার একটি কপি চার্চের প্রধান অফিসে থাকে। সমস্ত বিবাহের রেকর্ড হয়, নিয়মিত সরকারী অফিসে পাঠানো হয়।

৩. বিবাহের পূর্বে, দুই পরিবারের সম্মতি প্রদান তো সাধারণতঃ সব বিবাহেই হয়, কিন্তু খ্রিস্টান বিবাহের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। বেশির ভাগ সময় ছেলে ও মেয়ে দুইটি ভিন্ন চার্চের সদস্য বিবাহের পূর্বে, ছেলের চার্চ এবং মেয়ের চার্চ পরস্পরের কাছে সম্মতিপত্র দিলেই সেই বিবাহ সম্পাদিত হতে পারে, অন্যথায় নয়।

৪. কেবল সম্মতিপত্রই যথেষ্ট নয়, বিবাহের পূর্বে, তিন সপ্তাহে তিন বার, গীর্জায় উপসনালয়ে যখন সকলে একত্রিত হন, তখন এই বিবাহের নোটিস দেওয়া হয়। সকলের কাছে আবেদন করা হয় যদি কারও এই বিবাহের প্রতিবন্ধকতা জানা থাক, তবে তিনি যেন তা গীর্জায় পরিচালকের কাছে জানান। অনেকক্ষেত্রে, এই সময়ই বিশেষ গোপনীয় তথা প্রকাশ পেয়ে যায় এবং অনেক নারী-পুরুষের ভুল বিয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়।

৫. বিবাহের দিন গীর্জায় সকলে উপস্থিত হলে, আবার ছেলে-মেয়েকে এবং সমবেত সকলকে এই অনুরোধ করা হয়, কারও যদি এই বিবাহের কোন প্রতিবন্ধকতা জানা থাকে তা যেন তারা বিবাহের পূর্বেই এই শেষ মুহূর্তে প্রকাশ করেন।

৬. বিয়ের সময় সকলের সমানে, গীর্জায় পুরোহিতদের সামনে এবং ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে ছেলে ও মেয়ে দু'জনে পরস্পরের কাছে এই রকম প্রতিজ্হা করে 'আমি তপন, মিতু তোমাকে আমার পত্নীরূপে গ্রহণ করেছি'। আমি এই প্রতিজ্ঞা করছি যে, আজ থেকে সুখে-দুঃখে, ধনে-দারিদ্র্যে, স্বাস্থ্যে-অস্বাস্থ্যে আমি আজীবন তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকব, তোমাকে ভালবাসব ও সম্মান করে চলবে।

তারপর মেয়ে বলবে, 'আমি মিতু, তোমাকে তপন, আমার পতিরূপে গ্রহণ করছি। আমি এই প্রতিজ্ঞা করছি যে, আজ থেকে সুখে-দুঃখে, ধনে-দারিদ্র্যে, স্বাস্থ্যে-অস্বাস্থ্যে আমি আজীবন তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকব, তোমাকে ভালবাসব ও সম্মান করে চলব।'

এরপর আংটি আদান-প্রদানের মাধ্যমে পরস্পর-পরস্পরকে পার্থিব সম্পত্তির সমানাধিকার দান করে। এই সময় অনেকে মালাবদলও করে।

সরকার প্রদত্ত বিবাহের বয়সসীমা সাধারণত চার্চের বিবাহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৭. বিবাহ দিনের আলোতে সম্পাদিত হয়। সকাল ৬টা থেকে বিকাল ৭টার মধ্যে। এই সকল আইন-কানুন বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, খ্রিস্টান বিবাহ জীবনে একবার হবার কথা, নারী ও পুরুষ পরস্পরের কাছে প্রতিজ্ঞা করে পরস্পরকে বিবাহ করে। চার্চের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ সমান না নারী না পুরুষ নিচে, এই বিষয়ে কিছু মত পার্থক্য লক্ষিত হয়েছে।

**বিবাহ বিচ্ছেদ ঃ**

আগেই বলেছি, খ্রিস্টান বিবাহ-বিচ্ছেদ নেই। পরস্পরের কাছে আজীবন বিশ্বস্ত থাকার প্রতিজ্ঞা করা হয়। কিন্তু খ্রিস্টান বিবাহ-বিচ্ছেদের নজির সকলেই দেখিয়ে দিতে পারবেন। পাশ্চাত্য আইনে আছে। 'দি ইন্ডিয়ান ডিভোর্স এ্যাক্ট ১৮৬৯'। এই এ্যাক্ট-এর ১০নং অনুচ্ছেদ সম্পূর্ণ নারী স্বার্থ পরিপন্থী।

বিবাহ ভেঙ্গে দেবার জন্য স্বামী কোন ক্ষেত্রে আবেদন করতে পারে। যে কোন স্বামী ডিষ্ট্রিক কোর্ট বা হাইকোর্টে, বিবাহ ভেঙ্গে দেবার জন্য এই মর্মে আবেদন করতে পারেন যে, বিবাহের পর তার স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে।

**বিবাহ ভেঙ্গে দেবার জন্য স্ত্রী কোন ক্ষেত্রে আবেদন করতে পারেন ঃ**

লক্ষ্য করবার বিষয়, স্বামী কেবলমাত্র একটি কারণ স্ত্রীর ব্যভিচার, প্রদর্শন করতে পারলেই বিবাহ ভেঙ্গে দেবার জন্য আবেদন

করতে পারে। স্ত্রীর ক্ষেত্রে, স্বামীর ব্যভিচার এই একটি কারণ যথেষ্ট নয়। ব্যভিচারের সাথে আরও অভিযোগ করতে হবে।

**ভরণ-পোষণ ঃ**

ডিভোর্সের কেস চলাকালীন এবং ডিক্রি পাবার পর, স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে খোরপোষ পাবে। স্বামীর আয় ইত্যাদি সম্পর্কে বিবেচনার পর, কোর্ট সিদ্ধান্ত নেবে, স্ত্রী খোরপোষের জন্য কি পরিমাণ অর্থ পাবে।

**ব্যভিচারের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী ঃ**

ডিভোর্স এ্যাক্ট ১৯৮৯ এর ডিভোর্স এ্যাক্ট ১৮৮৯ এর ৩৪ অনুচ্ছেদের পরিবর্তন আয়োজন। স্বামী ব্যভিচারীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে। স্ত্রীর সাতে যে ব্যভিচার করেছে, স্বামী তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে। স্ত্রী কিন্তু স্বামীর ব্যভিচারের কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে না।

**বাতিল 'নাল এ্যাণ্ড ভয়েড' ঃ**

আগেই উল্লেখ করেছি বিবাহের প্রতিবন্ধকতা থাকলে বিবাহ সম্পাদিত হয় না। কোন বিবাহ যদি এই প্রতিবন্ধকতাগুলি গোপন রেখে সম্পাদিত হয়ে যায় এবং পরে প্রকাশ পায় তবে সেই বিবাহ, বিবাহ হিসেবে গণ্য হয় না।

ডিভোর্স এ্যাক্ট: ১৮৬৯ এর ১৯ অনুচ্ছেদে এই বাতিলের শর্তগুলি দেওয়া আছে।

১। যদি স্বামী বা স্ত্রী শারীরিক কারণে যৌন সঙ্গমে অক্ষম হয়।

২। যদি পুরুষ নারীর মধ্যে এমন একটি নিকট আত্মীয়তার আবিষ্কার হয়ে যায়।

**উদাহরণ ঃ**

রক্তের সম্পর্ক কোন পুরুষ তার ভাই-এর মেয়েকে বা কোন নারী তার ভাইয়ের ছেলেকে বিবাহ করতে পারে না। বৈবাহিক সম্পর্কে কোন পুরুষ তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর, স্ত্রীর মাকে বা কোন নারী তার স্বামীর মৃত্যুর পর তার স্বামীর বাবাকে বিবাহ করতে পারে না।

৩. মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তি বিবাহ করতে পারে না, করলে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে।

৪. একজনের প্রথম স্ত্রী বা জীবিত স্ত্রী থাকাকালীন লুকিয়ে অন্য বিবাহ বেআইনী প্রথম বিবাহ প্রধান করতে পারলে দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল হবে।

**ঘ. বাংলাদেশে প্রচলিত নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইন ঃ**

নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, তার প্রতি অন্যায় অত্যাচার সকল সময়ই বিরাজমান। তবে সাম্প্রতিককালে নারীর উপর নির্যাতন যথা- নারী পাচার, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, যৌন হয়রানি, অহরণ, হত্যা ইত্যাদি অপরাধ সীমাহীন বেড়ে গেছে। ফলে এ সম্পর্কিত আইন সমূহের সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ অতি জরুরী হয়ে পড়েছে।

**নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০**

**ধারা ২ ঃ**

**সংজ্ঞা ঃ**

(ক) 'অপহরণ' অর্থ বলপ্রয়োগ বা প্রলুব্ধ করিয়া বা ফুসলাইয়া বা ভুল বুঝাইয়া বা ভীতি প্রদর্শন করিয়া কোন স্থান হইতে কোন ব্যক্তিকে অন্যত্র যাইতে বাধ্য করা।

(খ) 'আটক' অর্থ কোন ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন স্থানে আটকাইয়া রাখা।

(গ) 'ধর্ষণ' অর্থ দ্বারা ৯ এর বিধান সাপেক্ষে, Penal Code, 1860 (Act, XLV of 1860) এর Section 375 ও সংজ্ঞায়িত 'rape'.

**বাংলাদেশ দণ্ডবিধি, ১৮৬০**

**ধারাঃ ৩৭৫ঃ** যে ব্যক্তি অতঃপর ব্যতিক্রান্ত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে নিম্নোক্ত পাঁচ প্রকার বর্ণনাধীন যে কোন অবস্থায় কোন নারীর সহিত যৌন সহবাস করে, সেই ব্যক্তি নারী ধর্ষণ করে বলিয়া গণ্য হইবে।

**প্রথমত ঃ** তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

**দ্বিতীয়ত ঃ** তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে।

**তৃতীয়ত ঃ** তাহার ব্যতিক্রমে যে ক্ষেত্রে তাহাকে মৃত্যু বা আঘাতের ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহার সম্মতি আদায় করা হয়।

**চতুর্থত ঃ** তাহার সম্মতিক্রমে যে ক্ষেত্রে লোকটি জানে যে সে তাহার স্বামী নহে এবং সে (নারীটি) এই বিশ্বাসে সম্মতি দান করে যে, সে (পুরুষটি) অন্য কোন লোক যাহার সহিত সে আইনানুগভাবে বিবেচিত অথবা সে নিজেকে তাহার সহিত আইনানুগভাবে বিবাহিত বলিয়া বিশ্বাস করে।

**পঞ্চমত ঃ** তাহার সম্মতি সহকারে বা বতিরেকে যে ক্ষেত্রে সে ১৪ (চৌদ্দ) বৎসরের কম বয়স্কা হয়।

**ব্যাখ্যা ঃ** অনুপ্রেবেশই নারী ধর্ষণের অপরাধরূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য, যৌন সহবাস অনুষ্ঠানের নিমিত্তে যথেষ্ট বিবেচিত হইবে।

**ব্যতিক্রম ঃ** কোন পুরুষ কর্তৃক তাহার স্ত্রীর সহিত যৌন-সহবাস-স্ত্রীর বয়স (তের) বৎসরের কম না হইলে নারী ধর্ষণ বলিয়া গণ্য হইবে না।

(ছ) 'নারী' অর্থ যে কোন বয়সের নারী,

(জ) 'মুক্তিপণ' অর্থ আর্থিক সুবিধা বা অন্য যে কোন প্রকারের সুবিধা;

**ধারাঃ ৪- দহনকারী ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা সংঘটিত অপরাধের শাস্তি ঃ**

(১) যদি কোন ব্যক্তি দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটান বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে ধণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কোন দহনকারী,ক্ষয়কারী বা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীকে এমনভাবে আহত করেন যাহার ফলে উক্ত শিশু বা নারীর দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট হয় বা শীররের কোন অঙ্গ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হয় বা তাহার শরীরের অন্য কোন স্থান আহত হয়, তাহা হইলে উক্ত শিশুর বা নারীর-

(ক) দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট বা মুখমণ্ডল, স্তন বা যৌনাঙ্গ বিকৃত বা নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন,

(খ) শরীরের অন্য কোন অঙ্গ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হওয়ার বা শরীরের কোন স্থানে আঘাত পাওয়ার ক্ষেত্রে উক্তি ব্যক্তি অনধিক চৌদ্দ বৎসর কিন্তু অন্যুন সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(গ) যদি কোন ব্যক্তি কোন দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ কোন শিশু বা নারীর উপর সংশ্লিষ্ট শিশু বা নারীর শারীরিক, মানসিক বা অন্য কোনভাবে কোন ক্ষতি না হইলেও, অনধিক সাত বৎসর কিন্তু অন্যুন তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদণ্ডের দণ্ডনীয় হইবেন।

(ঘ) এই ধারার অধীনে অর্থদণ্ডের অর্থ প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী দণ্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে বা তাহার বিদ্যমান সম্পদ, বা তাহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত্যুর সময় রাখিয়া যাওয়া সম্পদ হইতে আদায় করিয়া অপরাধের দরুণ যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহার উত্তরাধিকারীকে বা ক্ষেত্রমত যেই ব্যক্তি শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন, সেই ব্যক্তিকে বা সেই ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তাহার উত্তরাধিকারীকে প্রদান করা হইবে।

**ধারা ৫ - নারী পাচার ইত্যাদির শাস্ত ঃ**

(১) যদি কোন ব্যক্তি পতিতাবৃত্তি বা বেআইনী বা নীতিবহির্ভুত কোন কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে কোন নারীকে বিদেশ হইতে আনয়ন করেন বা বিদেশে পাচার বা প্রেরণ করেন অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করেন বা কোন নারীকে ভাড়ায় বা অন্য কোনভাবে নির্যাতনের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করেন বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যে কোন নারীকে তাহার দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখেন তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনধিক বিশ বৎসর কিন্তু অন্যুন দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) যদি কোন নারীকে কোন পতিতার নিকট বা পতিতালয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী বা ব্যবস্থাপকের নিকট বিক্রয়, ভাড়া বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করা হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি উক্ত নারীকে অনুরূপভাবে হস্তান্তর করিয়াছে তিনি, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, উক্ত নারীকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে বিক্রয় বা হস্তান্তর করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তিনি উপ ধারা (১) ও উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) যদি কোন পতিতালয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী বা পতিতালয়ের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কোন ব্যক্তি কোন নারীকে ক্রয় বা ভাড়া করেন বা অন্য কোনভাবে কোন নারীকে দখলে নেন বা জিম্মায় রাখেন, তাহা হইলে তিনি ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, উক্ত নারীকে পতিতা হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ক্রয় বা ভাড়া করিয়াচেন বা দখলে বা জিম্মায় রাখিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উপ ধারা (১) এ উল্লেখিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

**ধারা ৭ ঃ নারী ও শিশু অপহরণের শাস্তি ঃ**

যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৫-এ উল্লেখিত কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন নারী বা শিশুকে অপহরণ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অন্যুন চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

**ধারা ৮ ঃ মুক্তিপণ আদায়ের শাস্তি ঃ**

যদি কোন ব্যক্তি মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন নারী বা শিশুকে আটক করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

**ধারা ৯ ঃ ধর্ষণ, ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু ইত্যাদির শাস্তি ঃ**

(১) যদি কোন পুরুষ কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

**ব্যাখ্যা ঃ** যদি কোন পুরুষ বিবাহ বন্ধন ব্যতীত চৌদ্দ বৎসরের অধিক বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারনামূলকভাবে তাহার সম্মতি আদায় করিয়া, অথবা চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করেন, তাহা হইলে তিন উক্ত নারীকে ধর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধর্ষণ বা উক্ত ধর্ষণ পরবর্তী তাহার অনাধিক কার্যকলাপের ফলে ধর্ষিতা নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যুন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) যদি একাধিক ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন এবং ধর্ষণের ফলে উক্ত ব্যক্তি বা শিশুর মৃত্যু ঘটে বা তিনি আহত হন তাহা হইলে ঐ দলের প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যুন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডের দণ্ডনীয় হইবে।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি কোন নারী বা শিশুকে-

(ক) ধর্ষণ করিয়া মৃত্যু ঘটানোর বা আহত করার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(খ) ধর্ষণের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(৪) যদি পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে কোন নারী ধর্ষিতা হন, তাহা হইলে যাহাদের হেফাজতে থাকাকালীন উক্তরূপ ধর্ষণ সংঘটিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ধর্ষিতা নারীর হেফাজতের জন্য সরাসরিভাবে দায়ী ছিলেন, তিনি বা তাহারা প্রত্যেকে, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে হেফাজতের ব্যর্থতার জন্য, অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

**ধারা ১০ ঃ যৌন পীড়ন ইত্যাদির দণ্ড ঃ**

(১) কোন পুরুষ অবৈধভাবে তাহার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাহার শরীরের যে কোন অঙ্গ বা কোন বস্তু দ্বারা কোন নারী বা শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্য কোন অঙ্গ স্পর্শ করেন তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে যৌন পীড়ন বা তজ্জন্য উক্ত পুরুষ অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন পুরুষ অবৈধভাবে তাহার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কোন নারীর শ্লীলতাহানি করিলে বা অশোভন অঙ্গভঙ্গি করিলে তাহার এই কাজ যৌন হয়রানি এবং তজ্জন্য উক্ত পুরুষ অনধিক সাত বৎসর কিন্তু অন্যূন দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

**ধারা ১৩ ঃ ধর্ষণের ফলশ্রুতিতে জন্মলাভকারী শিশু সংক্রান্ত বিধান ঃ**

অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধর্ষণের কারণে কোন সন্তান জন্মলাভ করিলে-

(ক) উক্ত সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব ধর্ষণকারী পালন করিবেন,

(খ) উক্ত সন্তান জন্মলাভের পর সন্তানটি কাহার তত্ত্বাবধানে থাকিবে এবং তাহার ভরণপোষণ বাবদ ধর্ষণকারী কি পরিমাণ খরচ তত্ত্বাবধানকারীকে প্রদান করিবে তাহা ট্রাইব্যুনাল নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে,

(গ) উক্ত সন্তান পঙ্গু না হইলে, এই খরচ পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে ২১ বৎসর পর্যন্ত এবং কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে তাহার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত এবং পঙ্গু সন্তানের ক্ষেত্রে তিনি স্বীয় ভরণপোষণের যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত প্রদেয় হইবে।

**ধারা ১৪ ঃ সংবাদ মাধ্যমে নির্যাতিতা নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে বাধা-নিষেধ ঃ**

(১) এই আইনে বর্ণিত অপরাধের শিকার হইয়াছেন এইরূপ নারী বা শিশুর ব্যাপারে সংঘটিত অপরাধ বা তৎসম্পর্কিত আইনগত কার্যধারার সংবাদ বা তথ্য বা নাম-ঠিকানা বা অনাধিক তথ্য কোন কোন সংবাদ পত্রে বা অন্য কোন সংবাদ মাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশ বা পরিবেশন করা যাইবে যাহাতে উক্ত নারী বা শিশুর পরিচয় প্রকাশ না পায়।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করা হইলে উক্ত লংঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকে অনধিক দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

**ধারা ৩২ ঃ ধর্ষিতা নারী ও শিশুর মেডিক্যাল পরীক্ষা**

(১) ধর্ষিতা ঃ নারী ও শিশুর মেডিক্যাল পরীক্ষার ক্ষেত্রে, ধর্ষণ সংঘটিত হইবার পর যতশীঘ্র সম্ভব তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে মেডিক্যাল পরীক্ষা যথাশীঘ্র না করা হইলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার জন্য তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দিতে পারিবে।

সংবাদ মাধ্যমে নির্যাতিত নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশ করলে দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকের অনধিক দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড হবে। দহনকারী, ক্ষয়কারী বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটলে বা ঘটানোর চেষ্টা করলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এছাড়া অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড হবে।

নারী পাচার, জোরপূর্বক পতিতৃবত্তিতে নিয়োগ নারী ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীজন কারাদণ্ড বা অনাধিক বিশ বৎসর কিন্তু অন্যুন দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্তদণ্ড।

নারী বা শিশু অপহরণের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অন্যুন চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং সেই সাথে অর্থদণ্ড।

ধর্ষণের শাস্তি হচ্ছে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডও। ধর্ষণের চেষ্টা করার শাস্তি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যুন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং সেই সাথে অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।

ধর্ষণের ফলে জন্মলাভকার শিশুর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ধর্ষণকারী পালন করবে। সন্তান পঙ্গু না হলে, এই খরচ পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে ২১ বৎসর পর্যন্ত এবং কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত।

যৌন পীড়নের শাস্তি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যুন তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও অতিরিক্ত অর্থদণ্ড। শ্লীলতাহানি বা অশোভন অঙ্গভঙ্গির শাস্তি অনধিক সাত বৎসর কিন্তু অন্যুন দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর সাথে অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।

**বাংলাদেশ দণ্ডবিধি, ১৮৬০ ঃ**

**ধারা- ৫০৯ ঃ**

যে ব্যক্তি নারীর শালীনতার অমর্যাদা করার অভিপ্রায়ে এই উদ্দেশ্যে কোন মন্তব্য করে, কোন শব্দ বা অঙ্গভঙ্গি করে বা কোন বস্তু প্রদর্শন করে যে উক্ত নারী অনুরূপ মন্তব্য বা শব্দ শুনিতে পায় অথবা অনুরূপ অঙ্গভঙ্গি বা বস্তু দেখিতে পায়, কিংবা উক্ত নারীর নির্জনবাসে অনধিকার প্রবেশ করে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে- যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ ধণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

**যৌতুক ঃ**

সাধারণ অর্থে যৌতুক বলতে পাত্রপক্ষ কর্তৃক কনে পক্ষের কাছে কৃত দাবী-দাওয়া আদায়কে বুঝায় অর্থাৎ পাত্রপক্ষ কনেপক্ষ থেকে দাবী জানিয়ে যে সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আদায় করে তাই যৌতুক।

**যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ ঃ**

**ধারা ২ ঃ**

**সংজ্ঞা ঃ**

বিষয়বস্তু বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হইলে এই আইনে 'যৌতুক' বলিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রদত্ত যে কোন সম্পত্তি বা 'মূল্যবান জামানত' কে বুঝাইবে, যাহা-

ক) বিবাহের একপক্ষ অপর পক্ষকে, অথবা

খ) বিবাহের কোন এক পক্ষের পিতামাতা বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক বিবাহের যে কোন পক্ষকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে বিবাহ মজলিশে অথবা বিবাহের পূর্বে বা পরে, বিবাহের পণরূপে প্রদান করে বা প্রদান করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় তবে, যৌতুক বলিতে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়ত) মোতাবেক ব্যবস্থিত দেনমোহন বা মোহরানা বুঝাইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ ১ - সন্দেহ নিরসনকল্পে এতদ্বারা জ্ঞাত হইল যে, বিবাহের সহিত সরাসরি সম্পর্কিত নহেন এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বামী বা স্ত্রী, যে কোন পক্ষকে অনদিক পাঁচশত টাকা মূলবানের জিনিস বিবাহের পণ হিসাবে নহে, উপঢৌকনরূপে প্রদান করিলে, অনুরূপ উপঢৌকন এই ধারামতে যৌতুক হিসাবে গণ্য হইবে না।

ব্যাখ্যা : ২ - দণ্ডবিধির (ইং-১৯৮০ সালের ৪৫ নম্বর আইনের) ৩০ ধারায় মূল্যবান জামানত যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই আইনেও ঐ শব্দাবলী একই অর্থ বুঝাইবে।

**ধারা ৩ ঃ**

**যৌতুক প্রদান বা গ্রহণের দণ্ড ঃ**

এই আইন বলবৎ হওয়ার পর, কোন ব্যক্তি যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করিলে যৌতুক প্রদান বা গ্রহণে বাধ্যতা করিলে, সে সর্বাধিক এক বছর মেয়াদের কারাদণ্ড বা সর্বাধিক পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় কিম্ভ প্রকারে দণ্ডনীয় হইবে।

**ধারা ৪ ঃ**

**যৌতুক দাবী করার দণ্ড ঃ**

এই আইন কার্যকরী হওয়ার পর কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কনে বা বরের পিতামাতা বা অভিভাবকের নিকট যৌতুক দাবী করিলে সে সর্বাধিক এক বৎসরের কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়বিধ প্রকারে দণ্ডনীয় হইবে।

যৌতুক দাবী করা, গ্রহণ করা এবং প্রদান করা এমনকি এ সমস্ত কাজে সহায়তা করার শাস্তি হচ্ছে সর্বাধিক এক বৎসর মেয়াদের কারাদণ্ড বা সর্বাধিক পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দণ্ড।

**যৌতুকের জন্য অত্যচার ঃ** নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজে সচেতনতার অভাব, মূল্যবোধের অবক্ষয়, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, শিক্ষার অভাব প্রভৃতি যৌতুকের দাবীর মূল কারণ। আর দাবী পূরণ না হলে অসহায় নারীদের উপর অত্যাচার, যার মাত্রা মৃত্যু পর্যন্ত গড়ায়।

**নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ ঃ**

**ধারা ২ ঃ**

(ঞ) 'যৌতুক' অর্থ কোন বিবাহের কনে পক্ষ কর্তৃক বিবাহের বর বা বরের পিতা বা মাতা বা বর পরে অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, উক্ত বিবাহের সময় বা তৎপূর্বে বৈবাহিক সম্পর্কে বিদ্যমান থাকাকালে, বিবাহ স্থির থাকার শর্তে, বা বিবাহের পণ হিসাবে, প্রদত্ত অথবা প্রদানে সম্মত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ এবং উক্ত শর্ত বা পণ হিসাবে উক্ত বর বা বরের পিতা, মাতা বা বর পক্ষের অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক কনে বা কনে পক্ষের নিকট দাবীকৃত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ।

**ধারা ১১ ঃ যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো ইত্যাদির শাস্তি ঃ**

যদি কোন নারীর স্বামী অথবা পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটান বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন, উক্ত নারীকে আহত করেন বা আহত করার চেষ্টা করেন, তাহলে উক্ত স্বামী, স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা ব্যক্তি।

ক) মৃত্যু ঘটানোর জন্য মৃত্যুদণ্ডে বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উভয় ক্ষেত্রে উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

খ) আহত করার জন্য যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে বা আহত করার চেষ্টা করার জন্য অনধিক চৌদ্দ বৎসর কিম্ভ অন্যূন পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইবেন এবং উভয় ক্ষেত্রে উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

**৪.৬. বিভিন্ন দেশের মুসলিম পারিবারিক আইনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ**

মুসলিম পারিবারিক আইনের আলোচনার সাথে সাথে বিবাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে ইসলামী আইনের যে পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে তার উপর সামান্য আলোকপাত করতে চাই। আমাদের দেশে ১৯৬১ সনে মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী বহু বিবাহকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। কিম্ভ সেই নিয়ন্ত্রণ খুব দৃঢ় নয়।

(ক) তিউনিসিয়ায় ১৯৫৭ সালের ল অব পার্সোনাল স্টাটাস অনুযায়ী বহু বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সে দেশে ইসলামি চিন্তাবিধদের ব্যাখ্যানুযায়ী এই পরিবর্তন আনা হয়। একই আইনে ৩০ নং ধারায় আদালতের বাইরে যে কোন তালাককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

(খ) ১৯৫৯ সনে আলজেরিয়ায় তালাক সংক্রান্ত নতুন আইন জারি করা হয়। এই আইনানুযায়ী আদালত যুক্তিসংগত কারণে স্বামীর অনুকূলে তালাকের অনুমতি প্রদান করতে পারেন। অন্যদিকে স্ত্রী যদি তালাক চায়, তাহলে তাকে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে হবে। অর্থাৎ তালাকের ক্ষেত্রে উভয়ের সমান অধিকার।

(গ) ১৯৫৮ সনের মরক্কোয় বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করে। যদি আদালত মনে করে যে, বহু বিবাহের ফলে স্বামী তার স্ত্রীদের প্রতি সৎ আচরণ করতে পারবে না, তাহলে সে ক্ষেত্রে আদালত দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি প্রদান নাও করতে পারে।

(ঘ) ১৯৫৯ সালে ইরাকে ল অফ পার্সোনাল স্টাটাস জারি করা হয়। এই আইনানুযায়ী একজন কাজী কোন ব্যক্তিকে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি প্রদান করবেন না যদি না তিনিই এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, (১) দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের ক্ষেত্রে তার আর্থিক সংগতি রয়েছে (২) এক্ষেত্রে তার আইন সংগত উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে (৩) স্ত্রীদের মধ্যে কোন বৈষম্য হবে না।

(ঙ) ১৮৬৫ সালে পার্সী (পারস্য) বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ আইন- এ বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উক্ত আইনে বলা হয়েছে কোন স্বামী অথবা স্ত্রী জীবিত অবস্থায় কোন স্বামী অপর কোন নারীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। অনুরূপভাবে স্ত্রীও বর্তমান বিবাহ বৈধ থাকাকালে এবং বর্তমান স্বামী জীবিত থাকাকালে কোন ভাবে কোন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না।

(চ) তুরস্কে সাইপ্রাস সংক্রান্ত আইন বিধিতেও বহু বিবাহের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই বিধি-বিধানের মর্ম কথা হলো সেই ধরনের সকল বিবাহ অবশ্যই বাতিল বলে গণ্য হবে। যদিও প্রমাণিত হয় উক্ত বিবাহের দিনও স্বামী বা স্ত্রী বৈধ বিবাহ অব্যাহত।

(ছ) তুরস্কে সিভিল কোর্টে বলা হয়েছে কোন ব্যক্তি (নারী অথবা পুরুষ) ততক্ষণ পর্যন্ত পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে প্রমাণ করতে সামর্থ হচ্ছে যেঃ

১। ইতিপূর্বে বিবাহ বাতিল, মৃত্যুজনিত কারণে অথবা চিরস্থায়ী অবসান হয়েছে।

২। সমবিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারের আওতায় পরস্পর বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করেছে।

৩। আদালত কর্তৃক বিবাহ বন্ধন অবসান হয়েছে।

(জ) তিউনিসিয়ায় কোর্ট অফ পার্সোনাল স্টাটাস ঃ

একাধিক স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ। কোন ব্যক্তি বর্তমান বৈধ বিবাহ অব্যাহত থাকাকালে যদিও কোন ভাবে কোন কারণে দ্বিতীয় স্ত্রী অথবা স্বামী গ্রহণ করে তাহলে সে এক বছরের কারাদণ্ড অথবা দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার ফ্রাঙ্ক জরিমানা হবে। অথবা অবস্থা অনুসারে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

(ঝ) সোবিয়েত ইউনিয়ন তাজাকিস্তান সহ সকল মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে এই ধরনের আইন ও বিধি দ্বারা পরিচালিত আইন ও বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে পরিগণিত। বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে সমনাধিকারের বিধি-বিধান দীর্ঘকাল যাবৎ কার্যকর।

(ঞ) গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে সকল মুসলিম ধর্মাবলম্বী নারীদের জন্য এক এবং অভিন্ন বিধি-বিধানের রেওয়াজ দীর্ঘকাল থেকে কার্যকরী। যেখানে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ। বর্তমান বৈধ বিবাহ অব্যাহত থাকা কালে কোন ভাবেই একাধিক স্ত্রী বা স্বামী গ্রহণের ব্যবস্থা এই আইনে স্বীকৃত নয়।

(ট) ১৯৭৫ সনে ইন্দোনেশিয়া বিবাহ আইন ঃ ১৯৭৫ সনে ১লা অক্টোবর থেকে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমমর্যাদা ও সমানাধিকার এর ভিত্তিতে এ আইন প্রচলন করা হয়। এই আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সকল বিবাহের রেজিষ্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। নীতিগতভাবে পুরুষ ও নারী এক স্ত্রী বা এক স্বামী গ্রহণ করবে। অর্থাৎ বহু বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলো।

মোটামুটিভাবে এই হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ইসলামী আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ এবং শত শত বৎসরের পশ্চদপদ ধ্যান-ধারণা বহু বিবাহের রেওয়াজ বিলোপের কার্যকরী বিধি-বিধান যা বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী সমাজের বৈষম্যের অবসান এবং নারী সমাজের আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এসেছে। তা অবশ্যই বাংলাদেশ মুসলিম নারী সমাজে অধিকারকে আরো অর্থবহ করে তুলেছে।[৫২]

*Dhaka University Institutional Repository*

## তথ্য নির্দেশিকা

১. আল-কোরআন, ৪:১ ।

২. আল-কোরআন- ২:৩৫-৩৬

৩. আল-কোরআন, ৭:২০ ।

৪. আল-কোরআন,২০ : ১২০-১২২।

৫. আল-কোরআন,৭ : ৯-২৭।

৬. আল-কোরআন: ১৬; ৯৭

৭. আল-কোরআন, ৩:১৯৫।

৮. আল-কোরআন, ৩৩:৩৫।

৯. আল-কোরআন, ১৬:৫৯।

১০. আল-কোরআন- ৮১:৮-৯।

১১. আল-কোরআন: ৩০-২১।

১২. আল-কোরআন, ৪৬:১৫।

১৩. আল-কোরআন, ৬২-২২৮।

১৪. ড.মুস্তফা আসসিবারী,অনুবাদক- আকরাম ফারুক -ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী,(বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার,ঢাকা, ২০০৪ খ্রি.),পৃ.২১।

১৫. Hummudah Abdalati, op-cit, p-303-304. ।

১৬. আল-কুরআন, ৪৯ ঃ ১৩।

১৭. Hummudah Abdalati, op-cit, p-305 ।.

১৮. আল-কুরআন, ৩ ঃ ১৯৫।

১৯. আল-কুরআন, ৯ ঃ ৭১।

২০. আল-কুরআন, ৩৩ ঃ ৩৫-৩৬।

২১. সূরা আহযাবঃ ৩৫।

২২. সূরা তাওবাহঃ ৭১।

২৩. Hummudah Abdalati, Islam in Fucus, Al-Madina Printing and pablication, Jeddah-1973, P-301-302 ।.

২৪. আল-কুরআন, ২ ঃ ৩৫-৩৬।

২৫. আল-কুরআন, ৭ ঃ ১৯-২৭।

২৬. আল-কুরআন, ২০ ঃ ১১৭-১২৩।

২৭. সূরা আল ইমরান ঃ ১৯৫।

২৮. সূরা মু'মিনঃ ৪০।

২৯. সূরা নাহল ঃ ৯৭।

৩০. Hummudah Abdalati, op-cit, p-302-303।

৩১. Abdel Rahim Umrance op-cit, p-62 ।.

৩২. আল-কুরআন, ২০ ঃ ১২০-১২২।

৩৩. Abdel Rahim Umranc op-cit, p-63 ।.

৩৪. আল-কুরআন, ২৮ ঃ ৭।

৩৫. Abdel Rahim Umrance op-cit, p-63-64. ।

৩৬. আল-কুরআন, ২৭ ঃ ৩০।

৩৭. আল-কুরআন।

৩৮ Abdel Rahim Umrance op-cit, p-64-65. ।

৩৯. শহিদ আয়াতুল্লাহ্ ড. মুর্তাজা মোতাহ্হারি, নারীর অধিকার, আলহুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৭, পৃঃ ১১৭।

৪০. শহিদ আয়াতুল্লাহ ড. মুর্তাজা মোতাহ্হারি, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২১।

৪১. আল-কোরআন, ৩৫ ঃ ৩৯।

৪২. মুহাম্মদ কালাম মুস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৬-১১৭।

৪৩. সূরা নিসা।

৪৪. ইসলামে নারী বনাম পুস্তক ও বাস্তবতায় ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মের নারী প,২০।

৪৫. বুখারী শরীফ; খঃ-২ পৃঃ ৪৩।

৪৬. বুখারী শরীফ; খ-২ পৃঃ১২১।

৪৭. ইসলাম নারীর মর্যাদা ও কর্তব্য, পৃঃ ৭৬-৮০।

৪৮. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, অনুচ্ছেদ-৬(১)।

৪৯. ড. মোঃ নুরু ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ-২১২।

৫০. সিডো কমিটির চতুর্থ প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ-২, পৃ-৩৭।

৫১. সৈয়দা রহমান মালকানী বনাম বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য আবেদনকারীর পক্ষে ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম, ড. নরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত,পৃ-২১৩।

৫২. নারীর আইনী অধিকার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, জুন ২০০০।

*Dhaka University Institutional Repository*

## পঞ্চম অধ্যায়

## নারীর উত্তরাধিকার

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতা নারীকে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছে। কন্যা বিয়ে দেয়ার পর তার পিতা মাতার সম্পত্তিতে কন্যার আর কোন অধিকার থাকে না। পুত্রেরা যেমন পিতা-মাতার সন্তান, অনুরূপভাবে কন্যারাও পিতা মাতার সন্তান। একই পিতা-মাতার সন্তান হয়েও পুত্রেরা সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় অথচ কন্যারা উত্তরাধিকারী হয় না।[১]

পিতা-মাতার স্নেহ-মমতা, বিত্ত-বৈভব, অর্থ-সম্পত্তি সবকিছু থেকে বঞ্চিত করা হয় কন্যাকে। এটি নারীর প্রতি চরম অবহেলা ও অমর্যাদার পরিচায়ক। শুধু তাই নয়, একে সামাজিক বঞ্চনা এবং নারীর প্রতি অমানবিক আচরণও বলা যায়। পৃথিবীর দেশে দেশে ভিন্ন সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি নারীকে এভাবে বঞ্চিত করেছে, অবহেলিত করে রেখেছে, তাকে মারাত্মকভাবে ঠকিয়েছে। ইসলাম নারীর প্রতি এসব অমানবিক আচরণ তিরোহিত করে দিয়েছে। নারীর মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক মর্যাদা, উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। নারী তার পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী বলে ইসলামই সর্বপ্রথম ঘোষণা দিয়েছে। নারীর জাতির উত্তরাধিকার প্রশ্নে ইসলামের সুস্পষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে। ইসলামই নারীকে সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন- 'অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের রয়েছে নির্ধারিত অংশ।'[২]

মহান আল্লাহ বলেন- 'পুরুষের জন্য অংশ রয়েছে যা তার পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে গেছে এবং নারীর জন্যও অংশ রয়েছে যা তার পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে গেছে, কম হোক বা বেশি।'[৩]

হযরত মুহাম্মদ (সা.) সার্বজনীন নবী, ইসলাম সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের বিধিবিধানও সার্বজনীন। এতে কাউকে বঞ্চিত করা হয়নি, কাউকে পাওনার অতিরিক্ত কিছু দেয়া হয়নি। যার যা পাওয়া তাঁকে তা যথাযথ ভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় নারীর পৈত্রিক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার আইন কার্যকর করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের সূরা নিসায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন- 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন- 'একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। অত:পর যদি শুধু নারীই হয় দু'এর অধিক, তবে তাদের জন্য ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মারা যান এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্য অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিশ হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অত:পর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মতো পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ অসিয়তের পর, যা করে ইন্তেকাল করেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী তোমরা তা জান না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ।' আর তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের এক চতুর্থাংশ ঐ সম্পত্তির, যা তারা ছেড়ে যায় অসিয়তের পর, যা তারা করে এবং ঋণ পরিশোধের পর। স্ত্রীদের জন্য এক চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্য হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও অসিয়তের পর, যা তোমরা কর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যে পুরুষের ত্যাজ্য সম্পত্তি, তাঁর যদি পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এই মৃতের এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা এক তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে অসিয়তের পর, যা করা হয় অথবা ঋণের পর এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে। এ বিধান আল্লাহর। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।'[৪]

ইসলাম নারীর অনুকূলে এবং পুরুষের বিরুদ্ধে যেমন নয়, তেমনি পুরুষের অনুকূলে এবং নারীর বিরুদ্ধে ও কোন আইন প্রবর্তন করেনি। ইসলাম তার বিধি-বিধানে পুরুষ, নারী ও সন্তানরা যারা তাঁদের আঁচলে প্রতিপালিত হবে তাদের কল্যাণকে এবং তার সূত্র ধরে গোটা মানবজাতির কল্যাণকে বিবেচনা রেখেছে। ইসলাম নারী, পুরুষ তাদের সন্তানাদি এবং মানবজাতির জন্য কল্যাণে পৌছতে হলে সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতাশালী দক্ষ হাতে যে প্রাকৃতিক নিয়ম ও বিধানের অধীনে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলো উপেক্ষা করে না বলে মনে করে। সেই আইন বিধানগুলো নারী পুরুষ সবাইকে মেনে চলার নির্দেশ প্রদান করেছেন। কারণ নারী পুরুষের কল্যাণ অকল্যাণ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে ভাল জানে না।[৫]

উত্তরাধিকার বিষয়ে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেন- 'পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, তা অল্প হোক কিংবা বেশি, এ অংশ নির্ধারিত।

উত্তরাধিকার হচ্ছে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে তার জীবিত আত্মীয়-স্বজনদের অধিকার। মুসলমানদের উত্তরাধিকার আইন মুসলিম আইন অনুযায়ী রচিত আল-কোরআন, হাদীস (সুন্নাহ) ইজমা ও কিয়াস অবলম্বনে পরিচালিত। এ উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তিতে নারীর নিম্নলিখিত অধিকার রয়েছে। যেমন- স্বামী মারা গেলে তার সম্পত্তিতে তার স্ত্রীর অংশ হবে আট ভাগের এক ভাগ। তবে স্ত্রীদের সংখ্যা বেশি হলেও তারা এ অংশ পাবে সমষ্টিগতভাবে। তবে এ অংশ এখনই প্রযোজ্য হবে যখন এক সন্তান বা সন্তানের সন্তান থাকে তারা পাবে। আর যখন কোন সন্তান বা সন্তানের সন্তান না থাকে তখন স্ত্রী পাবে চার ভাগের এক ভাগ। আর কোন ছেলে না থাকলে কন্যা পাবে পিতার সম্পত্তিতে দুই ভাগের এক অংশ। আর কোন পুত্র না থাকলে দুই বা ততোধিক কন্যা সন্তান থাকলে কন্যারা পাবে দুই ভাগের তিন অংশ। আর পুত্র সন্তান থাকলে কন্যা সন্তান পাবে পুত্র সন্তানের অর্ধেক। আর যদি শুধুমাত্র ছেলের ঘরের এক কন্যা থাকে তখন সে পিতার সম্পত্তির সমগ্র অংশই পাবে। অর্থাৎ ছেলে পিতার সম্পত্তির যে অংশ পেত ছেলের মেয়ে সেই পরিমাণ অংশই পাবে। কেউ মারা যাওয়ার সময় শুধু মা, বাবা এবং বোন রেখে গেলে সেখানে মা পাবে তার সম্পত্তির ছয় ভাগের এক অংশ। পিতা ও অনুরূপ পাবে এবং বোনেরা কোন অংশ পাবে না। এ উত্তরাধিকার আইন যেহেতু ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী রচিত তাই এখানে নারীদের সকল অধিকার ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী নির্ধারিত।

**কন্যা সন্তানের অধিকার ঃ** পিতার মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী স্বত্ব লাভ করার ব্যাপারে কন্যা সন্তানের তিন অবস্থা। যথা: প্রথম অবস্থা কন্যা যদি একজন হয় এবং পুত্র না থাকে তাহলে কন্যা পিতার সকল সম্পত্তির $\frac{১}{২}$ অংশ অর্থাৎ অর্ধেক পাবে। যেমন- মরহুম আলী হোসেন সাহেব মৃত্যুকালে এক কন্যা এবং পিতা রেখে মারা যান। তার পুত্র সন্তান নেই। এমতাবস্থায়, কন্যা পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ এবং পিতা পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ। দ্বিতীয় অবস্থাঃ কন্যা যদি দুই বা ততোধিক হয় এবং পুত্র সন্তান না থাকে তাহলে কন্যারা পাবে পিতার সমস্ত সম্পত্তির $\frac{২}{৩}$ অংশ। উক্ত অংশ সকল কন্যাদের সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে। যেমন- আলী হোসেন সাহেব দুই কন্যা ও পিতা রেখে মারা গেলেন। তাঁর বোন পুত্র সন্তান নেই।

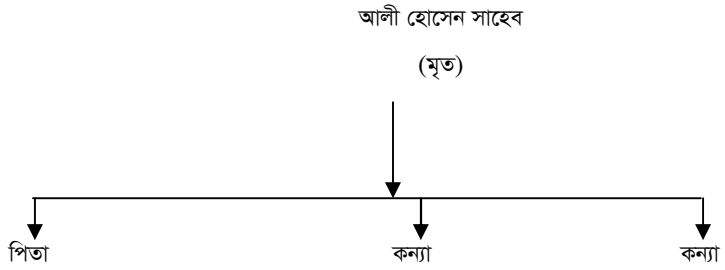


এমতাবস্থায়, প্রত্যেক কন্যা পাবে $\frac{২}{৩}$ অংশ এবং পিতা পাবেন $\frac{১}{৩}$ অংশ।

তৃতীয় অবস্থা ঃ কন্যার সাথে যদি পুত্র থাকে তাহলে প্রত্যেক পুত্র প্রত্যেক কন্যার দ্বিগুন অংশ পাবে। যেমন: মরহুম আলী হোসেন সাহেব অথবা আফরোজা হোসেন মৃত্যুকালে একপুত্র ও এক কন্যা রেখে যান।

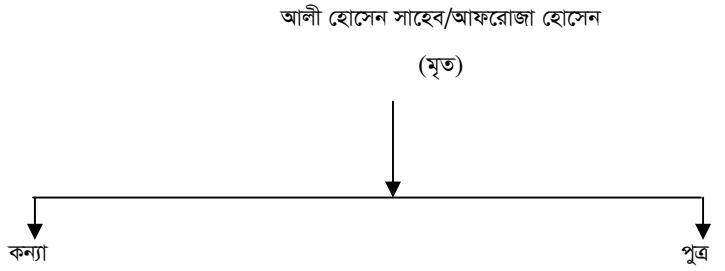

এমতাবস্থায়, প্রত্যেক কন্যা পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ এবং পুত্র পাবে $\frac{২}{৩}$ অংশ। মৃত ব্যক্তির কন্যা ব্যতিত যদি কোন ওয়ারিশ না থাকে, তাহলে কন্যার উপর রদ্দ হবে অর্থাৎ কন্যা মৃত পিতার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী হবে।

**১৯৬১ সালের ৮ম অধ্যাদেশ ঃ** পৌত্রির অধিকার সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে ১৯৬১ সালের ৮ম অধ্যাদেশ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। পৌত্রিক অধিকার এর ৬ষ্ঠ অবস্থায় বলা হয়েছে যে, পুত্রের বর্তমানে পৌত্রী কিংবা পৌত্র অর্থাৎ মৃত পুত্রের সন্তান সন্ততিগণ ওয়ারিশ হবে না। ১৯৯১ সালের ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে মৃত পুত্রের বর্তমানে পুত্রের সন্তান সন্ততিদেরকে উত্তরাধিকারী স্বত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পরে যদি তার পুত্র স্বীয় সন্তানদের রেখে মারা যায় এবং ঐ ব্যক্তির অন্য কোন পুত্র সন্তান জীবিত থাকে, তাহলে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার পৌত্রী কিংবা পৌত্র অর্থাৎ মৃত পুত্রের সন্তানগণ ওয়ারিশ হবে না। উদাহরণস্বরূপ: জনাব আলী হোসেন খানের স্ত্রী আফরোজা হোসেন এবং দুই পুত্র টিটু ও মিঠু আছে। গত ০১/০১/২০০০ইং তারিখে পুত্র টিটু তার এক ছেলে রহিম এবং এক মেয়ে সেলিনা রেখে মারা যায়। এরপর গত ০৬/১২/২০০৮ইং তারিখে জনাব আলী হোসেন খানও মারা যান। এমতাবস্থায় ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে রহিম এবং সেলিনা মরহুম আলী হোসেন খান সাহেবের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কোন অংশ পাবে না।[৬]

**হানাফী উত্তরাধিকার আইন ঃ**

**উত্তরাধিকারীর শ্রেণীবিভাগ ঃ** হানাফী আইনতত্ত্ববিদগণ উত্তরাধিকারীদের সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন; এর মধ্যে তিনটি মুখ্য ও চারটি সম্পূরক শ্রেণী রয়েছে।

**(ক) মুখ্য উত্তরাধিকারগণ ঃ**

(১) অংশীদার (যবিউল ফারুদ, Sharer)। প্রকৃতপক্ষে এদের কোরানিক উত্তরাধিকারী বলাই সংগত;

(২) অবশিষ্টভোগী (আসাবাত, Residuaries); ও

(৩) দূর আত্মীয় (যবিউল আরহাম, Distant kindred)।

**(খ) সম্পূরক উত্তরাধিকারিগণ ঃ**

(৪) চুক্তিমূলে উত্তরাধিকারী;

(৫) স্বীকৃত জ্ঞাতি (Acknowledged kinsman);

(৬) একমাত্র লিগ্যাটি (The universal legatee);

(৭) উত্তরাধিকারী অবর্তমানে রাষ্ট্র (The state by Escheat)।

হানাফী আইন অনুসারে মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত বিত্তের অংশ সর্বপ্রথম দেয়া হয় প্রথম শ্রেণীভুক্ত অংশীদারদের; তারা অবর্তমানে অথবা তাদের দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তার অধিকারী হন দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত অবশিষ্টভোগিগণ এবং প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণী অবর্তমানে ত্যক্ত বিত্ত তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত দূর আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করা হয়। মৃতের সংগে রক্তের সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়বর্গ এবং বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তাবদ্ধ স্বামী বা স্ত্রী এ তিন মুখ্য শ্রেণীর অন্তর্গত। সম্পূরক উত্তরাধিকারিগণ কেবল বিশেষ ক্ষেত্রে ত্যক্ত বিত্তের অধিকারী হন।

**(ক) মুখ্য উত্তরাধিকারিগণ ঃ সাধারণ আলোচনা-**

**প্রথম শ্রেণী ঃ অংশীদার ঃ** উত্তরাধিকার আইন কোরানে সামগ্রিকভাবে আলোচিত হয়েছে। কোরানে মৃত ব্যক্তির যে সমস্ত নিকট আত্মীয়দের নির্দিষ্ট অংশ (সাহ্‌ম) বরাদ্দ করা হয়েছে তারাই প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অংশীদার বা শেয়ারার কথাটি মূল আরবীর আক্ষরিক বা অন্তর্নিহিত কোন অর্থই বহন করে না বিধায় ফাইজী এদের কোরানিক উত্তরাধিকারী বলে অভিহিত করেছেন। উত্তরাধিকার আইন, ইলম আল ফারায়েয নামে পরিচিত এবং অবশ্য প্রাপ্য অংশের অধিকারীদের 'আসাব আল-ফারায়েয' বা 'যবিউল ফরুদ' বলা হয়ে থাকে। ১৯৭২ সনে স্যার উইলিয়াম জোনস অনুদিত সিরাজিয়ায় অংশীদার বা শেয়ারার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ম্যাকনাটেনও 'শেয়ারার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কোরানে বরাদ্দকৃত নির্দিষ্ট অংশের সংগে (সাহম) ইংরেজী 'শেয়ার' কথাটি সংগতিপূর্ণ বিধায় এ পুস্তকেও 'অংশীদার' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। এরূপ ভগ্নাংশের সংখ্যা হচ্ছে ছয়, যথা ঃ $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৮}$; $\frac{২}{৩}$, $\frac{১}{৩}$ ও $\frac{১}{৬}$ এবং এদের প্রাপকদের বলা হয় অংশীদার বা শেয়ারার। কোরানে এরূপ অংশ নির্দিষ্ট করা হয়েছে বিধায় তা অবশ্য প্রদেয় (obligatory)।

কোরানে প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারীদের অংশ নির্দিষ্ট করা হয়েছে বলে অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় তারা অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন। এরূপ বিধানের ফলে কোন বিশেষ শ্রেণী অধিকাংশ সম্পত্তি পেয়ে যান এরূপ মনে করা সংগত নয়। বিধানটি মোটামুটি এরূপ– সমস্ত সম্পত্তি একত্র করে কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক প্রাপককে তার নির্দিষ্ট অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পত্তির বৃহত্তম অংশ) আসাবাত বা গোত্রীয় উত্তরাধিকারীদের দেয়া হয়ে থাকে। আসাবাতগণ অবশিষ্টভোগী বা রেসিডুয়ারী নামে পরিচিত।

অংশদারদের মধ্যে মহিলারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কারণ সম্পত্তির বৃহত্তম অংশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারী অবশিষ্টভোগী বা আসাবাতদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। ধরা যাক কোন মুসলিম বিধবা পত্নী ও এক পুত্র রেখে মারা গেলেন। এক্ষেত্রে বিধবা অংশীদার হিসেবে পাবেন সম্পত্তির $\frac{১}{৮}$ অংশ ও পুত্র অবশিষ্টভোগী বা গোত্রীয় উত্তরাধিকারী হিসেবে পাবেন সম্পত্তির বাকী $\frac{৭}{৮}$ অংশ।

**দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ অবশিষ্টভোগী (আসাবাত, Residuaries) ঃ**

দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারিগণ অবশিষ্টভোগী বা আসাবাত নামে পরিচিত। আসাবাতের সাধারণ অর্থ হচ্ছে 'নিকট পুরুষ এ্যাগনেট'। এজন্য ফাইজী অবশিষ্টভোগী পরিবর্তে এ্যাগনেটিক উত্তরাধিকারী কথাটি ব্যবহার করেছেন। প্রকৃত প্রস্তাব প্রাক-ইসলাম যুগেও এ্যাগনেটগণ ছিলেন মুখ্য উত্তরাধিকারী; সুন্নী আইনে বর্তমানেও তারা মুখ্য পর্যায়ভুক্ত। অবশ্য অংশীদারদের নির্দিষ্ট অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পত্তি তাদের দেয়া হয়ে থাকে। কোরানের নির্দেশেই প্রথম শ্রেণীভুক্ত উত্তরাধিকারিগণ অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন।

রবার্টসন স্মিথের মতে সম্পত্তির অধিকার সামগ্রিকভাবে পরিবারের মধ্যেই নিহিত। কারণ অংশীদার অবর্তমানে বা তাদের অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি আসাবাতদের প্রাপ্য। আসাবাত বলতে সাধারণতঃ 'যারা পুরুষানুক্রমিক বিবাদে (blood-feud) যুদ্ধ করতে যান' তাদের বুঝানো হয়ে থাকে। সুতরাং 'অবশিষ্টভোগীর' চেয়ে 'এ্যাগনেটিক উত্তরাধিকারী' (পুরুষের লাইনে আত্মীয়) কথাটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কারণ মুসলিম আইনে আসাবাত হচ্ছেন (১) সমস্ত পুরুষ এ্যাগনেট ও (২) চারজন নির্দিষ্ট মহিলা এ্যাগনেট যথা– কন্যা, পুত্রের কন্যা (যত অধস্তন হোক), পূর্ণ বোন (full sister) ও বৈমাত্রের বোন (consanguine sister)। তথাপি অবশিষ্টভোগী বা রেসিডুয়ারী কথাটি এ উপমহাদেশে বহুল প্রচলিত বিধায় এ পুস্তকে এ্যাগনেটিক উত্তরাধিকারীর পরিবর্তে অবশিষ্টভোগী কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

**তৃতীয় শ্রেণী ঃ দূর আত্মীয় (যবিউল আরহাম, Distant kindred) ঃ**

তৃতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারিগণ দূর আত্মীয় বা যবিউল আরহাম নামে পরিচিত। পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে সমস্ত এ্যাগনেট ও উপরোক্ত চারজন ব্যতীত সকল মহিলা এ্যাগনেট এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। 'রাহের' (বহুবচনে আরহাম) শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'গর্ভ'; তবে আরবীতে এটি সাধারণতঃ রক্তের সম্পর্ক বা আত্মীয়তা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং 'যবিউল আরহাম' বলতে 'আত্মীয়' বা যাদের সঙ্গে আত্মীয়তা রয়েছে তাদেরই বুঝায়। রক্তের সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ নিকট হতে পারেন যথা– আসাবাত বা পুরুষ এ্যাগনেট, এরা এক গোত্রীয় বিধায় গোত্রের সপক্ষে যুদ্ধ করতে বাধ্য। পক্ষান্তরে তারা 'দূর' অর্থাৎ অন্য পরিবার বা গোত্রভুক্ত হলে তাদের বলা হয় 'যবিউল আরহাম'। কন্যা বা বোনের বিয়ে অন্য পরিবার বা গোত্রে হলে তাদের সন্তান-সন্ততিগণ দূর সম্পর্কীয় বলে গণ্য হন বিধায় মাতামহের গোত্রের সপক্ষে যুদ্ধ করার কোন বাধ্যবাধকতা তাদের নেই। সিরাজিয়াহ্ অনুসারে যারা 'অংশীদার বা অবশিষ্টভোগী' নন তারাই হচ্ছেন 'দূর আত্মীয়'।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, সুন্নী উত্তরাধিকার আইনের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত আসাবাতগণ শুধু প্রাচীনতম উত্তরাধিকারীই নন, উত্তরাধিকারী হিসেবে তাদের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অংশীদার বা কোরানিক উত্তরাধিকারীর সংখ্যা বেশি না হলে তারাই সম্পত্তির বৃহত্তম অংশের অধিকারী হন। অংশীদার ও অবশিষ্টভোগীদের অনুপস্থিতিতে ত্যক্ত বিত্তের অধিকারী হন দূর আত্মীয়গণ। তবে স্বামী বা স্ত্রী কোনক্রমেই উত্তরাধিকার থেকে বাদ পড়েন না।

**(খ) সম্পূরক উত্তরাধিকারী (Subsidiary heirs) ঃ** তিন মুখ্য শ্রেণীভুক্ত উত্তরাধিকারী অবর্তমানে ত্যক্ত বিত্তের অধিকারী হন সম্পূরক উত্তরাধিকারিগণ। তাদের মধ্যে আবার একশ্রেণী বর্তমানে অন্য শ্রেণী বঞ্চিত হন।

**(৪) চুক্তিমূলে উত্তরাধিকারী (Successors by contract) ঃ** হানাফী আইনে সম্পূরক উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীভুক্ত হচ্ছেন চুক্তিমূলে উত্তরাধিকারিগণ। এরূপ উত্তরাধিকারী দু'প্রকার হতে পারে ঃ (১) মুক্তিদাতা (emancipator) ও (২) বন্ধু (friend)। মুক্তিদাতা উত্তরাধিকারীর (ওয়ালা আল-ইতক) উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোন ব্যক্তি তার ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিলে সে উক্ত ক্রীতাসের ত্যক্ত বিত্তের উত্তরাধিকারী হবে, কিন্তু ক্রীতদাস তার প্রভুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না। ১৮৪৩ সনের Slavery Act-এর পর এ ধরনের 'ওয়ালার' অস্তিত্ব এ উপমহাদেশে নেই।

দ্বিতীয়টিক বলা হয় 'ওয়ালা আল-মোয়ালাত'। ধরা যাক রহিম জনৈক আগন্তুক হায়দারের সঙ্গে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলো যে, রহিমের দেয় যে কোন ক্ষতিপূরণ বা মুক্তিপণ (দিয়া, fine or ransom) হায়দার পরিশোধ করবে। এ শর্ত সাপেক্ষ রহিমের মৃত্যুর পর হায়দার তার ত্যক্ত বিত্তের উত্তরাধিকারী হবে। এরূপ সম্পর্ক 'ওয়ালা', এরূপ চুক্তি 'মোয়ালাত' ও এরূপ চুক্তিমূলে স্পষ্ট উত্তরাধিকারী 'মাওলা' নামে পরিচিত। ফৌজদারী অপরাধের জন্য ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা (দিয়া) এ উপমহাদেশে প্রচলিত নয় বিধায় বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

**(৫) স্বীকৃত জ্ঞাতি (acknowledged kinsman) ঃ** মৃত ব্যক্তি কোন অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তিকে নিজের জ্ঞাতি বলে স্বীকার করে থাকলে তাকে স্বীকৃত জ্ঞাতি বলা হয়ে থাকে। তবে সম্পর্কটি অবশ্যই স্বীকৃতিদাতার নিজের সূত্রে না হয়ে অন্যের সূত্রে হতে হবে। সুতরাং কোন ব্যক্তি অন্যকে নিজের ভাই (পিতার বংশধর) অথবা পিতৃব্য (চাচা, পিতামহের বংশধর) হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার অধিকারী হলেও সে কাউকে নিজের পুত্র বলে স্বীকৃতি দেয়ার অধিকারী নয়।

**(৬) একমাত্র লিগ্যাটি (The universal legatee) ঃ** উপরে বর্ণিত সকল উত্তরাধিকারী অবর্তমানে সমস্ত সম্পত্তি কোন ব্যক্তির অনুকূলে উইলের মাধ্যমে হস্তান্তর করা হলে এরূপ গ্রহীতাকে একমাত্র লিগ্যাটি বলা হয়ে থাকে। যেসব ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী বর্তমান রয়েছে শুধু সেসব ক্ষেত্রেই উইল সম্পর্কীয় এক-তৃতীয়াংশের বিধান প্রযোজ্য। কোন উত্তরাধিকারী অবর্তমানে সমস্ত সম্পত্তি উইলের মাধ্যমে হস্তান্তর করা যেতে পারে।

**(৭) উত্তরাধিকারী অবর্তমানে রাষ্ট্র (The State by escheat) ঃ** কোন উত্তরাধিকারী, লিগ্যাটি বা সাকসেসর অবর্তমানে ত্যক্ত বিত্তের মালিক হন রাষ্ট্র। ইসলামী আইনের বিধানমতে এরূপ সম্পত্তি মুসলিমদের কল্যাণার্থে রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা বায়তুল মাল জমা হবে। কিন্তু এ উপমহাদেশে কার্যকর মুসলিম আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রই এরূপ সম্পত্তির মালিক বলে গণ্য।

**প্রথম শ্রেণী ঃ অংশীদার (আসাব আল-ফারায়েয, sharers) ঃ** হানাফী আইন অনুযায়ী নিম্নলিখিত বারজন আত্মীয় প্রথম শ্রেণীভুক্ত অংশীদারের অন্তর্গত ঃ

(ক) বৈবাহিক সূত্রে উত্তরাধিকারী (Heirs by afinity) ঃ

(১) স্বামী;

(২) স্ত্রী;

(খ) রক্তের সম্পর্কীয় আত্মীয়বর্গ (Blood relations) ঃ

(৩) পিতা;

(৪) সত্য পিতামহ, যত ঊর্ধ্বতন হোক (True grand-father, how high soever);

(৫) মাতা;

(৬) সত্য পিতামহ, যত ঊর্ধ্বতন হোক (True grand-mother, how high soever);

(৭) কন্যা;

(৮) পুত্রের কন্যা, যত অধস্তন হোক (Son's daugter, how low soever);

(৯) পূর্ণ বোন (Full sister);

(১০) বৈমাত্রের বোন (Consanguine sister);

(১১) বৈপিত্রের ভাই (Utering brother);

(১২) বৈপিত্রের বোন (Utering sister);

লক্ষণীয় যে, উপরোক্ত বারজনের মধ্যে আটজনই হচ্ছে মহিলা। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে নিম্নে কতিপয় বিষয়ের সংজ্ঞা দেয়া হলো।

সংজ্ঞা ঃ

**(১) এ্যাগনেট ঃ** মৃত ব্যক্তির সংগে শুধু পুরুষের মাধ্যমে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে বলা হয় এ্যাগনেট; যথা– পুত্র, পুত্রের পুত্র, পুত্রের কন্যা, পিতা, পিতার পিতা প্রভৃতি;

**(২) কগনেট ঃ** মৃত ব্যক্তির সঙ্গে একা বা একাধিক মহিলার মাধ্যমে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে বলা হয় কগনেট; যথা– কন্যা পুত্র, কন্যার কন্যা, মাতার পিতা, পিতার মাতার পিতা প্রভৃতি;

**(৩) সত্য পিতামহ (True grandfather) ঃ** সত্য পিতামহ বলতে এমন একজন পুরুষ পূর্বসূরী বুঝার যার ও মৃত ব্যক্তির মাঝখানে কোন মহিলা নেই, যথা–পিতার পিতা, পিতার পিতার পিতা ও ও তার পিতা, যত ঊর্ধ্বতন হোক প্রভৃতি;

**(৪) মিথ্যা পিতামহ (False grandfather) ঃ** মিথ্যা পিতামহ বলতে এরূপ একজন পুরুষ পূর্বসূরী বুঝার যার ও মৃত ব্যক্তির মাঝখানে কোন মহিলা রয়েছে, যথা–মাতার পিতা, মাতার মাতার পিতা, মাতার পিতার পিতা, পিতার মাতার পিতা প্রভৃতি;

**(৫) সত্য পিতামহী (True grandmother) ঃ** সত্য পিতামহী বলতে এরূপ একজন মহিলা পূর্বসূরী বুঝার যার ও মৃত ব্যক্তির মাঝখানে কোন মিথ্যা পিতামহ নেই, যথা–পিতার মাতা, মাতার মাতা, পিতার মাতার পিতা, পিতার পিতার মাতা, মাতার মাতার মাতা প্রভৃতি;

**(৬) মিথ্যা পিতামহী (True grandmother) ঃ** মিথ্যা পিতামহী বলতে এরূপ একজন মহিলা পূর্বসূরী বুঝার যার ও মৃত ব্যক্তির মাঝখানে কোন মিথ্যা পিতামহ রয়েছেন, যথা–মাতার পিতার মাতা, পিতার মাতার পিতার মাতা প্রভৃতি;

**(৭) পুত্রের পুত্র, যত অধস্তন হোক ঃ** পুত্রের পুত্র, যত অধস্তন হোক বলতে অধস্তন পুরুষ এ্যাগনেট বুঝায়, যথা–পুত্রের পুত্র, পুত্রের পুত্রের পুত্র, তার পুত্র প্রভৃতি;

**(৮) পুত্রের কন্যা, যত অধস্তন হোক ঃ** পুত্রের কন্যা, যত অধস্তন হোক বলতে অধস্তন মহিলা এ্যাগনেট বুঝায়, যথা–পুত্রের কন্যা, পুত্রের পুত্রের কন্যা, পুত্রের পুত্রের পুত্রের কন্যা প্রভৃতি।

[সংজ্ঞাগুলো জটিল ও বিভ্রান্তিকর। এগুলো ভালভাবে আয়ত্ব করা প্রয়োজন। মিথ্যা পিতামহ (false grandfather) ও মিথ্যা পিতামহী (false grandmother) দূর আত্মীয়ের অন্তর্গত]

অংশীদারদের (sharer) তালিকা পর পৃষ্ঠায় দেয়া হলো। এটি বিশেষভাবে আয়ত্ব করা প্রয়োজন; কারণ আইনের মূলনীতিসমূহ এতে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে। উক্ত তালিকাটি উইলসন, তায়েবজী, মুল্লা ফাইজীর উপর ভিত্তি করে রচিত। প্রত্যেক উত্তরাধিকারী সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা ছাড়াও সচরাচর উদ্ভুত সমস্যাসমূহ বিস্তারিতভাবে এতে আলোচিত

হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি বিষয় যথাসম্ভব পরিহার করে 'আউল', রাদ ও নিয়ম বহির্ভূত অন্যান্য জটিল বিষয় যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

**অংশীদারদের তালিকা–হানাফী আইন**

**[সংকেত ঃ য,অ,হ = যত অধস্তন হোক]**

| ১ | ২ | | ৩ | ৪ | ৫ |
|---|---|---|---|---|---|
| উত্তরাধিকারিগণ | স্বাভাবিক অংশ | | যারা বর্তমানে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন। | যারা বর্তমানে বা অবর্তমানে অংশ প্রভাবিত হয়। | যেভাবে প্রভাবিত হয়। |
| | একজনের অংশ | দুই বা ততোধিকের সমবেত অংশ | | | |
| ১। স্বামী | $\frac{১}{৪}$ | ------ | কেউ না | সন্তান বা পুত্রের সন্তান, য, অ, হ, অবর্তমানে | অংশ বেড়ে $\frac{১}{২}$ হয়। |
| ২। স্ত্রী | $\frac{১}{৮}$ | $\frac{১}{৮}$ | কেউ না | সন্তান বা পুত্রের সন্তান, য, অ, হ, অবর্তমানে | অংশ বেড়ে $\frac{১}{৪}$ হয়। |
| ৩। পিতা | $\frac{১}{৬}$ | ------ | কেউ না | সন্তান বা পুত্রের সন্তান, য, অ, হ, অবর্তমানে | অবশিষ্টভোগী হন। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪। সত্য পিতামহ | ১/৬ | ------ | (১) পিতা<br>(২) নিকটতম সত্য পিতামহ | সন্তান বা পুত্রের সন্তান, য, অ, হ, অবর্তমানে | অবশিষ্টভোগী হন। |
| ৫। মাতা | ১/৬ | ------ | কেউ না | (১) অবর্তমানে (২) পুত্রের সন্তান, য, অ, হ, অবর্তমানে (৩) এক ভাই বা এক বোন বর্তমানে (৪) পিতা ও তৎসহ স্বামী বা স্ত্রী বর্তমানে। | (১), (২) ও (৩)-এর ক্ষেত্রে অংশ বেড়ে ১/৩ হয়।<br>(৪) এর ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রীর অংশ বাদে অবশিষ্ট সম্পত্তির ১/৩ অংশ পান। |
| ৬। সত্য পিতামহী (True grand-mother) ঃ<br>(ক) মাতৃকুলের<br><br>(খ) পিতৃকুলের | ১/৬<br><br>১/৬ | ১/৬<br><br>১/৬ | (১) মাতা (২) নিকটতম সত্য পিতামহী<br><br>(মাতৃকূল বা পিতৃকূলের)<br>(১) মাতা (২) নিকটতম সত্য পিতামহী সত্য পিতামহী (পিতৃকূলের) (৩) পিতা (৪) মধ্যবর্তী সত্য পিতৃমহ | কেউ না<br><br>কেউ না | .....<br><br>..... |
| ৭। কন্যা | ১/২ | ২/৩ | কেউ না | পুত্র বর্তমান | অবশিষ্টভোগী হন। |
| ৮। পুত্রের কন্যা* য,অ,হ | ১/২ | ২/৩ | (১) পুত্র (২) একাধিক কন্যা (৩) ঊর্ধ্বতন পুত্রের পুত্র (৪) ঊর্ধ্বতন পুত্রের একাধিক কন্যা। | (১) এক কন্যা বর্তমানে (২) ঊর্ধ্বতন পুত্রের এক কন্যা বর্তমানে (৩) সমান (equal) পুত্রের পুত্র বর্তমান | (১) ও (২)-এর ক্ষেত্রে অংশ কমে ১/৬ হয় (৩) এর ক্ষেত্রে অবশিষ্টভোগী হন। |
| ৯। পূর্ণ বোন (Full sister) | ১/২ | ২/৩ | (১) পুত্র (২) পুত্রের পুত্র য, অ, হ (৩) পিতা (৪) সত্য পিতামহ | পূর্ণ ভাই বর্তমানে। | অবশিষ্টভোগী হন। |
| ১০। বৈমাত্রের বোন (Consan-guine sister) | ১/২ | ২/৩ | (১) পুত্র (২) পুত্রের পুত্র, য,অ,হ (৩) পিতা (৪) সত্য পিতামহ (৫) পুর্ণ ভাই (full brother) (৬) একাধিক পূর্ণ বোন (full sister) | (১) একজন পূর্ণ বোন বর্তমানে (২) বৈমাত্রের ভাই (Consanguine brother) বর্তমানে। | (১) এর ক্ষেত্রে অংশ কমে ১/৬ হয় (২)-এর ক্ষেত্রে অবশিষ্টভোগী হন। |
| ১১। বৈপিত্রের ভাই (Uterine brother) | ১/৬ | ১/৩ | (১) সন্তান<br>(২) পুত্রের সন্তান য,অ,হ,<br>(৩) পিতা<br>(৪) সত্য পিতামহ | কেউ না | ..... |
| ১২। বৈ-পিত্রের বোন (Uterine sister) | ১/৬ | ১/৩ | (১) সন্তান<br>(২) পুত্রের সন্তান য,অ,হ,<br>(৩) পিতা<br>(৪) সত্য পিতামহ | কেউ না | ..... |

* ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ অনুসারে পূর্ব-মৃত পুত্র বা কন্যা জীবিত থাকলে যে অংশ পেতো তার পুত্র বা কন্যাও অনুরূপ অংশের অধিকারী হবে।

টীকাঃ (১) সমবেত অংশ প্রাপকদের মধ্যে সম-অংশে বণ্টিত হবে।

(২) কোন মুসলিমের একই সময়ে চারটি পর্যন্ত স্ত্রী থাকতে পারে।

(৩) পুত্রের পুত্র ও পুত্রের পুত্রের কন্যার মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তির তুলনায় ঊর্ধ্বতন পুত্রের পুত্র; পুত্রের পুত্র ও পুত্রের কন্যার মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তির তুলনায় অধস্তন পুত্রের পুত্র; পুত্রের পুত্র ও পুত্রের কন্যা অথবা পুত্রের পুত্রের পুত্র ও পুত্রের পুত্রের কন্যা সমান পুত্রের পুত্র ও কন্যা; কারণ উভয়ই মৃত ব্যক্তি থেকে সম-দূরবর্তী।

(৪) কোন সুন্নী (হানাফী) মুসলিমের ত্যক্ত বিত্ত বণ্টনকালে প্রথমে দেখতে হবে উপরোক্ত তালিকার কলাম (১)-এ বর্ণিত কোন অংশীদার কলাম (৩)-এ বর্ণিত কোন ব্যক্তি থাকায় সম্পূর্ণ বঞ্চিত হচ্ছেন কি-না; অত:পর দেখা প্রয়োজন কলাম (৪)-এ বর্ণিত কোন কারণে তার অংশ প্রভাবিত হচ্ছে কি-না; প্রভাবিত না হলে কলাম (২) এ উল্লিখিত অংশ তিনি পাবেন; প্রভাবিত হলে কলাম (৫)-এ উল্লিখিত অংশ তাকে দেয়া হবে।

**উদাহরণমালা**

[উদাহরণমালায় উল্লিখিত ব্যক্তিগণ হচ্ছেন মৃত ব্যক্তির জীবিত আত্মীয়বর্গ]

(ক) স্বামী, স্ত্রী ঃ

(১) স্বামী বা স্ত্রী সর্বদাই পরস্পরের উত্তরাধিকারী। বৈবাহিক সম্পর্কে আত্মীয়দের মধ্যে একমাত্র স্বামী-স্ত্রীকেই মুখ্য উত্তরাধিকারীর শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। প্রাক-ইসলাম যুগে তারা ছিলেন পরস্পরের উত্তরাধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। কোন সন্তান বা অধস্তন এ্যাগনেটিক বংশধর রেখে মারা গেলে স্বামী ত্যক্ত বিত্তের (নীট) $\frac{১}{৪}$ অংশের অধিকারী হন; কোন সন্তানাদি অবর্তমানে স্বামীর প্রাপ্য অংশ হয় $\frac{১}{২}$ ।

সন্তানাদি বর্তমানে স্ত্রী $\frac{১}{৮}$ অংশের অধিকারী হন; কোন সন্তান না থাকলে তার প্রাপ্য অংশ হয় $\frac{১}{৪}$ । একাধিক স্ত্রী থাকলে $\frac{১}{৮}$ বা $\frac{১}{৪}$ অংশ সমানভাবে তাদের মধ্যে বিভক্ত হবে।

(খ) স্বামী ও পিতা ঃ

(২) স্বামী ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

পিতা ---------- $\frac{১}{২}$ (অবশিষ্ট ভোগী হিসেবে)

(গ) বিধবা স্ত্রী ও সন্তানাদি ঃ

(৩) স্ত্রী ---------- $\frac{১}{৮}$ (অংশীদার হিসেবে)

সন্তাদি ---------- $\frac{৭}{৮}$ (অবশিষ্ট ভোগী হিসেবে)

এ সমস্ত সরল উদাহরণ থেকেও দেখা যাচ্ছে যে, অংশীদার ও অবশিষ্ট ভোগীদের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন একটি অপরটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং অংশীদার সম্পর্কীয় নিয়মাবলী আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্টভোগী সম্পর্কীয় নিয়মাবলীও আয়ত্ব করা বিশেষ প্রয়োজন। এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, অন্য কোন উত্তরাধিকারী অবর্তমানে স্বামী বা স্ত্রী সম্পূর্ণ সম্পত্তির অধিকারী হন। (মাহমেদ আরশাদ বনাম সাজিদা বানু)

(ঘ) পিতা, স্বামী, স্ত্রী ঃ

(৪) পিতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (কন্যা বর্তমানে অংশীদার হিসেবে)

পিতার পিতা --- -- (পিতা বর্তমানে বঞ্চিত)

মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (কন্যা বর্তমানে অংশীদার হিসেবে)

মাতার মাতা --- -- (মাতা বর্তমানে বঞ্চিত)

দুই কন্যা ------- $\frac{২}{৩}$ (অংশীদার হিসেবে)

পুত্রের কন্যা --- ---- (দুই কন্যা বর্তমানে বঞ্চিত)

১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে উদাহরণ (৪)-এ উল্লিখিত ব্যক্তিদের অংশ হবে ঃ

(৪-ক) পিতা ---------- $\frac{১}{৬}$

পিতার পিতা --------- ---- (পিতা বর্তমানে বঞ্চিত)

মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$

মাতার মাতা --------- ------ (মাতা বর্তমানে বঞ্চিত)

দুই কন্যা $\frac{২}{৩}$ এর $\frac{১}{২} = \frac{১}{৩}$ (প্রত্যেকের অংশ হবে $\frac{১}{৬}$)

পুত্রের কন্যা $\frac{২}{৩}$ এর $\frac{১}{২} = \frac{১}{৩}$

(৫) চার বিধবা স্ত্রী ---------- $\frac{১}{৪}$ (প্রত্যেক অংশ হবে $\frac{১}{১৬}$)

পিতা ---------- $\frac{৩}{৪}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

(৬) মাতা ঃ

(৬) মাতা ---------- $\frac{১}{৩}$ (অংশীদার হিসেবে)

পিতা ---------- $\frac{২}{৩}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

(৭) মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (কারণ দুই বোন বর্তমান)

দুই বোন ------ ---- (পিতা বর্তমানে বঞ্চিত)

পিতা ---------- $\frac{৫}{৬}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি অন্যকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বঞ্চিত করতে পারে। এখানে বঞ্চনাটি আংশিক কারণ মৃত ব্যক্তির দুই বোন না থাকলে মাতা পেতেন $\frac{১}{৩}$ অংশ অথচ তারা বর্তমানে (যদিও তারা কোন অংশের অধিকারী হচ্ছেন না) তিনি পাচ্ছেন $\frac{১}{৬}$ অংশ। সিরাজিয়াহ্ অনুসারে ঃ পিতা বর্তমানে দুই বা ততোধিক ভাই বা বোন (পূর্ণ, বৈমাত্রের বা বৈপিত্রেয়) উত্তরাধিকারী হন না তবে তারা মায়ের অংশকে $\frac{১}{৩}$ থেকে $\frac{১}{৬}$-এ কমিয়ে দেন। দুই বা ততোধিক ভাই অথবা দুই বা ততোধিক বোন অথবা এক ভাই ও এক বোন অথবা দুই বা ততোধিক ভাই-বোন বর্তমানে মায়ের অংশ $\frac{১}{৩}$-এর পরিবর্তে $\frac{১}{৬}$-এ পরিণত হয়।

পিতা বর্তমানে ভাই-বোন বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত নীতি প্রযোজ্য। তবে একমাত্র ভাই বা একমাত্র বোন বর্তমানে মাতা $\frac{১}{৩}$ অংশের অধিকারী হন। কোন বিশেষ আইন বা প্রথার ফলে কোন উত্তরাধিকারী বঞ্চিত হলে উক্ত নিয়ম প্রযোজ্য হবে না (আমিনা বাই বনাম আবা সাহেব)।

(৮) মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (কারণ দুই ভাই বর্তমান)

দুই ভাই ------ --- (পিতা বর্তমানে বঞ্চিত)

পিতা --------- $\frac{৫}{৬}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

(৯) মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (কারণ এক ভাই ও এক বোন বর্তমান)

এক ভাই (পূর্ণ, বৈমাত্রের বা)

বৈপিত্রেয়) ------ --- (পিতা বর্তমানে বঞ্চিত)

এক বোন (পূর্ণ, বৈমাত্রের বা বৈপিত্রের) ------- ---- (পিতা বর্তমানে বঞ্চিত)

পিতা ---------- $\frac{৫}{৬}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

(১০) মাতা ---------- $\frac{১}{৩}$ (কারণ মাত্র এক বোন বর্তমান)

এক বোন (পূর্ণ, বৈমাত্রের বা

বৈপিত্রেয়) ------ $\frac{২}{৩}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

(১১) মাতা --------- $\frac{১}{৩}$ (কারণ মাত্র এক ভাই বর্তমান)

এক ভাই (পূর্ণ, বৈমাত্রের বা

বৈমাত্রেয়) ------- --- (পিতা বর্তমানে বঞ্চিত)

পিতা ---------- $\frac{২}{৩}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

(১২) স্বামী --------- $\frac{১}{২}$ (কারণ সন্তান বা পুত্রের সন্তান য,অ,হ বর্তমান নেই)

মাতা -------- $\frac{১}{৬}$ ($\frac{১}{২}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{১}{৬}$)

পিতা ------- $\frac{১}{৩}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

টীকা ঃ সন্তান বা দুই বা ততোধিক ভাই-বোন অবর্তমানে সাধারণতঃ $\frac{১}{৩}$ অংশ মাতার প্রাপ্য; কিন্তু তা করা হলে মাতার অংশ পিতার অংশের তুলনায় বৃহত্তর হবে। মৃত মহিলার স্বামী ও পিতা বর্তমান বিধায় স্বামীর অংশ দেয়ার পর মাতা অবশিষ্ট সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ অংশের অধিকারী হবেন। স্বামীর অংশ হচ্ছে $\frac{১}{২}$; সুতরাং মাতার অংশ হবে অবশিষ্ট $\frac{১}{২}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{১}{৬}$। সিরাজিয়াহ্ অনুসারে সমান স্তরের পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পুরুষ মহিলার দ্বিগুণ অংশ পাবেন। সুতরাং মাতাকে পিতার চেয়ে বেশি অংশ বরাদ্দ করা যাবে না।

(১৩) বিধবা --------- $\frac{১}{৪}$ (কারণ কোন সন্তান নেই)

মাতা --------- $\frac{১}{৪}$ ($\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{১}{৪}$)

পিতা -------- $\frac{১}{২}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

টীকা ঃ এক্ষেত্রেও যুক্তি (১২)-এর অনুরূপ বিধায় বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। সিদ্ধান্ত দুটি নিয়েছিলেন হযরত ওমর। শিয়াগণ যুক্তিটি গ্রহণ করেন নি।

(১৪) স্বামী ---------- $\frac{১}{২}$

মাতা ---------- $\frac{১}{৩}$

পিতার পিতা ---------- $\frac{১}{৬}$ [১-($\frac{১}{২} + \frac{১}{৩}$) = $\frac{১}{৬}$ ; অবশিষ্টভোগী হিসেবে]

টীকা ঃ এখানে মাতা $\frac{১}{৩}$ অংশ পাচ্ছেন কারণ পিতার পিতা বর্তমানে তার অংশ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। অনুরূপ যুক্তি বিধবা স্ত্রী, মাতা ও পিতার পিতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য [উদাহরণ ১৫ দ্রষ্টব্য]।

(১৫) বিধবা স্ত্রী --------- $\frac{১}{৪}$ (কারণ কোন সন্তান নেই)

মাতা ---------- $\frac{১}{৩}$

পিতার পিতা ----- $\frac{৫}{১২}$ [১-($\frac{১}{৪} + \frac{১}{৩}$) = $\frac{৫}{১২}$ ; অবশিষ্টভোগী হিসেবে]

(চ) পিতা ঃ পিতা সর্ব অবস্থায় উত্তরাধিকারী; তিনি কখনও সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন না। তবে সন্তান বা পুত্রের সন্তান যত অধস্তন হোক অবর্তমান তিনি অবশিষ্টভোগী হন। সংক্ষেপে বলা যায় তিনি ঃ

(১) সন্তান-সন্ততি বর্তমানে পাবেন $\frac{১}{৬}$ অংশ; অবশিষ্ট $\frac{৫}{৬}$ অংশের অধিকারী হবেন সন্তানগণ। প্রত্যেক পুত্র প্রত্যেক কন্যার দ্বিগুণ অংশ পাবেন;

(২) সন্তান সন্ততি বা অধস্তন এ্যাগনেটিক বংশধর (অর্থাৎ পুত্রের পুত্র, যত অধস্তন হোক) অবর্তমানে অবশিষ্টভোগী শ্রেণীভুক্ত হবেন। অনুরূপ নিয়ম সত্য পিতামহের, যত ঊর্ধ্বতন হোক (True grandfather h. h. s.) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য;

(৩) পিতা এবং মাতা ভিন্ন অন্য কোন উত্তরাধিকারী না থাকলে মাতা পাবেন $\frac{১}{৩}$ অংশ; অবশিষ্ট $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবেন পিতা।

(১৬) পিতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

পুত্র --------- $\frac{৫}{৬}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

(১৭) কন্যা ------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

পিতা ------ $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে $\frac{১}{৬}$ +অবশিষ্টভোগী হিসেবে $\frac{১}{৩} = \frac{১}{২}$)

টীকা ঃ এখানে পিতা দুটি ভিন্ন দিক থেকে উত্তরাধিকারী হচ্ছেন। কন্যা বা বোন প্রথম বা দ্বিতীয় যে কোন শ্রেণীর উত্তরাধিকারী হতে পারেন, কিন্তু কোন অবস্থাতেই তারা উভয় শ্রেণীভুক্ত হন না। পক্ষান্তরে পিতা (১) অংশীদার (প্রথম শ্রেণী) হতে পারেন [উদাহরণ ১৬ দ্রষ্টব্য]; (২) সন্তান সন্ততি বা অধস্তন এ্যাগনেটিক বংশধর অবর্তমানে তিনি অবশিষ্টভোগীর পর্যায়ভুক্ত হন, যথা- পিতা ও মাতা ব্যতিত অন্য উত্তরাধিকারী না থাকলে মাতা পাবেন $\frac{১}{৩}$ অংশ এবং অবশিষ্টভোগী হিসেবে বাকী $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবেন পিতা; (৩) শুধু কন্যা বা পুত্রের কন্যা যত অধস্তন হোক বর্তমানে তিনি একই সঙ্গে উভয় শ্রেণীভুক্ত হন [উদাহরণ ১৭ দ্রষ্টব্য]।

(ছ) সত্য পিতামহ ও সত্য পিতামহী (True grandfather and true grandmother) ঃ

(১৮) পিতার মাতা ---------- (তিনি পিতৃকুলের সত্য পিতামহী বিধায় পিতা বর্তমানে বঞ্চিত)

মাতার মাতা -------- $\frac{১}{৬}$ (তিনি মাতৃকুলের সত্য পিতামহী বিধায় পিতা বর্তমানে বঞ্চিত নন)

পিতা ---------- $\frac{৫}{৬}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

(১৯) মাতার মাতা ------ $\frac{১}{১২}$

পিতার মাতা ----- $\frac{১}{১২}$ } (কারণ দুজনের সমবেত অংশ হচ্ছে $\frac{১}{৬}$)

পিতার পিতা ---- $\frac{৫}{৬}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

টীকা ঃ পিতার মাতা, পিতার পিতা বর্তমানে বঞ্চিত নন কারণ শেষোক্ত ব্যক্তি মধ্যবর্তী নন; বরঞ্চ সমপর্যায়ভুক্ত সত্য পিতামহ।

(২০) পিতার পিতার মাতা ---------- (পিতার পিতা বর্তমানে বঞ্চিত)

পিতার পিতা ---------- অবশিষ্টভোগী হিসেবে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী।

টীকা ঃ পিতার পিতার মাতা, পিতার পিতা বর্তমানে বঞ্চিত; কারণ শেষোক্ত ব্যক্তি মধ্যবর্তী সত্য পিতামহ। পিতার পিতার মাতা, পিতার পিতার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

(২১) পিতার মাতার মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$

পিতার পিতা ---------- $\frac{৫}{৬}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

টীকা ঃ পিতার মাতার মাতা হচ্ছেন পিতৃকুলের সত্য পিতামহী; পিতার পিতা হচ্ছেন সত্য পিতামহ। পিতার পিতা নিকটতর, কিন্তু পিতার মাতার মাতা, পিতার পিতার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নন; তিনি পিতার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং এক্ষেত্রে পিতার পিতা মধ্যবর্তী সত্য পিতামহ নন বিধায় পিতার মাতার মাতা পিতার পিতা বর্তমানে বঞ্চিত নন।

(২২) পিতার মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$

মাতার মাতার মাতা ---------- (নিকটতর সত্য পিতামহী পিতার মাতা বর্তমানে বঞ্চিত)

পিতার পিতা ---------- $\frac{৫}{৬}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

(২৩) পিতার মাতা ---------- --- (পিতা বর্তমানে বঞ্চিত)

মাতার মাতার মাতা ------- --- (নিকটতর সত্য পিতামহী পিতার মাতা বর্তমানে বঞ্চিত)

পিতা ---------- --- অবশিষ্টভোগী হিসেবে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী।

টীকা ঃ এক্ষেত্রে পিতার মাতা নিজে পিতা বর্তমানে বঞ্চিত হয়েও মাতার মাতার মাতাকে বঞ্চিত করছেন। কারণ কোন বঞ্চিত ব্যক্তিও অন্যকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বঞ্চিত করতে পারেন।

(২৪) মাতার মাতার মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

পিতা ---------- $\frac{৫}{৬}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

টীকা ঃ মাতার মাতার মাতা, মাতৃকুলের সত্য পিতামহী বিধায় পিতা বর্তমানে বঞ্চিত নন।

**বিশেষ তুলনামূলক আলোচনা ঃ**

পিতা, সত্য পিতামহ, যত ঊর্ধ্বতন হোক ঃ (১) পিতা সকল ক্ষেত্রে ও সর্ব অবস্থায় উত্তরাধিকারী কিন্তু সত্য পিতামহ (True grandfather) বর্তমানে বঞ্চিত। অনুরূপভাবে ঊর্ধ্বতন সত্য পিতামহ, অধস্তন সত্য পিতামহ বা পিতা বর্তমানে বঞ্চিত।

(২) পিতা যে অবস্থায় উত্তরাধিকারী হন পিতা অবর্তমানে সত্য পিতামহও অনুরূপ সকল ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী হন। তবে মাতা ও সত্য পিতামহ একই সঙ্গে বিদ্যমান থাকলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে। স্বামী বা স্ত্রীসহ পিতা বর্তমানে মাতার অংশ হ্রাস-প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অনুরূপ ক্ষেত্রে সত্য পিতামহ বর্তমানে মাতার অংশ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। [উদাহরণ (১২), (১৩), (১৪) ও (১৫) দ্রষ্টব্য]

**মাতা ও সত্য পিতামহী, যত ঊর্ধ্বতন হোক (Mother and true grandmother how high soever) ঃ** মাতা সর্বক্ষেত্রে এবং সর্ব অবস্থায় উত্তরাধিকারী হলেও সত্য পিতামহী (True grandmother) মাত্র কতিপয় ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী হয়ে থাকেন। মাতৃকূলের সত্য পিতামহী বর্তমানে বঞ্চিত হন। পিতৃকুলের সত্য পিতামহী, পিতা, মাতা, নিকটতর মাতৃ বা পিতৃকুলের সত্য পিতামহী অথবা মধ্যবর্তী সত্য পিতামহ (Intermediate true grandfather) বর্তমানে বঞ্চিত হন [উদাহরণ (১৮) থেকে উদাহরণ (২৪) দ্রষ্টব্য]।

**(জ) কন্যা ও পুত্রের কন্যা, যত অধস্তন হোক ঃ** কন্যা প্রাথমিক উত্তরাধিকারী, তিনি সর্বক্ষেত্রে ও সর্ব অবস্থায় উত্তরাধিকারী হন। পুত্র অবর্তমানে কন্যা (বা কন্যাগণ) অংশীদার ও পুত্র (বা পুত্রগণ) বর্তমানে তিনি অবশিষ্টভোগীর শ্রেণীভুক্ত হন। কন্যা অবর্তমানে পুত্রের কন্যা উত্তরাধিকারী হয়ে থাকেন। তবে এক মাত্র কন্যা বর্তমানে পুত্রের কন্যা তার সাথে যুগপৎ উত্তরাধিকারী হতে পারেন।

অবশ্য ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইন প্রযোজ্য হলে কন্যা ও পুত্রের কন্যা উভয়ই যুগপৎ উত্তরাধিকারী হবেন। পুত্র জীবিত থাকলে যে অংশ পেতেন তার প্রতিনিধি হিসেবে পুত্রের কন্যাও অনুরূপ অংশের অধিকারী হবেন।

(২৫) পিতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$

এক পুত্রের এক কন্যা

অপর পুত্রের দুই কন্যা -------- $\frac{২}{৩}$ (প্রত্যেকের অংশ হবে $\frac{২}{৩} \div ৩ = \frac{২}{৯}$)

টীকা ঃ পুত্রের কন্যাগণ মাথাপিছু অংশ পান; 'মূল' অনুসারে তাদের অংশ স্থিরীকৃত হয় না। সেজন্য উপরের উদাহরণে $\frac{২}{৩}$ অংশকে দুভাগে ভাগ করে এক পুত্রের এক কন্যাকে অর্ধাংশ ও অন্য পুত্রের দুই কন্যাকে বাকী অর্ধাংশ না দিয়ে সম্পত্তি সমান তিন ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক পুত্রের কন্যাসে $\frac{২}{৯}$ অংশ দেয়া হয়েছে। কারণ (১) সুন্নী উত্তরাধিকার আইনে প্রতিনিধিত্বের কোন বিধান নেই; (২) পুত্রের কন্যাগণ তাদের নিজ নিজ পিতার প্রতিনিধি হিসেবে উত্তরাধিকারী হন না, তারা মৃত ব্যক্তির পৌত্রী হিসেবে নিজ দাবিতে সরাসরি ত্যক্ত বিত্তের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকেন। উক্ত নীতি পুত্রের পুত্র, ভায়ের পুত্র, পিতৃব্যের পুত্র প্রভৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

অবশ্য ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইনে প্রতিনিধিত্বের সীমিত বিধান স্বীকৃত হয়েছে এবং এ আইন অনুসারে পুত্র বেঁচে থাকলে যে অংশ পেতেন পুত্রের কন্যাও তার প্রতিনিধি হিসেবে অনুরূপ অংশের অধিকারী হবেন। [উদাহরণ (২৬ক) দ্রষ্টব্য]। মুসলিম পারিবারিক আইন প্রযোজ্য হলে উদাহরণ (২৫)-এ বর্ণিত ব্যক্তিদের অংশ হবে ঃ

(২৫-ক) পিতা ----------$\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

এক পুত্রের এক কন্যা --------- $\frac{১}{৩}$ ($\frac{২}{৩}$ এর $\frac{১}{২}$=$\frac{১}{৩}$, পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে)

অপর পুত্রের দুই কন্যা -------- $\frac{১}{৩}$ (প্রত্যেকের অংশ হবে $\frac{১}{৬}$ ; পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে)

(২৬) পিতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

পুত্রের চার কন্যা ---- $\frac{১}{৬}$ (প্রত্যেকের অংশ হবে $\frac{১}{২৪}$)

টীকা ঃ এখানে এক কন্যা বিদ্যমান থাকায় পুত্রের কন্যাগণ সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে না। পুত্রের কন্যাদের দেয়া হয়েছে $\frac{১}{৬}$ অংশ কারণ কন্যার প্রাপ্য $\frac{১}{২}$ অংশ + পুত্রের কন্যাদের $\frac{১}{৬}$ অংশ = $\frac{২}{৩}$ অংশ। এটাই হচ্ছে কন্যাদের প্রাপ্য সর্বোচ্চ অংশ।

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে উদাহরণ (২৬)-এ বর্ণিত ব্যক্তিদের অংশ হবে ঃ

(২৬-ক) পিতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

কন্যা ---------- $\frac{২}{৯}$ ($\frac{২}{৩}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{২}{৯}$)

পুত্রের চার কন্যা --------- $\frac{৪}{৯}$ ($\frac{২}{৩}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{৪}{৯}$ ; পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে; প্রত্যেকের অংশ হবে $\frac{১}{৯}$)

(২৭) পিতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

পুত্রের কন্যা --------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

পুত্রের পুত্রের কন্যা --- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

টীকা ঃকন্যা ও পুত্রের ক্ষেত্রে অনুস্বত নীতি উর্ধ্বতন পুত্রের কন্যা ও অধস্তন পুত্রের কন্যার (যথা পুত্রের পুত্রের কন্যা) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বর্তমান উদাহরণে একটি মাত্র পুত্রের কন্যা থাকায় পুত্রের কন্যা সম্পূর্ণ বঞ্চিত না হয়ে $\frac{১}{৬}$ অংশ পাচ্ছেন কারণ পুত্রের কন্যার $\frac{১}{২}$ অংশ+পুত্রের পুত্রের কন্যার $\frac{১}{৬}$ অংশ = $\frac{২}{৩}$ ।

উল্লেখযোগ্য যে, কন্যা অবর্তমানে পুত্রের কন্যাদের সর্বোচ্চ অংশ $\frac{২}{৩}$ -এর বেশি হবে না।

(ঝ) কন্যার পুত্র ঃ কন্যার কন্যা ঃ

সাধারণ মুসলিম আইন অনুসারে কন্যার পুত্র বা কন্যার কন্যা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত দূর আত্মীয়ের (যবিউল আরহাম) অন্তর্গত। তারা কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারী অবর্তমানে কিংবা শুধু স্বামী বা স্ত্রী বর্তমানে উত্তরাধিকারী হন। মধ্যবর্তী পূর্বপুরুষদের মধ্যে লিংগের প্রভেদ নরা থাকলে তাদের প্রাপ্য ত্যক্ত বিত্ত মাথাপিছু বণ্টন করা হয় এবং পুরুষগণ মহিলাদের দ্বিগুণ অংশের অধিকারী হন।

(২৮) কন্যার এক পুত্র ---------- $\frac{২}{৩}$

ও

এক কন্যা ---------- $\frac{১}{৩}$

(২৯) কন্যা, 'ক' এর দুই পুত্র ঃ

'খ' ও ---------- $\frac{২}{৫}$

'গ' ---------- $\frac{২}{৫}$

কন্যা, 'জ' এর এক কন্যা, 'ম'- $\frac{১}{৫}$

(৩০) স্বামী ---------- $\frac{১}{২}$

কন্যার পুত্র ---------- $\frac{১}{৩}$ ($\frac{১}{২}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{১}{৩}$)

কন্যার কন্যা -------- $\frac{১}{৬}$ ($\frac{১}{২}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{১}{৬}$)

(৩১) স্ত্রী ---------- $\frac{১}{৪}$

কন্যার পুত্র ---------- $\frac{১}{২}$ ($\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{১}{২}$)

কন্যার কন্যা ---------- $\frac{১}{৪}$ ($\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{১}{৪}$)

(৩২) স্বামী ---------- $\frac{১}{২}$

কন্যার কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$

(৩৩) স্ত্রী ---------- $\frac{১}{৪}$

কন্যার কন্যা ---------- $\frac{৩}{৪}$

(৩৪) কন্যার কন্যা ---------- -- (পিতা বর্তমানে বঞ্চিত)

পিতা ---------- -- সমস্ত সম্পত্তি অধিকারী।

(৩৫) কন্যার কন্যা -------- --- (পূর্ণ বোন বর্তমানে বঞ্চিত)

পূর্ণ বোন ---------- --- সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী।

(৩৬) এক কন্যার এক কন্যা

অপর কন্যর এক কন্যা --- পূর্ণ বোন বর্তমানে বঞ্চিত

পূর্ণ বোন ---------- --- সমস্ত সম্পাত্তর আধকারী।

(৩৭) স্বামী ---------- $\frac{১}{৪} = \frac{৩}{১২}$

কন্যার কন্যা ------- --- (মাতা বর্তমানে বঞ্চিত)

মাতা ---------- --- $\frac{১}{৩} = \frac{৪}{১২}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৯}{১২}$

টীকা ঃ অবশিষ্টভোগী অবর্তমানেও যদি দেখা যায় যে, কোন দূর আত্মীয় বিদ্যমান তবে স্বামী বা স্ত্রী আগমের অধিকারী হবেন না। তাই উদাহরণ (৩৭)-এ স্বামীর অংশ বৃদ্ধি না করে মাতার অংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অংশীদার বা অবশিষ্টভোগী বর্তমানে (একমাত্র স্বামী বা স্ত্রী ব্যতীত) দূর আত্মীয় উত্তরাধিকারী হবে না তাই উদাহরণ (৩৪), (৩৫) ও (৩৬)-এ কন্যার কন্যা (দূর আত্মীয়) বঞ্চিত হয়েছেন। মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে পূর্ব-মৃত কন্যা বেঁচে থাকলে যে অংশ পেতেন তার পুত্র বা কন্যাও অনুরূপ অংশের অধিকারী হবেন। অত্র কথায় পূর্ব-মৃত কন্যার পুত্র বা কন্যা তাদের মা'র স্থলাভিষিক্ত হবেন। সুতরাং সুমলিম পারিবারিক আইন অনুসারে উদাহরণ (২৮) থেকে উদাহরণ (৩৭)-এ উল্লেখিত ব্যক্তিদের অংশ হবে ঃ

(২৮-ক) কন্যার এক পুত্র ---------- $\frac{২}{৩}$

ও

এক কন্যা ---------- $\frac{১}{৩}$

টীকা ঃ এখানে একই কন্যার এক পুত্র ও এক কন্যা রয়েছে। তাদের inter se অংশ কিরূপ হবে মুসলিম পারিবারিক আইনে তা বলা হয়নি বিধায় সাধারণ মুসলিম আইন অনুসারে তা নির্ণয় করা হয়েছে।

(২৯-ক) কন্যা 'ক'-এর দুই পুত্র

'খ' ও 'গ' ---------- $\frac{১}{২}$ (প্রত্যেকের অংশ হবে $\frac{১}{৪}$)

কন্যা 'জ' এর এক কন্যা 'ম' ----- $\frac{১}{২}$

(৩০-ক) স্বামী ---------- $\frac{১}{৪}$

কন্যার এক পুত্র ---------- $\frac{২}{৪}$

ও

এক কন্যা ---------- $\frac{১}{৪}$

টীকা ঃ এখানে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় কোন সন্তান বা পুত্রের সন্তান বর্তমান না থাকায় স্বামীর অংশ হবে $\frac{১}{২}$ কিন্তু কন্যার পুত্র ও কন্যা, কন্যার স্থলাভিষিক্ত হবেন বিধায় স্বামীর অংশ হবে $\frac{১}{৪}$ । পুনরায় একই কন্যার এক পুত্র ও এক কন্যা বিদ্যমান থাকায় স্বামীকে দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি উদাহরণ (২৮-ক) এ বর্ণিত নীতি অনুযায়ী তাদের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে।

(৩১-ক) স্ত্রী ---------- $\frac{১}{৮} = \frac{৩}{২৪}$

কন্যার এক পুত্র ---------- $\frac{৭}{১২} = \frac{১৪}{২৪}$

ও

এক কন্যা ---------- $\frac{৭}{২৪} = \frac{৭}{২৪}$

টীকা ঃ এখানেও সম্পত্তি উদাহরণ (৩০-ক) বর্ণিত নীতি অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে।

(৩২-ক) স্বামী ---------- $\frac{১}{৪}$

কন্যার কন্যা ---------- $\frac{৩}{৪}$ (কন্যার প্রতিনিধি হিসেবে)

টীকা ঃ এখানেও উদারহণ (৩০-ক)-এ নীতি অনুস্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে স্বামী বা স্ত্রী আগমের অধিকারী নন। তাই স্বামীর অংশ দেয়ার পর আর কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় অবশিষ্ট সম্পত্তি কন্যার প্রতিনিধি হিসেবে তার কন্যাকে দেয়া হয়েছে।

(৩৩-ক) স্ত্রী ----------$\frac{১}{৮}$

কন্যার কন্যা ------- $\frac{৭}{৮}$

টাকা ঃ এখানেও উদাহরণ (৩২-ক)-এ বর্ণিত নীতি অনুস্বত হয়েছে। তবে স্বামী বা স্ত্রী একমাত্র উত্তরাধিকারী হলে আগম তথা সম্পূর্ণ ত্যক্ত বিত্তের উত্তরাধিকারী হবেন।

(৩৪-ক) কন্যার কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ (কন্যার প্রতিনিধি হিসেবে)

পিতা ---------- $\frac{১}{২}$ [অংশীদার হিসেবে $\frac{১}{৬} + $ বৃদ্ধির ফলে $\frac{১}{৩} = \frac{১}{২}$]।

(৩৫-ক) কন্যার কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ (কন্যার প্রতিনিধি হিসেবে)

পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{২}$

(৩৬-ক) এক কন্যার এক কন্যা
ও অপর কন্যার এক কন্যা } --- $\frac{২}{৩}$ (কন্যাদের প্রতিনিধি হিসেবে; প্রত্যেকের অংশ হবে $\frac{১}{৩}$)

পূর্ণ বোন ---------- $= \frac{১}{৩}$

(৩৭-ক) স্বামী ---------- $\frac{১}{৪}$ ---------- $\frac{৪}{১৬}$

মাতা ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{৪} = \frac{৩}{১৬}$

কন্যার কন্যা ---------- $\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৩}{৪}$ এর $= \frac{৩}{৪} = \frac{৯}{১৬}$

টীকা ঃ মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে কন্যার পুত্র বা কন্যার কন্যা, কন্যার স্থলাভিষিক্ত হন বিধায় তারা সকল ক্ষেত্রে ও সর্ব অবস্থায় উত্তরাধিকারী হবেন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য উত্তরাধিকারীর সঙ্গে যুগপৎ উত্তরাধিকারী হতে পারবেন।

**(ঞ) পূর্ণ বোন ও বৈমাত্রেয় বোন ঃ** পূর্ণ বোন সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকারী নন। তিনি (১) পুত্র, (২) পুত্রের পুত্র যত অধস্তন হোক, (৩) পিতা, অথবা (৪) সত্য পিতামহ বর্তমানে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন। অন্য কথায় তিনি জ্ঞাতি বিধায় উর্ধ্বতন ও অধস্তন পুরুষ এ্যাগনেট বর্তমানে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন। পূর্ণ ভাই বর্তমানে এবং কতিপয় ক্ষেত্রে কন্যা (মুসলিম পারিবারিক আইন প্রযোজ্য হলে কন্যার কন্যা বর্তমানে তিনি অবশিষ্টভোগীর শ্রেণীভুক্ত হন।

বৈমাত্রেয় বোন (১) উপরোক্ত চার ব্যক্তি, (২) পূর্ণ ভাই অথবা (৩) দু'জন পূর্ণ বোন বর্তমানে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন। অন্যভাবে বঞ্চিত না হলে এক মাত্র পূর্ণ বোন বর্তমানে এক বা একাধিক বৈমাত্রেয় বোন $\frac{১}{৬}$ অংশের অধিকারী হন। বৈমাত্রেয় ভাই বর্তমানে বৈমাত্রেয় বোন অবশিষ্টভোগী হন।

(৩৮) স্বামী ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

পূর্ণ বোন ----------$\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

(৩৯) স্বামী ----------$\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$হ্রাস করে $\frac{৩}{৭}$

দুই বোন ---------- $\frac{২}{৩} = \frac{৪}{১৬}$ হ্রাস করে $\frac{৪}{৭}$

(৪০) পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৩}{৪}$

বৈমাত্রের বোন ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{১}{৪}$

(৪১) দুজন পূর্ণ বোন --------- (সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী; অংশীদার হিসেবে $\frac{২}{৩}$ +বৃদ্ধির ফলে $\frac{১}{৩}$

বৈমাত্রের বোন --------- (দু'জন পূর্ণ বোন বর্তমানে বঞ্চিত)

টীকা ঃ পূর্ণ ভাই বর্তমানে পূর্ণ বোন অবশিষ্টভোগী হন। অনুরূপভাবে বৈমাত্রেয় ভাই বর্তমানে বৈমাত্রেয় বোন অবশিষ্টভোগী হয়ে যান। পূর্ণ ভাই বর্তমানে বৈমাত্রের বোন সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন।

(৪২) স্বামী ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

ভাই ---------- $\frac{২}{৯}$ ($\frac{১}{৩}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{২}{৯}$ ; অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

বোন ---------- $\frac{১}{৯}$ ($\frac{১}{৩}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{১}{৯}$ ; অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

(৪৩) পূর্ণ ভাই ---------- $\frac{২}{৩}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{৩}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

বৈমাত্রেয় বোন -------- --- (পূর্ণ ভাই বর্তমানে বঞ্চিত)

(৪৪) বৈমাত্রেয় ভাই --------- $\frac{২}{৩}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

বৈমাত্রেয় বোন ---------- $\frac{১}{৩}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

টীকা ঃ কন্যা ও পূর্ণ বোন বর্তমানে কন্যা অংশীদার এবং বোন অবশিষ্টভোগী হবেন। মুসলিম পারিবারিক আইন প্রযোজ্য হলে কন্যার পুত্র বা কন্যা এবং পূর্ণ বোন বর্তমানেও অনুরূপ নীতি প্রযোজ্য [উদাহরণ (৪৫-ক), (৪৬-ক) ও (৪৭-ক) দ্রষ্টব্য]

(৪৫) কন্যা ----------$\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

বোন ---------- $\frac{১}{২}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

(৪৬) দুই কন্যা ---------- $\frac{২}{৩}$ (অংশীদার হিসেবে)

এক বোন ---------- $\frac{১}{৩}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

(৪৭) এক কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$

দুই বোন ---------- $\frac{১}{২}$ (প্রত্যেকের অংশ হবে $\frac{১}{৪}$ )

মুসলিম পারিবারিক আইন প্রযোজ্য হলে ঃ

(৪৫-ক) কন্যার কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ (কন্যার প্রতিনিধি হিসেবে)

বোন ---------- $\frac{১}{২}$

(৪৬-ক) এক কন্যার এক পুত্র ----- $\frac{১}{৩}$ (কন্যার প্রতিনিধি হিসেবে)

অপর কন্যার এক কন্যা ----- $\frac{১}{৩}$ (কন্যার প্রতিনিধি হিসেবে)

বোন ---------- $\frac{১}{৩}$

টীকা ঃ এখানে দুই কন্যার সমবেত অংশ $\frac{২}{৩}$ ও প্রত্যেকের অংশ ছিল $\frac{১}{৩}$ । প্রত্যেক কন্যার অংশ প্রতিনিধি হিসেবে তার পুত্র বা কন্যা পেয়েছে।

(৪৭-ক) কন্যার কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ (কন্যার প্রতিনিধি হিসেবে)

দুই বোন ---------- $\frac{১}{২}$ ( প্রত্যেকের অংশ হবে $\frac{১}{৪}$ )

**(ট) বৈপিত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয় বোন (Uterine brother and Uterine sister) ঃ** বৈপিত্রেয় ভাই বা বৈপিত্রেয় বোন সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকারী নন। তারা (১) সন্তান, (২) পুত্রের সন্তান, যত অধস্তন হোক, (৩) পিতা ও (৪) সত্য পিতামহ বর্তমানে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন। অবশ্য বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন পূর্ণ ভাই বা বোন বর্তমানে বঞ্চিত হন না। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন ত্যক্ত বিত্তে সমান অংশে অংশীদার হয়ে থাকেন। বৈপিত্রেয় এক ভাই বা এক বোন ত্যক্ত বিত্তের $\frac{১}{৬}$ অংশের অধিকারী। দুজন বৈপিত্রেয় ভাই অথবা দুজন বৈপিত্রের বোন কিংবা বৈপিত্রেয় এক ভাই ও এক বোন সমবেতভাবে $\frac{১}{৩}$ অংশের অধিকারী হন ও এরূপ সমবেত অংশ তাদের মধ্যে সমান অংশে বিভক্ত হয়; অন্য কথায় বৈপিত্রেয় ভাই বৈপিত্রেয় বোনের দ্বিগুণ অংশ পান না।

(৪৮) মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$

দুজন পূর্ণ বোন ---------- $\frac{২}{৩}$ (প্রত্যেকের অংশ হবে $\frac{১}{৩}$ )

বৈমাত্রেয় বোন ---------- --- (দুজন পূর্ণ বোন বর্তমানে বঞ্চিত)

বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন ---------- $\frac{১}{৬}$

(৪৯) দুজন পূর্ণ বোন ---------- $\frac{২}{৩}$

দুজন বৈপিত্রেয় বোন

(বা ভাই) ---------- $\frac{১}{৩}$ (প্রত্যেক অংশ হবে $\frac{১}{৬}$ )

(৫০) দুজন বৈমাত্রেয় বোন ---------- $\frac{২}{৩}$

দুজন বৈপিত্রেয় ভাই (বা বোন) ---------- $\frac{১}{৩}$ (প্রত্যেক অংশ হবে $\frac{১}{৬}$)

(৫১) একজন পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{২}$

একজন বৈমাত্রেয় বোন ------- $\frac{১}{৬}$

একজন বৈপিত্রেয় ভাই
একজন বৈপিত্রেয় বোন } ------ $\frac{১}{৩}$ (প্রত্যেকের অংশ হবে $\frac{১}{৬}$)

(৫২) একজন পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{২}$

দুজন বৈমাত্রেয় বোন ------- $\frac{১}{৬}$ (প্রত্যেকের অংশ হবে $\frac{১}{১২}$)

একজন বৈপিত্রেয় ভাই
একজন বৈপিত্রেয় বোন } ------ $\frac{১}{৩}$ (প্রত্যেকের অংশ হবে $\frac{১}{৬}$)

টীকা ঃ একজন পূর্ণ বোন বর্তমানে বৈমাত্রেয় বোন সম্পূর্ণ বঞ্চিত না হয়ে $\frac{১}{৬}$ অংশের অধিকারী হন।

প্রাচীন গ্রন্থকারগণ যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার মধ্যে Himariyya নামে খ্যাত হযরত ওমর কর্তৃক নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তটি অন্যতম ঃ কোন মহিলা (১) স্বামী, (২) মাতা, (৩) একজন পূর্ণ ভাই ও (৪) দুজন বৈপিত্রেয় ভাই রেখে মারা গেলে সিদ্ধান্ত হয় যে, তার ত্যক্ত বিত্ত নিম্নরূপ অংশে বিভক্ত হবে ঃ

(৫৩) স্বামী ---------- $\frac{১}{২}$

মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$

দুজন বৈপিত্রেয় ভাই ---------- $\frac{১}{৩}$

} আসাব-আল ফায়ায়েয বা অংশীদারদের প্রাপ্য অংশ বণ্টনের পর ত্যক্ত বিত্ত নিঃশেষিত।

পূর্ণ ভাই ---------- --- (সম্পূর্ণ বঞ্চিত, কারণ কোন সম্পত্তি অবশিষ্ট নেই)

সিদ্ধান্তটি হানাফিগণ গ্রহণ করা সত্ত্বেও এ বিষয়ে মতানৈক্য বিদ্যমান। অবৈধতা দুজন বৈপিত্রেয় ভায়ের মধ্যে পরস্পরের ওয়ারিশত্বের পথে প্রতিবন্ধক রূপে গণ্য। কোন মহিলার দুই পুত্রের মধ্যে একটি বৈধ ও অপরটি অবৈধ হলে তারা বৈপিত্রেয় ভাই হিসেবে স্বীকৃত নয় বিধায় একে অপরের ত্যক্ত বিত্তের উত্তরাধিকারী হবে না।

**বঞ্চিতকরণের নীতিমালা ঃ** অংশীদার সংক্রান্ত হানাফী আইনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য উপরে প্রদত্ত উদাহারণমালা, টীকা ও ব্যাখ্যায় আলোচিত হয়েছে। উদাহরণগুলো খুব ভালভাবে আয়ত্ব করা প্রয়োজন কারণ উত্তরাধিকার আইনের নীতিমালা অনুধাবনের পক্ষে ওগুলো খুবই সহায়ক। উক্ত নীতিমালা অনুধাবনের সহায়িকা হিসেবে নিচে বঞ্চিতকরণের কতিপয় ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

(১) স্বামী-স্ত্রী ঃ স্বামী-স্ত্রী প্রাথমিক উত্তরাধিকারী, তারা কোন অবস্থাতেই বঞ্চিত হন না বা অন্যকে বঞ্চিত করেন না। তাদের অংশ নির্দিষ্ট। তারা আগমের অধিকারী নন। তবে একমাত্র ওয়ারিশ হলে স্বামী বা স্ত্রী সমস্ত ত্যক্ত বিত্তের অধিকারী হতে পারেন। অবশিষ্টভোগী বা দূর আত্মীয়গণ স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে যুগপৎ উত্তরাধিকারী হতে পারেন। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে কেবল স্বামী বা স্ত্রী সঙ্গেই কোন দূর আত্মীয় যুগপৎ ত্যক্ত বিত্তের অধিকারী হন। অন্য কোন প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত উত্তরাধিকারী বর্তমানে দুর আত্মীয়গণ সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে থাকেন।

**(২) পিতা-সত্য পিতামহ (true grandfather), যত উর্ধ্বতন হোক ঃ** পিতা বর্তমানে উর্ধ্বতন এ্যাগনেটি পূর্বসূরী ও জ্ঞাতিগণ যথা- সত্য পিতামহ, পিতৃব্য (paternal uncle), ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র (brother's son) প্রভৃতি সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন। অনুরূপভাবে নিকতর সত্য পিতামত অধিকতর দূরবর্তীদের বঞ্চিত করে থাকেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারী অবশিষ্টভোগীদের সম্পর্কে আলোচনার সময় বিষয়টি আরও বিশদভাবে আলোচিত হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে বোন (পূর্ণ, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয়) ব্যতিত অন্য কোন অংশীদার পিতা বর্তমানে বঞ্চিত বা প্রভাবিত হন না। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে।

(৫৪) স্ত্রী, পিতা ও ভাই ---------- (ভাই সম্পূর্ণ বঞ্চিত)

(৫৫) স্বামী, পিতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র ---------- (ভ্রাতুষ্পুত্র সম্পূর্ণ বঞ্চিত)

(৫৬) পিতা, পূর্ণ বোন, বৈমাত্রেয় বোন ও বৈপিত্রেয় বোন -------- (বোনেরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত)

**(৩) মাতা, সত্য পিতামহী (true grandmother) যত উর্ধ্বতন হোক ঃ** মাতা বর্তমানে পিতৃকুলের বা মাতৃকুলের সত্য পিতামহী এবং নিকটতর সত্য পিতামহী বর্তমানে দূরবর্তী সত্য পিতামহী সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন। যারা বর্তমানে মাতার অংশ প্রভাবিত হয় তারা হচ্ছেন (১) সন্তান, (২) দুই বা ততোধিক ভাই বা বোন কিংবা এক ভাই ও এক বোন। (৩) স্বামী বা স্ত্রীসহ পিতা।

**(৪) কন্যা, পুত্রের কন্যা, যত অধস্তন হোক ঃ** কন্যা সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকারী। অধস্তন পুত্রে কন্যা, কন্যা বর্তমানে আংশিক বঞ্চিত হন। অধস্তন পুত্রের কন্যা একমাত্র কন্যা বা পুত্রের কন্যা বর্তমানে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন না, যথা-

(৫৭) এক কন্যা ---------- $\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৩}{৪}$

এক পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{১}{৪}$

(৫৮) পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৩}{৪}$

পুত্রের পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{১}{৪}$

পুত্রের দুই কন্যা বর্তমানে অধস্তন পুত্রের কন্যা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন; যথা-

(৫৯) পিতা ---------- $\frac{১}{৬}$

মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$

দুজনে পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{২}{৩}$

তিনজন পুত্রের পুত্রের কন্যা ---------- (বঞ্চিত)

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে পুত্রের কন্যা পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে তার প্রাপ্য অংশ পাবেন বিধায় উক্ত আইন প্রযোজ্য হলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে। সেক্ষেত্রে উপরের উদাহরণে বর্ণিত ব্যক্তিদের অংশ হবে নিম্নরূপ ঃ

(৫৭-ক) এক কন্যা ---------- $\frac{১}{৩}$

এক পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{২}{৩}$

(৫) বোন ঃ একজন পূর্ণ বোন বৈমাত্রেয় বোনকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করেন না, যথা-

(৬০) একজন পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৩}{৪}$

বৈমাত্রেয় বোন ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{১}{৪}$

অবশ্য দুজন পূর্ণ বোন বর্তমানে বৈমাত্রেয় বোন সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন, যথা-

(৬১) দুজন পূর্ণ বোন ---------- (সম্পূর্ণ সম্পত্তির অধিকারী)

বৈমাত্রেয় বোন ---------- (বঞ্চিত)

পূর্ণ ভাই বা পূর্ণ বোন বর্তমানে বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন বঞ্চিত হন না, যথা-

(৬২) মাতা ----------$\frac{১}{৬} = \frac{১}{৬}$

দুজন পূর্ণ বোন ---------- $\frac{২}{৩} = \frac{৪}{৬}$

বৈমাত্রেয় বোন ---------- (একাধিক পূর্ণ বোন বর্তমানে বঞ্চিত)

বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন ----- $\frac{১}{৬}$

পূর্ণ ভাই ও বোন বর্তমানে বৈমাত্রেয় বোন সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন। যথা-

(৬৩) পূর্ণ ভাই ---------- $\frac{২}{৩}$

পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{৩}$

বৈমাত্রেয় বোন ---------- --- (বঞ্চিত)

পূর্ণ ভাই বর্তমানে বৈমাত্রেয় ভাই ও বৈমাত্রেয় বোন সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন, যথা-

(৬৪) পূর্ণ ভাই ---------- (সম্পূর্ণ সম্পত্তির অধিকারী)

বৈমাত্রেয় ভাই<br>বৈমাত্রেয় বোন } -------- (বঞ্চিত)

পূর্ণ বোন, বৈমাত্রেয় বোন ও বৈপিত্রেয় বোন একে অন্যকে বঞ্চিত করেন না, যথা-

(৬৫) পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৩}{৫}$

বৈমাত্রেয় বোন ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{১}{৫}$

বৈপিত্রেয় বোন ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{১}{৫}$

বঞ্চিতকরণ তত্ত্বের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো কোন ব্যক্তি নিজে বঞ্চিত হয়েও অন্যকে বঞ্চিত করতে পারেন। নিচের উদাহরণমালার সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে ঃ

(৬৬) মাতা ----------------- $\frac{১}{৬}$ (কারণ দু'বোন বর্তমান)

পিতা ---------------- $\frac{৫}{৬}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

দুই বোন ------------ --- (পিতা বর্তমানে বঞ্চিত)

টীকা ঃ এক্ষেত্রে দু'বোন নিজেরা বঞ্চিত হয়েও মাতার অংশকে $\frac{১}{৩}$ থেকে $\frac{১}{৬}$ -এ নামিয়ে দিচ্ছেন। এটি মাতার আংশিক বঞ্চনার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(৬৭) মাতা ------------------------------ $\frac{১}{৬}$ (কারণ এক ভাই ও এক বোন বর্তমান)

ভাই (পূর্ণ, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয়) --- (পিতা বর্তমানে বঞ্চিত)

বোন (পূর্ণ, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয়) --- (পিতা বর্তমানে বঞ্চিত)

পিতা ----------------------------- $\frac{৫}{৬}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

টীকা ঃ এক্ষেত্রেও ভাই ও বোন নিজেরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের উপস্থিতির ফলে মাতা আংশিক বঞ্চিত হচ্ছেন ও তার অংশ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে $\frac{১}{৩}$ থেকে $\frac{১}{৬}$ হচ্ছে। অনুরূপভাবে পিতা, পিতার মাতা ও মাতার মাতার মাতার ক্ষেত্রেও আংশিক বঞ্চনার প্রশ্ন উঠতে পারে, যথা-

(৬৮) পিতা ----------------- (অবশিষ্টভোগী হিসেবে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী)

পিতার মাতা ---------- (পিতা বর্তমানে বঞ্চিত)

মাতার মাতার মাতা ----- [নিকটতর সত্য পিতামহী (true grandmother) পিতার মাতা বর্তমানে বঞ্চিত]

টীকা ঃ এক্ষেত্রে পিতার মাতা নিজে বঞ্চিত হয়েও মাতার মাতার মাতাকে বঞ্চিত করছেন।

**নিয়ম বহির্ভূত বিষয় ঃ বৃদ্ধি (আউল, increase) ও আগম (রোদ, return)** ঃ প্রত্যেক অংশীদারের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দ রয়েছে। এদের সকলের অংশ একত্রে (১) সমস্ত সম্পত্তি বা ১-এর সমান, (২) ১-এর চেয়ে কম বা (৩) ১-এর চেয়ে বেশি হতে পারে বিধায় উপরোক্ত তিনটি বিষয়ই পৃথক পৃথকভাবে পর্যালোচনা করা হচ্ছে ঃ

**(১) সমস্ত সম্পত্তি বা ১-এর সমান (Equal to unity)** ঃ ধরা যাক মৃত ব্যক্তির নিম্নলিখিত আত্মীয় বর্তমান। তাদের প্রত্যেকের অংশ হবে ঃ

(৬৯) পিতা ----------------$\frac{১}{৬}$

মাতা ----------------$\frac{১}{৬}$

দুই কন্যা ----------- $\frac{২}{৩}$

$$\frac{১}{৬} + \frac{১}{৬} + \frac{২}{৩} = ১$$

এক্ষেত্রে ভগ্নাংশগুলোর সমষ্টি 'সমস্ত' বা ১-এর সমান। অন্য একটি উদাহরণ নেয়া যাক ঃ

(৭০) পিতা ---------------- $\frac{১}{৬} = \frac{১}{৬}$ (কারণ দুই কন্যা বর্তমান)

পিতার পিতা ---------- (পিতা বর্তমানে বঞ্চিত)

মাতা---------------- $\frac{১}{৬} = \frac{১}{৬}$ (কারণ দুই কন্যা বর্তমান)

মাতার মাতা --------------- (মাতা বর্তমানে বঞ্চিত)

দুই কন্যা ---------- $\frac{২}{৩} = \frac{৪}{৬}$

এক্ষেত্রে ভগ্নাংশগুলোর সমষ্টি $\frac{১}{৬} + \frac{১}{৬} + \frac{৪}{৬} = ১$। কিন্তু এরূপ ঘটনা কদাচিৎ ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অংশীদার ও অবশিষ্টভোগী বিদ্যমান থাকেন এবং প্রথমোক্তদের প্রাপ্য নির্দিষ্ট অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি শেষোক্তদের মধ্যে বণ্টন করা হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রেও কোন সমস্যা দেখা যায় দেয় না।

**(২) 'সমস্ত' বা ১-এর অধিক (more than unity; আউল)** ঃ অংশীদারদের প্রদত্ত অংশের সমষ্টি 'সমস্ত' বা ১-এর বেশি হলেই জটিলতা দেখা দেয়। একটি সরল উদাহরণ নেয়া যাক ঃ

(৭১) স্বামী ---------- $\frac{১}{২}$

দু'জন পূর্ণ বোন ---------- $\frac{২}{৩}$

সাধারণ হরবিশিষ্ট করার পর উপরোক্ত ভগ্নাংশগুলোর যোগফল দাঁড়ায় $\frac{৩}{৬} + \frac{৪}{৬} = \frac{৭}{৬}$। এটি একটি সমস্যা এবং এর সমাধান এভাবে করা যেতে পারে- (১) হরগুলোকে বৃদ্ধি করে লবগুলোর যোগফলের সমান করা এবং (২) লবগুলো যা আছে তাই রাখা। এর ফলে প্রত্যেক ওয়ারিশের অংশ আনুপাতিক হারে কমে যাচ্ছে। কৃত্রিম উপায়ে হরগুলোকে এভাবে বৃদ্ধি করাকেই increase বা আউল বলা হয়ে থাকে। 'আউল' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'বৃদ্ধি' হলেও কার্যতঃ এর ফলে প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর অংশ আনুপাতিক হারে কমে যায়।

এ নিয়মে উপরোক্ত অংশগুলো দাঁড়াচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

(৭১-ক) স্বামী ---------- $\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬} = \frac{৩}{৭}$

দু'জন পূর্ণ বোন ------ $\frac{২}{৩} = \frac{৪}{৬} = \frac{৪}{৭}$

বিষয়টির সম্যক উপলব্ধির জন্য আরও কতিপয় উদাহরণ নিচে দেয়া হলো ঃ

(৭২) স্বামী ---------- $\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$ হ্রাস করে $\frac{৩}{৭}$

পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$ হ্রাস করে $\frac{৩}{৭}$

বৈমাত্রেয় বোন ------- $\frac{১}{৬} = \frac{১}{৬}$ হ্রাস করে $\frac{১}{৭}$

$\frac{৭}{৬}$ হ্রাস করে ১

(৭৩) দুজন পূর্ণ বোন ------- $\frac{২}{৩} = \frac{৪}{৬}$ হ্রাস করে $\frac{৪}{৭}$

দুজন বৈপিত্রেয় ভাই -- $\frac{১}{৩} = \frac{২}{৬}$ হ্রাস করে $\frac{২}{৭}$

মাতা ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{১}{৬}$ হ্রাস করে $\frac{১}{৭}$

$\frac{৭}{৬}$ হ্রাস করে ১

*Dhaka University Institutional Repository*

(৭৪) স্বামী ---------- $\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$ হ্রাস করে $\frac{৩}{৮}$

দুজন পূর্ণ বোন ----- $\frac{২}{৩} = \frac{৪}{৬}$ হ্রাস করে $\frac{৪}{৮}$

মাতা ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{১}{৬}$ হ্রাস করে $\frac{১}{৮}$

---

$\frac{৬}{৮}$ হ্রাস করে ১

(৭৫) স্বামী ---------- $\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$ হ্রাস করে $\frac{৩}{৮}$

পূর্ণ বোন --------- $\frac{২}{৩} = \frac{৩}{৬}$ হ্রাস করে $\frac{৩}{৮}$

তিন জন বৈপিত্রেয় বোন ও ভাই --- $\frac{১}{৩} = \frac{২}{৬}$ হ্রাস করে $\frac{২}{৮}$

---

$\frac{৮}{৬}$ হ্রাস করে ১

(৭৬) স্বামী ---------- $\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$ হ্রাস করে $\frac{৩}{৯}$

দুজন পূর্ণ বোন ----- $\frac{২}{৩} = \frac{৪}{৬}$ হ্রাস করে $\frac{৪}{৯}$

দু'জন বৈপিত্রেয় বোন ও একজন বৈপিত্রেয় ভাই } $\frac{১}{৩} = \frac{২}{৬}$ হ্রাস করে $\frac{২}{৯}$

$\frac{৯}{৬}$ হ্রাস করে ১

(৭৭) স্বামী ---------- $\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$ হ্রাস করে $\frac{৩}{৯}$

পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$ হ্রাস করে $\frac{৩}{৯}$

দু'জন বৈপিত্রেয় বোন ও একজন বৈপিত্রেয় ভাই } $\frac{১}{৩} + \frac{২}{৬}$ হ্রাস করে $\frac{২}{৯}$

মাতা ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{১}{৬}$ হ্রাস করে $\frac{১}{৯}$

---

$\frac{৯}{৬}$ হ্রাস করে ১

(৭৮) স্বামী ---------- $\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$ হ্রাস করে $\frac{৩}{১০}$

দুজন পূর্ণ বোন ----- $\frac{২}{৩} = \frac{৪}{৬}$ হ্রাস করে $\frac{৪}{১০}$

তিনজন বৈপিত্রেয় বোন ও
পাঁচজন বৈপিত্রেয় ভাই } $\frac{১}{৩} + \frac{২}{৬}$ হ্রাস করে $\frac{২}{১০}$

মাতা ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{১}{৬}$ হ্রাস করে $\frac{}{১০}$

$\frac{১০}{৬}$ হ্রাস করে ১

(৭৯) বিধবা স্ত্রী --------- $\frac{১}{৪} = \frac{৩}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{৩}{১৩}$

দুজন বৈমাত্রেয় বোন--- $\frac{২}{৩} = \frac{৮}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{৮}{১৩}$

মাতা ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{২}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{২}{১৩}$

$\frac{১৩}{১২}$ হ্রাস করে ১

(৮০) স্বামী ---------- $\frac{১}{৪} = \frac{৩}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{৩}{১৩}$

মাতা ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{২}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{২}{১৩}$

দুই কন্যা ---------- $\frac{২}{৩} = \frac{৮}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{৮}{১৩}$

$\frac{১৩}{১২}$ হ্রাস করে ১

(৮১) স্বামী ---------- $\frac{১}{৪} = \frac{৩}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{৩}{১৩}$

মাতা ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{২}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{২}{১৩}$

কন্যা ---------- $\frac{১}{২} = \frac{৬}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{২}{১৩}$

পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{২}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{২}{১৩}$

$\frac{১৩}{১২}$ হ্রাস করে ১

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী উদাহরণ (৮১)-তে উল্লেখিত ব্যক্তিদের অংশ হবে ঃ

(৮১-ক) স্বামী ---------- $\frac{১}{৪} = \frac{৯}{৩৬}$

মাতা ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{৬}{৩৬}$

কন্যা ---------- $\frac{২}{৩}\frac{১}{৬}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{৭}{৩৬}$

পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{২}{৩}\frac{১}{৬}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{১৪}{৩৬}$ (পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে)

(৮২) বিধবা স্ত্রী ---------- $\frac{১}{৪} = \frac{৩}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{৩}{১৩}$

মাতা ---------- $\frac{১}{৩} = \frac{৪}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{৪}{১৩}$

পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{২} = \frac{৬}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{৬}{১৩}$

$\frac{১৩}{১২}$ হ্রাস করে ১

(৮৩) বিধবা স্ত্রী ---------- $\frac{১}{৪} = \frac{৩}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{৩}{১৫}$

দু'জন পূর্ণ বোন ------- $\frac{২}{৩} = \frac{৮}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{৮}{১৫}$

দু'জন বৈপিত্রেয় বোন --- $\frac{১}{৩} = \frac{৪}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{৪}{১৫}$

$\frac{১৫}{১২}$ হ্রাস করে ১

(৮৪) বিধবা স্ত্রী ---------- $\frac{১}{৪} = \frac{৩}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{৩}{১৫}$

দু'জন পূর্ণ বোন ------- $\frac{২}{৩} = \frac{৮}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{৮}{১৫}$

একজন বৈপিত্রেয় বোন -- $\frac{১}{৬} = \frac{২}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{২}{১৫}$

$\frac{১৫}{১২}$ হ্রাস করে ১

(৮৫) স্বামী ---------- $\frac{১}{৪} = \frac{৩}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{৩}{১৫}$

পিতা ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{২}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{২}{১৫}$

মাতা ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{২}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{২}{১৫}$

তিন কন্যা -------- $\frac{২}{৩} = \frac{৮}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{৮}{১৫}$

$\frac{১৫}{১২}$ হ্রাস করে ১

(৮৬) বিধবা স্ত্রী ---------- $\frac{১}{৪} = \frac{৩}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{৩}{১৭}$

দু'জন পূর্ণ বোন -------- $\frac{২}{৩} = \frac{৮}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{৮}{১৭}$

দু'জন বৈপিত্রেয় বোন --- $\frac{১}{৩} = \frac{৪}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{৪}{১৭}$

মাতা---------- $\frac{১}{৬} = \frac{২}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{২}{১৭}$

$\frac{১৭}{১২}$ হ্রাস করে ১

(৮৭) বিধবা স্ত্রী ---------- $\frac{১}{৮} = \frac{৩}{২৪}$ হ্রাস করে $\frac{৩}{২৭}$

দুই কন্যা ---------- $\frac{২}{৩} = \frac{১৬}{২৪}$ হ্রাস করে $\frac{১৬}{২৭}$

পিতা ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{১}{২৪}$ হ্রাস করে $\frac{৪}{২৭}$

মাতা---------- $\frac{১}{৬} = \frac{১}{২৪}$ হ্রাস করে $\frac{৪}{২৭}$

$\frac{২৭}{২৪}$ হ্রাস করে ১

**(৩) সমস্ত বা ১-এর চেয়ে কম (Less than unity, Return, আগম বা রাদ) ঃ** অনেক সময় অংশীদারদের প্রাপ্য নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দ করার পর সম্পত্তির কিছু অংশ উদ্বৃত্ত থেকে যায়। কোন অবশিষ্টভোগী বর্তমান না থাকলে এরূপ উদ্বৃত্ত অংশ অংশীদারদের মধ্যে তাদের অংশের আনুপাতিক হারে ভাগ করে দেয়া হয়। সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্তির এ অধিকারকে বলা হয় আগম বা রাদ। আগম সম্পর্কীয় তিনটি মূলনীতি হচ্ছে ঃ

(১) উদ্বৃত্ত সম্পত্তির আগম প্রত্যেক ব্যক্তির অংশের আনুপাতিক হারে নিরূপিত হবে;

(২) কোন অংশীদার বা দূর আত্মীয় বর্তমানে স্বামী বা স্ত্রী আগমের অধিকারী হবেন না;

(৩) অন্য কোন উত্তরাধিকারী অবর্তমানে স্বামী বা স্ত্রী আগমের অধিকারী হয়ে সমস্ত ত্যক্ত বিত্তের মালিক হতে পারেন। কোন মুসলিম একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে তার স্ত্রীকে রেখে মারা গেলে স্ত্রী অংশীদার হিসেবে পাবেন ত্যক্ত বিত্তের $\frac{১}{৪}$ অংশ এবং আগমের ফলে বাকী $\frac{৩}{৪}$ অংশেরও তিনি অধিকারী হবেন। এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র উক্ত $\frac{৩}{৪}$ অংশের অধিকারী হবে না (মাহমেদ আরশাদ বনাম সাজিদা বানু)। অনুরূপ নীতি স্বামীর প্রযোজ্য (মীর ইসুব বনাম মীর ইসব)।

উদাহরণমালা

(৮৮) মাতা --------- $\frac{১}{৬} = \frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{১}{৪}$

কন্যা --------- $\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৩}{৪}$

$\frac{৪}{৬}$ বৃদ্ধি করে ১

এক্ষেত্রে সম্পত্তির ১-$\frac{১}{৬}+\frac{১}{২}=\frac{১}{৩}$ অংশ উদ্বৃত্ত রয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে ভগ্নাংশ গুলোকে প্রথমে সাধারণ হরবিশিষ্ট করা হয় ও হরকে কমিয়ে লবগুলোর যোগফলের সমষ্টির সমান করা হয়। উদাহরণ (৮৮)-এর ভগ্নাংশগুলোর সাধারণ হরবিশিষ্ট করলে দাঁড়ায় $\frac{১}{৬}$ ও $\frac{৩}{৬}$। এখানে লবগুলোর সমষ্টি হচ্ছে ১+৩ = ৪। সুতরাং এক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীদের অংশ হবে যথাক্রমে $\frac{১}{৪}$ ও $\frac{৩}{৬}$।

(৮৯) স্বামী --------- $\frac{১}{৪}$ (স্বামী আগমের অধিকারী নন, কারণ কন্যা বর্তমান)

কন্যা -------- --- (অংশীদার হিসেবে $\frac{১}{২}$ +বৃদ্ধির ফলে $\frac{১}{৪}=\frac{৩}{৪}$)

(৯০) স্ত্রী ---------- $\frac{১}{৪}$ (স্ত্রী আগমের অধিকারী নন, কারণ বোন বর্তমান)

বোন (পূর্ণ বা বৈমাত্রেয়) ---- $\frac{১}{২}$ অংশীদার হিসেবে + $\frac{১}{৪}$ বৃদ্ধির ফলে --- $\frac{৩}{৪}$

(৯১) স্বামী ---------- $\frac{১}{২}$

কন্যার পুত্র -------- $\frac{১}{২}$

টীকা ঃ সাধারণ মুসলিম আইন অনুসারে কন্যাদের পুত্র দূর আত্মীয় হওয়ায় তার উপস্থিতিতে স্বামী আগমের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অবশ্য মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে কন্যার পুত্র কন্যার প্রতিনিধি হিসেবে $\frac{১}{২}$ অংশের অধিকারী হবেন।

(৯২) স্ত্রী ---------- $\frac{১}{৮}$

পুত্রের কন্যা -------- $\frac{৭}{৮}$ (অংশীদার হিসেবে $\frac{১}{২}$ + বুদ্ধির ফলে $\frac{৩}{৮}=\frac{৭}{৮}$)

**টীকা ঃ** মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারেও পুত্রের কন্যা, পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে $\frac{৭}{৮}$ অংশের অধিকারী।

(৯৩) মাতা ---------- $\frac{১}{৬}=\frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{১}{৪}$

পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৩}{৪}$

$\frac{৪}{৬}$ বৃদ্ধি করে ১

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে উদাহরণ (৯৩)-এ উল্লিখিত ব্যক্তিদের অংশ হবে ঃ

*Dhaka University Institutional Repository*

(৯৩-ক) মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{৫}{৬}$ (পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে)

(৯৪) পিতার মাতা
মাতার মাতা ---------- $\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{১}{৫}$

দুই কন্যা ---------- $\frac{২}{৩}=\frac{৪}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৪}{৫}$

$\frac{৫}{৬}$ বৃদ্ধি করে ১

টীকা ঃ পিতার মাতা ও মাতার মাতা দু'জনই সত্য পিতামহী তাদের সমবেত অংশ হবে $\frac{১}{৬}$

(৯৫) মাতা ---------- $\frac{১}{৬}=\frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{১}{৫}$

কন্যা ---------- $\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{১}{৫}$

পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{৬}=\frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{১}{৫}$

$\frac{৫}{৬}$ $\quad$ ১

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে উদাহরণ (৯৫)-এ উল্লেখিত ব্যক্তিদের অংশ হবে ঃ

(৯৫-ক) মাতা ---------- $\frac{১}{৬}=\frac{৩}{১৮}$

কন্যা $\frac{৫}{৬}$ এর $\frac{১}{৩}$ ---------- $\frac{৫}{১৮}=\frac{৫}{১৮}$

পুত্রের কন্যা $\frac{৫}{৬}$ এর $\frac{২}{৩}$ ---- $\frac{৫}{৯}=\frac{১০}{১৮}$ (পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে)

(৯৬) পিতার মাতা
মাতার মাতা } ---------- $\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{১}{৫}$

পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৩}{৫}$

বৈমাত্রেয় বোন ---------- $\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{১}{৫}$

$\frac{৫}{৬}$ $\quad$ ১

(৯৭) পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৩}{৫}$

বৈমাত্রেয় বোন ---------- $\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{১}{৫}$

বৈপিত্রেয় বোন ---------- $\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{১}{৫}$

$$\frac{৫}{৬} \qquad ১$$

টীকা ঃ একটি মাত্র পূর্ণ বোন বর্তমানে বৈমাত্রেয় বোন সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন না, তবে তার অংশ কমে $\frac{১}{৬}$ হয়। বৈপিত্রেয় বোন পূর্ণ বোন বা বৈমাত্রেয় বোন বর্তমানে বঞ্চিত নন।

(৯৮) মাতা ------------------- $\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{১}{৫}$

পূর্ণ বোন -------------- $\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৩}{৫}$

বৈমাত্রেয় ভাই ---------- $\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{১}{৫}$

$$\frac{৫}{৬} \qquad ১$$

(৯৯) স্বামী ------------------- $\frac{১}{৪}=\frac{৪}{১৬}$

মাতা ------------------- $\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{৪}$ $=\frac{৩}{১৬}$

কন্যা ------------------ $\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{৩}{৪}$ $=\frac{৯}{১৬}$

$$\frac{৫}{৬} \qquad ১$$

টীকা ঃ অংশীদার বা দূর আত্মীয় বর্তমানে স্বামী আগমের অধিকারী নন।

(১০০) স্ত্রী ---------------------$=\frac{৪}{৩২}$

মাতা ------------------- $\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৭}{৮}$ এর $\frac{১}{৪}=\frac{৭}{৩২}$

কন্যা ------------------ $\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৭}{৮}$ এর $\frac{৩}{৪}=\frac{২১}{৩২}$

$$\frac{৪}{৬} \qquad ১$$

টীকা ঃ অংশীদার বা দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় বর্তমানে স্ত্রী আগমের অধিকারী নন।

(১০১) স্ত্রী ---------------------$\frac{১}{৮}=\frac{৫}{৪০}$

মাতা ------------------- $\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৭}{৮}$ এর $\frac{১}{৫}=\frac{৭}{৪০}$

দু'জন পুত্রের কন্যা ------ $\frac{২}{৩}=\frac{৪}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৭}{৮}$ এর $\frac{৪}{৫}=\frac{২৮}{৪০}$

$$\frac{৫}{৬} \qquad ১$$

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে উদাহরণ (১০১)-এ উল্লিখিত ব্যক্তিদের অংশ হবে ঃ-

*Dhaka University Institutional Repository*

(১০১-ক) স্ত্রী ---------- $\frac{১}{৮} = \frac{৩}{২৪}$

মাতা ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{৪}{২৪}$

দু'জন পুত্রের কন্যা ----- --- $\frac{১৭}{২৪}$ (পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে; প্রত্যেকের অংশ হবে $\frac{১৭}{৪৮}$ )

(১০২) স্বামী ---------- $\frac{১}{২} = \frac{২}{৪}$

বৈপিত্রেয় ভাই---------- $\frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{১}{২}$ এর $\frac{১}{২} = \frac{১}{৪}$

বৈপিত্রেয় কন্যা -------- $\frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{১}{২}$ এর $\frac{১}{২} = \frac{১}{৪}$

১

(১০৩) স্ত্রী ---------- $\frac{১}{৪} = \frac{২}{৮}$

বৈপিত্রেয় ভাই---------- $\frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{২}$ $= \frac{৩}{৮}$

বৈপিত্রেয় কন্যা -------- $\frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{২}$ $= \frac{৩}{৮}$

১

টীকা ঃ অংশীদার বা দূর আত্মীয় বর্তমানে স্বামী বা স্ত্রী আগমের অধিকারী নন।

(১০৪) স্ত্রী ---------- $\frac{১}{৪} = \frac{৪}{১৬}$

পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{৩}{৪} = \frac{৯}{১৬}$

বৈপিত্রেয় বোন -------- $\frac{১}{৬} = \frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{৪}$ $= \frac{৩}{১৬}$

$\frac{৪}{৬}$ ১

টীকা ঃ একটি মাত্র পূর্ণ বোন বর্তমানে বৈমাত্রেয় বোন সম্পূর্ণ বঞ্চিত হননা তবে তার অংশ কমে $\frac{১}{৬}$ হয়।

(১০৫) স্ত্রী ---------- $\frac{১}{৪} = \frac{১}{৪}$

মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{৩}$ $= \frac{১}{৪}$

বৈপিত্রেয় ভাই --------- $\frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{৩}$ $= \frac{১}{৪}$

বৈপিত্রেয় বোন -------- $\frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি করে $\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{৩}$ $= \frac{১}{৪}$

টীকা ঃ অংশীদার বা দূর আত্মীয় স্বামী বা স্ত্রী আগমের অধিকারী নন।

উদাহরণ (৯৯) থেকে উদাহরণ (১০৫)-এ দেখা যাচ্ছে যে, অংশীদার বা দূর আত্মীয় বর্তমানে স্বামী বা স্ত্রী আগমের অধিকারী হন না। এসব ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত সম্পত্তি স্বামী বা স্ত্রী ব্যতিত অন্যান্য উত্তরাধিকারীর মধ্যে তাদের অংশের আনুপাতিক হারে পুনরায় বণ্টন করা হয়েছে; যথা- উদাহরণ (৯৯)-এ স্বামীর অংশ প্রদানের পর সম্পত্তির $\frac{৩}{৪}$ অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। সুতরাং মাতা ও কন্যার অংশ দাঁড়াচ্ছে (১) মাতা $\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{৪} = \frac{৩}{১৬}$ ; (২) কন্যা $\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{৩}{৪} = \frac{৯}{১৬}$

[উদাহরণ (৮৮) দ্রষ্টব্য]

(১০৬) স্ত্রী ---------- $\frac{১}{৪}$

ভায়ের কন্যা ------ $\frac{৩}{৪}$

টীকা ঃ ভায়ের কন্যা দূর আত্মীয়ের অন্তর্গত বিধায় সে বর্তমানে স্ত্রী আগমের অধিকারী হবে না। তাই উদ্বৃত্ত সম্পত্তি ভায়ের কন্যার প্রাপ্য।

**আউল ও রাদের পার্থক্য (Difference between Increase and Return) ঃ** রাদ হচ্ছে আউলের বিপরীত। অংশগুলোর সমষ্টি সমস্ত বা ১-এর কম হলে রাদের প্রশ্ন উঠে পক্ষান্তরে আউলের প্রশ্ন উঠে অংশগুলোর সমষ্টি সমস্ত বা ১-এর বেশি হলে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে অংশগুলো আনুপাতিক হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও শেষোক্ত ক্ষেত্রে অংশগুলো আনুপাতিক হারে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

**পিতা ও সত্য পিতামহ (Father and true grandfather) ঃ** কোন ব্যক্তি একমাত্র অংশীদার হলে তিনি সমস্ত ত্যক্ত বিত্তের অধিকারী হন। অংশীদার হিসেবে কোরানিক অংশ পাওয়ার পর রাদের ফলে তিনি অবশিষ্ট ত্যক্ত বিত্তেরও অধিকারী হন। পিতা একমাত্র উত্তরাধিকারী হলে তিনি অবশিষ্টভোগী হিসেবে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়ে থাকেন (প্রকৃত প্রস্তাবে এ্যাগনেটিক উত্তরাধিকারী বলেই তিনি এ সুবিধা পান); কারণ সন্তান বা পুত্রের সন্তান যত অধস্তন হোক, অবর্তমানে তিনি অংশীদারের শ্রেণীভুক্ত হন না। সত্য পিতামহ একমাত্র উত্তরাধিকারী হলে অনুরূপ রীতি প্রযোজ্য।

**দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ অবশিষ্টভোগী (আসাবাত; Residuaries) ঃ** সিরাজিয়ায় অবশিষ্টভোগী (আসাবাত) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ

(১) আপন অধিকার বলে অবশিষ্টভোগী (আসাবা বি-নাফসিহি);

(২) অন্যের অধিকার বলে অবশিষ্টভোগী আসাবা বি-গায়রিহি);

(৩) অন্যের সঙ্গে অবশিষ্টভোগী (আসাবা মা'-গায়রিহি);

সমস্ত পুরুষ এ্যাগনেট প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। অবশিষ্টভোগীদের মধ্যে এরা শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠই নন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থানেরও অধিকারী। পুত্র, পুত্রের পুত্র, পিতা, ভাই, পিতৃব্য (paternal uncle) ও তার পুত্র প্রভৃতি এর অন্তর্গত। প্রাক-ইসলাম যুগে উত্তরাধিকারী হিসেবে এদের যে প্রাধান্য ছিল হানাফী আইনে তা অনেকটা বজায় রয়েছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছে চারজন নির্দিষ্ট মহিলা এ্যাগনেট। সমপর্যায়ভুক্ত পুরুষ আত্মীয় বর্তমানে এর অবশিষ্টভোগীর পর্যায়ভুক্ত হন, যথা-

(১) পুত্র বর্তমানে কন্যা।

(২) পুত্রের পুত্র, যত অধস্তন হোক, বর্তমানে সমপর্যায়ের পুত্রের কন্যা, যত অধস্তন হোক।

(৩) পূর্ণ ভাই বর্তমানে পূর্ণ বোন, ও

(৪) বৈমাত্রেয় ভাই বর্তমানে বৈমাত্রেয় বোন।

এখানে লক্ষণীয় যে, (১) কন্যা ও (২) পুত্রের কন্যা, যত অধস্তন হোক, হচ্ছেন অধস্তন লাইনের মহিলা এ্যাগনেট। সমপর্যায়ভুক্ত পুরুষ এ্যাগনেট বর্তমানে তারা অবশিষ্টভোগী হন। পক্ষান্তরে পূর্ণ বোন ও বৈমাত্রেয় বোন persona designata হওয়া সত্ত্বেও তাদের অধস্তন বংশধরগণ অবশিষ্টভোগী বা আসাবাত না হয়ে যবিউল আরহাম বা দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের শ্রেণীভুক্ত হন। কারণ এরা সবাই কগনেট, এ্যাগনেট নন।

তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছেন দুজন (১) পূর্ণ বোন ও (২) বৈমাত্রেয় বোন। কন্যা বা পুত্রের কন্যা বর্তমানে এরা অবশিষ্টভোগী হন। ধরা যাক কোন ব্যক্তি এক কন্যা ও একজন পূর্ণ বোন রেখে মারা গেলেন। এক্ষেত্রে কোরানের নির্দেশ অনুসারে কন্যাকে ত্যক্ত বিত্তের $\frac{১}{২}$ অংশ ও পূর্ণ বোনকে বাকী অর্ধাংশ দেয়া যেতে পারে। কিন্তু যদি কেউ দুই কন্যা ও একজন পূর্ণ বোন অথবা এক কন্যা ও দুজন পূর্ণ বোন অথবা দুই কন্যা ও দুজন পূর্ণ বোন রেখে মারা যান তবে ত্যক্ত বিত্ত কিভাবে বণ্টন করা হবে? এসব ক্ষেত্রে কোরানিক অংশের সমষ্টি সমস্ত বা ১ এর অধিক। সুতরাং কাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং তা কেনই বা দেয়া হবে? কন্যা হচ্ছেন অধস্তন বংশধর পক্ষান্তরে বোন হচ্ছেন জ্ঞাতি; তাই স্বভাবতঃই কন্যা অগ্রাধিকার যোগ্য। সুতরাং কন্যা প্রথম শ্রেণীভুক্ত অংশীদার হিসেবে প্রথমে তার অংশ পাবেন ও উদ্বৃত্ত সম্পত্তি বোনকে বা বোনদের দেয়া হবে। এজন্যই "অন্যের সঙ্গে" এ কথাটি মূল আরবীর যথাযথ অনুবাদ নয় æin spite of" বা "সত্ত্বেও" বরঞ্চ মূল আরবীর অনেকটা কাছাকাছি শব্দ।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, প্রথম শ্রেণীভুক্ত অবশিষ্টভোগীগণ সবাই পুরুষ এ্যাগনেট। উত্তরাধিকারীদের মধ্যে এদের স্থানই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক-ইসলাম যুগে এরাই ছিলেন গোত্রীয় উত্তরাধিকারী। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছেন চারজন মহিলা এ্যাগনেট; সমপর্যায়ের পুরুষ এ্যাগনেট বর্তমানে এরা অবশিষ্টভোগীর শ্রেণীভুক্ত হন। বিধিবহির্ভুত পূর্ণ বোন ও বৈমাত্রেয় বোনের বিষয়টি তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অবশিষ্টভোগী বা আসাবাতদের নিম্নলিখিত উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ

(১) অধস্তন পুরুষ (Descendants)

(২) ঊর্ধ্বতন পুরুষ (Ascendants)

(৩) জ্ঞাতি (Collaterals)

সিরাজিয়াহ্ অনুসারে এরা হচ্ছেন ঃ

(১) মৃত ব্যক্তির বংশধর, যথা- পুত্র ও পুরুষের লাইনে তাদের বংশজ উত্তরসূরিগণ। এরা অধস্তন পুরুষ নামে পরিচিত।

(২) মৃত ব্যক্তির "মূল", যথা- তার পিতা, পিতার পিতা প্রভৃতি ঊর্ধ্বতন পুরুষ পূর্বসূরিগণ, এরা ঊর্ধ্বতন পুরুষ নামে পরিচিত।

(৩) মৃত ব্যক্তির পিতার বংশধর, যথা- মৃত ব্যক্তির ভাই (পূর্ণ বা বৈমাত্রেয়) ও পুরুষের লাইনে তাদের বংশজ উত্তরসূরিগণ। এরা জ্ঞাতি নামে পরিচিত।

(৪) মৃত ব্যক্তির প্রকৃত পিতামহের, যত ঊর্ধ্বতন হোক বংশধর, যথা- পিতৃব্য ও বংশজ ঊধ্বতন পুরুষ পূর্বসূরীদের যে কোন পুরুষ উত্তরসূরী যত দূরবর্তী হোক। এরাও জ্ঞাতির অন্তর্ভুক্ত। মনযোগ সহকারে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মৃত ব্যক্তির পুরুষ এ্যাগনেটদের উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ ও সামগ্রিক। অবশিষ্টভোগীদের অগ্রাধিকারের প্রশ্নটি নিম্নলিখিত নীতি অনুযায়ী স্থিরীকৃত হয়ে থাকে ঃ

(১) প্রথমে আসেন অধস্তন পুরুষগণ (Descendants);

(২) অতঃপর আসেন ঊর্ধ্বতন পুরুষগণ (Ascendants) ও

(৩) সবশেষে আসেন জ্ঞাতিগণ (Collaterals)।

অবশিষ্টভোগীদের একটি তালিকা নীচে দেয়া হলো ঃ

মুসলিম পারিবারিক আইনের ফলে উদ্ভুত প্রশ্নসমূহ উক্ত তালিকায় ও সংশ্লিষ্ট উদাহরণ মালায় পৃথকভাবে আলোচিত হয়েছে।

**অবশিষ্টভোগীদের তালিকা ঃ হানাফী আইন ঃ**

**(ক) অধস্তন পুরুষ (Descendants) ঃ**

(১) পুত্র ঃ বর্তমানে কন্যা অবশিষ্টভোগী হন; পুত্র কন্যার দ্বিগুণ অংশ পেয়ে থাকেন।

**(২) পুত্রের পুত্র, যত অধস্তন হোক ঃ** নিকটতর দূরবর্তীকে বঞ্চিত করেন। দুই বা ততোধিক পুত্রের পুত্র সমান অংশে ত্যক্ত বিত্তের অংশীদার হন। সমপর্যায়ের পুত্রের পুত্র বর্তমানে পুত্রের কন্যা, যত অধস্তন হোক, অবশিষ্টভোগীর শ্রেণীভুক্ত হয়। সমপর্যায়ের পুত্রের পুত্রের পরিবর্তে অধস্তন পুত্রের পুত্র বর্তমানে যদি দেখা যায় যে, পুত্রের কন্যা অংশীদারের শ্রেণীভুক্ত হতে পারছেন না তবে তিনি অবশিষ্টভোগীর শ্রেণীভুক্ত হবেন [উদাহরণ (১১৮) দ্রষ্টব্য]। উভয় ক্ষেত্রেই প্রত্যেক পুত্রের পুত্র, যত অধস্তন হোক, প্রত্যেক পুত্রের কন্যার, যত অধস্তন হোক, দ্বিগুণ অংশ পেয়ে থাকেন। টীকা ঃ পুত্রের কন্যা, যথা অধস্তন হোক, অধস্তন পুত্রের

পুত্রের সঙ্গে অবশিষ্টভোগীর শ্রেণীভুক্ত হলে যদি দেখা যায় যে, অধস্তন পুত্রের পুত্রের সমপর্যায়ভুক্ত অধস্তন পুত্রের কন্যা বর্তমান তবে পুত্রের কন্যা, যত অধস্তন হোক, কে তাদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা হবে ও সমান বা তুল্য অংশে ত্যক্ত বিত্তের উত্তরাধিকারী হবেন [উদাহরণ (১২০) দ্রষ্টব্য] মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে পুত্রের পুত্র (বা কন্যা) কিংবা কন্যার পুত্রের (বা কন্যার কন্যার) প্রতিনিধিত্বের বিধানটি সীমিত বিধায় অধিক দূরবর্তী পুত্রের পুত্র বা কন্যা, যত অধস্তন হোক, এক্ষেত্রে উপরে (২)-এ বর্ণিত নীতি প্রযোজ্য, [নিচে প্রদত্ত উদাহরণমালা দ্রষ্টব্য]।

**(খ) ঊর্ধ্বতন পুরুষগণ (Ascendants) ঃ**

**(৩) পিতা।**

**(৪) সত্য পিতামহ, যত ঊর্ধ্বতন হোক ঃ** নিকটর দূরবর্তীকে বঞ্চিত করেন।

**(গ) পিতার বংশধরগণ ঃ**

**(৫) পূর্ণ ভাই ঃ** পূর্ণ ভাই বর্তমানে পূর্ণ বোন অবশিষ্টভোগী হন। প্রত্যেক ভাই প্রত্যেক বোনের দ্বিগুণ অংশ পেয়ে থাকেন।

**(৬) পূর্ণ বোন ঃ** পূর্ণ ভাই ও উপরোক্ত সকল অবশিষ্টভোগী অবর্তমানে যদি দেখা যায় যে, শুধু (১) এক বা একাধিক কন্যা বা পুত্রের কন্যা, যত অধস্তন হোক, কিংবা (২) এক কন্যা ও এক বা একাধিক পুত্রের কন্যা, যত অধস্তন হোক বর্তমান তবে তাদের অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির অধিকারী হবেন পূর্ণ বোন। [মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে পূর্ণ বোন পুত্রের কন্যা বর্তমানে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবেন, কারণ এক্ষেত্রে পুত্রের কন্যা পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে তার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। [নিচের উদাহরণমালা দ্রষ্টব্য]।

**(৭) বৈমাত্রেয় ভাই ঃ** বৈমাত্রেয় ভাই বর্তমানে বৈমাত্রেয় বোন অবশিষ্টভোগী হন। তাই বোনের দ্বিগুণ অংশ পেয়ে থাকেন।

**(৮) বৈমাত্রেয় বোন ঃ** বৈমাত্রেয় ভাই ও উপরোক্ত সকল অবশিষ্টভোগী অবর্তমানে যদি দেখা যায় যে, শুধু (১) এক বা একাধিক কন্যা অথবা (২) এক বা একাধিক পুত্রের কন্যা, যত অধস্তন হোক কিংবা (৩) এক কন্যা ও এক বা একাধিক পুত্রের কন্যা, যত অধস্তন হোক, বর্তমান তবে তাদের প্রাপ্য অংশ দেয়ার পর বৈমাত্রের বোন অবশিষ্ট সম্পত্তির অধিকারী হবেন।

(৯) পূর্ণ ভায়ের পুত্র (full brother's son)

(১০) বৈমাত্রেয় ভায়ের পুত্র (consanguine brother's son)

(১১) পূর্ণ ভায়ের পুত্রের পুত্র

(১২) বৈমাত্রেয় ভায়ের পুত্রের পুত্র

অতঃপর আসেন (১১) নম্বর ও (১২) নম্বরে উল্লেখিত ব্যক্তির অধস্তন পুরুষ উত্তরসূরিগণ অর্থাৎ (১১) নম্বরের পুত্র, তারপর (১২) নম্বরের পুত্র, তারপর (১১) নম্বরের পুত্রের পুত্র, তারপর (১২) নম্বরের পুত্রের পুত্র ইত্যাদি ইত্যাদি।

**(ঘ) সত্য পিতামহের, যত ঊর্ধ্বতন হোক, বংশধরগণ ঃ**

**(১৩) পিতার পূর্ণ ভাই**

**(১৪) পিতার বৈমাত্রেয় ভাই**

**(১৫) পিতার পূর্ণ ভায়ের পুত্র**

**(১৬) পিতার বৈমাত্রেয় ভায়ের পুত্র**

**(১৭) পিতার পূর্ণ ভায়ের পুত্রের পুত্র**

**(১৮) পিতার বৈমাত্রেয় ভায়ের পুত্রের পুত্র**

অতঃপর (১৭) নম্বর ও (১৮) নম্বরের অধস্তন পুরুষ উত্তরসূরিগণ পর্যায়ক্রমে আসেন, অর্থাৎ (১৭) নম্বরের পুত্র, তারপর (১৮) নম্বরের পুত্র, তারপর (১৭) নম্বরের পুত্রের পুত্র, তারপর (১৮) নম্বরের পুত্রের পুত্র, তারপর (১৭) নম্বরের পুত্রের পুত্রের পুত্র, তারপর (১৮) নম্বরের পুত্রের পুত্রের পুত্র ইত্যাদি ইত্যাদি।

**(ঙ) অধিকতর দূরবর্তী সত্য পিতামহের অধস্তন পুরুষ উত্তরসূরিগণ ঃ**

মৃতব্যক্তির পিতার ভাই, তার পুত্র, পুত্রের পুত্র প্রভৃতির ক্ষেত্রে অনুসৃত ক্রম অধিতর দূরবর্তী সত্য পিতামহের অধস্তন উত্তরসূরিদের ক্ষেত্রেও অনুসৃতব্য। প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য পিতামহের বংশধর থেকেই অগণিত জ্ঞাতির সূত্রপাত হয়। তত্ত্বীয় দিক থেকে এরা আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এদের প্রশ্ন প্রায়ই উত্থাপিত হয় না বিধায় এ সম্পর্কে বিস্তারিবত আলোচনা থেকে বিরত থাকা হলো।

উদাহরণমালা

(ক) অধস্তন পুরুষ (Descendants) ঃ

(১) পুত্র ও কন্যা ঃ

(১০৭) পুত্র ---------- $\frac{২}{৩}$

কন্যা ---------- $\frac{১}{৩}$ } অবশিষ্টভোগী হিসেবে

টীকা ঃ পুত্র বর্তমানে কন্যা অংশীদারের শ্রেণীভুক্ত হন না। তবে সাধারণ মুসলিম আইন অনুসারে এক কন্যা ও এক পুত্রের পুত্র বর্তমানে কন্যা অংশীদার হিসেবে ত্যক্ত বিত্তের $\frac{১}{২}$ অংশের অধিকারী হন। তবে মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে অনুরূপ ক্ষেত্রে পুত্রের পুত্র পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে ত্যক্ত বিত্তের $\frac{২}{৩}$ অংশের এবং কন্যা $\frac{১}{৩}$ অংশের অধিকারী হবেন।

(১০৮) দুই পুত্র ---------- $\frac{৪}{৭}$ (প্রত্যেকের অংশ হবে $\frac{২}{৭}$)

তিন কন্যা ---------- $\frac{৩}{৭}$ (প্রত্যেকের অংশ হবে $\frac{১}{৭}$)

(১০৯) বিধবা স্ত্রী ---------- $\frac{১}{৮} = \frac{৩}{২৪}$ (অংশীদার হিসেবে)

পুত্র ---------- $\frac{৭}{৮}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{৭}{১২} = \frac{১৪}{২৪}$

কন্যা ---------- $\frac{৭}{৮}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{৭}{২৪} = \frac{৭}{২৪}$ } অবশিষ্টভোগী হিসেবে

(১১০) স্বামী ---------- $\frac{১}{৪}$ (অংশীদার হিসেবে)

মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

পুত্র ---------- $\frac{৭}{১২}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{৭}{১৮}$

কন্যা ---------- $\frac{৭}{১২}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{৭}{৩৬}$ } অবশিষ্টভোগী হিসেবে

(১১১) স্বামী ---------- $\frac{১}{৪}$ (অংশীদার হিসেবে)

মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

দুই পুত্র ---------- $\frac{৭}{১২}$ এর $\frac{৪}{৭} = \frac{১}{৩}$

তিন কন্যা ---------- $\frac{৭}{১২}$ এর $\frac{৩}{৭} = \frac{১}{৪}$ } অবশিষ্টভোগী হিসেবে

**(২) পুত্রের পুত্র, যত অধস্তন হোক ও পুত্রের কন্যা যত অধস্তন হোক ঃ**

(১১২) পুত্রের পুত্র ---------- $\frac{২}{৩}$

পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{৩}$ } অবশিষ্টভোগী হিসেবে

**টীকা ঃ** পুত্রের পুত্র বর্তমানে পুত্রের কন্যা অংশীদারের শ্রেণীভুক্ত না হয়ে অবশিষ্টভোগীর শ্রেণীভুক্ত হন। অনুরূপভাবে পুত্রের পুত্রের পুত্র বর্তমানে পুত্রের পুত্রের কন্যাও অবশিষ্টভোগীর শ্রেণীভুক্ত হন, কারণ এরা সবাই পরস্পরের সমপর্যায়ভুক্ত।

(১১৩) দুই কন্যা ---------- $\frac{২}{৩}$ (অংশীদার হিসেবে)

পুত্রের পুত্র ---------- $\frac{১}{৩}$ (অংশীদার হিসেবে)

পুত্রের পুত্রের পুত্র ---------- (পুত্রের পুত্র বর্তমানে বঞ্চিত)

পুত্রের পুত্রের কন্যা ---------- (কন্যাগণ ও পুত্রের পুত্র বর্তমানে বঞ্চিত)

মুসলিম পারিবারিক অনুসারে উদাহরণ (১১৩)-তে উল্লেখিত ব্যক্তিদের অংশ হবে ঃ

(১১৩-ক) দুই কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ (প্রত্যেকের অংশ হবে $\frac{১}{৪}$)

পুত্রের পুত্র ---------- $\frac{১}{২}$ (পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে)

পুত্রের পুত্রের পুত্র ---------- (বঞ্চিত)

পুত্রের পুত্রের কন্যা ---------- (বঞ্চিত)

(১১৪) দুই কন্যা ---------- $\frac{২}{৩} = \frac{৬}{৯}$

পুত্রের এক পুত্র ---------- $\frac{১}{৩}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{২}{৯}$

তিন কন্যা ---------- $\frac{১}{৩}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{১}{৯}$ } অবশিষ্টভোগী হিসেবে

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে উদাহরণ (১১৪)-তে উল্লেখিত ব্যক্তিদের অংশ হবে ঃ

(১১৪-ক) দুই কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ (প্রত্যেকের অংশ হবে $\frac{১}{৪}$)

পুত্রের এক পুত্র ---------- $\frac{১}{২}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{১}{৩}$

ও এক কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{১}{৬}$ } পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে

টীকা ঃ মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী পূর্ব-মৃত পুত্র বা কন্যা বেঁচে থাকলে যে অংশ পেতেন তার পুত্র বা কন্যাও "মূল" অনুযায়ী অনুরূপ অংশের অধিকারী হবেন। তাই এক্ষেত্রে প্রথমে এক পুত্র ও দুই কন্যা ধরে নিয়ে অংশ হচ্ছে, এক পুত্র $\frac{১}{২}$, দুই কন্যা $\frac{১}{২}$। মুসলিম পারিবারিক আইনে পূর্ব-মৃত পুত্র বা কন্যার সন্তানদের অংশ তাদের নিজেদের মধ্যে কিভাবে বিভক্ত হবে তা বলা হয়নি বিধায় সাধারণ মুসলিম আইন অনুসারে প্রাপ্য অংশ তাদের দেয়া হয়েছে। এভাবে তাদের অংশ হচ্ছে, পুত্রের পুত্র ------- $\frac{১}{২}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{১}{৩}$; পুত্রের কন্যা -------- $\frac{১}{২}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{১}{৬}$।

(১১৫) কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

পুত্রের এক পুত্র ---------- $\frac{১}{২}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{১}{৩}$

ও এক কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{১}{৬}$ } অবশিষ্টভোগী হিসেবে

টীকা ঃ এক্ষেত্রে এক কন্যা বর্তমান সুতরাং পুত্রের পুত্র না থাকলে পুত্রের কন্যা অংশীদার হিসেবে $\frac{১}{৬}$ অংশ পেতেন। পুত্রের পুত্র বর্তমান থাকায় পুত্রের কন্যা অবশিষ্টভোগী হচ্ছেন, কারণ উভয়েই সমপর্যায়ভুক্ত।

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে উদাহরণ (১১৫)-তে উল্লিখিত ব্যক্তিদের অংশ হবে নিম্নরূপ ঃ [উদাহরণ (১১৪-ক) দ্রষ্টব্য]

(১১৫-ক) কন্যা ---------- $\frac{১}{৩} = \frac{৩}{৯}$ (অংশীদার হিসেবে)

পুত্রের এক পুত্র ---------- $\frac{২}{৩}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{৪}{৯}$

ও এক কন্যা ---------- $\frac{২}{৩}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{২}{৯}$ } পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে

(১১৬) পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে).

পুত্রের পুত্রের পুত্র ---------- $\frac{১}{২}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

টীকা ঃ এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কোন আত্মীয় বর্তমান না থাকায় পুত্রের কন্যা অংশীদার হচ্ছেন (অংশীদারের তালিকা দ্রষ্টব্য)। যে ক্ষেত্রে পুত্রের কন্যা অংশীদারের শ্রেণীভুক্ত হতে পারেন না শুধু সেক্ষেত্রেই তিনি পুত্রের পুত্রের পুত্রের (অধস্তন পুত্রের পুত্র) সঙ্গে অবশিষ্টভোগী হন [উদাহরণ (১১৮) দ্রষ্টব্য]

(১১৭) কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে, কারণ একমাত্র কন্যা বর্তমান)

পুত্রের পুত্রের পুত্র ---------- $\frac{১}{৩}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{২}{৯}$

পুত্রের পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{৩}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{১}{৯}$ } অবশিষ্টভোগী হিসেবে

টীকা ঃ এক্ষেত্রে একমাত্র কন্যা বর্তমান থাকায় পুত্রের কন্যা অংশীদার হিসেবে $\frac{১}{৬}$ অংশের অধিকারী, তাই তিনি পুত্রের পুত্রের পুত্রের (অধস্তন পুত্রের পুত্র) সঙ্গে অবশিষ্টভোগীর শ্রেণীভুক্ত হচ্ছেন না।

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে উদাহরণ (১১৭)-এ উল্লেখিত ব্যক্তিদের অংশ হবে ঃ

(১১৭-ক) কন্যা ---------- $\frac{১}{৩}$

পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{২}{৩}$ (পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে)

পুত্রের পুত্রের পুত্র ---------- (বঞ্চিত)

পুত্রের পুত্রের কন্যা ---------- (বঞ্চিত)

(১১৮) দুই কন্যা ---------- $\frac{২}{৩}$ (অংশীদার হিসেবে; প্রত্যেকের অংশ হবে $\frac{১}{৩}$)

পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{৩}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{১}{৯}$

ও এক কন্যা ---------- $\frac{১}{৩}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{২}{৯}$

} অবশিষ্টবোগী হিসেবে

টীকা ঃ এক্ষেত্রে দুই কন্যা বর্তমান থাকায় পুত্রের কন্যা অংশীদার না হয়ে পুত্রের পুত্রের পুত্রের (অধস্তন পুত্রের পুত্র) সঙ্গে অবশিষ্টভোগী হচ্ছেন।

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে উদাহরণ (১১৮)-তে উল্লিখিত ব্যক্তিদের অংশ হবেঃ

(১১৮-ক) দুই কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ (প্রত্যেকের অংশ হবে $\frac{১}{৪}$)

পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ (পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে)

পুত্রের পুত্রের পুত্র ---------- ---(বঞ্চিত)

(১১৯) দু'জন পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{২}{৩}$ (অংশীদার হিসেবে)

পুত্রের পুত্রের পুত্র ---------- $\frac{১}{৩}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{২}{৯}$

পুত্রের পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{৩}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{১}{৯}$

} অবশিষ্টভোগী হিসেবে

টীকা ঃ এক্ষেত্রে পুত্রের কন্যার অংশীদার হওয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই বিধায় তিনি পুত্রের পুত্রের পুত্রের সঙ্গে অবশিষ্টভোগী হচ্ছেন না।

(১২০) দুই কন্যা ---------- $\frac{২}{৩}$ (অংশীদার হিসেবে)

পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{৩}$ এর $\frac{১}{৪} = \frac{১}{১২}$

পুত্রের পুত্রের পুত্র ---------- $\frac{১}{৩}$ এর $\frac{২}{৪} = \frac{১}{৬}$

পুত্রের পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{৩}$ এর $\frac{১}{৪} = \frac{১}{১২}$

} অবশিষ্টভোগী হিসেবে

টীকা ঃ (ক) দুই বা ততোধিক কন্যা বর্তমানে, (খ) পুত্রের কন্যা, যত অধস্তন হোক, অধস্তন হোক, অধস্তন পুত্রের পুত্রের সঙ্গে অবশিষ্টভোগীর শ্রেণীভুক্ত হলে যদি দেখা যায় যে, অধস্তন পুত্রের পুত্রের সমপর্যায়ভুক্ত পুত্রের কন্যা, যত অধস্তন হোক, বর্তমান তবে ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন পুত্রের কন্যাগণ সমপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য ও সমান অংশে অংশীদার হবেন। এক্ষেত্রে দুই কন্যা বর্তমানে থাকায় পুত্রের কন্যা অংশীদার না হয়ে পুত্রের পুত্রের পুত্রের (অধস্থন পুত্রের পুত্র) সঙ্গে অবশিষ্টভোগী হচ্ছেন। পুত্রের পুত্রের পুত্র ও পুত্রের পুত্রের কন্যাও অবশিষ্টভোগীর শ্রেণীভুক্ত হচ্ছেন, কারণ উভয়ই সমপর্যায়ভুক্ত। এভাবে পুত্রের কন্যা ও পুত্রের পুত্রের কন্যা উভয়েই অবশিষ্টভোগী হয়ে প্রত্যেকে ত্যক্ত বিত্তের $\frac{১}{১২}$ অংশের অধিকারী হচ্ছেন। এ উদাহারণের দুইটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো ঃ (১) পুত্রের পুত্রের কন্যা অধিক দূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও পুত্রের কন্যার সঙ্গে যুগপৎ উত্তরাধিকারী হচ্ছেন; (২) পুত্রের কন্যা অধস্তন পুত্রের পুত্রের (পুত্রের পুত্রের পুত্র) সঙ্গে অবশিষ্টভোগী হচ্ছেন। এর অন্যথা হলে পুত্রের কন্যা, পুত্রের পুত্রের কন্যা থাকায় বঞ্চিত হবেন এবং তা হবে মুসলিম আইনের নীতি-বিরোধী; কারণ সিরাজিয়াহ্ অনুসারে নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তি দূর সম্পর্কীয়ের তুলনায় অগ্রাধিকার পাবেন।

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে উদাহরণ (১২০)-এ উল্লিখিত ব্যক্তিদের অংশ হবে ঃ

(১২০-ক) দুই কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$

পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ (পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে)

পুত্রের পুত্রের পুত্র
পুত্রের পুত্রের কন্যা } (বঞ্চিত)

**৩। পিতা ঃ পিতা বর্তমানে প্রাথমিক উত্তরাধিকারী বা তাদের বিকল্প ব্যতিত সকলেই সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন।**

(১২১) পিতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

পুত্র (অথবা পুত্রের পুত্র,
যত অধস্তন হোক) ---------- $\frac{৫}{৬}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

টীকা ঃ এক্ষেত্রে অংশীদার হচ্ছেন কারণ পুত্র বর্তমান [অংশীদারদের তালিকা দ্রষ্টব্য]

(১২২) মাতা ---------- $\frac{১}{৩}$ (অংশীদার হিসেবে)

পিতা ---------- $\frac{২}{৩}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

টীকা ঃ এক্ষেত্রে পিতা অবশিষ্টভোগী হচ্ছেন, কারণ কোন প্রস্তাব বা পুত্রের সন্তান, যত অধস্তন হোক, বিদ্যমান নেই [অংশীদারদের তালিকা দ্রষ্টব্য]

(১২৩) কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

মাতা ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে $\frac{১}{৬}$ +অবশিষ্টভোগী হিসেবে $\frac{১}{৩} = \frac{১}{২}$)

টীকা ঃ এক্ষেত্রে পিতা অংশীদার ও অবশিষ্টভোগী এ উভয় শ্রেণীভুক্ত হচ্ছেন। তিনি অংশীদার কারণ কন্যা বিদ্যমান। পক্ষান্তরে পুত্র বা পুত্রের সন্তান, যত অধস্তন হোক, অবর্তমানে তিনি অবশিষ্টভোগী হিসেবে অবশিষ্ট $\frac{১}{৩}$ অংশেরও অধিকারী হচ্ছেন। পিতা একই সাথে অংশীদার ও অবশিষ্টভোগীর শ্রেণীভুক্ত হতে পারেন। পুত্র বা পুত্রের পুত্র, যত অধস্তন হোক, বর্তমানে তিনি শুধু কোরানিক অংশের অধিকারী [উদাহরণ (১২১) দ্রষ্টব্য]। সন্তান বা পুত্রের সন্তান, যত অধস্তন হোক, অবর্তমানে তিনি শুধু অবশিষ্টভোগী হন [উদাহরণ (১২২) দ্রষ্টব্য]। শুধু কন্যা বা পুত্রের কন্যা, যত অধস্তান হোক, বর্তমানে তিনি একই সাথে অংশীদার ও অবশিষ্টভোগী হন [উদাহরণ (১২৩) দ্রষ্টব্য] সত্য পিতামহের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নীতি প্রযোজ্য। প্রকৃত প্রস্তাবে শুধু পিতা ও সত্য পিতামহই, যত উর্ধ্বতন হোক, এরূপ উভয় দিক থেকে উত্তরাধিকারী হতে পারেন।

অবশ্য মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে পিতা ও পুত্রের কন্যা বর্তমানে (পুত্রের কন্যা, যত অধস্তন হোক, নয়) পিতা শুধু অংশীদার হিসেবে কোরানিক অংশের অধিকারী হবেন, যথা-

(১২৩-ক) পিতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

পুত্রের কন্যা --------- $\frac{৫}{৬}$ (পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে)

**(৪) সত্য পিতামহ, যত উর্ধ্বতন হোক, (True grandfather how high soever) ঃ** যে সব ক্ষেত্রে পিতা উত্তরাধিকারী হয়ে থাকেন পিতা অবর্তমানে সত্য পিতামহও অনুরূপ সকল ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী হন। অধিক দূরবর্তী সত্য পিতামহ নিকটতর সত্য পিতামহ বর্তমানে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে থাকেন। স্বামী বা স্ত্রীসহ পিতা বর্তমানে মাতার অংশ হ্রাসপ্রাপ্ত হলেও অনুরূপ ক্ষেত্রে সত্য পিতামহ বর্তমানে মাতার অংশ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। [উদাহরণ (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১২৭) ও (১২৮) দ্রষ্টব্য]।

(১২৪) পিতার পিতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

পুত্র (অথবা পুত্রের পুত্র,

যত অধস্তন হোক) ---------- $\frac{৫}{৬}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

(১২৫) মাতা ---------- $\frac{১}{৩}$ (অংশীদার হিসেবে)

পিতার পিতা ---------- $\frac{২}{৩}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

পিতার পিতার পিতা ------- (পিতার পিতা বর্তমানে বঞ্চিত)

(১২৬) কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

পিতার পিতা ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে $\frac{১}{৬}$ +অবশিষ্টভোগী হিসেবে $\frac{১}{৩}=\frac{১}{২}$)

(১২৭) বিধবা ---------- $\frac{১}{৪}$ (অংশীদার হিসেবে)

মাতা ----- $\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{৩}$ ----- $\frac{১}{৪}$ (অংশীদার হিসেবে)

পিতা ---------- $\frac{১}{২}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

(১২৮) স্বামী ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

মাতা ---------- $\frac{১}{৩}$ (অংশীদার হিসেবে)

পিতার পিতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

(১২৯) পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

পিতার পিতা ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে $\frac{১}{৬}$ +অবশিষ্টভোগী হিসেবে $\frac{১}{৩} = \frac{১}{২}$)

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে উদাহরণ (১২৯)-এ উল্লিখিত বক্তিদের অংশ হবে ঃ

(১২৯-ক) পিতার পিতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{৫}{৬}$ (পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে)

**(গ) জ্ঞাতিবর্গ (Collaterals) ঃ পিতার বংশধরগণ ঃ**

**(৫) পূর্ণ ভাই (ful brother) ঃ** পূর্ণ ভাই বর্তমানে পূর্ণ বোন অবশিষ্টভোগী হন; ভাই বোনের দ্বিগুণ অংশ পেয়ে থাকেন। পূর্ণ ভাই পিতা (অবর্তমানে সত্য পিতামহ), পুত্র অথবা পুত্রের পুত্র, যত অধস্তন হোক বর্তমানে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন।

**(৬) পূর্ণ বোন (full sister) ঃ** পূর্ণ ভাই অবর্তমানে পূর্ণ বোন নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সঙ্গে অবশিষ্টভোগী হন; (১) এক বা একাধিক কন্যা, (২) এক বা একাধিক পুত্রের কন্যা, যত অধস্তন হোক, অথবা (৩) এক কন্যা ও এক পুত্রের কন্যা, যত অধস্তন হোক।

পূর্ণ বোন নিম্নবর্ণিত যে কোন শ্রেণীর উত্তরাধিকারী হতে পারেন ঃ (১) অংশীদা, (২) পূর্ণ ভাই বর্তমানে অবশিষ্টভোগী ও (৩) কন্যা বা পুত্রের কন্যা, যত অধস্তন হোক বর্তমানে অবশিষ্টভোগী। উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ণ বোন অংশীদার বা অবশিষ্টভোগী হতে পারেন তবে তিনি কোন অবস্থাতেই পিতার মত একই সঙ্গে উভয় শ্রেণীভুক্ত হন না। পূর্ণ বোন পিতা (অবর্তমানে সত্য পিতামহ), পুত্র অথবা পুত্রের পুত্র, যত অধস্তন হোক, বর্তমানে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন।

পূর্ণ বোন পুত্র বর্তমানে বঞ্চিত হন বিধায় মুসলিম পারিবারিক আইন প্রযোজ্য হলে পুত্রের কন্যা বর্তমানেও তিনি সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবেন। অনুরূপ নীতি পূর্ণ ভায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য [নিচের উদাহরণমালা দ্রষ্টব্য]

(১৩০) স্বামী ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

পূর্ণ ভাই ----- $\frac{১}{৩}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{২}{৯}$

পূর্ণ বোন ----- $\frac{১}{৩}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{১}{৯}$

} অবশিষ্টভোগী হিসেবে

টীকা ঃ এক্ষেত্রে ভাই বর্তমান বিধায় বোন অংশীদার না হয়ে অবশিষ্টভোগী হচ্ছেন। মাতা $\frac{১}{৬}$ অংশ পাচ্ছেন কারণ এক ভাই ও এক বোন বর্তমান।

(১৩১) পূর্ণ ভাই ---------- $\frac{২}{৩}$

পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{৩}$

} অবশিষ্টভোগী হিসেবে

বৈমাত্রেয় বোন ---------- (পূর্ণ ভাই বর্তমানে বঞ্চিত)

**পূর্ণ বোন, কন্যা ও পুত্রের কন্যা ঃ**

(১৩২) কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{২}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

পূর্ণ ভাইয়ের পুত্র --------- --- (নিকটতর অবশিষ্টভোগী পূর্ণ বোন বর্তমানে বঞ্চিত)

টীকা ঃ এক্ষেত্রে কন্যা বর্তমান বিধায় পূর্ণ বোন অংশীদার হতে পারছেন না। পূর্ণ ভাই বর্তমানে তিনি অবশিষ্টভোগী হতে পারেন তবে এক্ষেত্রে পূর্ণ ভাই নেই। সুতরাং তিনি কন্যার সঙ্গে অবশিষ্টভোগী হচ্ছেন। সাধারণ মুসলিম আইনে তিনি পুত্রের কন্যা বর্তমানেও অবশিষ্টভোগী হবেন [উদারহণ (১৩৩) দ্রষ্টব্য] অন্যথায় ভায়ের পুত্র তার তুলনায় অধিক দূরবর্তী হয়েও অগ্রাধিকার পেয়ে যাবেন।

(১৩৩) পুত্রের কন্যা, যত

অধস্তন হোক ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{২}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

পূর্ণ ভাইয়ের পুত্র ---------- --- (নিকটতর অবশিষ্টভোগী পূর্ণ বোন বর্তমানে বঞ্চিত)

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে পুত্রের কন্যা পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে সমস্ত ত্যক্ত বিত্তের অধিকারী এবং পূর্ণ বোন ও ভায়ের পুত্র সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবেন। অবশ্য পুত্রের কন্যা, যত অধস্তন হোক, এর ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলিম আইন প্রযোজ্য, কারণ মুসলিম পারিবারিক আইনে প্রতিনিধিত্বের বিধানটি সীমাবদ্ধ। উক্ত আইন প্রযোজ্য হলে উদাহরণ (১৩৩) এ উল্লিখিত ব্যক্তিদের অংশ হবে ঃ

(১৩৩-ক) পুত্রের কন্যা ---------- --- (পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে সমস্ত ত্যক্ত বিত্তের অধিকারী)

পূর্ণ বোন<br>পূর্ণ ভাইয়ের পুত্র } --- --- বঞ্চিত

(১৩৪) দুই কন্যা ---------- $\frac{২}{৩}$ (অংশীদার হিসেবে)

পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{৩}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

(১৩৫) মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{৩}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

(১৩৬) দুই কন্যা (বা পুত্রের কন্যা, যত অধস্তন হোক) ---------- $\frac{২}{৩}$ (অংশীদার হিসেবে)

পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{৩}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

(১৩৭) দুই কন্যা ---------- $\frac{২}{৩}$ (অংশীদার হিসেবে)

স্বামী ---------- $\frac{১}{৪}$ (অংশীদার হিসেবে)

পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{১২}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

পিতার পিতৃব্যের পুত্র

(Father's paternal

uncle's son) ---------- --- (নিকতটর অবশিষ্টভোগী

পূর্ণ বোন বর্তমানে বঞ্চিত)

মেহেরজান বনাম শাজাদী

(১৩৮) কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{৩}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে উদাহরণ (১৩৮)-এ উল্লিখিত ব্যক্তিদের অংশ হবে ঃ

(১৩৮-ক) কন্যা ---------- $\frac{১}{৩}$

পুত্রের কন্যা --------- $\frac{২}{৩}$ (পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে)

পূর্ণ বোন ---------- --- (বঞ্চিত)

(১৩৯) মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{৬}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে উদাহরণ (১৩৯)-এ উল্লিখিত ব্যক্তিদের অংশ হবে ঃ

(১৩৯-ক) মাতা ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{৩}{১৮}$

কন্যা ---------- $\frac{৫}{৬}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{৫}{১৮}$

পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{৫}{৬}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{৫}{৯} = \frac{৫}{১৮}$ (পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে)

পূর্ণ বোন ---------- --- (বঞ্চিত)

(১৪০) স্বামী ---------- $\frac{১}{৪}$ (অংশীদার হিসেবে)

কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

পুত্রের কন্যা -------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{১২}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে উদাহরণ (১৪০)-এ উল্লিখিত ব্যক্তিদের অংশ হবে ঃ

(১৪০-ক) স্বামী ---------- $\frac{১}{৪}$ (অংশীদার হিসেবে)

কন্যা ---------- $\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{১}{৪}$

পুত্রের কন্যা -------- $\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{১}{২} = \frac{২}{৪}$ (পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে)

পূর্ণ বোন ---------- (বঞ্চিত)

(১৪১) স্বামী ---------- $\frac{১}{৪}$ (অংশীদার হিসেবে) = $\frac{৩}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{৩}{১৩}$

মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে) = $\frac{২}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{২}{১৩}$

কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে) = $\frac{৬}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{৬}{১৩}$

পুত্রের কন্যা -------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে) = $\frac{২}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{২}{১৩}$

পূর্ণ বোন ---------- (বঞ্চিত) ১

টীকা ঃ এক্ষেত্রে পূর্ণ বোন কেবল অবশিষ্টভোগী হতে পারেন, কারণ কন্যা ও পুত্রের কন্যা বর্তমান। অংশীদারদের প্রাপ্য অংশ প্রদানের পর ত্যক্ত বিত্ত অবশিষ্ট থাকলে তবেই অবশিষ্টভোগীদের অংশ দেয়ার প্রশ্ন উঠে। প্রদত্ত উদাহরণে কোরানিক অংশ প্রদানের পর ত্যক্ত বিত্ত শুধু নিঃশেষিতই হয়নি প্রদত্ত অংশগুলোর সমষ্টি সমস্ত বা ১-এর অধিক হয়েছে, তাই পূর্ণ বোন বঞ্চিত হয়েছেন ও অংশীদারদের প্রাপ্য অংশ হ্রাস করা হয়েছে।

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে উদাহরণ (১৪১)-এ উল্লেখিত ব্যক্তিদের অংশ হবে ঃ

(১৪১-ক) স্বামী ---------- $\frac{১}{৪} = \frac{৯}{৩৬}$

মাতা ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{৬}{৩৬}$

কন্যা ---------- $\frac{৭}{১২}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{৭}{৩৬}$

পুত্রের কন্যা -------- $\frac{৭}{১২}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{১৪}{৩৬}$ (পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে)

পূর্ণ বোন ---------- (বঞ্চিত)

**(৭) বৈমাত্রেয় ভাই (Consanguing brother) ঃ** বৈমাত্রেয় ভাই বর্তমানে বৈমাত্রেয় বোন অবশিষ্টভোগী হন; ভাই বোনের দ্বিগুণ অংশ পেয়ে থাকেন। বৈমাত্রেয় ভাই পিতা (অবর্তমানে সত্য পিতামহ), পুত্র, পুত্রের পুত্র অথবা পূর্ণ ভাই বর্তমানে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন।

**(৮) বৈমাত্রেয় বোন (Consanguing sister) ঃ** বৈমাত্রেয় বোন পিতা (অবর্তমানে সত্য পিতামহ), পুত্র, পুত্রের পুত্র, যত অধস্তন হোক, পূর্ণ ভাই অথবা, একাধিক পুর্ণ বোন বর্তমানে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন।

(৯) পূর্ণ বোন অবর্তমানে বৈমাত্রেয় বোন একজন হলে ত্যক্ত বিত্তের $\frac{১}{২}$ অংশ ও একাধিক হলে সমবেতভাবে $\frac{২}{৩}$ অংশ পেয়ে থাকেন।

(খ) বৈমাত্রেয় বোন পূর্ণ বোনের অনুরূপ নিম্নলিখিত যে কোন শ্রেণীর উত্তরাধিকারী হতে পারেন (১) অংশীদার, (২) বৈমাত্রেয় ভাই বর্তমানে অবশিষ্টভোগী, (৩) কন্যা বা পুত্রের কন্যা, যত অধস্তন হোক, বর্তমানে অবশিষ্টভোগী। তিনি অংশীদার অথবা অবশিষ্টভোগী হতে পারেন কিন্তু কোন অবস্থাতেই উভয় শ্রেণীভুক্ত হন না।

(গ) একজন পূর্ণ বোন বর্তমানে বৈমাত্রেয় বোন অন্যভাবে বঞ্চিত না হলে ত্যক্ত বিত্তের $\frac{১}{৬}$ অংশের অধিকারী হন। এটি æFull blood excludes the consanguineous of the same order and degree"- এ নীতির একটি ব্যতিক্রম।

(ঘ) একাধিক পূর্ণ বোন বর্তমানে বৈমাত্রেয় বোন সম্পূর্ণ বঞ্চিত হলেও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সঙ্গে বৈমাত্রেয় বোন একাধিক পূর্ণ বোন বর্তমানেও অবশিষ্টভোগী হতে পারেন। এক্ষেত্রে ভাই বোনের দ্বিগুণ অংশের অধিকারী হন। পূর্ণ বোনের সংখ্যা এক বা একাধিক যাই হোক না কেন পূর্ণ বোন ও বৈমাত্রেয় বোনের সমবেত অংশ কোনক্রমেই $\frac{২}{৩}$ -এর অধিক হবে না। ফলে একজন পূর্ণ বোন বর্তমানে বৈমাত্রেয় বোন (বা বোনেরা) পাচ্ছেন $\frac{২}{৩} - \frac{১}{২} = \frac{১}{৬}$ অংশ; একাধিক পূর্ণ বোন বর্তমানে বৈমাত্রেয় বোন পাচ্ছেন $\frac{২}{৩} - \frac{২}{৩} = ০$।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বৈপিত্রেয় ভাইও (বা বোন) পিতা, সত্য পিতামহ, পুত্র অথবা পুত্রের সন্তান, (পুত্র অথবা, কন্যা) যত অধস্তন হোক বর্তমানে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন।

(১৪২) পিতা ---------- (সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী)

এক ভাই (পূর্ণ, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয়
এক বোন (পূণ, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় } পিতা বর্তমানে বঞ্চিত

(১৪৩) বিধবা ---------- $\frac{১}{৮} = \frac{৩}{২৪}$ (কারণ সন্তান বর্তমান)

পুত্র ---------- $\frac{৭}{৮}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{১৪}{২৪}$

কন্যা ---------- $\frac{৭}{৮}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{৭}{২৪}$

পুত্রের ভাই ---------
পূর্ণ বোন ---------- } পুত্র বর্তমানে বঞ্চিত

(১৪৪) মাতা ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{৩}{১৮}$ (অংশীদার হিসেবে)

পুত্রের পুত্র ---------- $\frac{৫}{৬}$ এর $\frac{২}{৩}$ $= \frac{১০}{১৮}$

পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{৫}{৬}$ এর $\frac{১}{৩}$ $= \frac{৫}{১৮}$

পূর্ণ ভাই ---------- ---
পূর্ণ বোন ---------- --- } পুত্রের পুত্র বর্তমানে বঞ্চিত

(১৪৫) পিতা (বা সত্য পিতামহ) ------- (সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী)

ভাই (পূর্ণ, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয়)
বোন (পূর্ণ, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয়) } পিতা (বা সত্য পিতামহ) বর্তমানে বঞ্চিত

(১৪৬) স্বামী ---------- $\frac{১}{৪}$ (কারণ পুত্র ও কন্যা বর্তমান)

পুত্র ---------- $\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{১}{২} = \frac{২}{৪}$
কন্যা ---------- $\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{৩} =$ $\frac{১}{৪}$ } অবশিষ্টভোগী হিসেবে

বৈমাত্রেয় ভাই ------- ---
বৈমাত্রেয় বোন ------ --- } পুত্র বর্তমানে বঞ্চিত

(১৪৭) স্ত্রী ---------- $\frac{১}{৮}$ $= \frac{৩}{২৪}$ (কারণ পুত্রের সন্তান বর্তমান)

পুত্রের পুত্র ---------- $\frac{৭}{৮}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{১৪}{২৪}$
পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{৭}{৮}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{৭}{২৪}$ } অবশিষ্টভোগী হিসেবে

বৈমাত্রেয় ভাই ------- ---
বৈমাত্রেয় বোন ------ --- } পুত্রের পুত্র বর্তমানে বঞ্চিত

(১৪৮) পূর্ণ ভাই ---------- $\frac{২}{৩}$

পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{৩}$

বৈমাত্রেয় বোন --------- (পূর্ণ ভাই বর্তমানে বঞ্চিত)

(১৪৯) দুজন পূর্ণ বোন --------- (সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী)

বৈমাত্রেয় বোন --------- (দুজন পূর্ণ বোন বর্তমানে বঞ্চিত)

(১৫০) পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

বৈমাত্রেয় বোন --------- $\frac{১}{৬}$ (কারণ একজন পূর্ণ বোন বর্তমান)

মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

ভায়ের পুত্র ---------- $\frac{১}{৬}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

(১৫১) মাতা ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{৩}{১৮}$ (কারণ ভাই ও বোন বর্তমান)

দুজন পূর্ণ বোন -------- $\frac{২}{৩} = \frac{১২}{১৮}$

বৈমাত্রেয় ভাই --------- $\frac{১}{৬}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{২}{১৮}$

বৈমাত্রেয় বোন -------- $\frac{১}{৬}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{১}{১৮}$

} অবশিষ্টভোগী হিসেবে

টীকা ঃ এক্ষেত্রে বৈমাত্রেয় ভাই বর্তমান রয়েছে বিধায় দুজন পূর্ণ বোন থাকা সত্ত্বেও বৈমাত্রেয় বোন বঞ্চিত না হয়ে বৈমাত্রেয় ভায়ের সঙ্গে অবশিষ্টভোগী হচ্ছেন।

(১৫২) পুত্রের পুত্র ---------- $\frac{২}{৩}$

পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{৩}$

} অবশিষ্টভোগী হিসেবে

পূর্ণ ভাই
পূর্ণ বোন
বৈমাত্রেয় ভাই
বৈমাত্রেয় বোন

} পুত্রের পুত্র বর্তমান বঞ্চিত

বৈমাত্রেয় বোন, কন্যা ও পুত্রের কন্যা ঃ

(১৫৩) কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

বৈমাত্রেয় বোন ------ $\frac{১}{২}$ (অবশিষ্টভোগী হিসাবে)

পূর্ণ ভায়ের পত্র ------ (নিকটতর অবশিষ্টভোগী বৈমাত্রেয় বোন অবর্তমানে বঞ্চিত)

টীকা ঃ এক্ষেত্রে কন্যা বর্তমান বিধায় বৈমাত্রেয় বোন অংশীদারের শ্রেণীভুক্ত হচ্ছেন না। বৈমাত্রেয় ভাই বিদ্যমান বৈমাত্রেয় বোন অবশিষ্টভোগী হতে পারেন, কিন্তু এক্ষেত্রে বৈমাত্রেয় ভাই বর্তমান নেই। তাই তিনি কন্যার সঙ্গে অবশিষ্টভোগী হচ্ছেন। সাধারণ মুসলিম আইনে পুত্রের কন্যা বর্তমানেও তিনি অবশিষ্টভোগী হবেন [উদাহরণ (১৫৪) দ্রষ্টব্য; অন্যথায় ভাইয়ের পুত্র অধিক দূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও অগ্রাধিকার পেয়ে যাবেন এবং তা হবে মুসলিম আইনের নীতিবিরোধী।

(১৫৪) পুত্রের কন্যা, যত

অধস্তন হোক ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

বৈমাত্রেয় বোন --------- $\frac{১}{২}$ (অবশিষ্টভোগী হিসাবে)

পূর্ণ ভাইয়ের পত্র ------- (নিকটতর অবশিষ্টভোগী বৈমাত্রেয় বোন অবর্তমানে বঞ্চিত)

টীকা ঃ মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে পুত্রের কন্যা পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী ও বৈমাত্রেয় বোন এবং ভাইয়ের পুত্র সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবেন। অবশ্য অধস্তন পুত্রের কন্যা বর্তমানে সাধারণ মুসলিম আইন প্রযোজ্য, কারণ মুসলিম পারিবারিক আইনে প্রতিনিধিত্বের বিধান সন্তানের সন্তান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

(১৫৫) দুই কন্যা ---------- $\frac{২}{৩}$ (অংশীদার হিসেবে)

বৈমাত্রেয় বোন --------- $\frac{১}{৩}$ (অবশিষ্টভোগী হিসাবে)

(১৫৬) মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

বৈমাত্রেয় বোন --------- $\frac{১}{৩}$ (অবশিষ্টভোগী হিসাবে)

(১৫৭) দুই কন্যা (বা পুত্রের

কন্যা, যত অধস্তন হোক) ---------- $\frac{২}{৩}$ (অংশীদার হিসেবে)

বৈমাত্রেয় বোন ---------- $\frac{১}{৩}$ (অবশিষ্টভোগী হিসাবে)

টীকা ঃ মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে এক্ষেত্রে কন্যার পরিবর্তে পুত্রের কন্যা বর্তমান থাকলে তিনি পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হবেন।

(১৫৮) দুই কন্যা ----------$\frac{২}{৩}$ (অংশীদার হিসেবে)

স্বামী ---------- $\frac{১}{৪}$ (অংশীদার হিসেবে)

বৈমাত্রেয় বোন ---------- $\frac{১}{১২}$ (অবশিষ্টভোগী হিসাবে)

পিতার পিতৃব্যের পুত্র ------- (নিকটতর অবশিষ্টভোগী বৈমাত্রেয়
(Father's paternal বোন বর্তমানে বঞ্চিত)
uncle's son) মেহেরজান বনাম শাজাদী

(১৫৯) কন্যা ----------$\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

বৈমাত্রেয় বোন ---------- $\frac{১}{৩}$ (অবশিষ্টভোগী হিসাবে)

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে উদাহরণ (১৫৯)-এ উল্লিখিত ব্যক্তিদের অংশ হবে ঃ

(১৫৯-ক) কন্যা ---------- $\frac{১}{৩}$

পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{২}{৩}$ (পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে)

বৈমাত্রেয় বোন ---------- (বঞ্চিত)

(১৬০) মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

বৈমাত্রেয় বোন ---------- $\frac{১}{৬}$ (অবশিষ্টভোগী হিসাবে)

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে উদাহরণ (১৬০)-এ উল্লিখিত ব্যক্তিদের অংশ হবে ঃ

(১৬০-ক) মাতা ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{৩}{১৮}$

কন্যা ---------- $\frac{৫}{৬}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{৫}{১৮}$

পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{৫}{৬}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{১০}{১৮}$ (পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে)

বৈমাত্রেয় বোন ---------- --- (বঞ্চিত)

(১৬১) স্বামী ---------- $\frac{১}{৪} = \frac{৩}{১২}$ (অংশীদার হিসেবে)

কন্যা ---------- $\frac{১}{২} = \frac{৬}{১২}$ (অংশীদার হিসেবে)

পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{২}{১২}$ (অংশীদার হিসেবে)

বৈমাত্রেয় বোন ---------- $\frac{১}{১২} = \frac{১}{১২}$ (অবশিষ্টভোগী হিসাবে)

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে উদাহরণ (১৬১)-এ উল্লিখিত ব্যক্তিদের অংশ হবে ঃ

(১৬১-ক) স্বামী ---------- $\frac{১}{৪}$ (অংশীদার হিসেবে)

কন্যা ---------- $\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{১}{৪}$

পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{২}{৪}$ (পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে)

বৈমাত্রেয় বোন ---------- (বঞ্চিত)

(১৬২) স্বামী ---------- $\frac{১}{৪} = \frac{৩}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{৩}{১৩}$

মাতা ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{২}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{২}{১৩}$

কন্যা ---------- $\frac{১}{২} = \frac{৬}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{৬}{১৩}$

পুত্রের কন্যা --------- $\frac{১}{৬} = \frac{২}{১২}$ হ্রাস করে $\frac{২}{১৩}$

বৈমাত্রেয় বোন ------- (বঞ্চিত) ১

টীকা ঃ এক্ষেত্রে কন্যা ও পুত্রের কন্যা বর্তমান বিধায় বৈমাত্রেয় বোন কেবল অবশিষ্টভোগী হতে পারেন। অংশীদারের প্রাপ্য অংশ প্রদানের পর কোন সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকলে তবেই অবশিষ্টভোগীদের দাবির প্রশ্ন উঠে। বর্তমান ক্ষেত্রে কোরানিক অংশ বণ্টন করতেই ত্যক্ত বিত্ত শুধু নিঃশেষিত হয়নি কোরানিক অংশের সমষ্টি সমস্ত বা ১-এর অধিক হয়েছে। তাই বৈমাত্রেয় বোন বঞ্চিত হয়েছেন এবং অংশীদারের প্রাপ্য অংশ আনুপাতিক হারে হ্রাস করা হয়েছে।

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে উদাহরণ (১৬২)-এ উল্লিখিত ব্যক্তিদের অংশ হবে ঃ

(১৬২-ক) স্বামী ---------- $\frac{১}{৪} = \frac{৯}{৩৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

মাতা ---------- $\frac{১}{৬} = \frac{৬}{৩৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

কন্যা ---------- $\frac{৭}{১২}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{৭}{৩৬}$

পুত্রের কন্যা ------- $\frac{৭}{১২}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{১৪}{৩৬}$ (পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে)

বৈমাত্রেয় বোন ------- (বঞ্চিত)

**অন্যান্য অবশিষ্টভোগী (Other Residuaries)**

**(৯) পূর্ণ ভায়ের পুত্র (Full brother's son)**

**(১০) বৈমাত্রেয় ভায়ের পুত্র (Consanguine brother's son)**

**(১১) পূর্ণ ভায়ের পুত্রের পুত্র (Full brother's son)**

**(১২) বৈমাত্রেয় ভায়ের পুত্রের পুত্র (Consanguine brother's son's son)**

**অতঃপর আসেন ১১ নম্বর ও ১২ নম্বরের দূরবর্তী পুরুষ উত্তরসূরিগণ [অবশিষ্টভোগীদের তালিকা দ্রষ্টব্য]।**

**প্রকৃত পিতামহের (True grandfather h.h.s.). যত ঊর্ধ্বতন হোক, বংশধরগণ ঃ**

**(১৩) পিতার পূর্ণ ভাই (Full paternal uncle)**

**(১৪) পিতার বৈমাত্রেয় ভাই (Consanguine paternal uncle)**

**(১৫) পিতার পূর্ণ ভায়ের পুত্র (Full parternal uncle's son)**

**(১৬) পিতার বৈমাত্রেয় ভায়ের পুত্র (Consanguine paternal uncle's son)**

**(১৭) পিতার পূর্ণ ভায়ের পুত্রের পুত্র (Full paternal uncle's son's son)**

**(১৮) পিতার বৈমাত্রেয় ভায়ের পুত্রের পুত্র (Consanguine paternal uncle's son's son)**

অতঃপর আসেন ১৭ নম্বর ও ১৮ নম্বরের দূরবর্তী পুরুষ উত্তরসূরিগণ [অবশিষ্টভোগীদের তালিকা দ্রষ্টব্য]।

(১৬৩) পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

বৈমাত্রেয় বোন --------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

ভায়ের পুত্র ---------- $\frac{১}{৬}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

টীকা ঃ মুসলিম আইন অনুসারে বোন অবশিষ্টভোগী হলে ভায়ের পুত্র বঞ্চিত হবেন, কারণ প্রথমোক্ত ব্যক্তি নিকটতর অবশিষ্টভোগী। এক্ষেত্রে বোন অবশিষ্টভোগী হতে পারছেন না কারণ ভাই, কন্যা বা পুত্রের কন্যা বর্তমান নেই। সুতরাং ভায়ের পুত্র অবশিষ্টভোগী হিসেবে ত্যক্ত বিত্তের অবশিষ্ট $\frac{১}{৬}$ অংশ পাচ্ছেন।

(১৬৪) পূর্ণ বোন ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

পিতার পূর্ণ ভায়ের পুত্রগণ ------ $\frac{১}{২}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

টীকা ঃ এক্ষেত্রেও পূর্ণ বোন অবশিষ্টভোগী হন নি বিধায় পিতার পূর্ণ ভায়ের পুত্রগণ অবশিষ্টভোগী হিসেবে সম্পত্তি পাচ্ছেন। এখানে পিতার পুর্ণ ভায়ের পুত্রের পরিবর্তে পিতার পিতার পূর্ণ ভায়ের পুত্রের পুত্র অথবা পিতার বৈমাত্রেয় ভায়ের পুত্র অথবা পিতার বৈমাত্রেয় ভায়ের পুত্রের পুত্র বর্তমান থাকলেও তিনি অবশিষ্টভোগী হিসেবে ত্যক্ত বিত্তের $\frac{১}{২}$ অংশের অধিকারী হতেন।

(১৬৫) বিধবা ---------- $\frac{১}{৪} = \frac{৩}{১২}$ (অংশীদার হিসেবে)

মাতা ---------- $\frac{১}{৩} = \frac{৪}{১২}$ (অংশীদার হিসেবে)

পিতার পূর্ণ

(বা বৈমাত্রেয়) ভাই --- $\frac{৫}{১২}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

(১৬৬) স্বামী ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

পিতার পূর্ণ ভাই -------- $\frac{১}{২}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

পিতার বৈমাত্রেয় ভাই --- --- (পিতার পূর্ণ ভাই বর্তমানে বঞ্চিত)

টীকা ঃ স্বামী বা স্ত্রী কখনো অবশিষ্টভোগী হন না, একমাত্র উত্তরাধিকারী না হলে তারা আগমেরও অধিকারী নন। পিতার বৈমাত্রেয় ভাই পিতার পূর্ণ ভাই বর্তমানে বঞ্চিত হবেন কারণ æFull blood excludes the consanguineous of the same order and degree"

(১৬৭) স্ত্রী ---------- $\frac{১}{৪}$ (অংশীদার হিসেবে)

পিতার বৈমাত্রেয় ভায়ের

পুত্রের পুত্র ---------- $\frac{৩}{৪}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

পিতার পূর্ণ ভায়ের

পুত্রের পুত্রের পুত্র ---------- --- (নিকটতর অবশিষ্টভোগী পিতার বৈমাত্রেয় ভায়ের

পুত্রের পুত্র বর্তমানে বঞ্চিত)

(১৬৮) মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

সত্য পিতামহী (মাতৃকুলের) ------ -- (মাত বর্তমানে বঞ্চিত)

পূর্ণ ভাই ---------- $\frac{৫}{৬}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

বৈমাত্রেয় ভাই ---------- --- (পূর্ণ ভাই বর্তমানে বঞ্চিত) কারণ æFull blood

excludes the consanguineous of the same order and degree"

(১৬৯) মাতা ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

বৈপিত্রেয় ভাই ---------- $\frac{১}{৬}$ (অংশীদার হিসেবে)

পূর্ণ ভাই ---------- $\frac{২}{৩} = \frac{৪}{৬}$ (অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

বৈমাত্রেয় ভাই ---------- (পূর্ণ ভাই বর্তমানে বঞ্চিত)

টীকা ঃ অংশীদার ও অবশিষ্টভোগীদের তালিকা ও উপরে প্রদত্ত উদাহরণমালার সঙ্গে প্রদত্ত ব্যাখ্যা থেকেই আলোচ্য বিষয়টির সম্যক উপলব্ধি সম্ভব বিধায় এখানে আর অধিক উদাহরণ দেয়া থেকে বিরত থাকা হলো।

**সংক্ষিপ্তবৃত্তি (Recapitulation) ঃ** উত্তরাধিকারের নীতিমালা সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন বিধায় এর সারমর্ম নিচে প্রদত্ত হলো ঃ

(১) ছজন প্রাথমিক উত্তরাধিকারী কোন অবস্থাতেই সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন না। এদের অবর্তমানে বিকল্পগণ এদের স্থলাভিষিক্ত হন। বিকল্পগণ প্রাথমিক উত্তরাধিকারী ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তি বর্তমানে বঞ্চিত হন না। এ নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম হলো একটি মাত্র কন্যা বর্তমানে পুত্রের কন্যা তার সঙ্গে যুগপৎ উত্তরাধিকারী হয়ে থাকেন। ছজন প্রাথমিক উত্তরাধিকারীর মধ্যে স্বামী বা স্ত্রী কোন বিকল্প নেই। বাকী চারজন ও তাদের বিকল্প হচ্ছে ঃ

প্রাথমিক উত্তরাধিকারী ঃ

(১) পিতা (২) মাতা (৩) পুত্র (৪) কন্যা

বিকল্প (Substitute) ঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| (১) সত্য পিতামহ, যত ঊর্ধ্বতন হোক। | (২) সত্য পিতামহী, (পিতৃ অথবা মাতৃকুলের) যত ঊর্ধ্বতন হোক। | (৩) পুত্রের পুত্র, যত অধস্তন হোক। | (৪) পুত্রের কন্যা, যত অধস্তন হোক। |

(২) কোন ব্যক্তি জীবিত থাকা পর্যন্ত তার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্য কেউ ত্যক্ত বিত্তের উত্তরাধিকারী হবেন না, যথা, পিতা বর্তমানে পিতার পিতা, ভাই (পূর্ণ, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয়) বা বোন (পূর্ণ, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয়) ত্যক্ত বিত্তের উত্তরাধিকারী নন। এ নিয়মের একটি ব্যতিক্রম হলো বৈপিত্রের ভাই বা বোন মা'র মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েও তারা মা বর্তমানে বঞ্চিত হয় না।

(৩) একই শ্রেণীভুক্ত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে নিকটতর অধিক দূরবর্তীকে বঞ্চিত করে। অবশ্য প্রাথমিক উত্তরাধিকারী কর্তৃক বঞ্চিত ব্যক্তি তার বিকল্প (এরূপ বিকল্প অধিক দূরবর্তী হলেও) বর্তমানেও বঞ্চিত হবেন। যথা-পুত্রের পুত্র, যত অধস্তন হোক (অধস্তন পুত্রের পুত্র) বহু দূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও নিকটতর অবশিষ্টভোগী ভাইকে বঞ্চিত করেন।

(৪) অভিন্ন ক্রম ও পর্যায়ভুক্ত হলে পূর্ণ রক্তের সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ অর্থ রক্তের সম্পর্কীয়দের তুলনায় অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন, যথা-পূর্ণ ভাই বর্তমানে বৈমাত্রেয় ভাই বঞ্চিত হন। এ নিয়মের একটি ব্যতিক্রম হলো একটি মাত্র পূর্ণ বোন বর্তমানে বৈমাত্রেয় বোন (বা বোনেরা) বঞ্চিত না হয়ে $\frac{১}{৬}$ অংশের অধিকারী হন।

(৫) অভিন্ন ক্রম ও পর্যায়ভুক্ত পুরুষ ও মহিলা যুগপৎ উত্তরাধিকারী হলে পুরুষ মহিলার দ্বিগুণ অংশ পেয়ে থাকেন।

(৬) কোন উত্তরাধিকারী নিজে বঞ্চিত হয়েও অন্যকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বঞ্চিত করতে পারেন।

(৭) বারজন অংশীদার বা কোরানিক উত্তরাধিকারীর মধ্যে পাঁচজন কোন অবস্থাতেই অবশিষ্টভোগীর শ্রেণীভুক্ত হন না। এরা হচ্ছেন ঃ (১) স্বামী, (২) স্ত্রী, (৩) সত্য পিতামহী, (৪) বৈপিত্রেয় ভাই ও (৫) বৈপিত্রেয় বোন, বাকী ছজন ক্ষেত্রবিশেষে অংশীদার বা অবশিষ্টভোগী হয়ে থাকেন। এরা হচ্ছেন (১) পিতা, (২) সত্য পিতামহ, (৩) কন্যা, (৪) পুত্রের কন্যা, (৫) পূর্ণ বোন ও (৬) বৈমাত্রেয় বোন। মাতার বিষয়টি অনেকটা ভিন্নধর্মী। সাধারণভাবে অংশীদারের শ্রেণীভুক্ত হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে তাকে পিতার সঙ্গে অবশিষ্টভোগীর পর্যায়ভুক্ত গণ্য করা চলে এবং এসব ক্ষেত্রে পিতা মাতার দ্বিগুণ অংশ পেয়ে থাকেন। (এ, সি, ঘোষ, এ্যাংলো মোহামেডান ল', ১০৫)

(১) মাতা ---------- $\frac{১}{৩}$ (কারণ কোন সন্তান নেই)

পিতা ---------- $\frac{২}{৩}$ [অবশিষ্টভোগী হিসেবে (লক্ষণীয়, তিনি মাতার দ্বিগুণ অংশ পাচ্ছেন]

(২) স্বামী ---------- $\frac{১}{২}$

মাতা ---------- $\frac{১}{২}$ এর $\frac{১}{৩}$ = $\frac{১}{৬}$

পিতা ---------- $\frac{১}{৩}$ [অবশিষ্টভোগী হিসেবে; এক্ষেত্রেও পিতার মাতার দ্বিগুণ অংশ পাচ্ছেন]

(৩) স্ত্রী ---------- $\frac{১}{৪}$

মাতা ---------- $\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{৩}$ = $\frac{১}{৪}$

পিতা ---------- $\frac{২}{৪}$ (অবশিষ্টভোগী হিসাবে; এক্ষেত্রেও পিতা, মাতার দ্বিগুণ অংশ পাচ্ছেন)

(৮) মুসলিম পারিবারিক আইন প্রযোজ্য হলে পূর্ব-মৃত পুত্র বা কন্যা জীবিত থাকলে যে অংশ পেতেন তাদের সন্তানগণও (পুত্র বা কন্যা) অনুরূপ অংশের অধিকারী হবেন।

**আল জাবারী সূত্র ঃ** আল জাবারী সূত্র অনুসরণই হচ্ছে উত্তরাধিকারীদের অগ্রাধিকার নির্ণয়ের সহজতম পন্থা। এ সূত্র অনুসারে অগ্রাধিকার নিম্নলিখিতভাবে নিরূপিত হয়ে থাকে ঃ

(ক) প্রথমে ক্রম (order) তারপর;

(খ) পর্যায় (degree) ও সবশেষে;

(গ) রক্তের সম্পর্ক (blood tie);

**(ক) প্রথমে ক্রম (order) ঃ** পিতা ও পুত্র উভয়ই মৃত ব্যক্তি থেকে সমদূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও পুত্র অধস্তন পুরুষের ক্রম ভুক্ত বিধায় অবশিষ্টভোগী হিসেবে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। সেজন্য পুত্র পিতাকে বঞ্চিত করেন এবং পুত্র বর্তমানে পিতা অংশীদার হিসাবে ত্যক্ত বিত্তের $\frac{১}{৬}$ অংশের অধিকারী হয়। ক্রমাণুসারে প্রথমে আসে অধস্তন পুরুষগণ ,অতঃপর ঊর্ধ্বতন পুরুষগণ ও সর্বশেষে আসে জ্ঞাতিগণ । এ থেকে অবশিষ্টভোগীদের উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় প্রাক-ইসলামী গোত্রীয় আইন ও হানাফী আইনের মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।

**(খ) পর্যায় (Degree) ঃ** প্রতিনিধিত্বের বিধান হানাফী আইনে স্বীকৃত নয়; নিকতর কঠোরভাবে দূরবর্তীকে বঞ্চিত করে। কোন হানাফী মুসলিম 'ম' এক পুত্র ও এক পূর্ব-মৃত পুত্রের পুত্র (পৌত্র) রেখে মারা গেলে পুত্র সমস্ত ত্যক্ত বিত্তের অধিকারী ও পূর্ব-মৃত পুত্রের পুত্র সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে। এ বিষয়ে হানাফী (সুন্নী) ও ইসনা আসারিগণ (শিয়া) সম্পূর্ণ একমত।

অনুরূপভাবে ঊর্ধ্বতন লাইনে পিতা বর্তমানে পিতার পিতা ও পিতার ভাই বর্তমানে পিতার ভায়ের পুত্র সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

**এরূপ বঞ্চনার সমর্থনে সিরাজিয়ায় বলা হয়েছে ঃ** "অন্যের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তি উক্ত মধ্যবর্তী ব্যক্তি জীবিত থাকা পর্যন্ত ত্যক্ত বিত্তের অধিকারী হবেন না" এটিই হচ্ছে বঞ্চনার সাধারণ নীতি। এর ফলে পুত্র বর্তমানে তার নিজ পুত্র ও পিতা বর্তমানে সর্ব প্রকার ভাই ও বোন বঞ্চিত হয়। এ নিয়মের একটি ব্যতিক্রম রয়েছে এবং তা হলো বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন মাতার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া সত্ত্বেও তারা মাতা বর্তমানে বঞ্চিত হয় না।

**সিরাজিয়ায় এ সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে ঃ** "সবচেয়ে নিকটতম রক্তের সম্পর্কীয় ব্যক্তি ত্যক্ত বিত্তের উত্তরাধিকারী হয়"। 'ম' নিচের অনুচিত্র অনুযায়ী এক পুত্র, 'ক' ও এক পূর্ব-মৃত পুত্রের পুত্র, 'গ' কে রেখে মারা যান ঃ

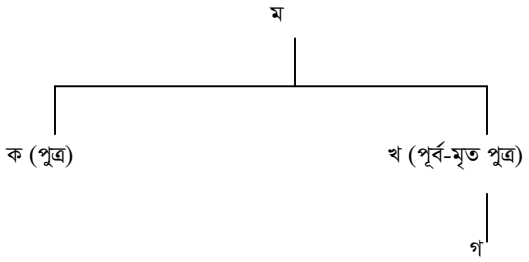


সমস্ত সুন্নী মযহাব এবং শিয়া আইন অনুসারে 'ক' বর্তমানে 'গ' সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবেন।

উল্লেখ্য যে, মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে এবং ত্যক্ত বিত্তের $\frac{১}{২}$ অংশের পাবেন 'ক' ও অবশিষ্ট $\frac{১}{২}$ অংশ পাবেন 'গ'। [এ পুস্তকের পরিশিষ্টে মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ দ্রষ্টব্য]।

**(গ) রক্তের সম্পর্ক (Blook tie) ঃ** ক্রম ও পর্যায় অভিন্ন হলে পূর্ণ রক্তের সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ অগ্রাধিকার পাবে, এর ফলে পূর্ণ ভাই বর্তমানে বৈমাত্রেয় ভাই বঞ্চিত হয় এবং বৈমাত্রেয় ভাই পূর্ণ ভায়ের পুত্রকে বঞ্চিত করে। নীতিটি যে হাদিসের ভিত্তিতে উপর প্রতিষ্ঠিত তা হলো "একই পিতা-মাতার সন্তান অবশ্যই একই পিতার সন্তানের তুলনায় অগ্রাধিকার পাবে" এ নিয়মের একটি ব্যতিক্রম রয়েছে এবং তা হলো একটি মাত্র পূর্ণ বোন বর্তমানে বৈমাত্রেয় বোন (বানেরা) সম্পূর্ণ বঞ্চিত না হয়ে ত্যক্ত বিত্তের $\frac{১}{৬}$ অংশের অধিকারী হয়।

**প্রাথমিক উত্তরাধিকারী ঃ অংশীদার ও অবশিষ্টভোগী সংক্রান্ত নীতিমালা হলো ঃ** (১) অংশীদার অবর্তমানে অথবা কোরানিক অংশ প্রদানের পর ত্যক্ত বিত্তের কোন কিছু অবশিষ্ট থাকলে তবেই অবশিষ্টভোগীদের দাবির প্রশ্ন উঠবে। (২) চারজন ব্যতিত সমস্ত অবশিষ্টভোগী হচ্ছেন পুরুষ, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহের চারজন মহিলা অন্যের দাবিতে (আসবাত বেগায়রিহি) এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন, যথা- (ক) পুত্র বর্তমানে কন্যা, (খ) পুত্রে পুত্র, যত অধস্তন হোক, বর্তমানে সমপর্যায়ের পুত্রের কন্যা, (গ) পূর্ণ ভাই বর্তমানে পূর্ণ বোন ও (ঘ) বৈমাত্রেয় ভাই বর্তমানে বৈমাত্রেয় বোন। (৩) পূর্ণ বোন ও বৈমাত্রেয় বোন কোন কোন সময় অন্যের সঙ্গেও এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন (আসাবাত মা'-গায়রিহি)। বিষয়টি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে বিধায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সমস্ত স্কুল অনুসারেই (১) স্বামী, (২) স্ত্রী, (৩) পিতা, (৪) মাতা, (৫) পুত্র ও (৬) কন্যা হচ্ছেন প্রাথমিক উত্তরাধিকারী। এরা অন্যকে বঞ্চিত করেন; কিন্তু কখনও বঞ্চিত হন না।

প্রাথমিক উত্তরাধিকারীদের অধিকার সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃবৈবাহিক সূত্রে একমাত্র উত্তরাধিকারী হচ্ছেন স্বামী ও স্ত্রী। প্রাক ইসলাম যুগে তারা পরস্পরের উত্তরাধিকারী ছিলেন না; ইসলামের অভ্যুদয়ের পর তারা অংশীদারের শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন। তাদের অংশ সুনির্দিষ্ট এবং তারা কখনও আগমের অধিকার হন না। তবে শরিয়তের এ বিধান এ উপমহাদেশে শিথিল করা হয়েছে। এখানে স্বামী বা স্ত্রী একমাত্র উত্তরাধিকারী হলে সমস্ত ত্যক্ত বিত্তের অধিকারী হন।

পুত্র অবশিষ্টভোগী বা এ্যাগনেটিক উত্তরাধিকারী হিসেবে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। অংশীদারের কোরানিক অংশ এরূপ নৈপুণ্যের সঙ্গে স্থির করা হয়েছে যে পুত্র কোন অবস্থাতেই বঞ্চিত হন না। কন্যার অবস্থাও অনুরূপ। তিনিও কোন অবস্থাতেই বঞ্চিত হন না। কন্যা অংশীদার হিসেবে নির্দিষ্ট কোরানিক অংশের অধিকারী হন অথবা পুত্র বর্তমানে তিনি তার সঙ্গে অবশিষ্টভোগী হয়ে যান। এরূপ ক্ষেত্রে পুত্র কন্যার দ্বিগুণ অংশ পেয়ে থাকেন। অতঃপর আসেন পিতা ও মাতা। মাতার বিষয়টি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তিনি সব সময় অংশীদার হিসেবে কোরানিক অংশ পান। তবে কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে তাকে বস্তুত: অবশিষ্টভোগী পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা চলে [উপরে সংক্ষিপ্তবৃত্তি দ্রষ্টব্য]। পুত্র বা কন্যা অবর্তমানে কিংবা শুধু এক ভাই বা এক বোন বর্তমানে তিনি বর্ধিত অংশের অধিকারী হন।

পিতার বিষয়টি অনেকটা ভিন্নধর্মী বিধায় তা সংক্ষেপে নীচে পুনরালোচিত হলো ঃ

**প্রথমত ঃ** পিতা ও পুত্র উভয়ই বর্তমানে পুত্র qua descendant পিতার তুলনায় অগ্রাধিকার পান। সেজন্য কোরানে তার জন্য একটি নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দ করা হয়েছে; তিনি পান $\frac{১}{৬}$ অংশ বাকি $\frac{৫}{৬}$ অংশ পান পুত্র।

**দ্বিতীয়ত ঃ** এরূপ হতে পারে যে, মৃত ব্যক্তির কোন সন্তানাদি নেই শুধু পিতা ও মাতা জীবিত রয়েছেন। প্রাক-ইসলামী আইনে এরূপ ক্ষেত্রে মাতা বঞ্চিত ও পিতা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হতেন। ইসলামী আইনে এরূপ ক্ষেত্রে মাতা পান $\frac{১}{৩}$ অংশ বাকি $\frac{২}{৩}$ অংশ পিতা পেয়ে থাকেন। সন্তানাদি বর্তমানে মাতা ও পিতা প্রত্যেকে $\frac{১}{৬}$ অংশ করে পান; অবশিষ্ট সম্পত্তি সন্তানগণ পেয়ে থাকেন। প্রত্যেক পুত্র প্রত্যেক কন্যার দ্বিগুণ অংশের অধিকারী হন।

**তৃতীয়ত ঃ** শুধু পিতা ও কন্যা জীবিত থাকলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। প্রাক-ইসলাম যুগে এরূপ ক্ষেত্রে কন্যা পিতা বর্তমানে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হতেন। কিন্তু ইসলামী আইনে কোরানিক নির্দেশ অনুসারে এরূপ ক্ষেত্রে ত্যক্ত বিত্তের $\frac{১}{২}$ অংশ কন্যার প্রাপ্য এবং সন্তান বিদ্যমান বিধায় পিতার কোরানিক অংশ হবে $\frac{১}{৬}$। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সম্পত্তির অবশিষ্ট $\frac{১}{৩}$ অংশের কি ব্যবস্থা করা হবে? কন্যা এমনিই বেশি অংশের অধিকারী হয়েছেন বিধায় অবশিষ্ট সম্পত্তি সমান বা আনুপাতিক হারে বিভক্ত করলে কন্যা পিতার তুলনায় আরো বেশি অংশের অধিকারী হবেন। এ সমস্যার নিরসনকল্পে অবশিষ্ট $\frac{১}{৩}$ অংশ অবশিষ্টভোগী হিসেবে পিতাকে বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। এভাবে পিতা ও কন্যার অংশ হবে ঃ

কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে)

পিতা ---------- $\frac{১}{২}$ (অংশীদার হিসেবে $\frac{১}{৬}$ + অবশিষ্টভোগী হিসেবে $\frac{১}{৩} = \frac{১}{২}$)

**এই একটি মাত্র ক্ষেত্রেই পিতা একই সঙ্গে অংশীদার ও অবশিষ্টভোগীর শ্রেণীভুক্ত হয়ে ত্যক্ত বিত্তের অধিকারী হয়ে থাকেন।**

সত্য পিতামহের বিষয়টি কিছুটা জটিল। পিতা যেসব ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী পিতা অবর্তমানে সত্য পিতামহও অনুরূপ সকল ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী হন। পিতা যাদের বঞ্চিত করেন পিতা অবর্তমানে সত্য পিতামহও তাদের বঞ্চিত করে থাকেন। অন্য কথায় পিতা অবর্তমানে সত্য পিতামহকে পিতার স্থলাভিষিক্ত গণ্য করা হয়। অনুরূপভাবে সত্য পিতামহ, যত ঊর্ধ্বতন হোক, কে নিকটতর সত্য পিতামহ অবর্তমানে তার স্থলাভিষিক্ত গণ্য করা হয়। এ নিয়মের যে ব্যতিক্রমটি রয়েছে তা হলো স্বামী বা স্ত্রীসহ পিতা বর্তমানে মাতার অংশ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু অনুরূপ ক্ষেত্রে পিতার পরিবর্তে সত্য পিতামহ বর্তমানে মাতার অংশ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না।

**দূর আত্মীয় (Distant kindred) ঃ**

মৃত ব্যক্তির যে সমস্ত রক্তের সম্পর্কীয় আত্মীয় অংশীদার বা অবশিষ্টভোগী নন তাদের দূর আত্মীয় বা যবিউল আরহাম্ বলা হয়ে থাকে।

এখন সর্বাগ্রে দেখা প্রয়োজন অংশীদার বা অবশিষ্টভোগী নন এরূপ রক্তের সম্পর্কীয় ব্যক্তি কারা? স্পষ্টত:ই এরা হচ্ছেন মহিলা এ্যাগনেট ও পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে কগনেটগণ। এ দুই উপদল সম্মিলিতভাবে সুন্নী (হানাফী) আইনের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত উত্তরাধিকারী দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় বা যবিউল আরহামের অন্তর্ভুক্ত।

দূর আত্মীয়দের উত্তরাধিকারের নীতিমালা সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

(১) অংশীদার ও অবশিষ্টভোগী অবর্তমানে দূর আত্মীয়গণ ত্যক্ত বিত্তের অধিকারী হন;

(২) স্বামী বা স্ত্রী ও দূর আত্মীয় বর্তমানে স্বামী বা স্ত্রী নির্দিষ্ট কোরানিক অংশ পেয়ে থাকেন, অবশিষ্ট ত্যক্ত বিত্তের অধিকার হন দূর আত্মীয়গণ, যথা-

(১৭০) স্ত্রী ---------- $\frac{১}{৪}$ (অংশীদার হিসেবে)

দুজন কন্যার কন্যা -------- $\frac{৩}{৪}$ (প্রত্যেকের অংশ হবে $\frac{৩}{৮}$ )

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে উদাহরণ (১৭০)-এ উল্লেখিত ব্যক্তিদের অংশ হবে ঃ

(১৭০-ক) স্ত্রী ---------- $\frac{১}{৮}$ (অংশীদার হিসেবে)

দুজন কন্যার কন্যা ----- $\frac{৭}{৮}$

টীকা ঃ স্বামী বা স্ত্রী আগমের অধিকারী নন বিধায় স্ত্রী কোরানিক অংশ প্রদানের পর কন্যার কন্যাগণ অবশিষ্ট সম্পত্তির অধিকারী হবেন।

**দূর আত্মীয়দের শ্রেণীবিভাগ ঃ**

দূর আত্মীয়দের শ্রেণীবিভাগ অবশিষ্টভোগী বা আসাবাতদের অনুরূপ, যথা- (ক) অধস্তন পুরুষ, (খ) ঊর্ধ্বতন পুরুষ, (গ) পিতা ও মাতার বংশধরগণ ও (ঘ) ঊর্ধ্বতন পুরুষদের বংশধরগণ। সুতরাং অগ্রাধিকারের ক্রমানুসারে প্রথমে আসেন অধস্তন পুরুষগণ অতঃপর ঊর্ধ্বতন পুরুষগণ ও সর্বশেষে আসেন জ্ঞাতিবর্গ অর্থাৎ পিতা ও মাতার বংশধরগণ ও ঊর্ধ্বতন পুরুষদের বংশধরগণ।

**(ক) অধস্তন পুরুষগণ (Descendants) ঃ**

(১) কন্যার সন্তান ও তাদের বংশধরগণ;

**টীকা ঃ** মুসলিম পারিবারিক আইন প্রযোজ্য হলে কন্যার সন্তানগণ কন্যার স্থলাভিষিক্ত হবেন।

(২) পুত্রের কন্যার, যত অধস্তন হোক, সন্তান ও তাদের বংশধরগণ ad infinitum.

**(খ) ঊর্ধ্বতন পুরুষগণ (Ascendants) ঃ**

(১) মিথ্যা পিতামহগণ, যত ঊর্ধ্বতন হোক, (False grandfathers, how high soever);

(২) মিথ্যা পিতামহী, যত ঊর্ধ্বতন হোক, (False grandmothers, how high soever);

(গ) পিতা ও মাতার বংশধরগণ (Descendants of parents) ঃ

(১) পূর্ণ ভায়ের কন্যা ও তাদের বংশধরগণ;

(২) বৈমাত্রেয় ভায়ের কন্যা ও তাদের বংশধরগণ;

(৩) বৈপিত্রেয় ভায়ের সন্তান (পুত্র বা কন্যা) ও তাদের বংশধরগণ;

(৪) পূর্ণ ভায়ের পুত্রের, যত অধস্তন হোক, কন্যা ও তাদের বংশধরগণ;

(৫) বৈমাত্রেয় ভায়ের পুত্রের, যত অধস্তন হোক, কন্যা ও তাদের বংশধরগণ;

(৬) বোনদের (পূর্ণ, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয়) সন্তান ও তাদের বংশধরগণ।

**(ঘ) ঊর্ধ্বতন পুরুষদের বংশধরগণ ঃ**

**[অব্যবহিত (immediate) পিতামহ বা পিতামহীর (সত্য বা মিথ্যা) বংশধরগণ (Descendants of immediate grand-parents (true or false)] ঃ**

(১) পিতার পূর্ণ বোন ও তার বংশধরগণ।

(২) পিতার বৈমাত্রেয় বোন ও তার বংশধরগণ।

(৩) পিতার বৈপিত্রেয় ভাই-বোন ও তাদের বংশধরগণ।

(৪) পিতার পূর্ণ ভায়ের কন্যা ও তাদের বংশধরগণ।

(৫) পিতার বৈমাত্রেয় ভায়ের কন্যা ও তাদের বংশধরগণ।

(৬) পিতার বৈপিত্রেয় ভাই, তাদের সন্তান ও তাদের বংশধরগণ।

(৭) পিতার পূর্ণ ভায়ের পুত্রের, যত অধস্তন হোক, কন্যা ও তাদের বংশধরগণ।

(৮) পিতার বৈমাত্রেয় ভায়ের পুত্রের, যত অধস্তন হোক, কন্যা ও তাদের বংশধরগণ।

(৯) মাতার ভাই ও বোন, তাদের সন্তান এবং তাদের বংশধরগণ ও দূরবর্তী উর্ধ্বতন পুরুষদের, যত উর্ধ্বতন হোক (সত্য বা মিথ্যা) বংশধরগণ।

সিরাজিয়ায় দূর আত্মীয়দের মাত্র কয়েক জনের উল্লেখ রয়েছে; এদের পূর্ণ তালিকা এতে দেয়া হয় নি। তাই এক সময় মনে করা হতো শুধু সিরাজিয়ায় উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গই দূর আত্মীয়ের অন্তর্ভূক্ত। এ ভ্রান্ত ধারণার অবসান হয়েছে এবং বর্তমানে এটা স্বীকৃত যে, যে সমস্ত আত্মীয় মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত বিত্তের অংশীদার বা অবশিষ্টভোগী নন তারা সকলেই তার দূর আত্মীয়ের অন্তর্ভুক্ত।

জ্ঞাতিবর্গকে বিভিন্ন গ্রন্থকার বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছেন। উইলসন ও তাকে অনুসরণ করে মুলøা 'গ' ও 'ঘ'-কে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত করেছেন। এখানে উলেøখ্যযোগ্য যে, উপরোক্ত তথাকথিত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী আসলে পৃথক পৃথক শ্রেণী নয়; একই শ্রেণীর উপশ্রেণী মাত্র। এ ছাড়াও জ্ঞাতিবর্গের আরো অসংখ্য শাখা রয়েছে। শ্রেণী হিসেবে দূর আত্মীয়গণ (যবিউল আরহাম) শুধু বিরাটই নয়, জটিলও বটে।

**(১) বন্টন ও বঞ্চনার নীতিমালা (Principles of distribution and exclusion) ঃ**

(ক) অংশীদার ও অবশিষ্টভোগী অবর্তমানে দূর আত্মীয়গণ ত্যক্ত বিত্তের অধিকারী হন। এ নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম হলো স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে দূর আত্মীয়গণ যুগপৎ উত্তরাধিকারী হতে পারেন।

(খ) দূর আত্মীয়গণ চার শ্রেণীতে বিভক্ত যথা- (১) অধস্তন পুরুষ, (২) উর্ধ্বতন পুরুষ, (৩) পিতা ও মাতার বংশধর ও (৪) উর্ধ্বতন পুরুষদের বংশধর। প্রথম শ্রেণী বর্তমানে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী বর্তমানে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণী বর্তমানে চতুর্থ শ্রেণী সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন।

(২) অধস্তন পুরুষদের মধ্যে নিম্নলিখিত দুটি মুলনীতি অনুসারে অগ্রাধিকার নিরূপিত হয় ঃ

(ক) নিকটতর অধিক দূরবর্তীকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করেন। সাধারণ মুসলিম আইনে (i) কন্যার পুত্র (বা কন্যা) ও (i) পুত্রের কন্যার পুত্র উভয়ই দূর আত্মীয়। এক্ষেত্রে প্রথমোক্ত ব্যক্তি থেকে দুই পুরুষ (degree) ও শেষোক্ত ব্যক্তি তিন পুরুষ (degree) দূরবর্তী বিধায় কন্যার পুত্র (বা কন্যা) বর্তমানে পুত্রের কন্যার পুত্র বঞ্চিত হন।

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারেও এক্ষেত্রে কন্যার পুত্র (বা কন্যা) কন্যার প্রতিনিধিরূপে সমস্ত ত্যক্ত বিত্তের অধিকারী ও পুত্রের কন্যার পুত্র বঞ্চিত হবেন। (মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ধারা-৪)।

(খ) সকলেই অভিন্ন ক্রয় ও পর্যায়র্ভুক্ত হলে অংশীদার ও অবশিষ্টভোগীদের সন্তানগণ দূর আত্মীয়ের সন্তানদের তুলনায় অগ্রাধিকার পাবেন। পুত্রের কন্যার পুত্র (বা কন্যা) ও কন্যার কন্যার পুত্র (বা কন্যা) উভয়ই অভিন্ন ক্রম ও পর্যায়ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পুত্রের কন্যার পুত্র (বা কন্যা) অংশীদারের সন্তান হিসেবে কন্যার কন্যার পুত্রের (বা কন্যার) তুলনায় অগ্রাধিকার পাবেন, কারণ কন্যার কন্যার পুত্র (বা কন্যা) দূর আত্মীয়ের সন্তান।

(৩) উপরোক্ত নিয়ম সাপেক্ষ ঃ

(ক) পূর্ণ রক্তের সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ অর্ধ রক্তের সম্পর্কীয় আত্মীয়দের তুলনায় অগ্রাধিকার পাবেন।

(খ) পুরুষ উত্তরাধিকারী মহিলার দ্বিগুণ অংশ পেয়ে থাকেন।

**(ক) প্রথম শ্রেণীভুক্ত দূর আত্মীয়দের (অধস্তন পুরুষ) অগ্রাধিকারের ক্রম (order of priority) ঃ**

প্রথম শ্রেণীভুক্ত দূর আত্মীয়দের অগ্রাধিকারের ক্রম নিম্নলিখিতভাবে স্থিরীকৃত হয়ে থাকে ঃ

(১) কন্যার সন্তানগন।

[মুসলিম পারিবারিক আইন প্রযোজ্য হলে কন্যার সন্তানগণ কন্যার স্থলাভিষিক্ত হবেন]

(২) পুত্রের কন্যার সন্তানগণ।

(৩) কন্যার পৌত্র-পৌত্রিগণ (কন্যার সন্তানের সন্তানগণ)।

(৪) পুত্রের পুত্রের কন্যার সন্তানগণ।

৫) কন্যার প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রিগণ (কন্যার সন্তানের সন্তানের সন্তানগণ) ও পুত্রের কন্যার প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রিগণ (পুত্রের কন্যার সন্তানের সন্তানগণ)।

(৬) অতঃপর মৃত ব্যক্তির অন্যান্য দূরবর্তী বংশধরগণ অনুরূপভাবে আসবেন।

উপরোক্ত দল সমূহের একটি নিঃশেষিত না হওয়া পর্য্যন্ত পরবর্তীটি ত্যক্ত বিত্তের অধিকারী হবেন না।

**টীকা ঃ কন্যার পুত্র (বা কন্যা) বর্তমানে অন্যান্য সমস্ত দূর আত্মীয়ই বঞ্চিত হবেন।** উপরোক্ত দলসমূহের মধ্যে (১) দ্বিতীয় পুরুষের, (২) ও (৩) তৃতীয় পুরুষের এবং (৪) ও (৫) চতুর্থ পুরুষের অন্তর্গত। (২)-এর অন্তর্ভুক্ত পুত্রের কন্যার সন্তানগণ অংশীদারের সন্তান হিসেবে (৩)-এর অন্তর্ভুক্ত কন্যার কন্যার (বা পুত্রের সন্তানগণকে (দূর আত্মীয়ের সন্তান) বঞ্চিত করেন। অনুরূপভাবে (৪)-এর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ (৫)-এর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বঞ্চিত করে থাকেন।

**অংশ বণ্টন (Allotment of shares) ঃ** মৃত ব্যক্তির অধস্তন পুরুষদের মধ্যে কারা তার ত্যক্ত বিত্তের অধিকারী এটা স্থির করার পর পরবর্তী পদক্ষেপ হবে তাদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টনের ব্যবস্থা করা। দুর আত্মীয়দের মধ্যে ত্যক্ত বিত্ত বণ্টনের প্রশ্নে ইমাম আবু হানিফার দুই প্রধান শিষ্য কাজী আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ আসসায়বানীর মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান। আবু ইউসুফের মতবাদটি খুবই সরল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এটি এ উপমহাদেশে অনুসৃত হয় না। ইমাম মুহাম্মদের মতবাদটি জটিল হওয়া সত্ত্বেও এ উপমহাদেশে অনুসৃত হয়ে আসছে। সিরাজিয়ার গ্রন্থাকার আল-সাজাওয়ান্দিও এ মতবাদই গ্রহণ করেছেন। শরিফিয়ার গ্রন্থকারও কার্যতঃ এ মতবাদকে অনুসরণ করেছেন। কোলকাতা হাইকোর্টও ইমাম মুহাম্মদের মতবাদকে সমর্থন করেছেন। আবু ইউসুফের মতবাদ এ উপমহাদেশে প্রচলিত নয় বিধায় এ পুস্তকে ইমাম মুহাম্মদের মতবাদকে অনুসরণ করে ক্ষেত্রেবিশেষে দুই মতবাদের পার্থক্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। অবশ্য সবক্ষেত্রেই এই দুই মতবাদের মধ্যে পার্থক্য নেই। পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে শুধু মধ্যবর্তী পুরুষদের লিংগ ও রক্তকে কেন্দ্র করে। মধ্যবর্তী পুরুষদের লিংগ ও রক্ত অভিন্ন হলে দুই মতবাদে কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। শুধু নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে মতভেদ বিদ্যমান।

(১) মধ্যবর্তী পুরুষদের মধ্যে লিংগের প্রভেদ হলে অর্থাৎ তাদের মধ্যে কেউ পুরুষ ও কেউ মহিলা হলে, অথবা;

(২) মধ্যবর্তী পুরুষদের মধ্যে রক্তের পার্থক্য থাকলে অর্থাৎ তাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ রক্তের সম্পর্কীয় ও কেউ অর্ধ-রক্তের সম্পর্কীয় হলে।

আবু ইউসুফের মতে মধ্যবর্তী পুরুষ বা "মূল" দের লিংগ ও রক্ত নয়, প্রকৃত দাবিদার বা "শাখা"দের লিংগ ও রক্তই হচ্ছে বিবেচ্য বিষয়। এ মতবাদ অনুসারে পুত্রের পুত্র ও পুত্রের কন্যার ক্ষেত্রে অনুস্বত নীতি অনুসারে সম্পত্তি বিভক্ত হবে অর্থাৎ মাথাপিছু ভাগ হবে; প্রত্যেক পুরুষ প্রত্যেক মহিলার দ্বিগুণ অংশ পাবেন। ইমাম মুহাম্মদের মতে শুধু প্রকৃত দাবিদার নয় মধ্যবর্তী পুরুষদের লিংগ ও রক্তের বিষয়ও সমভাবে বিবেচ্য। মধ্যবর্তী পুরুষদের লিংগ অভিন্ন না হলে দুই মতবাদ অনুসারে প্রকৃত প্রাপকদের প্রাপ্য অংশেও প্রভেদ দেখা যায়। উপরোক্ত 'ক' শ্রেণীভুক্ত অধস্তন পুরুষ অথবা 'গ' শ্রেণীভুক্ত ভাই ও বোনের সন্তান অথবা 'ঘ' শ্রেণীভুক্ত পিতা বা মাতার ভাই ও বোনদের ক্ষেত্রে এ প্রভেদ সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত।

মধ্যবর্তী পুরুষদের রক্ত অভিন্ন না হলে এই মতবাদ অনুসারে উত্তরাধিকারের ক্রমে (order of succession) প্রভেদ দেখা দেয়। 'গ' শ্রেণীভুক্ত জীবিত আত্মীয়দের কেউ পূর্ণ বা বৈমাত্রেয় ভাই (বা বোনের বংশধর হলে এবং কেউ বেপিত্রেয় ভাই বা বোনের বংশধর হলে এ প্রভেদ বেশ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। 'ক' ও 'খ' শ্রেণীভুক্ত আত্মীয়দের মধ্যে এ প্রভেদ দৃষ্ট হয় না, কারণ এই দুই ক্ষেত্রেই মধ্যবর্তী পুরুষদের রক্ত অভিন্ন। 'ঘ' শ্রেণীভুক্ত আত্মীয়গণ পিতা বা মাতার ভাই ও বোনদের বংশধর বিধায় এ ক্ষেত্রেও এ প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় না।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দূর আত্মীয়দের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী পুরুষের রক্ত ও লিংগের প্রভেদ থাকতে পারে, কিন্তু অবশিষ্টভোগীদের ক্ষেত্রে এরূপ প্রভেদ থাকে না কারণ তারা এ্যাগনেটিক উত্তরাধিকারী।

দূর আত্মীয়দের মধ্যে ত্যক্ত বিত্ত বণ্টনের সময় নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুসরণ করা হয় ঃ

**নিয়ম (১) ঃ** মধ্যবর্তী পুরুষের লিংগ অভিন্ন হলে ত্যক্ত বিত্ত প্রাপকদের মধ্যে মাথাপিছু বণ্টন করা হয়; প্রত্যেক পুরুষ প্রত্যেক মহিলার দ্বিগুণ অংশের অধিকারী হন।

(১৭১) কন্যার পুত্র ---------- $\frac{২}{৩}$

কন্যার কন্যা ---------- $\frac{১}{৩}$

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারেও উদাহরণ (১৭১)-এ উল্লেখিত ব্যক্তিগণ অনুরূপ অংশের অধিকারী হবেন।

(১৭২) কন্যার পুত্রের পুত্র ---------- $\frac{২}{৩}$

কন্যার পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{৩}$

(১৭৩) কন্যা 'ক'-এর দুই পুত্র ---------- $\frac{৪}{৫}$

কন্যা 'খ'-এর এক কন্যা -------- $\frac{১}{৫}$

টীকা ঃ দূর আত্মীয়দের ক্ষেত্রে ত্যক্ত বিত্ত মাথাপিছু ভাগ করা হয়; মূল অনুসারে ভাগ করা হয় না। Pe stirpes ভাগ করা হলে এক্ষেত্রে দুই পুত্র পেতেন $\frac{১}{২}$ অংশ, অবশিষ্ট $\frac{১}{২}$ অংশ পেতেন কন্যা।

(১৭৪) কন্যা 'ক'-এর দুই পুত্র ---------- $\frac{৪}{৬}$

কন্যা 'খ'-এর দুই কন্যা ---------- $\frac{২}{৬}$

টীকা ঃ 'মূল' অনুসারে ভাগ করা হলে এক্ষেত্রে দুই পুত্র পেতেন $\frac{১}{২}$ অংশ, অবশিষ্ট $\frac{১}{২}$ অংশ পেতেন দুই কন্যা।

(১৭৫) কন্যা 'ক'-এর দুই পুত্র ---------- $\frac{২}{৪}$

কন্যা 'খ'-এর দুই কন্যা ---------- $\frac{২}{৪}$

আবু ইউসুফের মতানুসারে উদাহরণ (১৭১) থেকে উদাহরণ (১৭৫)-এ উল্লেখিত ব্যক্তিগণ অনুরূপ অংশের অধিকারী হবেন কারণ উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রেই মধ্যবর্তী পুরুষদের লিংগ অভিন্ন। ধরা যাক উত্তরাধিকারিগণ কন্যার কন্যার পুত্র ও কন্যার পুত্রের কন্যা। এক্ষেত্রে মধ্যবর্তী পুরুষদের মধ্যে লিংগের প্রভেদ বিদ্যমান সত্ত্বেও আবু ইউসুফের মতে প্রথমোক্ত ব্যক্তি পুরুষ বিধায় ত্যক্ত বিত্তের $\frac{২}{৩}$ অংশ ও শেষোক্ত ব্যক্তি মহিলা বিধায় ত্যক্ত বিত্তের $\frac{১}{৩}$ অংশের অধিকারী হবেন। কারণ তার মতে মধ্যবর্তী পুরুষদের লিংগ বিবেচনা না করে প্রকৃত প্রাপকদের লিংগ বিবেচনাপূর্বক ত্যক্ত বিত্ত বণ্টন করা হবে। ইমাম মুহাম্মদের মতে শুধু প্রকৃত দাবিদার নয় মধ্যবর্তী পুরুষদের লিংগও সমভাবে বিবেচ্য। এ মতবাদ অনেকটা শিয়া মতবাদের অনুরূপ।

**নিয়ম (২) ঃ** মধ্যবর্তী পুরুষদের লিংগ অভিন্ন না হলে নিম্নলিখিত নিয়ামানুসারে ত্যক্ত বিত্ত বণ্টন করা হবে ঃ

(ক) সবচেয়ে সরল ক্ষেত্র হচ্ছে সেগুলো যেখানে দুজন দাবিদারের মধ্যে একজন এক ঊর্ধ্বতন পুরুষের লাইনে ও অপরজন অন্য ঊর্ধ্বতন পুরুষের লাইনে নিজ নিজ দাবি উত্থাপন করছেন। এরূপ ক্ষেত্রে যে পর্যায়ে মধ্যবর্তী পুরুষদের লিংগের প্রভেদ হবে সেখানে থেমে পুরুষ পূর্বসূরীকে মহিলা পূর্বসূরীর দ্বিগুণ অংশ বরাদ্দ করা হবে। পুরুষ পূর্বসূরীয় অংশ পাবেন সে ব্যক্তি যিনি তার মাধ্যমে দাবিদার। অনুরূপভাবে মহিলা পূর্বসূরীর মাধ্যমে দাবিদার ব্যক্তি তার (মহিলা পূর্বসূরী) অংশ পাবেন। এরূপ ক্ষেত্রে প্রকৃত দাবিদারের লিংগের প্রশ্ন উপেক্ষণীয়।

*Dhaka University Institutional Repository*

উদাহরণ

(১৭৬) আলী আসগর নামক কোন মুসলিম নিচের অনুচিত্র অনুযায়ী এক কন্যার পুত্রের কন্যা সখিনা ও এক কন্যার কন্যার পুত্র ইউনুসকে রেখে মারা যান ঃ

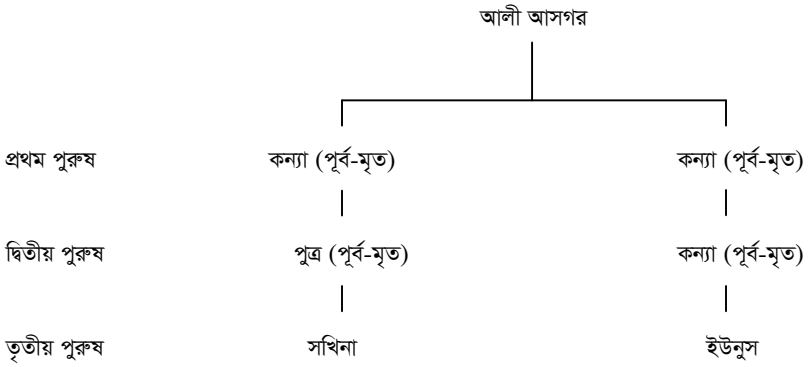


এক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সখিনা ও ইউসুফের মধ্যে কে ত্যক্ত বিত্তের উত্তরাধিকারী হবেন? সখিনা ও ইউনুস উভয়ই মৃত আলী আসগর থেকে তিন পুরুষের ব্যবধান বিধায় তারা যুগপৎ উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্য। পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে ত্যক্ত বিত্ত তাদের মধ্যে কিভাবে বণ্টন করা হবে? এক্ষেত্রে দ্বিতীয় পুরুষে এসে পূর্বসূরীদের মধ্যে লিংগের প্রভেদ হচ্ছে বিধায় এখানেই পুরুষকে মহিলার দ্বিগুণ অংশ বরাদ্দ করা হবে। তা করা হলে কন্যার পুত্র $\frac{২}{৩}$ অংশ ও কন্যার কন্যা $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবেন। কন্যার পুত্রের $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবেন তার কন্যা সখিনা ও কন্যার কন্যার $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবেন তার পুত্র ইউনুস। এভাবে ত্যক্ত বিত্তের অংশ হবে ঃ

সখিনা (কন্যার পুত্রের কন্যা) ---------- $\frac{২}{৩}$

ইউনুস (কন্যার কন্যার পুত্র) ---------- $\frac{১}{৩}$

আবু ইউসুফের মতে সখিনা পাবেন $\frac{১}{৩}$ অংশ ইউনুস পাবেন $\frac{২}{৩}$ অংশ।

টীকা ঃ মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী চতুর্থ বা আরো অধিক দূরবর্তী পুরুষের অন্তর্গত হলে মধ্যবর্তী পুরুষদের লিংগের প্রভেদ অনুসারে প্রতিটি পর্যায় পরপর পুরুষ উত্তরাধিকারীকে দ্বিগুণ অংশ বরাদ্দ করে যেতে হবে (নিচের উদাহরণ (১৮২) দ্রষ্টব্য]

(ছ) কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তিন বা ততোধিক দাবিদারের প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ঊর্ধ্বতন পুরুষের লাইনে তাদের দাবি উত্থাপন করছেন। এক্ষেত্রেও যে পর্যায়ে মধ্যবর্তী লিংগের প্রভেদ রয়েছে সেখান থেকে প্রত্যেক পুরুষ পূর্বসূরীকে প্রত্যেক মহিলা পূর্বসূরীর দ্বিগুণ অংশ বরাদ্দ করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে পূর্বের মত (উদাহরণ ১৭৬) পূর্বসূরীদের বরাদ্দকৃত অংশ তাদের নিজ নিজ বংশধরদের না দিয়ে পুরুষ পূর্বসূরীদের সমবেত অংশ তাদের মাধ্যমে দাবিদার সকল অধস্তন পুরুষদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। অনুরূপভাবে মহিলা পূর্বসূরীদের সমবেত অংশও তাদের বংশধরদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রত্যেক পুরুষ প্রত্যেক মহিলার দ্বিগুণ অংশ পাবেন।

উদাহরণমালা

(১৭৭) জনৈক মুসলিম 'ম' নিচের অনুচিত্র অনুযায়ী এক কন্যার পুত্রের কন্যা, এক কন্যার কন্যার পুত্র ও এক কন্যার কন্যার কন্যা রেখে মারা যান।

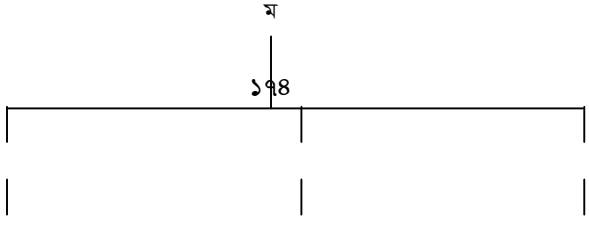

| | | |
|---|---|---|
| কন্যা | কন্যা | কন্যা |
| পুত্র | কন্যা | কন্যা |
| কন্যা | পুত্র | কন্যা |

এক্ষেত্রে দ্বিতীয় পুরুষে এসে দেখা যাচ্ছে পূর্বসূরীদের একজন পুরুষ ও বাকী দুজন মহিলা, পুরুষের অংশ হবে মহিলার দ্বিগুণ এ নীতি অনুসারে এখানে এসে প্রত্যেকের অংশ দাড়াচ্ছে ঃ

কন্যার পুত্র ---------- $\frac{১}{২}$

কন্যার কন্যা ---------- $\frac{১}{৪}$

কন্যার কন্যা ---------- $\frac{১}{৪}$

} মহিলা পূর্বসূরীদের সমবেত অংশ হচ্ছে $\frac{১}{২}$ সুতরাং প্রত্যেকের অংশ হবে $\frac{১}{৪}$ ।

কন্যার পুত্র একক পুরুষ পূর্বসূরী বিধায় তার $\frac{১}{২}$ অংশের অধিকারী হবেন তার কন্যা। পক্ষান্তরে মহিলা পূর্বসূরীদের সমবেত অংশ $\frac{১}{২}$ তাদের বংশধরদের মধ্যে বিভক্ত হবে এবং এক্ষেত্রেও প্রত্যেক পুরুষ প্রত্যেক মহিলার দ্বিগুণ অংশ পাবেন বিধায় তাদের অংশ দাঁড়াচ্ছে ঃ

কন্যার কন্যার পুত্র ---------- $\frac{১}{২}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{১}{৩}$

কন্যার কন্যার কন্যা ---------- $\frac{১}{২}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{১}{৬}$

অতএব উত্তরাধিকারীদের চূড়ান্ত অংশ হবে ঃ

কন্যার পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$

কন্যার কন্যার পুত্র ---------- $\frac{১}{৩} = \frac{২}{৬}$

কন্যার কন্যার কন্যা---------- $\frac{১}{৬} = \frac{১}{৬}$

আবু ইউসুফের মতে উদাহরণ (১৭৭)-এ উল্লেখিত ব্যক্তিদের অংশ হবে ঃ

কন্যার পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{৪} = \frac{১}{৪}$

কন্যার কন্যার পুত্র ---------- $\frac{১}{২} = \frac{২}{৪}$

কন্যার কন্যার কন্যা ---------- $\frac{১}{৪} = \frac{১}{৪}$

(১৭৮) জনৈক মুসলিম, 'ম' নিচের অনুচিত্র অনুযায়ী এক কন্যার কন্যার পুত্র, এক কন্যার পুত্রের পুত্র ও এক কন্যার পুত্রের কন্যা রেখে মারা যান ঃ

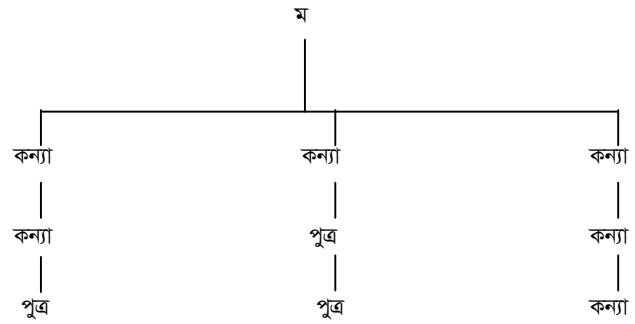


এক্ষেত্রে দ্বিতীয় পুরুষে এসে দেখা যাচ্ছে পূর্বসূরীদের মধ্যে একজন মহিলা বাকী দুজন পুরুষ, পুরুষের অংশ হবে মহিলার দ্বিগুণ এ নীতি অনুসারে এখানে এসে প্রত্যেকের অংশ দাঁড়াচ্ছে ঃ

কন্যার কন্যা ---------- $\frac{১}{৫}$

কন্যার পুত্র ---------- $\frac{২}{৫}$

কন্যার পুত্র ---------- $\frac{২}{৫}$

পুরুষ পূর্বসূরীদের সমবেত অংশ হচ্ছে $\frac{৪}{৫}$

সুতরাং প্রত্যেকের অংশ হবে $\frac{২}{৫}$ ।

কন্যার কন্যা একক মহিলা পূর্বসূরী বিধায় তার $\frac{১}{৫}$ অংশের অধিকারী হবেন তার পুত্র। পক্ষান্তরে পুরুষ পূর্বসূরীদের সমবেত অংশ $\frac{৪}{৫}$ তাদের বংশধরদের মধ্যে বিভক্ত হবে এবং এক্ষেত্রেও প্রত্যেক পুরুষ প্রত্যেক মহিলার দ্বিগুণ অংশ পাবেন বিধায় তাদের অংশ দাঁড়াচ্ছে ঃ

কন্যার পুত্রের পুত্র ---------- $\frac{৪}{৫}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{৮}{১৫}$

কন্যার পুত্রে র কন্যা ---------- $\frac{৪}{৫}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{৪}{১৫}$

অতএব উত্তরাধিকারীদের চূড়ান্ত অংশ হবে ঃ

কন্যার কন্যার পুত্র ---------- $\frac{১}{৫} = \frac{৩}{১৫}$

কন্যার পুত্রের পুত্র ---------- $\frac{৮}{১৫}$

কন্যার পুত্রের কন্যা---------- $\frac{৪}{১৫}$

আবু ইউসুফের মতে উদাহরণ (১৭৮)-এ উল্লেখিত ব্যক্তিদের অংশ হবে ঃ

কন্যার কন্যার পুত্র ---------- $\frac{২}{৫}$

কন্যার পুত্রের পুত্র ---------- $\frac{২}{৫}$

কন্যার পুত্রের কন্যা ---------- $\frac{১}{৫}$ ।[৭]

ইসলামী উত্তরাধিকার নীতিমালা গোটা বিশ্বে একটি অনন্য সাধারণ পদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত। ইসলামী বিধান কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের জন্য মৃত ব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পত্তিকে এককভাবে প্রদান না করে মৃতের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সমন্বিতভাবে বন্টন করেছে এবং উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার সম্পর্কে মানব সমাজকে অবহিত করেছে। উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে আল্লাহতায়ালা বর্ণনা করেন- 'আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন- 'এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান। যদি দু'য়ের বেশি মেয়ে হয় তাহলে পরিত্যাক্ত সম্পত্তির তিনভাগের দুইভাগ তাদের দাও, আর যদি একটি মেয়ে ওয়ারিশ হয়, তাহলে পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তার। যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে তাহলে তার বাপ-মা প্রত্যেকে সম্পত্তির ছয় ভাগের একভাগ পাবে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং বাপ মা তার ওয়ারিশ হয়, তাহলে মা'কে তিনভাগের একভাগ দিতে হবে। যদি মৃতের ভাই বোনও থাকে, তাহলে মা ছয় ভাগের একভাগ পাবে। মৃত ব্যক্তি যে ওসিয়ত করে গেছে তা পূর্ণ করার পর এবং সে যে ঋণ রেখে গেছে তা পরিশোধ করার পর। তোমরা জানো না তোমাদের বাপ-মা ও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারের দিক দিয়ে কে তোমাদের বেশি নিকটবর্তী, এসব অংশ আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ অবশ্যই সকল সত্য পালনে এবং সকল কল্যাণময় ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন।[৮]

**ইয়ুদী ধর্মে উত্তরাধিকার ঃ**

ইয়াহুদী আইনানুসারে পুরুষ উত্তরাধিকারীর বর্তমানে নারীর উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত। অনুরূপভাবে নারীর দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকারও নেই।[৯]

ইহুদী ধর্মে নারী হলো সমস্ত পাপের মুল। তাওরাতে বলা হয়েছে, "স্ত্রীলোক মৃত্যুর চেয়েও মারাত্মক। আল্লাহর কাছে যে ব্যক্তি সৎ, সে স্ত্রীলোকের কবল থেকে আত্মরক্ষা করে থাকে। এক হাজার জনের মধ্যে এরকম পুরুষ মাত্র একজন পাওয়া যাবে। কিন্তু হাজার জনের মধ্যে একজন স্ত্রীলোকও সৎ পাওয়া যাবে না। নারীকে তারা দাসীর মর্যাদা দিত। মেয়েকে বিক্রি করে দেয়া পিতার কোন অপরাধ ছিল না। পুরুষ সৎ স্বভাব বিশিষ্ট ও সৎকর্মশীল এবং নারী বদস্বভাব বিশিষ্ট ও ভন্ড"-এ ছিল তাদের বিশ্বাস। কেবল পুত্র সন্তান না থাকলেই মেয়ে সন্তান পিতা-মাতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার হবে।[১০]

তাওরাতে আছে "আইয়ুবের স্ত্রীদের ন্যায় সুন্দরী নারী পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না। তাদের পিতা তাদের ভাইদের সাথে তাদের উত্তরাধিকারের অংশ দিয়েছে।" অর্থাৎ একাধিক ভাই থাকলে বোন উত্তরাধিকার পাবে। একজন ভাই থাকলে বোন পিতার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। কোন পুত্র সন্তান না থাকলে কন্যা সন্তান পিতার সম্পত্তির অংশীদার। কিন্তু শর্ত হলো যে, সে নিজ গোত্র ছাড়া অন্য গোত্রের কাউকে বিয়ে করতে পারবে না এবং নিজ সম্পদ অন্য কারো কাছে হস্তান্তর করতে পারবে না। মেয়ের পন নেয়ার ক্ষমতা পিতার হাতে। তারা যত ইচ্ছা বিয়ে করতে ও রক্ষিতা রাখতে পারে।[১১]

**খ্রিষ্টধর্ম উত্তরাধিকার ঃ**

বাংলাদেশে বসবাসকারী খ্রিষ্টানগণ জন্মগত সূত্রে এবং খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত খ্রীষ্টান। খ্রিষ্টানগণ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা-১। ক্যাথলিক ও ২। প্রটেস্ট্যান্ট। আমাদের দেশে মুসলিম বা হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ন্যায় খ্রিষ্টানদের পৃথক কোন উত্তরাধিকার আইন ছিল না। ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকারী আইন (Act 39 of 1925) এর ২৩-২৮ (অংশ-৪) এবং ২৯-৪৯ (অংশ-৫) ধারা সমূহ বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে বসবাসকারী খ্রিষ্টানগণের জন্যে উত্তরাধিকার আইন সমভাবে প্রযোজ্য।[১২]

১৯২৫ সালের খ্রিষ্টান উত্তরাধিকার আইনের বিভিন্ন ধারাগুলো এ স্থাবন সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলঃ

১। যদি একজন হিন্দু খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত সে খ্রিষ্টাণ থাকে, তাহলে ২৯ ধারার সংজ্ঞায় সে হিন্দু নহে এবং তার ইনটেস্টেট সম্পত্তি উত্তরাধিকারের সকল প্রশ্নের মীমাংসা ২৯ অংশের আইন দ্বারা নিষ্পত্তি হবে।

Nrependra Vs Sitakanta, 15 C.W.N. 158 (161) Kamawati Vs Digbijai, 43 ALL 525 (533)

(P.C) হিন্দু ধর্ম হতে খ্রিষ্টার্ণ ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তির উইল বিহীন সম্পত্তি ভারতীয় উত্তরাধিকার বিধিসমূহের দ্বারা পরিচালিত হবে এবং তারা হিন্দু ছিল বলে তাদের উত্তরাধিকারের বিধিসমূহ হিন্দু আইনে পরিচালিত হবে এরূপ সাক্ষ্য প্রদর্শনের স্বীকৃতি নিস্প্রয়োজন।

২। ৩৭-৪০ ধারায় বর্ণিত বিধিসমূহ অনুযায়ী উইলবিহীন সম্পত্তি এক বংশদ্ভুত সন্তানগণের অর্থাৎ পুত্র, পৌত্র ও প্রেপৌত্রদের মধ্যে বণ্টন হবে, যদি বিধবা স্ত্রী থাকেন তাহলে তার অংশ রাখতে হবে।

৩। উইলবিহীন একটি জীবিত সন্তান বা সন্তানগণ রেখে মারা গেলে তার মৃত সন্তানের মাধ্যমে যদি কোন অধস্তন না থাকে, তাহলে ৩৭নং ধারা অনুযায়ী সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে জীবিত সন্তান। সন্তান একাধিক হলে তা সন্তানগণের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন হবে।

৪। উইল বিহীন সন্তান না রেখে পৌত্র বা প্রপৌত্র রেখে মারা গেলে, সেক্ষেত্রে ৩৮ নং ধারা অনুযায়ী তার সম্পত্তির অধিকারী হবে পৌত্র বা পৌত্ররা।

৫। মাতা, ভ্রাতা এবং ভগ্নিগণ জীবিত থাকলে এবং কোন ভ্রাতা বা ভগ্নির সন্তান জীবিত না থাকলে, সেক্ষেত্রে ৪৩ ধারা অনুযায়ী মাতা, ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ সম্পত্তিতে সমতুল অংশে উত্তরাধিকারী হবে।

৬। একজন হিন্দু খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে যদি ভ্রাতা, ভগ্নি ও স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী $\frac{১}{২}$ অংশ এবং বাকি $\frac{১}{২}$ অংশ ভ্রাতা ও ভগ্নি সমান অংশে পাবে।

৭। বৈধ স্বামীও স্ত্রীর সন্তানগণকে খ্রিষ্টান উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করে। কিন্তু অবৈধ সন্তানগণ কে উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করে না।

৮। একজন বিধবা যদি তার বিবাহের পূর্বে বৈধ চুক্তির মাধ্যমে তার স্বামীর সম্পত্তিতে স্বত্ববান না হয়ে থাকে, তাহলে তার মৃত স্বামীর সম্পত্তি শেয়ারে বঞ্চিত হয়।

৯। ৩৩ ধারায় বর্ণিত বিধি অনুযায়ী মৃত ব্যক্তি যদি তার এক বংশমম্ভুত অধ:স্তন ব্যক্তিগণ রেখে যায়, তাহলে তার সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ অংশ তার বিধবা স্ত্রী এবং অবশিষ্ট $\frac{২}{৩}$ অংশ তার এক বংশসম্ভূত অধ:স্তন সন্তানগণ এর অর্থ হচ্ছে বৈধ স্বামী স্ত্রীর সন্তানগণ। স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক নয় এমন স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে জন্মপ্রাপ্ত সন্তানগণ উত্তরাধিকারী হবে না। ইংল্যান্ডের আইনানুসারে বহুবিধ বিবাহের সন্তানগণ উত্তরাধিকারী হতে বঞ্চিত হবে।

উপরোক্ত তথ্যাবলীতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, খ্রিষ্টার্ণ উত্তরাধিকার আইনে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন, পিতা-মাতা প্রত্যেকেই কম বেশী সমভাবে উত্তরাধিকারী হচ্ছে। অবৈধ অর্থাৎ জারজ সন্তানগণ তাদের জন্মলাভের ব্যাপারে দায়ী নন বরং সে সকল নারী পুরষের অবৈধ মিলনের ফলে তারা জন্মপ্রাপ্ত হয়েছে সে সকল নারী পুরষরাই দায়ী। জারজ সন্তানরা পিতৃ এবং মাতৃত্বের পরিচয় দিতে পারছে না। উপরন্তু তাদেরকে উত্তরাধিকার থেকেও করা হয়েছে বঞ্চিত। মানুষ এবং পশুর মধ্যে যেন কোন ভেদাভেদ নেই। যারা জারজ সন্তান জন্ম দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না বরং আইনের মাধ্যমে এটাকে বৈধ করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি হচ্ছে বিঘ্নিত। নারীকে মনে করা হচ্ছে ভোগের সামগ্রী। ধর্ম বা আইন নারীকে মাতৃত্বের মর্যাদাটুকু পর্যন্ত দিতে পারেনি সে সকল আইন উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে নারীকে প্রকৃতপক্ষে কতটুকু আত্মকার দিতে পারবে তা সহজেই বোধগম্য।

**বৌদ্ধ উত্তরাধিকারী আইন ঃ**

বৌদ্ধদের জন্যে পৃথক কোন উত্তরাধিকার আইন নেই। বাংলাদেশের মারুয়া বৌদ্ধগণ ব্যতীত অন্যান্য বৌদ্ধগণ সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দায়ভাগ আইন দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মারুয়া বৌদ্ধগণ ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনে (১৯২৫ সালের ৩৯নং আইন) শাসিত। ভারতীয় বৌদ্ধ জৈন ও শিখ সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার ভারতীয় হিন্দু আইনে শাসিত ও আওতাভূক্ত। ভারত উপমহাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিজ নিজ প্রথা ব্যতীত ধর্মীয় মূলনীতিতে তেমন কোন পার্থক্য নেই।

ডি.এফ মোল্লার Principal of Hindu law এর Operation of Hindu Law এর অনুচ্ছেদে Persons governed by Hindu Law তে বলা হয়েছে:

"অর্থাৎ ভারতের জৈন, বৌদ্ধ ও শিখ সম্প্রদায় অবশ্য তাদের নিজস্ব প্রথাসম্মত আইন ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে হিন্দু আইনের আওতাভুক্ত।

## তথ্য নির্দেশিকা

১. মুহাম্মদ জসীম উদ্দিন জিহাদি, ইসলামি সমাজে নারীর মর্যাদা ইসলামিয়া কুতুবখানা, ৩২, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ-৭৪।

২. আল-কোরআন ৪ ঃ ৭।

৩. আল-কোরআন, ৪ ঃ ৭।

৪. আল-কোরআন, ৪ ঃ ১১-১২।

৫. মোঃ গোলাম কিবরিয়া- ইসলাম ও বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেনমোহর: একটি পর্যালোচনা, পৃ-৩২০।

৬. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান, ইসলাম উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, আর আই.এস পাবলিকেশনস্, ঢাকা নভেম্বর ১৯৯৫, পৃ-৩৭।

৭. এস কে রাউত- মুসলিম আইন (ইসলামী আইনতত্ত্ব ও ১৯৬১সনের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ সহ), আইডিয়াল লাইব্রেরী ঢাকা, ৫ই মে,১৯৮৯ ।

৮.আল-কোরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত-১১।

৯. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসারী উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১-৩৩।

১০. আব্দুল খালেক, নারী দ্বীনি পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৯৯ পৃ: ৮।

১১. Report of the commission, Marriage, Divorce and the Church, London, 1971, P-9।

১২. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, ইসলাম উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, আর.আই.এস. পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৫। পৃ: ১৪১-১৪২।

*Dhaka University Institutional Repository*

## ষষ্ঠ অধ্যায়

## বাংলাদেশের মুসলিম নারীর আইনগত মর্যাদা ও উত্তরাধিকার- বাস্তবতা

সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের বিস্ময়কর সাফল্যের পেছনে নারীর অগ্রগতি বড় ভূমিকা রাখলেও ঘরের মধ্যে কিন্তু নারীর অবস্থা তেমন বদলায়নি। দেশের বিবাহিত নারীদের ৮৭ শতাংশই স্বামীর মাধ্যমে কোন না কোন সময়ে, কোনো না কোনো ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ৮৫ শতাংশ নারীর উপার্জনের স্বাধীনতাও নেই। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রথম বারের মতো নারী নির্যাতন নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে চালানো জরিপ প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশ করে।

সমাজের পরিবর্তন আনয়নে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হচ্ছে সমাজের, বিশেষ করে একশ্রেণীর অধিকার নির্ধারকদের অত্যাচারী মনোভাব, যা নারীকে অবদমন করে, যার বহিঃপ্রকাশ নারী নির্যাতন। নারী নির্যাতন আমাদের দেশে নিত্য-নতুন আতঙ্ক নিয়ে দেখা দিচ্ছে। সাধারণ নির্যাতনের পাশাপাশি চলছে ধর্ষণ, দলগত ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যাসহ চরম নিষ্ঠুরতা। ব্যক্তির অমানবিক আচরণ গোষ্ঠীর ওপরও প্রভাব ফেলছে।

সারা বিশ্বে একদিকে যখন জোরদার হচ্ছে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, তখন আমাদের দেশের নারীরা বহুভাবে নির্যাতন-নিপীড়ন আর নানা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। অগণিত নারী, কন্যাশিশুর মানসিক-শারীরিক নির্যাতনসহ ভয়াবহ নানা সহিংসতার চিত্র যেন নিত্যদিনের ঘটনা। ফলে নারীর জীবন হচ্ছে নিরাপত্তাহীন। ব্যাহত হচ্ছে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। এমন সব ঘৃণ্য নির্যাতনের শিকার হয়ে নারীরা ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে অকালমৃত্যু ও মানসিক ভারসাম্যহীনতার দিকে। এসব কারণে সমাজ ও জাতি হারাচ্ছে সামগ্রিক সুস্থ্যতা। তাতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে উন্নয়নের গতি।

বাংলাদেশে শুধু নারী নির্যাতনের কারণে প্রতিবছর ১৫ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়, যা বাংলাদেশে মোট জিডিপির প্রায় ২ দশমিক ০৫ শতাংশ। নির্যাতিত নারীর চিকিৎসা বিচার-প্রক্রিয়া সম্পাদন, বিচারপ্রার্থী ও আসামির আদালতে যাহায়াত, খাবার, পেনালটি এবং সালিস আয়োজনে এই পরিমাণ টাকা খরচ হয়।

নির্যাতিত নারীর মানসিক ধকল, তার সন্তানদের মনঃসামাজিক অবস্থা, কাজে অনুপস্থিতি বা কর্মঘন্টার ব্যাত্যয়, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বিবেচনায় নিতে পারলে এই খরচের হিসাব আকাশচুম্বী হয়ে উঠবে বলে আমাদের ধারণা।

ইউএন উইমেনের এক জরিপ মতে, নারীর প্রতি সহিংসতার কারণে দেশের মোট আয়ও কমছে বছরে অন্তত ২ দশমিক ১২ শতাংশ। যার পরিমাণ এক হাজার ৯৩৯ কোটি টাকা।

পুষ্টির ক্ষেত্রেও ভয়ানক বৈষ্যমের শিকার আমাদের দেশের নারীরা। ২০১১ সালের পুষ্টি জরিপ মতে, বাংলাদেশে ৫০ শতাংশের বেশি নারী পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। পুষ্টিহীনতার কারণে ৫৪ শতাংশ অর্থাৎ ৯৫ লাখ শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ৫৬ শতাংশ শিশুর জন্ম হয় কম ওজন নিয়ে।

অসচেতনতা ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে নারীরা যথাযথ খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে সব সময়ই নিজেকে বঞ্চিত করে। মেয়েশিশুরা ছোটবেলা থেকেই ছেলেশিশুর তুলনায় কম খাবার খেতে পায়। যে নারী হাঁস-মুরগি পালন করে, সেই তার ছেলেশিশু ও পরিবারের পুরুষ সদস্যের পাতে ডিম-দুধ-মাছ-মাংস তুলে দেয়। মা একই সঙ্গে মেয়েশিশু ও নিজেকে বঞ্চিত করে পুরুষ সদস্যকে ভালো জিনিসটা বেশি পরিমাণে খাওয়ায়। এই মেয়েশিশুটি বেড়ে ওঠে অপুষ্টিতে ভোগে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরিণত বয়সের আগেই তার বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ে হওয়ার পরও সে বঞ্চিত হয় প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও খাবার থেকে। এরপর অপুষ্টিতে ভোগা এই শিশুমেয়েটিই আবার মা হয়। একটা অপুষ্ট শিশুর জন্ম দেয়। এভাবে অপুষ্টির চক্র চলতেই থাকে, যা জাতীয় অর্থনীতিকে শুধু নয়, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশকেও দুর্বল করে দেয়।

নারী নিজের ও নিজ কন্যার পাতে কম দিয়ে স্বামী বা পুত্রসন্তানের পাতে ভালো খাবার পরিবেশন করে। কারণ, সমাজ তাকে এটাই শিখিয়েছে এবং এ কাজটিই সামাজিকভাবে স্বীকৃত। এতে নিজের, সমাজের এবং জাতির ক্ষতি হচ্ছে। এ সর্বনাশা সনাতন সামাজিক প্রথা ও আচার-আচরণকে পরিবর্তন করতে হবে। ঘরের সাথি পুরুষও এই ভ্রান্ত প্রথা বদলাতে, নারীর প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিতে। নারীকে অধস্তন অবস্থায় রেখে নিজেকে এবং দেশকে ভয়াবহ বিপদের মুখে ঠেলে দেয়ার প্রধান কারণই হচ্ছে বিষয়টির প্রকৃত গুরুত্ব অনুধাবনে অজ্ঞতা।

বাংলাদেশের নারীদের গৃহস্থালির কাজের অর্থমূল্য হিসাব করা হয় না। এটা করা গেলে অর্থনীতিতে নারীর অবদান আড়ালে থেকে যেত না। উপরন্ত, জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) অনেক বেশি হতো। দেশের এক গবেষণায় এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

অন্যদিকে বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশেও একই অবস্থা বলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আই এম এফ) এক গবেষণায় বলা হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের হিসাবে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। কৃষি, শিল্প, উদ্যোক্তা, অফিস-আদালতসহ সব কর্মক্ষেত্রেই নারীরা কাজ করছেন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১০ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে এক কোটি ৬২ লাখ নারী কর্মক্ষেত্রে রয়েছেন। ২০০৬ সালে এই সংখ্যা ছিল এক কোটি ১৩ লাখ। এর মানে ওই চার বছরে প্রায় ৪৯ লাখ নারী শ্রমবাজারে প্রবেশ করেছেন। সপ্তাহে যারা ১ ঘন্টা কাজ করেন, তাদের নিয়ে এই হিসাব করা হয়েছে।

২০১২ সালে প্রকাশিত এই জরিপ অনুযায়ী, গৃহস্থালির কাজ করে কোনো মজুরি পান না ৯১ লাখ নারী। তাদের মধ্যে কেউ আছেন পরিবারের সদস্য, আবার কেউ গৃহকর্মী। আবার মজুরি দেওয়ার ক্ষেত্রেও নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। পুরুষের চেয়ে নারীদের কম মজুরি দেওয়া হয়।

শ্রমশক্তি জরিপের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে আট লাখ ৪৯ হাজার নারী দিনমজুর রয়েছেন। তাঁরা পুরুষের সমান কাজ করে মজুরী কম পান। পুরুষ দিন মজুরেরা পান গড়ে ১৮৪ টাকা, নারীরা পান ১৭০ টাকা। তবে শহরে নারী-পুরুষের মজুরির বৈষম্য কিছুটা কম। এখানে নারী-পুরুষেরা গড়ে প্রায় সমান মজুরি পান। শহরের পুরুষ দিনমজুরেরা পান ২০০ টাকা, নারীরা পান ১৯৮ টাকা।

বাংলাদেশের নারীরা দৈনিক গড়ে ১৬ ঘন্টা গৃহস্থালির কাজ করেন, যার জন্য কোনো মজুরি তারা পান না। তারা সব মিলিয়ে প্রতিবছর ৭৭ কোটি ১৬ ঘন্টা কাজ করেন। এতে এ কাজের মোট অর্থমূল্য হয় ছয় হাজার ৯৮১ কোটি থেকে নয় হাজার ১০০ কোটি ডলার। এই অর্থ যদি বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) যুক্ত করা মতো, তাহলে এর আবার দ্বিগুণেরও বেশি হতো। বাংলাদেশের একজন পুরুষ যে কাজ করেন, তার ৯৮ শতাংশই জিডিপিতে যুক্ত করা হচ্ছে। আর একজন নারী মাত্র ৪৭ শতাংশ কাজের স্বীকৃতি জিডিপিতে মিলছে। বাংলাদেশে নারীর বাসাবাড়িতে রান্না-বান্না, সন্তান লালন-পালন সহ গৃহস্থালির কাজকর্মের স্বীকৃতি জিডিপিতে নেই। এই শ্রমের আর্থিক মূল্যমানও নির্ধারণ করা হয়না।

এসব প্রতিকূলতার মধ্যেও সুখবর হলো, পুরুষদের মধ্যে যেখানে বেকারত্বের হার বাড়ছে, সেখানে নারীদের বেকারত্বের হার কমেছে। ২০০৬ সালে যেখানে নারীর বেকারত্বের হার ছিল ৭ শতাংশ, ২০১০ সালে এসে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৫ দশমিক ৮ শতাংশে। আর পুরুষের ক্ষেত্রে দশমিক ৭০ শতাংশ বেড়ে ৪ দশমিক ১ শতাংশ হয়েছে।

আবার যুবশক্তিতে তরুণীদের অংশগ্রহণও বেড়েছে। ২০০৬ সাল পর্যন্ত ৪৬ লাখ তরুণী শ্রমবাজারে ছিলেন। আর ২০১০ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৮ লাখ। আলোচ্য সময়ে তরুণীদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের হার প্রায় ৭০ শতাংশ বেড়েছে। বর্তমানে তরুণ-তরুণী মিলিয়ে মোট যুবশক্তিতে রয়েছেন ২ কোটি ৯ লাখ।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ যথেষ্ট বেড়েছে। ২০০৬ সালে হিসাব করা শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ২৯ শতাংশ। ২০১০ সালে এসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬ শতাংশ। তবু নারীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুরোপুরি স্বীকৃত হচ্ছে না। তাদের বড় অংশই কাজ করেন পারিবারিক মন্ডলে, মজুরি পান না। শ্রমবাজারে প্রবেশ করে নারীরা অর্থনীতিতে তাদের প্রথম ধাপ অর্জন করেছেন। সব বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ যেমন পুরুষের অধিকারে থাকে জমি। ঋণও পান পুরুষেরাই। নারীর অবদানের ফলেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন এসেছে।[১]

বাংলাদেশের অধিকাংশ মহিলা বিশেষ করে গ্রামীণ নারী সমাজ ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক মূল্য বোধ ও কুসংস্কারে বিশ্বাসী। শত শত বছরের সামাজিক মূল্যবোধ, যা শিক্ষা ও আর্থিক কারণে পারিবারিক জীবনের সাথে মিশে রয়েছে। এ ব্যবস্থায় নারী সমাজ বরাবরই পুরুষের মুখাপেক্ষী। তাই পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় গৃহস্থালী কর্ম সম্পাদন, সন্তান গর্ভধারণ, জন্মদান ও লালন-পালন এটাই ছিল নারীর কর্মধারা। নারী সমাজের এ কর্মধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য সমাজ ব্যবহার করে আসছে নারীর দুর্বলতা, অজ্ঞতা ও অসহায়ত্বকে। গ্রাম সমীক্ষাগুলোতে দেখা যায়, মহিলাদের দৈনন্দিন গৃহস্থালীর কাজের সময় পুরুষের দৈনিক গড় কাজের চেয়ে বেশি। দিনের অর্ধেক সময়ের চেয়ে বেশি সময় ধরে অনাহারে থাকে। যার ফলে নারীরা অপেক্ষাকৃত বেশি অপুষ্টির স্বীকার। বাঙ্গালী মুসলিম সমাজ নারীকে চিরকালই অন্দর মহলের বাসিন্দা বলে গণ্য করেছে। নারীদের একমাত্র ভূমিকা ছিল গৃহিনী ও জননী হিসেবে। বাংলাদেশের পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থায় বাবা সমসময় মেয়েদের শিক্ষা ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত ও নির্দিষ্ট করে রাখছেন। অন্যদিকে মায়েরা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজের সনাতনী মেয়েলী আদর্শ বজায় রাখা এবং নারী সুলভ গুণাবলী অর্জন করার ব্যাপারে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা ও নারীর অবস্থান সম্পর্কে যে চিত্র পাওয়া যায় বলতে গেলে এটা ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা ও নারী পুরুষের সমতাবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃত রূপ নয়। এটা ইসলামের খন্ডিত ও অপূর্ণাঙ্গ রূপমাত্র। কেননা ইসলাম পারিবারিক কল্যাণ ও নারীর সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার যে অনুপম আদর্শ নীতিমালা ও দৃষ্টিভঙ্গি সামনে উপস্থাপন করেছে তার প্রকৃত রূপ, তার যথার্থ ব্যাখ্যা ও শিক্ষা আমাদের সমাজে পালিত হচ্ছে না।[২]

ধর্মীয় গোঁড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার ও পুরুষ প্রধান সমাজ ব্যবস্থার তৃণমূল পর্যায়ে মেয়েরা লিঙ্গের কারণেই অনেক বেশি অবহেলিত, নিরাপত্তাহীনতা ও ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার। তাই এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য নারীদেরকে নিজেদের কর্মতৎপরতা ও দক্ষতার মাধ্যমে তাদের অধিকার কাউকে দেয়া হয় না। নিজেকে সেটি অর্জন করে নিতে হয়। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে কিংবা আমাদের নগরজীবনে এভাবেই কিছুটা হলেও নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই রাষ্ট্রীয়ভাবে সরকারকেই তৃণমূল পর্যায়ের নারী সমাজের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পর্দা প্রথার কঠোরতা, সামাজিক অনুশাসনের বেড়াজাল ছিন্ন করে বাংলাদেশের নারীদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার অবস্থান পাকাপোক্ত করে নিতে হবে। আমাদের দেশে সরকারি বেসরকারি অনেক নারী সংগঠন রয়েছে, তারা নারী বৈষম্য দূরীকরণে বদ্ধপরিকর। তাদেরকে নারীর অধিকার আদায়ের জন্য আরো বেশি তৎপর হতে হবে বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন।[৩]

বাংলাদেশে নারীদের অধ:স্তন থাকার সূচনা পরিবার থেকেই। তাই গ্রামের অবহেলিত নারী সমাজকেও শিক্ষিত এবং স্বাবলম্বী হতে হবে। নির্যাতন প্রতিরোধে সক্রিয় হতে হবে। নিজের অধিকার নিজেকেই অর্জন করে নিতে হবে। তাই এক্ষেত্রে প্রধান তিনটি বিষয়ে স্বাবলম্বী হতে হবে। (১) শিক্ষা (২) অর্থনৈতিক (৩) ক্ষমতা। কেননা মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ, দায়িত্ববোধ, অধিকার সংরক্ষণ ও নাগরিক চেতনাবোধের উন্নয়নে মৌলিক উপাদান হচ্ছে শিক্ষা। তাছাড়া নারী পুরুষের অসমতা ও বৈষম্য দূরীকরণে এবং নারীদের অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার বিকল্প নেই। কেননা নারী সমাজ একটি দেশের বিরাট জনশক্তি। সুতরাং এ জনশক্তিকে পশ্চাদমুখী ও উন্নয়নবিমুখ রেখে স্থায়ী কোন উন্নয়ন সাফল্যমন্ডিত হতে পারেনা। আবার অর্ধেক মানব সম্পদ মজুদ শ্রমবাহিনী ও নাগরিক হিসেবে নারী দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে দূরে থাকলেও কাঙ্খিত উন্নয়ন কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কিন্তু নারীর শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষতা অর্জনের পথে ব্যাপক প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। যার ফলে নারী পুরুষের সমতার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জিত হয় না। তবে একথা সত্য যে, কোন সমাজেই নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম দীর্ঘ সময়ের হয়ে থাকে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন- আইন ও নীতিমালা প্রয়োজন হয়। তেমনি প্রয়োজন প্রশাসনিক কাঠামো, প্রয়োজন নারী, পুরুষ, নির্বিশেষে সমগ্র সমাজের সনাতনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।[৪]

কেননা সমাজের এ সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই নারী সমাজ শিক্ষা, অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ। যেসকল কারণে নারী সমাজ শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ তান্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি দিক হলো-

**প্রথমত ঃ** গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় নারীদেরকে অর্থনৈতিকভবে তেমন একটা মূল্যায়ন করা হয় না। ফলে মেয়ে বলে শিক্ষার প্রতি পারিবারিক উৎসাহ প্রথম থেকেই তেমন একটা পায় না। অন্যদিকে ছেলেদেরকে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সহায়ক এবং বৃদ্ধকালে অবলম্বন হিসেবে ধরা হয়। ফলে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদেরকে শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশি মাত্রায় সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে।[৫]

**দ্বিতীয়ত ঃ** বিদ্যা অর্জনের সুযোগ আসে আর্থিক স্বচ্ছলতা আসার পর। সেখানে শতকরা ৯০% মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে এবং শতকরা ৬০% মানুষ চরম দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে, সেখানে বিদ্যা শিক্ষার আগ্রহ থাকে না। চরম দারিদ্র ও অভাবের দরুণ গ্রামীণ পরিবারে প্রাথমিক বিদ্যালয় বয়সী সন্তানদের মাত্র ৩৫% স্কুলে যায়। সম্প্রতি অর্থনৈতিক কারণে পুরুষ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সঞ্চারিত হচ্ছে এ ভেবে যে ছেলে শিক্ষিত হলে শহরে একটি চাকুরী পেয়ে যেতে পারে, যা পরিবারের আয়ের পথ সুগম করবে।

**তৃতীয়ত ঃ** গ্রামীণ সমাজ এখনও রক্ষণশীল ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশাকে তারা খুব একটা পছন্দ করেন না। এ জন্য মা বাবা যে উৎসাহ নিয়ে কন্যাদের স্কুলে পাঠান অনেক ক্ষেত্রে সে উৎসাহ কন্যার পঞ্চম শ্রেণীতে উঠা পর্যন্ত বজায় থাকে না।

চতুর্থত ঃ গ্রামীণ এলাকায় মেয়েদেরকে সাংসারিক কাজের সহায়ক হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। এজন্য মেয়েদের শিক্ষার হার অনেকটা সংকুচিত হচ্ছে। সমাজের চোখে মেয়েরা এখনও মা এবং বধু। তাই জনমতে এখনও বিশ্বাস যে, আদর্শ মা ও আদর্শ গৃহিনী হওয়ার জন্য মেয়েদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন।

**পঞ্চম ঃ** যৌতুক সমস্যার কারণেও নারীদের শিক্ষার হারে তারতম্য লক্ষ্য করা যায় ।[৬] অনেক সময় দেখা যায় যে, শিক্ষিত ও যোগ্যতা সম্পন্ন মেয়েদেরকে বিবাহ দেয়ার ব্যাপারে মা-বাবাকে বিরাট ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ, তদ্রুপ শিক্ষিত ও যেগ্যতা সম্পন্ন ছেলে পাওয়া যায় না। ফলে তাদেরকে পরোক্ষভাবে যৌতুকের শিকার হতে হয়। এজন্য মা বাবা তার কন্যা সন্তানকে উচ্চতর শিক্ষা দিতে চান না।[৭]

অতএব দারিদ্র, পারিবারিক মানসিকতা ও ধর্মীয় রক্ষণশীল নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধার অপর্যাপ্ততার কারণেই শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সম অধিকার নীতি প্রয়োগ হচ্ছে না।

বাংলাদেশে বর্তমান সমাজে রাজনৈতিক অঙ্গনে মহিলাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রান্তিক বা পশ্চাৎপদ। তবে এটা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। বাংলাদেশের স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে যে সব নারী রাজনীতিতে এসেছেন তারাই হয় উত্তরাধিকারসূত্রে পরিবার কেন্দ্রিক অথবা এলিট শ্রেণী থেকে আগত। মহিলারা যে সকল কারনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে না বা করতে পারে না তন্মধ্যে কয়েকটি কারণ হল-

বিবাহ, বৈবাহিক সম্পর্ক ও মাতৃত্বকে। অর্থাৎ বাংলাদেশে নারীদের সামাজিক মর্যাদার স্বল্পতার পিছনে ক্রিয়াশীল একটি সাংস্কৃতিক উপাদান হল বিবাহ প্রথা, বৈবাহিক সম্পর্ক ও মাতৃত্ব।[৮] বলা হয়েছে ইসলামে বিয়ে চুক্তি হিসেবে গণ্য হলেও বাস্তবে দেখা যায় তা দুই অসম পক্ষের মধ্যে চুক্তি। এখানে নারীর অধিকার অসম। পুরুষের তালাক দেবার, এক সঙ্গে চার স্ত্রী রাখার, সন্তানের অভিভাবকত্বের স্ত্রীর শরীরের উপর পুরোপুরি অধিকার বিদ্যমান, অন্য পক্ষে নারীর অধিকার শুধু মাহর ও ভরণ পোষণের। এরও নিশ্চয়তা বিধান নেই। ফলে নারী এখানে অধস্তন। দেখা যাচ্ছে বিয়ের মাধ্যমে নারী-পুরুষের পারস্পরিক যে সম্পর্ক তা অসম। এ অসম সম্পর্ক বৈবাহিক জীবনে, মাতৃত্ব তথা নারীর সমস্ত জীবনে প্রভাব ফেলে। অসম সমপর্ক শুধু ধর্মীয় দিয়েই নয় সামাজিক কারণেও ঘটে থাকে। কারণ ধর্ম সমাজকে ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত।[৯]

ইসলাম নারী পুরুষের সমতা, নারীদের সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ প্রাপ্তির অধিকার, নাবালক সন্তানদের তত্ত্বাবধানের অধিকার, মোহরের অধিকার ইত্যাদি যা কিছু দিয়েছে অর্থাৎ ইসলাম সামাজিক বিন্যাস, নারীর উপযুক্ত অবস্থান, তাদের ভূমিকা, কর্তব্য ও দায়িত্ব সহজাত গুণাবলী তাদের অধিকার এবং এরূপ অন্যান্য বিষয়াদি যে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে ইসলামের সে সব মতাদর্শগত ধ্যান ধারণাকে নারী বিরোধী বলে অনেকে মন্তব্য করে থাকেন।[১০] ইসলাম সম্পর্কে এসব বিশেষজ্ঞদের অভিমত ও চিন্তা চেতনা একপেশে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। ইসলামে নারীর অবস্থান নিয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে তারা নিরপেক্ষতা উদারতা ও সুস্থ মন মানসিকতার পরিচয় দিতে পারেননি। অর্থাৎ ইসলামের যথার্থ অবস্থান ও সৌন্দর্যকে তুলে ধরতে পারেন নি। তারা এটাই দেখাতে চেয়েছেন যে মানব সমাজের পুরুষরাই সর্বেসর্বা আর নারীরা হচ্ছে হাতের সামগ্রী। আর এটাতেই ইসলাম কিছু নিয়ম-নীতির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে।[১১]

ইসলামে দৈহিক গঠন ব্যতীত অন্যান্য মৌলিক মানবাধিকারসহ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নে নারী-পুরুষের কোন প্রকার বৈম্যকে স্বীকার করে না।[১২] কেননা নারী পুরুষ একই উপাদান হতে একই রকম আবেগ অনুভূতি নিয়ে সৃষ্ট। সামাজিক ক্ষেত্রে উভয়েই একে অপরের সহযোগী। সুতরাং নারীরা সমাজের কোন বিচ্ছিন্ন অংশ নয়। নারীরা মানব সমাজেরই অতি প্রয়োজনীয় একটি বিরাট অংশ। তাই ইসলাম মনে করে এদের বাদ দিয়ে হয়তো সমাজ হতে পারে, মানব সমাজ হয় না। তাই যে সমাজে নারীর বসবাস যে সমাজে ব্যবস্থার মর্যাদা ও উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে পারলেই নারী-পুরুষ উভয়ে তারা ফল ভোগ করতে পারবে।

বিশ্ব মানব জাতি সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত মৌলিক যে সমস্ত ভুল ও অপরাধ করে দেশ, জাতি ও ধর্মকে ধ্বংস করেছে, দুনিয়াকে অশান্তিময় বানিয়েছে এবং পুরুষকে করেছে উগ্র প্রতাপশালী তন্মধ্যে নারী সমাজের প্রতি ইহসানের ব্যর্থতা অন্যতম এবং বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। কেননা নারী সমাজ হল মানবজাতির অংশ। সে অর্ধেক অংশের প্রকৃত অবস্থান নির্ণয়ে বিফল হলে সমাজের সব কিছুতে সে বিলফতা ও ব্যর্থতার চরম ক্ষতি ও অপকারী সমাজ ও রাষ্ট্রকে অধপতনের নিম্নতম পর্যায়ে নিয়ে যায়। ফলে সব দিকে তখন ভাঙ্গন, বিপর্যয়, অশান্তি ও আযাব প্রকট আকার ধারণ করে। মায়ের সাথে স্ত্রীর ন্যায় এবং স্ত্রীর সাথে মায়ের ন্যায় আচার-আচরণ ও ব্যবহার করলে যতটুকু অশান্তি ও অবনতি হয় সমাজে প্রতিটি নারীর বেঠিক অবস্থান ঠিক অনুরূপ ফলই দেয়।

ইসলাম পূর্বযুগে সমাজে নারীদের তেমন কোন মর্যাদা বা কোন অধিকার ছিল না, নারীরা ছিল ভোগ বিলাসের সামগ্রী। তাদেরকে সকল পাপের তথা সকল অনিষ্টের মূল কারণ মনে করা হত। ইবাদত উপাসনা থেকে তাদেরকে ঘৃণার সাথে দূরে রাখা হত। পিতার সম্পদের মধ্যে কোন একটা অংশ তাদের ভাগ্যে জুটত না। তাদেরকে যেথায় ইচ্ছে সেথায় বিয়ে দেয়া হত, তাদের কাছ থেকে অনুমতি নেয়া প্রয়োজন মনে করা হত না। কোন কোন ধর্ম ও সমাজে নারীদের প্রতি এমন মানবতা বিরোধী ব্যবহার করা হত যে, স্বামী মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রী হিসেবে তাকেও চিতার আগুনে নিক্ষেপ করা হত। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের জীবন ছিল অভিশপ্ত। সে সময়ে কন্যার জন্মে পিতা-মাতাসহ সবাই হত ব্যথিত ও দুঃখিত। শিশু কন্যাকে হয় হত্যা করা হত অথবা জ্যান্ত কবর দেয়া হত। স্ত্রীরা ছিল ক্রীতদাসীর মত। স্বামী তাদের উপর কারণে-অকারণে পাশবিক নির্যাতন চালাত, যখন খুশি তালাক দিত এবং একাধিক বিয়ে করত। অসহনীয় অত্যাচারিত নিপীড়িত, নির্যাতিত, পদদলিত অবস্থা থেকে নারীদেরকে মুক্তি দানের উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা অবতীর্ণ করেন, যার নাম সূরা আন-নিসা। ঘোষণা করা হল- 'হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহার সঙ্গীনি সৃষ্টি করেন, যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বহু নর-নারী ছড়াইয়া দেন; এবং আল্লাহকে ভয় কর যাহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্ছা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে, আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন।' [১৩]

আমাদের বর্তমান জনসংখ্যার প্রগতিশীল মানব জাতির একটি অংশ হল নারী সমাজ। ইসলামে নারী-পুরুষের অধিকার সমান, কিন্তু কাজের দায়িত্ব পরিপূরক। ইসলাম নারীকে পূর্ণ মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছে। মহান আল্লাহ নারীদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছেন এবং যে সব অধিকার তাদের প্রাপ্য প্রত্যেক নারী তা কুরআন ও

সুন্নাহর আইন বিধানে অর্জন করে নিতে পারেন। প্রথাগতভাবে ইসলামী সমাজে নারীরা গৃহে থাকে এবং স্বামীরা তাদের সম্পত্তির দেখাশুনা করেন। এ বিষয়টি বর্তমানে এমন একটা ধারণা জন্ম দিয়েছে যে, ইসলামে নারীর স্থান পুরুষের নীচে এবং পুরুষের তুলনায় তাদের অধিকার ও মর্যাদা খুবই কম। এ ভ্রান্ত ধারণা দূর করা এবং নারীর মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য ইসলামী বিধিমালা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দৈনন্দিন কাজে নারীদেরকে ইসলাম ঘরের বাইরে আসার ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করেছে। তবে শর্ত এই সময়ে তাদের শালীন পোশাক ও হিজাবের মাধ্যমে শারীরিক সৌন্দর্য ঢেকে রাখতে হবে। ইসলাম নারী জাতিকে কন্যার স্থানে কন্যার মর্যাদা, বোনের স্থানে বোনের মর্যাদা, স্ত্রীর স্থানে স্ত্রীর মর্যাদা এবং মায়ের স্থানে মায়ের মর্যাদা দিয়েছে। আজ সভ্যতার চরম উৎকর্ষে কোন কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় মনে করে ইসলাম নারীদেরকে উপহাস ও হেয় প্রতিপন্ন করছে। শুধু তা নয়, তারা বলে ইসলাম নারীকে ঘরবন্দী করে তাদের মর্যাদাকে বিনষ্ট করছে। অথচ প্রথমেই বলেছি যে, ইসলাম নারী প্রগতি ও নারী মর্যাদার যে অধিকার দিয়েছে আর কোন ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায় তা দেয়া হয়নি।

নারীর সামাজিক নিরাপত্তা প্রশ্নে যা করা দরকার তা হল ইসলাম বহির্ভূত অতি প্রাচীন ঐতিহ্য, রীতিনীতি ও এমন সব আইন-কানুন বাদ দিয়ে আমাদের সমাজে এমন একটি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা যাতে পুরুষদের মত নারীদেরও এ সুযোগ ঘটে যে সে তার মানসিক, আধ্যাত্মিক ও শারীরিক যোগ্যতাকে কাজে লাগাতে পারে এবং মুসলিম সমাজের উন্নয়নে স্বীয় বৈধ কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাহলে বুদ্ধিমান কোন ব্যক্তিরই এ ধরনের সমতায় আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু যদি নারী ও পুরুষের সমতার অর্থ এই যে, নারীর দৈহিক বৈশিষ্ট্য মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা ও মানসিক যোগ্যতা হুবহু পুরুষের অনুরূপ, কিংবা নারী ও পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক নয়, বরং এক অভিন্ন কর্মক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ এবং পুরুষের প্রতিটি কর্তব্য-কর্ম নারীও সুষ্ঠুরূপে আঞ্জাম দিতে পারে অথবা পুরুষ ও নারীর কর্ম পালন করতে সক্ষম। তবে এ ধরনের নারী পুরুষ সমতা একবারেই অবাস্তব ও অগ্রহণযোগ্য। বস্তুত নারী ও পুরুষের মধ্যে যেটুকু বুনিয়াদী সাম্য বর্তমান, আল-কুরআন এক ব্যাপক তাৎপর্যময় ও অর্থপূর্ণ আয়াত দ্বারা তা প্রমাণ করে দিয়েছে। বলা হয়েছে, 'হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করে যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাহার সঙ্গীনি সৃষ্টি করেন, যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বহু নর-নারী ছড়াইয়া দেন।[১৪] অর্থাৎ নারী জাতির অস্তিত্ব ঐ একই ব্যক্তি হতে সংঘটিত হয়েছে, যার থেকে পুরুষ জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে যেমন নারী পুরুষের মৌল সমতা ঘোষিত হয়েছে, তেমনি সমগ্র মানব জাতিকে বংশ, রক্ত ও গোত্র নির্বিশেষে সমান ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা সব মানুষই তো শেষ পর্যন্ত ঐ এক ব্যক্তিরই ফসল।

নারী জাতি পুরুষদের হতে নির্গত বা সৃষ্ট। ফলে উপাদানগত দিক থেকে পুরুষের চেয়ে নারীর মর্যাদা কম ইসলাম এ ভুল ধারণা মিটিয়ে দিয়েছে এবং আল-কুরআন নারী ও পুরুষের মর্যাদা সমান বলে গণ্য করে বলেছে- 'তাহারা তোমাদের পরিচ্ছেদ এবং তোমরা তাহাদের পরিচ্ছেদ।[১৫] পোশাকের কাজ হল লজ্জা অঙ্গ বা ছতর ঢাকা, সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা এবং ময়লা হতে দেহকে রক্ষা করা। এখানে পুরুষের লেবাস বলে গণ্য করার অর্থ হল, যেভাবে পুরুষ নারীকে অনিষ্ট হতে রক্ষা করে এবং যেসব গুণ নারীর মধ্যে পাওয়া যায় না, তার পূর্ণতা বিধান করে তেমনিভাবে নারী ও পুরুষকে অশ্লীল কর্ম থেকে ফিরে থাকতে সহায়তা করে এবং পুরুষের মধ্যে যে গুণের ঘাটতি আছে তা পূর্ণ করে। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর সৃষ্টি-তে নারী ও পুরুষ মর্যাদায় সমান। আরবদের মত সমাজে যেখানে নারীকে এত হেয় জ্ঞান করা হত, কোনআনের এই ঘোষণা নিরতিশয় বিপ্লবাত্মক ছিল এবং নিছক আরবদের মধ্যেই নয়, বরং ইউরোপীয় দেশগুলোতে এ দু'শ বছর পূর্বে নারীকে যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে তার নিরিখে বিচার করলে কোরআন ঘোষিত সাম্যনীতি সভ্য দুনিয়ার মাপকাঠি থেকে অনেক উর্ধ্বে। অনুরূপভাবে আরবদের মধ্যে কন্যা সন্তানকে যে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা হত এবং কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তাদের অস্তিত্বকে এক মস্ত বোঝা মনে করত। আল-কোরআন পরিষ্কার ভাষায় তার নিন্দা করে ঐসব লোককে চরম অসভ্য ও হীনমন্য বলে আখ্যায়িত করেছে।[১৬]

অনুরূপভাবে এ ধারণা কোরআন প্রত্যাখ্যান করেছে যে, পুরুষদের মোকাবিলায় নারীর কোন বিধিসম্মত অধিকার নেই, বরং পুরুষ এ ব্যাপারে স্বাধীন যে সে তার সাথে যা ইচ্ছে তাই ব্যবহার করতে পারে। যেমন আল-কোরআনে বলা হয়েছে- 'এবং নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাহাদের উপর পুরুষদের।[১৭]

এ সাম্য নীতি শিক্ষা দেয়ার জন্য মহানবী (সা.) অতিমাত্রায় মুসলমানদেরকে তাগিদ দিয়েছেন যে, কন্যা সন্তানের সাথে ঠিক তদ্রুপই ব্যবহার করা উচিত যেরূপ পুত্র সন্তানের সাথে করা হয়। ইসলাম পূর্ব কালের ন্যায় বর্তমান সমাজেও কন্যা সন্তানের তুলনায় পুত্র সন্তানকে বেশি মূল্যায়ন করা হয়। যাতে ভবিষ্যতে তার দ্বারা পরিবারের অর্থনৈতিক কল্যাণ ও উন্নতি সাধিত হয়। তাই পুত্র সন্তানের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষা দীক্ষার প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় না। মহানবী (সা.) এরূপ মন-মানসিকতার প্রতি কঠোর মনোভার ব্যক্ত করেছেন এবং এ সমুদয় জিনিসের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে পরিষ্কার ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন যে পুত্র এবং কন্যার সাথে প্রতিক্ষেত্রে, সেটা খানা-পিনা সম্পর্কে হোক, শিক্ষা দীক্ষা সম্পর্কে হোক কিংবা বিবাহ-শাদীর ব্যাপারে হোক সর্বত্র একই ব্যবহার করা

উচিত। এ চিন্তা ধারার স্বপক্ষে আমরা মহানবী (সা.)-এর কতকগুলো উক্তি এখানে তুলে ধরতে পারি। যেমন তিনি বলেছেন- 'যদি কোন ব্যক্তির কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় এবং সে তাকে কষ্ট দেয় না, ঘৃণা করে না এবং পুত্র সন্তানকে তার উপর প্রাধান্য দেয়না, তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করবেন।'[১৮]

এভাবেই ইসলাম কন্যা বা নারী জাতির প্রতি জন্মলগ্ন থেকেই সুবিচার ও সুন্দর আচরণ করেছে, বিশ্বে যার দ্বিতীয় কোন নজীর নেই। কেননা নারী শিক্ষার উপর গোটা জগতে সুখ, শান্তি, উন্নতি ও কল্যাণ নির্ভরশীল। বিশ্বমানব সমাজকে প্রকৃত মানুষ করতে যার অবদান সর্বাধিক সেই মা একজন নারী। আর নারী সমাজকে সুশিক্ষিত না করলে সবই বরবাদ হবে। তার জন্য মহানবী (সা.) নারী সমাজের শিক্ষার উপর এত বেশি জোর দিয়েছেন।

আমাদের সমাজে অনেকে নারী শিক্ষার ব্যাপারে অবচেতন। কেননা তাদের মধ্যে আল-কোরআন ভিত্তিক বাস্তব শিক্ষা নেই। অনেকে মনে করেন মেয়ের জন্য শিক্ষা নয়। আবার অনেকের ধারণা মেয়েরা তার বাবার কিংবা স্বামীর কাছ থেকে ঘরে বসে শিখবে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রত্যেক ঘরেই একজন শিক্ষিত বাবা পাওয়া যাবে এর নিশ্চয়তা নেই। আর বাবাও যেসব বিষয়ে পুরোপুরি জ্ঞানের অধিকারী হবেন তাও কি সম্ভব? শুধু ঘরে বসেই যদি শেখা যেত তাহলে অনেক নারী সাহাবী তার স্বামীর কাছে যা শিখে মহানবী (সা.)-এর কাছে, কখনও হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট আসতেন। তাই যথোপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে ঘরের বাইরে আসতে হবে এ কথা বলাই বাহুল্য। এজন্য ইসলাম সমাজের প্রতিটি নর-নারীর প্রতি শিক্ষাকে ফরয করেছে। তাই কোন জাতি যদি সমাজের নারী ও পুরুষ উভয় অংশকে শিক্ষিত না করে তুলে তাহলে সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হয় না। তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে সমাজকে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে মেয়েদের জন্য বেঁধে দেয়া নির্দিষ্ট চলার পথ থেকে সরে যাওয়া চলবে না।

ইসলাম পদাপ্রথা ও ব্যক্তিসত্তার পবিত্রতার দিক দিয়ে নারী সামাজিক নিরাপত্তা পুরুষের সমতা বিধান করেছে। পর্দা এমন একটি প্রথা যার মাধ্যমে নারী জাতিকে দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান সম্পদে পরিণত করে। কোরআন শরীফে বলা হয়- 'তোমরা মিনার ধারে কাছেও যেওনা অর্থাৎ মিনার পরিবেশ তৈরি কর না।'[১৯] অপরদিকে নারীকে সতর ঢাকা ও পর্দা করার জন্য বলা হল, 'হে বনী আদম! তোমাদগের লজ্জাস্থান ঢাকিবার ও বেশভূষার জন্য ামি তোমাদিগকে পরিচ্ছদ দিয়াছি এবং তাকওয়ার পরিচ্ছদই সর্বোত্তকৃষ্ট।'[২০] 'মুমিন নারীদেরকে বল, তাহারা যেন তাহাদিগের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাহাদিগের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তাহারা যেন যাহা সাধারণত প্রকাশ থাকে তাহা ব্যতীত তাহাদিগের আবরণ প্রদর্শন না করে। তাহাদিগের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত থাকে।'[২১]

অন্যদিকে মুমিন পুরুষদেরকেও একই নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন। যেমন- 'মুমিনদেরকে বল, তাহারা যেন তাহাদিগের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাহাদিগের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে ইহাই তাহাদিগের জন্য উত্তম।'[২২] পর্দার মাধ্যমে সংরক্ষিত নারীর ছতরাঙ্গ যে মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয় নারী যদি বেপর্দা হয়ে তা হারিয়ে ফেলে তখন সে সমাজ ও ধর্মীয় দৃষ্টিতে হয়ে উঠে ঘৃণিত ও অপাংক্তেয়। এজন্যই মহান আল্লাহ বেপর্দা হয়ে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন- 'হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে- যেভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে সে জান্নাত হইতে বহিস্কৃত পরিয়াছিল। তাহাদিগকে তাহাদিগের লজ্জাস্থান দেখাইবার জন্য বিবস্ত্র করিয়াছিল।'[২৩]

এভাবেই ইসলাম পর্দা প্রথার মাধ্যমে নারী জাতিকে সকল প্রকারের পাপাচার, অশ্লীলতা, মূল্যহীনতা, ক্ষতি, বদনাম, ধ্বংস, অসম্মান, স্বামীর অনাদার ও জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেছে এবং তাকে সম্মান, মর্যাদ ও নিরাপত্তার সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে কারো কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ার পর থেকে শুরু হয়ে যায় পিতার কাছ থেকে মেয়ের অধিকার আদায়ের পালা। প্রথমত: মেয়েকে যত্নের সঙ্গে লালন পালন করে যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত করে সংসারে বিয়ে দেয়া হলো পিতার দায়িত্ব। তবে মনে রাখতে হবে যে, বিয়ের পূর্বে মেয়ে অবশ্যই ছেলেকে পছন্দ করতে হবে। মেয়ের যদি ছেলে পছন্দ না হয় তাহলে জোরপূর্বক কোন জায়গায় বিয়ে দিতে পারবে না।[২৪]

আর বিয়ের প্রথম শর্ত হল মোহর আদায় করা।[২৫] যদি কোন মেয়ে ছেলেকে পছন্দ করে ইসলামের এ বিধানকে পাশ কাটার উদ্দেশ্যে দেনমোহর ছাড়াই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় সেক্ষেত্রে ইসলাম বলে দিয়েছে যে, দশ দিরহামের কম মোহরে বিবাহ সিদ্ধ হবেনা।[২৬] এমনকি পূর্ণ দেনমোহর হাতে না পেয়ে মেয়ে স্বামী ঘরে যেতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে, তার জন্য মেয়েকে কেউ কোন প্রকার জোর জবরদস্তি করতে পারবে না। এ অধিকার নারীকে ইসলাম আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বেই দিয়েছে।

বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে মুসলিম বিবাহে উচ্চহারে দেনমোহর নির্ধারণ একটি পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধির বিষয় বলে অনেকে মনে করেন। যদিও এক্ষেত্রে তারা দেনমোহরের বাস্তব উপযোগিতাকে অবমূল্যায়নই করেন। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যেহেতু দেনমোহর পরিশোধ না করাটাই অনেকটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই দেনমোহরের মত সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাটি বর্তমানে নিছক একটি সামাজিক রীতিতে পরিণত হয়েছে। যেই মোহর ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ইসলাম বৈবাহিক ক্ষেত্রে পুরুষের অদম্য ক্ষমতা ও প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে স্বামী স্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়ন করেছে। বাংলাদেশে বস্তুত সেই দেনমোহর ব্যবস্থাটি বাংলাদেশী মুসলিম নারীর অসহায়ত্বেও একটি প্রতিচ্ছবি বিশেষে পর্যবসিত হয়েছে।[২৭] নিম্নমধ্যবিও শ্রেণীর মধ্যে দেনমোহর পরিশোধ সচেতনতা নেই

বললেই চলে। বিয়ের পর স্বামী দেনমোহর পরিশোধের বিষয়টি সর্বাংশে ভুলে যান এবং দেনমোহরের অর্থ দাবী না করে বা মাফ করে দেয়াই কর্তব্য বলে স্ত্রী মনে করেন।[২৮]

বাংলাদেশী মধ্যবিত্ত মুসলিম নারী বিবাহিত জীবনে দেনমোহরের টাকা দাবী না করাটাই অধিক মর্যাদাপূর্ণ বিষয় বলে মনে করেন। তবে প্রায় সব নারীরই ধারণা যে দেনমোহর স্বামী পরিশোধনীয় কোন ঋণ বা প্রতিশ্রুতি নয়। সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের প্রচলিত বৈবাহিক পরিমণ্ডলের খুব সামান্য ক্ষেত্রেই দেনমোহর পরিশোধিত হয়। ইসলাম দেনমোহরকে এতটা গুরুত্ব দেয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের সমাজে এ ব্যবস্থাটির প্রতি নারীর মতই অবহেলা করা হয়। অথচ দেনমোহর মূলত একটি বৈবাহিক চুক্তি দেনমোহর পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বৈবাহিক চুক্তি ভঙ্গেও নামান্তর। তাই সুষ্ঠু দেনমোহর ব্যবস্থার অনুশীলন সুনিশ্চিত করে নিজেদের পবিত্রতা ও সংহতি রক্ষা করা আজ আমাদেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ জন্য দরকার ব্যাপক সমাজ ও গণসচেতন এবং সামাজিক আন্দোলন।

সুতরাং ইসলাম বৈবাহিক ক্ষেত্রে যে জিনিসটির উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছে তাহলো স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেয়া দেনমোহর। কেননা, আল-কোরআনের ভাষায় দেখা যায়। বৈবাহিক বন্ধন সিদ্ধ হওয়ার প্রধান শর্তই হল মোহর বা দেনমোহর। অর্থাৎ মোহর আদায় করলেই কেবল স্ত্রী অঙ্গ হালাল হয়।[২৯]

এতে তার পিতা-মাতা, ভাই, স্বামী বা অন্য কেউ হাত দিতে পারবে না। এ অর্থ সে নিজ দায়িত্বে ব্যবসা- বাণিজ্যে ব্যবহার করে অতিসত্বর যাকাত প্রদানকারিনী হতে পারবে অধুনা দেখা যায় মুসলিম সমাজ অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়ের মত যৌতুককে বিয়ের প্রধান শর্ত করে নিচ্ছে।

প্রতিদিন আমাদেও সমাজে এই যৌতুকের কারণে ঘটে চলেছে নানা প্রকার অনাকাঙ্খিত মারাত্মক ঘটনা। এমনকি আমাদের দেশে এমন আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যার ফলে বিয়ের সময় স্বামীর পক্ষ থেকে জিনিসপত্র ও টাকা অংকের দাবী মেটানো তাদের পক্ষে সম্বব নয়। কোন আইন রচনা করে এর যতটুকু না রোধ করা সম্ভব তার চেয়ে বেশি রোধ করা সম্ভব এ সম্পর্কীয় ইসলামী নীতিমালার যথাযথ বাস্তাবায়নের মাধ্যমে। যৌতুক রোধের জন্য বরপক্ষকে যেমন পরিহার করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। যৌতুক দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। সকলের ঐকান্তিক উদ্যোগেই এটা সম্ভব।

যৌতুক আদান-প্রদান শুধু ইসলামী আইন ও মূল্যবোধের পরিপন্থীই নয়, এটা আমাদের দেশীয় আইনেও নিষিদ্ধ। ১৯৮০ সালে পাশ হওয়া যৌতুক বিরোধী আইনে যৌতুক দেয়া ও নেয়া দন্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষিত হয়েছে। তথাপি যৌতুকের কবল থেকে আমাদের মেয়েরা রেহাই পাচ্ছে না। যৌতুক আদান প্রদান ও যৌতুককে কেন্দ্র করে নারী নির্যাতন, বিবাহ বিচ্ছেদ ও গৃহবধু হত্যা যেন দেশে বেড়ে চলেছে গাণিতিক হারে। মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে সচেতনতার অভাব বা অজ্ঞতাই কি যৌতুক সমস্যার জন্য দায়ী, না কি ধর্মের নামে অজ্ঞতা, কুপমন্ডুকতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থ চিন্তা ও সমস্যার সৃষ্টির মূলে কাজ করছে সে বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক পর্যালোচনা ও তদানুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতীব জরুরী।[৩০]

দেশে যৌতুক বিরোধী আইন আছে, দেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলামেও যৌতুক আদান-প্রদান ঘৃণ্য ও নিষিদ্ধ একটি ধর্ম। এ দুই অস্ত্রকে মূলধন করে একটি যৌতুক বিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। সম্ভাব্য সে আন্দোলনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে দেশের সম্মানিত ইমাম সমাজ। ইমামগণের নেতৃত্বে মসজিদ ভিত্তিক যৌতুক বিরোধী একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলে, যৌতুক বিষয়ে বিদ্যমান আইনকে যুগোপযোগী করে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে পারলে এবং ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে যৌতুক বিরোধী মনোভাব সম্পন্ন লোকজনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা গেলেই কেবল এক্ষেত্রে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারবে। সুতরাং এ ব্যাপারে চাই ব্যাপক আন্দোলন নতুবা যৌতুকের কবল থেকে আমাদের কন্যা-জায়া-জননীরা কখনই নিরাপদ হতে পারবে না।

মায়ের মর্যাদার নারী ও পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠাকল্পে ইসলাম বারবার যে কথাটির উপর অতিমাত্রায় জোর দিয়েছেন তা হল সন্তানের জন্য মা ও বাবা উভয়ের মর্যাদাই সমান। নারী এবং পুরুষকে মহান আল্লাহ সমান মর্যাদা দিয়েছেন। এমনকি আল-কোরআন ও সুন্নাহতে মায়ের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আল-কোরআনে বলা হয়েছে- 'আমি মানুষকে তাহার পিতামাতার প্রতি সদয় ব্যবহার নির্দেশে দিয়েছি। তাহার জননী তাহাকে গর্ভধারণ করে কষ্টের সহিত, প্রসব করে আবার কষ্টের সহিত।'[৩১]

ইসলাম নারী সমাজকে সম্মান এর এমন এক স্থান প্রদান করেছেন কোন সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম ব্যবস্থায় তার নজীর পাওয়া যায় না। নারীর অধিকার ও তার সমান মর্যাদার প্রতি ইসলাম যে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে তা অভূতপূর্ব। সে শুধু নারীদের সাথেই সদ্ব্যবহার করার তাগিদ করেনি, বরং দাসীদেরকেও মান সম্মান দান করেছে। যেমন মহানবী (সা.) বলেছেন- 'যে ব্যক্তির অধিনে কোন বাদী-দাসী আছে এবং সে তাকে শিক্ষা-দীক্ষার বন্দোবস্ত করেন। নারী ও পুরুষের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও চারিত্রিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কে কোরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে পূর্ণ সমতা বিদ্যমান আর পুরুষের মত নারীও নিজ চেষ্টা প্রচেষ্টা ও ইবাদত বন্দেগীর দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতর পর্যায়ে পৌছাতে পারে।[৩২]

আধ্যাত্মিক উন্নতি ও চারিত্রিক ক্রম বিকাশের গণ্ডীতে নারীদের সমান মর্যাদার উপর জোর দিতে গিয়ে আল-কোরআন খ্যাতনামা কয়েকজন নারীর উল্লেখ করেছে। তারা নিজেদের সাধ্য-সাধনায় ও চেষ্টা-প্রচেষ্টায় উন্নত নৈতিক গুণাবলী সৃষ্টি করেছিলেন। এক্ষেত্রে হযরত মরিয়ম (আ.), ফেরাউনের স্ত্রী, মুসা (আ.)-

এর মা ও বোন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এদেরকে আল্লাহ তায়ালা আধ্যাত্মিক চরম উৎকর্ষ ও চারিত্রিক গুণাবলীর দরুণ তারা বিশেষ বরকত ও নিয়ামত দ্বারা সম্মানিত করেছেন। তাই দেখা যায় যে, যদি কোরআনের ঘোষণা অনুসারে নারী ও পুরুষের উপর সালাত ও যাকাত আদায়, সত্য ও ন্যায়ের প্রচার এবং মিথ্যা অন্যায়কে প্রতিরোধ করা সমানভাবে ফরজ হয়ে থাকে তাহলে তাদের শিক্ষা ক্ষেত্রেও একই অধিকার এবং সমান সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা সত্য ও ন্যায়ের প্রচার এবং মিথ্যা ও অন্যায় প্রতিরোধের কাজটি নিছক ঘরোয়া জীবনের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

কুরআন এমন কোন সীমা নির্ধারণ করে দেয়নি, যাতে এটা প্রমাণিত হয় যে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত বিষয়ে সরকার কিংবা সমাজকে সঠিক পথনির্দেশ এবং ভ্রান্ত নীতি অবলম্বনে বাধা দানে নারী সমাজের কোন অধিকার নেই। তাছাড়া যদি ভালোর আদেশ ও মন্দের নিষেধের বিধানটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়ে থাকে তাহলে যে নারী সমাজকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে দেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক শিক্ষাদান কার্য কিংবা অর্থনৈতিক ও শিল্পকর্ম হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে, তারা সমাজ ও সরকারকে ভ্রান্ত পথে চলা থেকে কিভাবে বাধা দিতে পারে? যে নারীসমাজ রাজনীতি জ্ঞান শূন্য, যারা তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণা শূন্য, যাদের শিক্ষানীতি সম্পর্কে কোন ধারণা নেই; তারা এসব ব্যাপারে ভালোর আদেশ ও মন্দের নিষেধের বিধান হতে কিভাবে দায়িত্বমুক্ত হবে? সুতরাং কুরআনের উপরোক্ত আয়াত থেকে অনিবার্যরূপে এই অর্থ বেরিয়ে আসে যে, নারী এবং পুরুষ কেবল ঘরোয়া জীবনেই সমান অধিকার রাখে না। রাজনীতি, অর্থনীতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও তারা সমান মর্যাদার অধিকারী। নারী যদি তার ঐ সব বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য হতে মুক্ত হতে পারে যা পারিবারিক জীবনের গণ্ডীতে তার উপর অর্পিত হয়েছে, তাহলে গোটা দেশীয় ও রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ করা তাদের পক্ষে শুধু জায়েজই নয়, অপরিহার্যও হয়ে পড়ে।

এমন অনেক প্রমাণ রয়েছে যাতে দেখা যায় যে, নারীগণ প্রায়ই মহানবী (সা.) এর নিকট এসে পারিবারিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করতেন। মহানবী (সা.) সাহাস্য বদনে, উদার মানসিকতার সাথে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাবলী সম্পর্কে তাদেরকে পথনির্দেশ দান করতেন। তৎকালীন বিশ্বের সাধারণ অবস্থা বিশেষত আরব ভূখণ্ডের অবস্থার প্রেক্ষাপটে সেখানে যেমন নারীদের জন্য, তেমনি বালকদের জন্য কোন উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। তাই নারী শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝার জন্য আমাদেরকে দেখতে হবে যে, নারীদের মধ্যে যারা ধর্মীয় বিশ্বাসগত, আইনগত ও রাজনৈতিক বিষয়সমূহের জ্ঞান লাভ করতে চাইত ঐ নারীদের সাথে মহানবী (সা.) কি পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। নবী জীবনের উপর দৃষ্টিপাত করলে সাধারণত দেখা যায় তিনি মুসলিম নারীদেরকে তাঁর দরবারে এসে যখনই ইচ্ছা এসব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার সাধারণ অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন। তিনি নারীদের জ্ঞানস্পৃহা ও অনুসন্ধানপ্রিয়তাকে শুধু সুনজরেই দেখেন নি, বরং স্পষ্টত তাদের উৎসাহ যুগিয়েছেন। স্বয়ং তাঁর পত্নী হযরত আয়েশা (রা.) সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রাথমিক যুগে কেবল আরকান-আহকাম ব্যাপারেই নয়, বরং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁর মতামত ও পরামর্শ বিরাট গুরুত্ব বহন করত। বিশেষ করে ফিকহ্ (ব্যবহারিক) মাসয়ালার ক্ষেত্রে হযরত আয়েশার (রা.) ইজতিহাদ সমূহ আজও স্বীকৃত হয়ে আছে।[৩৩]

তবে এটাও সত্য যে, যদিও আল-কোরআনে নারী ও পুরুষের মৌল সমতা স্বীকার করে এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাদের সমান অধিকার প্রদান করে, কিন্তু নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক ও মনস্তাত্ত্বিক তারতম্যকে মোটেই উপেক্ষা করে না। কেননা প্রকৃতি উভয় শ্রেণীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতা ও শক্তি নিহিত রেখেছে। তাদেরকে সমাজ যোগ্যতা ও সমান শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়নি। আল-কোরআন এ কথা স্বীকার করে যে, পুরুষ ও নারী প্রত্যেকে নিজ নিজ বিশেষ ও স্বতন্ত্র সামাজিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কেননা প্রকৃতি তাদেরকে কোন কোন ক্ষেত্রে পরস্পর থেকে ভিন্নতর বানিয়েছে এবং সভ্যতার উৎকর্ষের জন্য প্রত্যেক শ্রেণীকে কিছু বিশেষ দায়িত্ব অর্জন করেছে। এজন্যই এমন কিছু কাজ রয়েছে যা নারী-সমাজ খুবই ভালভাবে সম্পাদন করতে পারে এবং কোন কাজ পুরুষের নারীদের চেয়ে অধিক সুন্দররূপে সম্পন্ন করতে পারে। কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে নারী ও পুরুষ একে অপরের ব্যক্তিত্ব পূরণ করে। সেসব গুণ পুরুষের মধ্যে কম রয়েছে। প্রকৃতি তা নারীর মধ্যে কিঞ্চিত বেশি দিয়েছে এবং যেসব গুণ থেকে নারী সমাজ বঞ্চিত তাদের ঘাটতি পুরুষরা পূরণ করে।[৩৪]

নারী ও পুরুষের কর্তব্য  মর্যাদা সম্পর্কে আল-কোরআন এমন কিছু ইঙ্গিত প্রদান করেছে, যাতে বুঝা যায় যে, ইসলাম পুরুষ ও নারীর সমান মর্যাদা স্বীকার করার পর তাদের ব্যবধান ও তারতম্যকে নজরে রেখেছে। যেমন- কোরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, নারীকে পুরুষের জন্য শান্তি ও আরামের কারণ হতে হবে। এখন যদি কোন নারী এটাকে অস্বীকার করে, নারী স্বাধীনতা ও সাম্য নীতির অজুহাত তুলে ধরে এ দাবী করে যে, সে এ শান্তি ও আরামের উপকরণ যোগাতে বাধ্য নয়, বরং নিজ সংসারের প্রতি উদাসীন থেকে যেনতেনভাবে জীবন-যাপন করবে, তবে এ দাবী কোরআনের সাম্য নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।[৩৫] আবার কোরআনে বলা হয়েছে যে, 'কোন কোন ক্ষেত্রে নারী পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে পুরুষ এক ধাপ পরে।'[৩৬]

*Dhaka University Institutional Repository*

সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে পুরুষের মতামত নারী অপেক্ষা কিছুটা বেশি মূল্যবান বিবেচিত হলেও পুরুষরা হচ্ছে প্রভুত্বের অধিকারী এ ধারণা যারা পোষণ করেন তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কোরআনে বর্ণিত 'কাওয়ামুনা'-এর অর্থ প্রভুত্ব নয়, বরং অর্থনৈতিক দিক থেকে পুরুষ হচ্ছে তার পরিবারের যামিন। আর তাই সে পরিবারের শান্তি শৃঙ্খলা ও গৃহের তত্ত্বাবধানে নারীর চেয়ে কিছুটা বেশি ক্ষমতাবান। কোরআন পুরুষকে এর চেয়ে আর কোন শ্রেষ্ঠত্ব দান করেনি।

ইসলাম নারী ও পুরুষের আলাদা বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের জন্য কতিপয় বিশেষ অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যা মিলিত অধিকার ও কর্তব্য থেকে ভিন্নতর। অর্থাৎ কোন কোন অধিকার ও কর্তব্য এমন যে তা একটি মাত্র শ্রেণীর সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু মূলগতভাবে পুরুষ ও নারীর মধ্যে পূর্ণ সমতা বিরাজমান। এটা স্পষ্ট যে, কোরআন যখন নারীদেরকে পুরুষদের জন্য শান্তির কারণ হিসেবে গণ্য করে তাদের মধ্যকার ভালবাসার সম্পর্কে একটি নৈসর্গিক সম্পর্কের মর্যাদা দান করেছে তখন তার অর্থ দাঁড়ায় যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্ক দৃঢ় ভিত্তিক উপর দাঁড়ানো উচিত।

মহানবী (সা.) এর প্রাক নব্যুওয়াত যুগে নারীর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা বলতে কিছু ছিল না। নারীর নিজস্ব সত্ত্বা আছে বলেও কেউ স্বীকার করত না। ফলে পুরুষ সমাজ নারীদেরকে ভোগের বস্তু হিসেবে যথেচ্ছা ব্যবহার করত। যত খুশি বিয়ে করত এবং যখন-তখন তালাকও দিত। এরূপ অসহনীয়, অমানবিক ব্যবস্থা উৎপাটিত করে নারীদের ন্যায্য অধিকার সমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। পুরুষ কর্তৃক স্ত্রী গ্রহণের সংখ্যা শর্ত সাপেক্ষে সর্বোচ্চ চারজন নির্ধারিত হয়। কিন্তু কেউ শর্ত পালনে সক্ষম না হলে তার একাধিক বিয়ে মটেই বৈধ নয়।[৩৭] আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় এবং ভারতবর্ষেও হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় একাধিক বিবাহকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়। এমনকি কঠোর দন্ডনীয় ব্যবস্থাও তাতে রয়েছে। এ ব্যবস্থায় দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তি বজায় রাখা এবং নারীর প্রতি অন্যায় অবিচারের প্রতিরোধ করা ব্যতিত অন্য কিছু আছে বলে আমাদের জানা নেই। যদি কেবল একারণেই এ ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়ে থাকে তবে এতে নতুনত্বের কিছু নেই।

প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই ইসলাম এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। একাধিক স্ত্রী গ্রহণ ইসলাম কর্তৃক আরোপিত শর্ত হল যদি কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করা দাম্পত্য জীবনের সুখ বজায় রাখতে পারে তবে তার জন্য একান্ত প্রয়োজনবোধে সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি রয়েছে। কিন্তু বাধ্যবাধকতা নেই। আর যদি সমতা রক্ষা করে সুখ শান্তি বজায় রাখতে অপারগ হয় তবে তার জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহন করা নিষিদ্ধ। উল্লেখ্য যে কোন বিত্তশালী, স্বাস্থ্যবান পুরুষ যৌন সম্পর্কীয় কোন কারণশত এক স্ত্রীতে তুষ্ট থাকতে না পারলে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় বা প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় তার বেশ্যাগমন বা কোন বান্ধবী অন্বেষণের ন্যায় হীন ও জঘণ্যতম সমাজ বিরোধী কার্য ব্যতীত বিকল্প পথ নেই। নারী জাতির প্রতি এটা যে অন্যায় ও অবিচার তা যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করবেন। এক্ষেত্রে ইসলাম শর্ত সাপেক্ষে চারজন স্ত্রী পর্যন্ত গ্রহণের অনুমতি দিয়ে নৈতিকতা বর্জিত অন্যায় ও অশ্লীল সমাজ বিরোধী কাজ করা থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করে সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছে তা সবাই স্বীকার করবেন।

ইসলাম পক্ষপাতমূলক নীতির বহু উর্ধ্বে। ইসলাম সর্বক্ষেত্রে সকলের প্রতি ভারসাম্যমূলক নীতি নির্ধারণ করে এসেছে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অন্ধকার যুগে নারীগণ ছিল মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। এরূপ সমাজ গর্হিত ব্যবস্থা হিন্দু ও খ্রীষ্টান সমাজে আজও বিদ্যামন নীতিবাদীরা অবশ্যই এটাকে নারীর প্রতি সুবিচার বলবে না। ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকার নীতিতে সকল সন্তান ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন, নর-নারী সকলকেই উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা প্রদান করেছে। নারীকে মানব জাতির ধারাক্রম রক্ষায় সমানভাবে অপরিহার্য এক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মানব সত্তারূপে স্বীকৃতি দান ছাড়াও ইসলাম তাকে উত্তরাধিকারের এক সুনির্দিষ্ট অংশ দিয়েছে। ইসলামের পূর্বে তাকে শুধু ঐ অংশ থেকেই বঞ্চিত করা হয়নি, বরং তাকেই উত্তরাধিকার রূপে প্রাপ্য পুরুষের সম্পত্তিরূপে গণ্য করা হত। নারীর সহজাত মানবীয় গুণাবলীকে স্বীকৃতি দিয়ে ইসলাম তাকে ঐ হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তির পর্যায় থেকে এক স্থায়ী উত্তরাধিকারের পরিণত করেছে। সে স্ত্রী হোক কিংবা জননী, ভগ্নী হোক কিংবা কন্যা যে কোন অবস্থায় সে পরলোকগত নিকটাত্মীয়ের সম্পত্তির নির্দিষ্ট অংশ লাভ করে, যার পরিমাণ নির্ভর করে পরোলোকগত ব্যক্তির সাথে তার সম্পর্কের ধরণ এবং উত্তরাধিকাদের মোট সংখ্যার উপর। এই অংশ একান্তভাবেই তার, কোন ব্যক্তি একে ছিনিয়ে নিতে কিংবা তাঁকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। এমনকি মৃত ব্যক্তি যদি অন্য কোন আত্মীয়ের কাছে অথবা অন্য বিষয়ের অনুকূলে অসিয়ত করে তাকে বঞ্চিত করতে চায়, তাহলে আইন তাকে তা করতে দেবে না। যেকোন মালিক বা স্বত্বাধিকারী তার সম্পত্তির শুধুমাত্র এক তৃতীয়াংশের সীমার মধ্যে অসিয়ত করতে পারে, যেন সে তার উত্তরাধিকারী নর-নারীর অধিকার ক্ষুণ্ন করতে না পারে। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সমতা ও তুল্যতা পুরোপুরি প্রযোজ্য।[৩৮]

সুতরাং দেখা যায়, মহানবী (সা.) এর প্রাক-নব্যুয়াত যুগের কোন সভ্যতা ও সংস্কৃতি নারী সমাজকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে নি। ইসলামই সর্বপ্রথম নারীকে সসম্মানে পূর্ণ অধিকার ও মর্যাদাসহ প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলামের সেই পথ ও মত ব্যতীত নারী সমাজ কোন দিন সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না এটা

নিশ্চিত। মহানবী (সা.) নারী সমাজকে পুরুষের সমান নয়, তাদের থেকেও অধিক মর্যাদা ও অধিকার দান করেছে। এমন অধিকার, সম্মান, মর্যাদা ও নিরাপত্তা নারী জাতিকে দুনিয়াতে অদ্যবধি আর কেউ দেয়নি এবং দিতে পারবে না। নারী জাতির জন্য এর চেয়ে কোন ইহসান নেই। সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্নে নারী পুরুষ সমতাবিষয়ে ইসলামের এই মহিমানব বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি সত্বেও বর্তমান সমাজে অজ্ঞতা কিংবা বিরোধবশত যে কোন কারণেই হউক এমন একটা ভুল ধারণার জন্ম দিয়েছে যে, ইসলামে নারীর স্থান পুরুষের নিচে এবং পুরুষের তুলনায় তাদের অধিকার ও মর্যাদা কম। এ ধারণা যে একবারেই ভিত্তিহীন ও অন্তঃসারশূন্য এবং এটা যে ইসলামের বিরুদ্ধে কত বড় অপবাদ, উপর্যুক্ত পর্যালোচনাই তার প্রমাণ।

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান একটি দেশ। এর শতকরা ৮৮.৩ ভাগ জনগণই ইসলাম ধর্মের অনুসারী মুসলমান।[৩৯] তথাপি দেখা যায় এ বিষয়ে ইসলামে নীতিমালাগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না। যা কিছু অনুসরণ করা হচ্ছে তা নিতান্তই ইসলামের একটি খণ্ডিত কিংবা বিকৃত রূপ মাত্র। এক্ষেত্রে ইসলামের নীতিমালা অনুসরণ না করার অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই অব্যাহত গতিতে আমাদের দেশে বেড়ে চলেছে নারী নির্যাতন, যৌতুক প্রথা, যৌতুকের জন্য দৈহিক ও মানসিকভাবে চাপ প্রয়োগ, অপহরণ, জোরপূর্বক পতিতা বৃত্তিতে নিয়োগ, ধর্ষণ, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে, এসিড নিক্ষেপ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিদেশে পাচার, তালাক, ধর্ষণ করতে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনা বা জখম করা ইত্যাদি অপরাধগুলো ব্যাপক আকার ধারণ করছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী মূল্যবোধের অনুপস্থিতি কিংবা অবমূল্যয়নই আমাদের দেশে নারী নির্যাতনকে আরো ত্বরান্বিত করছে। এতে দেখা যায় পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় বাংলাদেশে নারীদের পুরুষদের অপেক্ষা হীন মনে করা হয়। এখানে নারীর সঠিক মূল্যায়ন হয় না বলেই তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিতে পুরুষরা নির্যাতন চালায়। নারী নির্যাতনে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা অনেকাংশে দায়ী। ইসলাম ধর্ম ও বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার থাকলেও নিরক্ষর জনগোষ্ঠী এ সত্য কথাটি জানে না। আবার নারীরাও তাদের অধিকার সম্পর্কে তেমন একটা সচেতন নয়। তাই তারা অহরহ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।[৪০]

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ একটি গুরুত্বপর্ণ বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। নিম্ন আয়ের লোকেরা বহু বিবাহ করে স্ত্রীদের মর্যাদা তো দিচ্ছেই না, বরং তাদের উপর বিভিন্ন ভাবে পাশবিক ও মানসিক নির্যাতন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে এখনও বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। আবার যৌতুক প্রথা বাংলাদেশে বিদ্যমান থাকায় এ সমস্যা আরো প্রকট রূপে দেখা দিয়েছে। দরিদ্র অভিভাবকগণ তাদের কন্যার বিয়েতে যৌতুকের দাবী পূরণ করতে ব্যর্থ হলে বরের পক্ষ থেকে স্ত্রীর উপর অমানবিক নির্যাতন নেমে আসে। এমনকি স্বামী- পুত্র- সন্তানের শোকে স্ত্রীদের উপর নির্যাতন চালায়। অন্যদিকে পতিতাবৃত্তি প্রথা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের দেশে পতিতাবৃত্তির আইনগত বৈধতার সুযোগে নারীদেহ ব্যবসায়ী মেয়েদের অপহরণ করে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ করে।

মানসিক নিপীড়ন নারী নির্যাতনের একটি বিশেষ দিক। মানসিকভাবে নির্যাতিত নারীরা অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। বাংলাদেশ শহরে গ্রামাঞ্চলে অহরহ নারী আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। আর এসব ঘটনার প্রকৃত কারণ হল পারিবারিক অশান্তি, দাম্পত্য কলহ, যৌতুক প্রথা ইত্যাদি। সুতরাং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারী নির্যাতন মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এদেশে নারী নির্যাতন যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে সমাজে শুধু নারীদের নিরাপত্তাই বিঘ্নিত হচ্ছে না বরং সামাজিক সংহতি এবং পারিবারিক সৌহার্দ্য মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। নারী নির্যাতনের প্রভাব পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বহুমুখী সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি উদাসীনতা বা এড়িয়ে চলার প্রবণতাই এহেন সামাজিক দুরবস্থার বিশেষত: নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ। ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাবে মানসিক চিন্তা-চেতনার অনুপস্থিতির কারণেই বর্তমানে বাংলাদেমে নারীদের উপর এসিড নিক্ষেপ, হত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ, পাচার এবং নানাভাবে দৈহিত ও মানসিক নির্যাতন ও নিপীড়নের হার অতিমাত্রায় বেড়ে গেছে। ফলে নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা মারাত্মক হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।[৪১]

এ ব্যাপারে আরও স্পষ্ট বক্তব্য হল এই যে, নারীর মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আলোকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ইসলাম নারী সমাজকে গৃহের চার দেয়ালের মাঝে আবদ্ধ রাখেনি, বরং দৈনন্দিন কাজে নারীদেরকে ঘরের বাইরে আসার ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছে। ইসলামী সমাজে মেয়েরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবে এবং পুরুষদের জীবনের সমান অংশীদার হিসেবে দৈনন্দিন জীবনের কাজ-কর্মে অংশগ্রহণ করবেন। ইসলামের যেসব নিয়ম-নীতির দ্বারা নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয়, সেসব নিয়ম-নীতি নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনের প্রসঙ্গিক আয়াতগুলো হল- " হে মুমিনগণ! তোমরা নিজদিগের গৃহ ব্যতিত অন্য কাহারও গৃহে গৃহবাসীদিগের অনুমতি না লইয়া এবং তাহাদিককে সালাম না করিয়া প্রবেশ করো না। ইহাই তোমাদিগের জন্য শ্রেয়, যাহাকে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। যদি তোমরা গৃহে কাহাকেও না পাও তাহা হইলে উহাতে প্রবেশ করিবে না যতক্ষণ না তোমাদিককে অনুমতি দেওয়া হয়। যদি তোমাদিগকে বলা হয়, ফিরিয়ে যাও, তবে তোমরা ফিরিয়া যাইবে, ইহাই তোমাদিগের জন্য উত্তম এবং তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।[৪২]

পারিবারিক জীবনে নিরাপত্তার ও নারী পুরুষ সমতা বিষয়ে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি তা খুবই উদার, নি:স্বার্থ ও মানবিক আধুনিক পাশ্চাত্য জীবন ধারার ন্যায় সংকীর্ণ ও স্বার্থপর নয়। কেননা ইসলাম বৈবাহিক সম্পর্ককে পাশ্চাত্যের ন্যায় কেবলমাত্র যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির এক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান বলে মনে করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে জীবনের বিস্তার, বিকাশ এবং পূর্ণতার সোপান হল বৈবাহিক জীবন। পারস্পারিক সাহচর্য, সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতার মধ্য দিয়ে জীবন হয় বিকশিত। বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে জীবন এগিয়ে চলে পূর্ণতার দিকে। এরই মধ্যে রয়েছে মানসিক শক্তি, স্বস্তি এবং নিরাপত্তার একান্ত নিবৃত্ত কোণ। আল-কোরআনে তাই বলা হয়েছে- "এবং তাহার নির্দেশনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে তিনি তোমাদিগের জন্য তোমাদিগের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদিগের সঙ্গীনিদিগকে যাহাতে তোমরা উহাদিগের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদিগের মধ্যে পারস্পারিক ভালবাসা ও দয়ার সৃষ্টি করিয়াছেন।[৪৩]

এখানে আত্মিক প্রশান্তিও কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই প্রারম্ভিকা। এর পথ বেয়ে আসে ঘনিষ্ঠতা এবং সহমর্মিতা। জীবন চলার পথে পারস্পরিক সহযোগিতা, সাহচর্য এবং সহানুভূতি পরস্পরকে ক্রমান্বয়ে বেঁধে দেয় মজবুত বাঁধনে। স্ত্রী হবে স্বামীর পরিপূরক, স্বামী ঘুচিয়ে দিবে স্ত্রীর যত অপূর্ণতা। এভাবে একে হয়ে উঠবে অপরের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত সহচর।

প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক বিবাহ বিচ্ছেদ এবং গৃহত্যাগের মূলেও ক্রিয়াশীল ঐ সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। পাশ্চাত্যে বিবাহ বিচ্ছেদের সিংহভাগই ঘটে পারস্পারিক নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার অভাবে। এগুলো হচ্ছে ধর্মবিমুখ পারিবারিক ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি। দেখতে পাই মানব সমাজের প্রধান সমস্যা হচ্ছে দুটি। যেমন ব্যক্তি ও ব্যক্তি সমষ্টির পারস্পারিক সম্পর্ক নির্ধারণ এবং সমাজ-সভ্যতায় মহিলাদের অবস্থান নির্ধারণ। এ দুটি ক্ষেত্রে আধুনিক মতবাদগুলো সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বর্তমান বিশ্বেও আধুনিক পাশ্চাত্য জীবন ধারা এ দুটি ক্ষেত্রেই মানুষকে কঠিন দুর্ভোগের আবর্তে নিক্ষেপ করেছে। বিভিন্নভাবে দেখা গেছে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ কিংবা সমাজবাদ কোনটাই মানুষের জন্য কল্যাণকর ব্যবস্থা নয়।

বাংলাদেশের ইসলাম প্রিয় জনগোষ্ঠীকে ইসলামী জীবন যাপনের জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে প্রয়োজনীয় তৎপরতা গ্রহণ ও ক্ষেত্রে বিশেষে ত্যাগ স্বীকারের দীক্ষায় উজ্জীবিত করতে এবং সুসংহত করে সুগঠিত শক্তিতে রূপান্তর করতে যে উদ্যোগ ও তৎপরতা প্রয়োজন এই মুহূর্তে তার বড়ই অভাব। যথাযথ ধর্মীয় আবেগ, অনুভূতি ও আদর্শের যথার্থ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এর যথোচিত মোকাবিলা করতে পারলে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে দেশের নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই তৎপর হওয়া বাঞ্চনীয়।

এ প্রসঙ্গে বলা যায়, নারী প্রগতির অর্থ জীবনের সার্বিক উন্নতি, অগ্রগতি। আর সংসার হল নারী প্রগতির প্রথম উন্নয়ন ক্ষেত্র। নারী জীবনের মূল লক্ষ্যবস্তু হল তার সংসার। একজন প্রগতিশীল নারী সংসার সুন্দরভাবে সুপরিচালনার মাধ্যমে গৃহকর্ম ও মূল কর্তব্য পালনে উন্নতির দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। নারী প্রগতি ও নারী মর্যাদার মহান আল্লাহর দেয়া অন্যতম নিয়ামত হল হিজাব বা পর্দা। নারী প্রগতি মানেই তো নারীর সার্বিক উন্নতি। আর এ উন্নতির জন্য সর্বাবস্থায় প্রয়োজন ইসলামী নিয়মনীতি মেনে চলা। ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে নারী প্রগতি ও নারী মর্যাদা রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। নারী প্রগতির প্রথম শর্তই হল নারী মর্যাদার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। আর সেটা সম্ভব ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পালনের মাধ্যমে দেখতে পাই বিশ্ব নারী সমাজের মধ্যে নারী প্রগতি ও নারী মর্যাদার সুন্দরতম উন্নত ব্যবস্থা একমাত্র ইসলামী আইন বা বিধানের মধ্যে রয়েছে। পৃথিবীতে মানব জন্মলগ্ন থেকেই ইসলাম নারীর মর্যাদা নিয়ে এসেছে। ইসলাম একটি প্রগতিশীল ধর্ম ব্যবস্থা। আর এর ঐতিহ্য, নারী প্রগতি ও নারী মর্যাদার সর্বাবস্থায় অবিকৃত। এ প্রসঙ্গে লাইলী আকতার যথার্থ বলেছেন- 'নারী প্রগতি ও নারী মর্যাদার অধিকার পেতে হলে, কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করলে সত্যিকার মর্যাদার অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হতে পারে। কোন মুসলিম নারী যদি আল্লাহর দেয়া বিধানকে লংঘন করে নিজেদের মনগড়া বিধান অথবা অন্য কোন বিজাতিকে অনুসরন করে, তাহলে ইহকাল পরকাল দু'কালেই সেই নারীর জন্য মানবতার মুক্তির বদলে বয়ে আনবে ভয়াবহ আযাবের মহাপ্লাবন। চিন্তা করলে দেখা যায় জগতের যেখানেই অশান্তি ও অনর্থ সৃষ্টি হয়েছে তার অধিকাংশ কারণ ধর্মীয় অনুশাসন থেকে বিপরীতভাবে চলা। আল্লাহর নাফরমানী করা, তাঁর আদেশ নিষেধের অবমাননা করা। আর তা করলে কোন নারীই পৃথিবীতে প্রগতিশীল মর্যাদার অধিকার পেতে পারে না।[৪৪]

সুতরাং নারী সমাজের মানবাধিকার ও সমতা বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি যেহেতু পাশ্চাত্য হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন সেহেতু এর পারিবারিক জীবন ও ব্যাপক ও বহুমূখী। এখানে স্বামী-স্ত্রীর স্বার্থপরতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতার অবকাশ বা প্রবণতাই কোনটাই নেই। পারিবারিক জীবনের শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য ইসলামের প্রথম পদক্ষেপ হল মানুষের চেতনার গভীরভাবে প্রোথিত করা। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, এই বোধ বিশ্বাসই পরিবারের অফুরন্ত কল্যাণের বাহন এবং বহু প্রকার সামাজিক সমস্যার একমাত্র প্রতিরোধক।

## তথ্য নির্দেশিকা

১. প্রথম আলো, সংখ্যা-১২৩, ৮ই মার্চ,২০১৪।

২. নারী ও শিক্ষাঃ উইমেন ফর উইমেন রিসার্চ এন্ড স্টাডি গ্রুপ, ৮/৫, লালমাটিয়া, ঢাকা, পৃ-২৩।

৩. আব্দুর রউফ সম্পাদিত, প্রজন্ম (পরিবার পরিকল্পনার সহায়ক সেবায় কার্যক্রম), ১৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৯৫, পৃ-১২

৪. আব্দুর রউফ, প্রাগুক্ত, পৃ-১২।

৫. UNICEF Report of a peasibility survey of productive in come severating Activities for means as Bangladesh Development programme, Dhaka-1977. ।

৬. তাহমিনা আখতার, প্রাগুক্ত, পৃ-২৩, ২৪।

৭. Elen Suthar, Village women's at work in women's for women's Dhaka University Press-1975, p-39. ।

৮. সুরাইয়া বেগম, নারী নির্যাতনের একটি দিক, বাংলাদেশে নারী নির্যাতন, সম্পাদক বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও জেরিনা রহমান খান) সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭, পৃ-৩৩-৩৮।

৯. সুরাইয়া বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৮-৩৯।

১০. রেহনুমা আহমেদ, 'ধর্মীয় মতাদর্শ ও বাংলাদেশে নারী আন্দোলন', বাংলাদেশ নারী নির্যাতন, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৭-১১০, দ্রষ্টব্য।

১১. রেহনুমা আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ-১০২-১০৫।

১২. আল-কুরআন, ২ ঃ ১৮৭, ৩ ঃ ১৯৫, ৪ ঃ ১, ৪৯ ঃ ১৩, ৯ ঃ ৭১।

১৩. আল-কুরআন, ৪ ঃ ১।

১৪. আল-কুরআন, ৪ ঃ ১।

১৫. আল-কুরআন, ২ ঃ ১৮৭।

১৬. আল-কোরআন, ১৬ ঃ ৫৯ ।

১৭. আল-কোরআন, ২ ঃ ২২৮ ।

১৮. অলি আল দীন, পৃ-৪২৩ ।

১৯. আল-কোরআন, ১৭ ঃ ৩২ ।

২০. আল-কোরআন, ৭ ঃ ২৬।

২১. আল-কোরআন, ২৪ ঃ ৩১।

২২. আল-কোরআন, ২৪ ঃ ৩০

২৩. আল-কোরআন, ৭ ঃ ২৭ ।

২৪. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, ১১শ খন্ড, পৃ-৯৬।

২৫. আল-কোরআন, ৪ ঃ ৪।

২৬. ওবায়েদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, শরহে বেকায়া, (অনু-মাওঃ রফিকুল ইসলাম) ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ-১৬৫।

২৭. Ayesh Noman, op.cit, p-11।

২৮. Gazi shamsur Rahman, Islamic law, Islamic Foundation Bangdesh, Dhaka-1981, 196-197 ।

২৯. আল-কোরআন ঃ ৪ ঃ ২৪।

৩০. দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ই জুলাই, ২০০২, পৃ-৪।

৩১. আল-কোরআন, ৪৮ ঃ ১৫।

৩২. আল-কোরআন, ৪ ঃ ১২৪ ও ৯ ঃ ৭১-৭২।

৩৩. মোহাম্মদ মাজাহার উদ্দিন সিদ্দিকী, ইসলাম ও নারী-পুরুষের সমতা, ইসলামীক ফাউন্ডেশন পত্রিকা অক্টোবর-ডিসেম্বর, সংখ্যা-১৯৬২, পৃ-১৫৮।

৩৪. মুহাম্মদ মাযহার উদ্দিন সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬১।

৩৫. আল-কোরআন- ৭ ঃ ১৮৯।

৩৬. আল-কোরআন- ২ ঃ ২২৮।

৩৭. আল-কোরআন, ৪ ঃ ৩।

৩৮. Hammuda Abdalati. Op. Cit. P-187.

৩৯. Statistical Year Book of Bangladesh-2000, Bangladesh Burcaur of statistics 21ed. P.20 - 30।

৪০. মোঃ শফিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ-২৭৭।

৪১. শফিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ-২৮।

৪২. আল-কোরআন, ২৪ ঃ ২৭-২৮।

৪৩. আল-কোরআন, ৬০ ঃ ২১।

৪৪. মাসিক মদীনা, মার্চ-১৯৯৮, পৃ-২৪।

*Dhaka University Institutional Repository*

## সপ্তম অধ্যায়
## সুপারিশমালা

"বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের আইনগত মর্যাদা ও উত্তরাধিকার" গবেষণাটি একটি সমাজিক গবেষণা । সেজন্য এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি গবেষণা। নারীর আইনগত মর্যাদা ও উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার সুপারিশমালা-

১। নারীদের সমতা প্রতিষ্ঠা করে সবার জন্য অগ্রগতি সাধন করতে হবে।

২। অর্থনীতির পরিসর বাড়াতে এবং অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে লিঙ্গসমতা ও নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন জরুরী।

৩। যত বেশি নারী কাজ করবে, অর্থনীতি তত বেশি শক্তিশালী হবে। নারীদের কাজের সুবিধা বাড়ানো ও উন্নতি করতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৪। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা এবং সমান সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে তাদের পূর্ণ অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বে সহযোগিতা করা গেলে ন্যায়সংগত ও সামুদয়িক অর্থনৈতিক উন্নতি এবং দারিদ্র্য কমানো যাবে।

৫। নারী উন্নয়নের বিভিন্ন উদ্যোগকে অনুপ্রেরণা প্রদান এবং সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে যদি মূলধারায় যুক্ত করা যায় তাহলে সমাজে কাঙ্খিত পরিবর্তন সম্ভব।

৬। পরিবর্তনের লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগগুলোকে যদি উৎসাহ অনুপ্রেরণা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া যায় আর সহযোগী বাড়ানো যায়, তাহলে নারীর আইনগত মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

৭। অসচেতন ও দায়িত্ব বর্জিত ব্যক্তি বা সমাজ মাঝে মধ্যে নারী দিবস উদযাপন করে খবরা-খবর ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজের জানা-বোঝাকে প্রসারিত করার সুযোগ পায়। ফলে নারী-পুরুষ সমতা বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করার ও শিক্ষা লাভের সুযোগ থাকে, অজ্ঞতা কমে।

৮। নারী দিবসকে উপলক্ষ করে সদা প্রান্তিকে অবস্থানরত নারী ও তার জীবনগাথা জনসমক্ষে তুলে ধরার আর প্রশংসা করার সুযোগ তৈরি হয়। বছরে একদিনের জন্য হলেও নিজেকে চেনার সুযোগ পায়। তার অবদান ও অবস্থানকে মূল্যবান হিসেবে দেখতে পায়।

৯। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ করে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসাগুলোতে ইসলামী শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ ইসলামী রীতিবদ্ধ আইন সিলেবাসভূক্ত করে পরিস্কার ধারনা দিয়ে শক্তি, সাহস, অঙ্গীকার ও নিষ্ঠা বিনিময়ের মাধ্যমে সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সচেতনতাবোধ সৃষ্টি করতে হবে।

১০। মসজিদের ইমামদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে তাদেরকে সুস্পষ্ট ধারনা দিতে হবে। যাতে তারা মসজিদে পর্যবেক্ষনমূলক কাজ এবং প্রশিক্ষন দিতে পারে।

১১। মসজিদকে সামাজিক উন্নয়নের গনসচেতনতামূলক প্রশিক্ষন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

১২। ধর্মীয় বা জাতিগত সংখ্যালঘু, দুর্গম ও চরের বাসিন্দা, প্রতিবন্ধী, ফলিত, যৌনকর্মী, হিজড়া বা অন্য কোন যৌন বৈশিষ্ট্যের সম্প্রদায়- কোন নারী ও শিশুই যেন উন্নয়নের মূল স্রোত থেকে বাদ পড়ে না যায়।

১৩। আজকের মেয়ে শিশু তথা ভবিষ্যতের নারীর জীবনে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা ও তার কারণগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করে এবং দূর করার জন্য পারিবারিক, সামাজিক, শিক্ষাগত, সাংস্কৃতিক, চেতনাগত, দৃষ্টি-ভঙ্গিগতভাবে উদ্যোগ নিই, তাহলে নারী-পুরুষ সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা যাবে এবং নারীর আইনগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৪। এদেশের এলিট শ্রেণী বা রাজনীতিবিদরা ধর্ম এবং রাজনীতিকে পুঁজি করে জনসাধারণকে ভুল পথে পরিচালিত করে। তাই তাদের এ ধরনের ঘৃণ্য রাজনীতি থেকে দূরে সরে আসতে হবে এবং সুস্থ্য মন-মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

১৫। স্থানীয় সরকার পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন বাড়াতে হবে। জাতীয় রাজনীতিতেও নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে, নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় নারীর গুরুত্ব বাড়াতে হবে।

১৬। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে নারীর অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে।

১৭। সামাজিক-সাংস্কৃতিক-মনস্তাত্ত্বিক বৈষম্য দূর করে নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে।

১৮। সমাজে নারী-পুরুষ সমতা অর্জনের পথে পশ্চাৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গি এক বিরাট বাধা। পুরুষ সহকর্মীদের পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। শিক্ষায় নারীর আরও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধে ব্যাপক রূপান্তর ঘটাতে হবে; আসতে হবে পরিবর্তন। পরিবর্তনে উৎসাহিত করতে হবে গোটা সমাজ ব্যবস্থাপকে।

১৯। মানসিকতা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও যথাযথ প্রয়োগ এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক যেসব আন্তর্জাতিক চুক্তিতে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে, তাঁর বাস্তবায়নে গুরুত্ব দিতে হবে। বাংলাদেশ সরকার এ পর্যন্ত নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও)। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ (সি আর সি) এবং নির্যাতন ও অমানবিক আবরণের বিরুদ্ধে সনদে (সিএটি) স্বাক্ষর করেছে। এসব সনদের সঙ্গে সংগতি রেখে দেশের প্রচলিত আইনগুলোকে সংশোধন করতে হবে। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারের ১৬টি বিশেষ আইন ও নীতি থাকার পরও এসব আইন তেমন কোনো কাজে আসছে না। নারীর মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি ও জটিল প্রক্রিয়া। এর জন্য যুদ্ধ করতে হবে নারীর এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে হলে নারীকেও নীরবতার দেয়াল ভাঙতে হবে, প্রতিবাদী হতে হবে। নিজের বুদ্ধি, মেধা ও শ্রম দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদানের বিষয়ে সচেতন হয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং সামাজিক ও আইনি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বৈষম্য ও সহিংসতাকে চ্যালেঞ্জও করতে হবে। আত্মশক্তিতে বলীয়ান নারীই হবে সামাজিক পরিবর্তনের মূল দিশারি।

২০। বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হবে এবং এ ব্যাপারে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

২১। রাষ্ট্রক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ স্তরে নারীদের উপস্থিতিই নারীর ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করে না; বরং ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং সর্বোপরি সামাজিক ভাবে নারীকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতির ইতিবাচক পরিবর্তনই নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে পারে। আর এ ক্ষেত্রে নারীর শ্রম ও মেধার মূল্যায়নটাই সর্বাগ্রে জরুরি।

২২. সর্বোপরি আইন প্রণেতা এবং রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ যাতে নারীর নিরাপত্তা এবং আইনী অধিকার আইনী কাঠামোতে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তবে প্রয়োগ করার সবিনয় অনুরোধ করছি।

*Dhaka University Institutional Repository*

## অষ্টম অধ্যায়

## উপসংহার

কোন দেশ বা ভূখন্ডে রাজনৈতিক বা আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে কোন মানুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। গাজী শামছুর রহমান তার ভাষ্যে বলেছেন- নারী পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক, পৌর অথবা অন্য কোন ক্ষেত্রে মানবাধিকার এবং মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার স্বীকৃতি উপভোগ অথবা অনুশীলনকে খর্ব করে এমন যে কোন ধরনের পার্থক্য বিয়োজন বা প্রতিবন্ধক যদি লিঙ্গের ভিত্তিতে নারীর প্রতি করা হয় তাহলে সেটাই হবে নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য। প্রতিটি সমাজে নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য বিরাজমান। বিভিন্ন দিক থেকে নারীর প্রতি এ বৈষম্য প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং একটি দেশের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নারী এ বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। যেমন: সামাজিকভাবে নারী বিবাহ ও পরিবার গঠনে অধিকার লাভে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। পারিবারিক জীবনে বাস্তব অর্থে নারী পুরুষের সমঅধিকার পাচ্ছে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অনেক দেশে ভোটাধিকার নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার সরকার পরিচালনায় যোগদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিকানা, কর্মসংস্থান, ব্যবসা বাণিজ্য, এসবক্ষেত্রে তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে খেলাধূলা, বিনোদন ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যকান্ডে অংশগ্রহণ নারী অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের সমান নয়।

ইসলাম নারীদের জন্য যে, অধিকার ও মর্যাদা নির্ধারণ করেছে তা নারী পুরষের সমঅধিকারের তুলনায় অনেক অনেক বেশি কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক। সমাজ সংগঠন পুরুষ জাতি নিজেদের ক্ষমতাধর প্রমাণের লক্ষ্যে নিজেদের অংশের কর্তৃত্ব প্রদর্শন করতে যতটা উৎসাহী ভূমিকা পালন করে; নারীর প্রতি তার দায়িত্ব পালনে তার চেয়ে বেশীই অবহেলা করে থাকে। যার ফলে একদিকে নারী যেমন তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অপরদিকে তেমনি পুরষের অযাচিত কর্তৃত্বে কোনঠাসা হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা ও তাতে নারীর অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা যথার্থ অর্থেই নেতিবাচক। সমাজ ব্যবস্থা ও পরিবেশগত কারণে যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে নারীদের প্রতি বৈষম্য চলে আসছে। দৈহিক কারণ তো রয়েছেই। পুরুষ সমাজের চিরাচারিত দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজের সার্বিক অস্থিতিশীলতার জন্য অবজ্ঞা অবহেলা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে নারীরা। পত্রিকার পাতা অথবা টিভি খুললেই আমরা দেখতে পাই নারী নির্যাতনের ও নারী বৈষম্যের  কারণ চিত্র যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ধর্ষন, বহুবিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, নারী পাচার অকালে গর্ভধারণ ইত্যাদি মানবসৃষ্ট সামাজিক অভিশাপকে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে নারী সমাজকেই।

ইসলাম দৈহিক গঠন ব্যতীত অন্যান্য মৌলিক মানবাধিকারসহ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নে নারী-পুরুষের কোন প্রকার বৈষম্যকে স্বীকার করে না। কেননা নারী পুরুষ একই উপাদান হতে একই রকম আবেগ, অনুভূতি দিয়ে সৃষ্ট। উভয়েই একে অপরের সহযোগী। নারীরা সমাজের কোন বিচ্ছিন্ন অংশ নয়। মানব সমাজেরই অতি প্রয়োজনীয়  একটি বিরাট অংশ নারীরা। তাই ইসলাম মনে করে এদের বাদ দিয়ে হয়তো সমাজ হতে পারে, মানব সমাজ হয় না। তাই যে সমাজে নারীর বসবাস  সে সমাজ ব্যবস্থার মর্যাদা ও উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে পারলেই মানব সমাজের উন্নয়ন আবশ্যাম্ভী এবং নারী পুরুষ উভয়ে তার ফল ভোগ করতে পারবে। ইসলামে নারী পুরুষের অধিকার সমান, কিন্তু কাজের দায়িত্ব পরিপূরক। ইসলাম নারীকে পূণ মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা নারীদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছেন এবং যেসব অধিকার তাদের প্রাপ্য প্রত্যেক নারী তা কোরআন ও সুন্নাহর আইন বিধানে অর্জন করে নিতে পারেন। প্রথাগতভাবে ইসলামী সমাজে নারীরা সাধারণত গৃহে থাকে এবং স্বামীরা তাদের সম্পত্তির দেখভাল করেন। এ বিষয়টি বর্তমানে একটা ধারণা জন্ম দিয়েছে যে, ইসলামে নারীর স্থান পুরষের নীচে এবং পুরুষের তুলনায় তাদের অধিকার ও মর্যাদা খুবই কম। এ ভ্রান্ত ধারনা দূর করা এবং নারীর মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য ইসলামী বিধিমালা পর্যালোচনা করতে দেখা যায় যে, প্রাত্যহিক কাজে নারীদেরকে ইসলাম ঘরের বাইরে আসার ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। তবে শর্ত এসময়ে  তাদের শালীন পোষাক ও হিজাবের মাধ্যমে শারীরিক সৌন্দর্য ঢেকে রাখতে পাবে। ইসলাম নারী জাতিকে কন্যার স্থানে কন্যার মর্যাদা বোনের স্থানে বোনের মর্যাদা, স্ত্রীর স্থানে স্ত্রীর মর্যাদা এবং মায়ের স্থানে মায়ের মর্যাদা দিয়েছে। আজ এক বিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েও কোন কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় মনে করে ইসলাম নারীদেরকে ছোট ও হেয় প্রতিপন্ন করছে। শুধু তাই নয় তারা বলে ইসলাম নারীকে ঘরবন্ধী করে তাদের মর্যাদাকে বিনষ্ট করছে। দেখা যায় যে, ইসলামই নারী প্রগতি ও নারী মর্যাদার যে অধিকার দিয়েছে আর কোন ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায় তা দেখা হয়নি।

ইসলাম নারীকে যে অধিকার প্রদান করেছে বিশেষ করে মহানবী (স.) বিদায় হজ্জের ভাষণে নারীদের যে অধিকারের ঘোষণা প্রদান করেছেন এবং মহানবী (স.)-এর যুগে নারীরা যে অধিকারসমূহ ভোগ করেছেন বর্তমান কালেও নারীরা সে অধিকার ভোগ করার সুযোগ পেলে আবার এ সমাজ সুখী ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজে পরিণত হবে। নারীরা কেউ যুলুমের শিকার হবে না। তাই বিশ্বের প্রত্যেক মুসলিম নারীকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হতে হবে। ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার সকল নারীর সামনে উপস্থাপন করে জনমত গঠন করতে হবে। যদি উন্নত ও উপযুক্ত পরিবেশে একাটি নারীর সামাজিকীকরণ ঘটে থাকে অর্থাৎ নারীটিকে যদি উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়, তাকে যদি চিন্তা-চেতনার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা যায়,

তাহলে সে নি:সন্দেহে একটি সুন্দর মনের অধিকারী হবে। আর যদি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অনুন্নত পরিবেশে একটি নারীর সামাজিকীকরণ ঘটে, তবে সে প্রগতি বিমুখ মন-মানসিকতা নিয়ে গড়ে উঠবে। শিক্ষা প্রগতির একটি বলিষ্ঠ উপকরণ। একটি শিক্ষিত নারী কোন ভাবেই প্রগতি বিরোধী হবে না। ইসলাম যেহেতে শিক্ষার উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে, সেহেতে ইসলাম প্রগতির অন্তরায় নয়।

নারীদের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতা পূর্ববর্তী ইতিহাসের চেয়ে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমর্ধী। বর্তমান শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশে নারী আন্দোলনই শুধু জোরদার হয়ে ওঠেনি, নারীরা ভোটাধিকারসহ বিভিন্ন অধিকার আদায় করতে সমর্থ হয়েছে। কাজেই প্রশ্ন উঠেছে, বিংশ শতাব্দীতে নারীদের মর্যাদা কি সত্যি সত্যি বেড়েছে? বাংলাদেশে একটি নৃতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে নীরব হিংস্রতা বিরাজ করছে। বেটসি হার্টম্যান ও জেমস বয়েসের নৃতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে পল্লীঅঞ্চলে মহিলারা শোষিত হচ্ছে। তাঁদের বর্ণনা হতে দেখা যাচ্ছে, হিন্দুই হোক আর মুসলমান হোক, ধনীই হোক আর দরিদ্রই হোক- মহিলারা সব শেষে খেতে বসে এবং সবেচেয়ে কম খাওয়া পায়। বাংলাদেশে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে ২৯% কম ক্যালরি পেয়ে থাকে। পৃথিবীর কোথাও নারীরা পুরুষদের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। ১৯৯৫ সনের মানব উন্নয়নে প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, বর্তমান বিশ্বে সুইডেনে মহিলাদের অবস্থান সবচেয়ে উর্দ্ধে। তবু সুইডেনে মহিলারা উন্নয়নের দিক থেকে পুরুষদের তুলনায় প্রায় ৯ শতাংশ পিছিয়ে আছে। নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহিলাদের দীর্ঘস্থায়ী ভোটাধিকার আন্দোলনে। আঠারো শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এডামসের স্ত্রী তাই দাবি করেছিলেন: "যদি মহিলাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দেওয়া হয়, আমরা বিদ্রোহ করার জন্য সংকল্পবদ্ধ এবং যে সব আইনে আমাদের কোন ভূমিকা বা প্রতিনিধিত্ব নেই সে সব আইন মানতে আমরা বাধ্য নই।"

মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না, এ ধরনের আইন করাই যথেষ্ট নয়। মহিলাদের জন্য বিভিন্ন চাকুরিতে কোটা প্রবর্তনের মাধ্যমে আসন সংরক্ষণ করতে হবে। নারীজাতির ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য নারীগণকে নিজেদের নেতৃত্ব দিতে হবে। নারীদের ইচ্ছামত কাজ করার পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে নারীদের ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। চেতনার বিকাশের মাধ্যমে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর সুপ্ত ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলা এ সমর্থন করাই ক্ষমতায়নের মূল লক্ষ্য।শিক্ষার মাধ্যমে এ ধরনের চিন্তার বিকাশ সম্ভব। ক্ষমতায়ন তৃণমূল থেকে সঞ্চারিত হতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন অবহেলিত জনগোষ্ঠীসমূহের "পারস্পারিক ক্ষমতায়ন"। এদের একে অপরকে ক্ষমতায়িত করতে হবে। ক্ষমতায়নের প্রধান উপাদান পাঁচটি: (১) নারীদের শিক্ষা, (২) নারীদের সম্পত্তির মালিকানা, (৩) নারীদের কাজের সুযোগ, (৪) শ্রম বাজারে নারীদের অবস্থান ও (৫) নারীদের চাকুরী সম্পর্কে পরিবার ও সমাজের মনোভাব। ১৯৯৫ সনের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে চারটি উপাদানের (আইন সভায় মহিলা সদস্যের হার, প্রশাসক ও ব্যবস্থাপক পদে মহিলাদের হার, পেশাদার ও কারিগরী কাজে মহিলাদের হার ও মোট আয়ে নারীদের হিসসা) যৌগিক সূচকের ভিত্তিতে নারীদের ক্ষমতায়নের পরিমাপের প্রককলন করা হয়েছে। এই প্রাককলন অনুসারে বাংলাদেশে নারীরা ভারত ও পাাকিস্তানের নারীদের চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান। মুসলমান-প্রধান দেশসমূহের মধ্যে নারীদের ক্ষমতায়ন সূচক অনুসারে সর্বোচ্চ স্থান মালয়েশিয়ার, দ্বিতীয় স্থান ইন্দোনেশিয়ার এবং তৃতীয় স্থান বাংলাদেশে। নারী শিক্ষার হার বেড়ে গেলে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি কমে যায়। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায়, আর্থিক কর্মকাণ্ডে নারীরা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি সৃজনশীল ও দায়িত্ববান। বাংলাদেশে অধিকাংশ মহিলা ঋণের টাকা ফেরত দেয় কিন্তু অধিকাংশ পুরুষ দেয় না। বাংলাদেশে মহিলারা অতি সামান্য ঋণ দিয়ে পরিবারের আর্থিক অবস্থানের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। ভারতের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যাচ্ছে, যে অঞ্চলে জনসংখ্যাতে মহিলাদের অনুপাত বেশি সে সব অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কম অপরাধ সংঘটিত হয়। উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য নারীদের উন্নয়ন সামগ্রিক উন্নয়নের সবচেয়ে সহজ পথ।

১৯৯৫ সনের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে যথার্থই বলা হয়েছে: লিঙ্গভিত্তিক না হলে মানব উন্নয়ন বিপন্ন হবে। সামগ্রিকভাবে নারী ও পুরুষের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থাকলেও নারী যথার্থ অর্থে পুরুষের অধস্তন নয়। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে প্রকাশ্য কিংবা সুক্ষ্ম কৌশল প্রয়োগ করে টিকিয়ে রাখা হয়েছে লিঙ্গ বৈষম্য, পুরুষ আধিপত্য ও নারীর অধস্তন অবস্থান। নারীর মর্যাদাকে শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করার সুদক্ষ প্রবণতা এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে নারীর সম্পৃক্ততাকে খাটো করে দেখার মনোভাব বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে প্রকৃত অর্থে দ্বিধান্বিত করে। ক্রমবিকাশমান উন্নয়নের ধারাকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে এমন অমানবিক পরিস্থিতি, অপরিনামদর্শিতা, ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব তথা কৃত্রিম সমাজসৃষ্ট লিঙ্গ বৈষম্যকে সঙ্গত কারণেই চিহ্নিত করে পর্যায়ক্রমে নারীর অধিকার ও নিরাপত্তা সংরক্ষণে সক্রিয় হতে হবে। নারীর মর্যাদা সুদৃঢ়করণে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও আইনগত প্রক্রিয়া ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতে পারে। বিভিন্ন স্তরবিন্যাসের স্পর্শকাতরতার মধ্যে দিয়ে নারী সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবকাঠামোগত নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে প্রবেশ করে। বিবাহ নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানে নারীর নিরাপত্তার ধারণাটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহ একটি দেওয়ানি চুক্তি, যেখানে সমতার ভিত্তিতে নারী-পুরুষের ভূমিকা নির্ধারিত হয় কিন্তু বাস্তবিক অর্থে দেখা যায় যে, নারী বিবাহের সার্বজনীন প্রক্রিয়ায় নেতিবাচক মাত্রায় নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। বিবাহ পরবর্তী বিভিন্ন সংকট তথা বিবাহ বিচ্ছেদ, দাম্পত্য বিচ্ছেদ সন্তানের অভিভাবকত্বহীনতা, ভরণ-পোষণের মতো মৌলিক বিষয়গুলি নিয়ে নারী দ্বিধাগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

জাতিসংঘের এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে নারীরা শুধু পরিবারের জন্য যে পরিশ্রম করেন তার অর্থমূল্য সম্পর্কে সন্দিহান থাকে। পুরুষের শ্রমের সামাজিক মূল্যের সঙ্গে এর গুণগত পার্থক্য নারীকে মনস্তাত্বিকভাবে নিরাপত্তাহীন ও অপরাধবোধের টানাপোড়েনের মুখোমুখি করে। স্বামী এবং স্বামীর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নিপীড়িত হওয়া নারীর জন্য নিত্যনৈমিত্তিকতায় পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে বিবাহ উত্তর জীবন যাপন প্রক্রিয়ায় হত্যা, ধর্ষণ এবং মারাত্মকভাবে জখম হওয়ার মতো ঘটনা ঘটে। অনেকক্ষেত্রে আইনগত প্রক্রিয়ায়র মধ্যে স্ব-বিরোধী প্রবণতা প্রকল হয়ে উঠে; নারী নিপীড়ণকে আইন ব্যবস্থার প্রধান আলোচ্য ভূমিকায় এনে আইনী সংস্কার নিশ্চিত করলেও নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এর বাস্তব প্রয়োগ অনেকক্ষেত্রে আশাবঞ্জক নয়। আইন অনেকক্ষেত্রে সমাজের বিভিন্ন প্রতিকূলতা দিয়ে প্রভাবিত হয়, যা নারীর জন্য নেতিবাচক স্থবিরতা নিয়ে আসে। নারীর নিরাপত্তার নীতি নির্ধারণে গতিশীলতার জন্য নারী-পুরুষের সম-অধিকার প্রদান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সেদিক থেকে বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সম-অধিকার নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়াটি লিখিতভাবে উদ্বৃত থাকলেও এর আইনী প্রয়োগযোগ্যতার অভাব এবং রাজনৈতিক-সামাজিক স্বার্থগত কারণে নারী-পুরুষের সম-অধিকারের ভিত্তিভূমি কার্যকরী ভূমিকায় ক্রিয়াশীল হয়নি। সামাজিকীকরণের ফলে নারী-পুরুষ বৈষম্য এবং পিতৃতান্তিক আধিপত্যমূলক মানসিকতা আইনী প্রশাসনকেও অনেকক্ষেত্রে প্রভাবিত করে। যার ফলশ্রুতিতে নারী আইন প্রশাসনের ক্রিয়াগত ঐতিহ্যের মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ করে।

সমাজের বৈরী মনোভাব নানান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিষয়টিকে নিরুৎসাহিত করে থাকে। সমাজ নিশ্চিতভাবেই নারীকে বিভিন্ন কর্মকাঠামো থেকে বঞ্চিত করে তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে অনিশ্চিত করে তাকে চরমভাবে নিরাপত্তাহীন করে তোলে; সমাজসৃষ্ট কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় একটি ব্যাপক প্রচেষ্টা প্রায়শই ক্রিয়াশীল থাকে যা বিভিন্ন কর্মদক্ষতা প্রদর্শন বা পেশা নির্বাচনে পুরুষের প্রাধান্যকে কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্ব দিয়ে নারীর ক্ষমতাহীনতা করে। নারীর কোন নিজস্ব অর্থনৈতিক ভিত্তি নেই। লিঙ্গ বৈষম্যগত সামাজিক কৃত্রিম বিভাজনে নারীর সম্ভাবনা ও বিকাশের পর্যায়কে ব্যহত করে। সামাজিকীকরণের সাধারণ প্রক্রিয়ায় নারীর প্রকৃতিকে এমন পর্যুদস্ত ও দুর্বল করে ভাবা হয় যেখানে নারী সমাজ নির্ধারিত পারিপার্শ্বিকতাকে স্বাভাবিক ভাবতে অভ্যস্ত নয়। সমাজ বিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায় থেকে নারীর দৈহিক অনিশ্চিয়তা বোধ নারীকে নৈতিক ও মনস্তাত্বিক দিকের দক্ষতা অর্জনের সম্ভাবনাকে সীমিত করে, যা অনভিপ্রেতভাবে পুরুষ আধিপত্যের শৃঙ্খলে নারীকে বন্দী করে এবং সামাজিক অনুশাসনগুলি বদ্ধমূল সংস্কারের আকারে নারীর মধ্যে ক্রমান্বয়ে বিকশিত ও রূপান্তিত হয় নারী-পুরুষ বৈষম্য নীতি অনুসরণে দেখা যায় নারীর মধ্যে অসহায়ত্ব ও নিরপত্তার অভাববোধ পুরুষের চেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল।

ধর্মীয় অনুশাসন বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে নারীর নিরাপত্তাকে সংকটাপূর্ণ করে তোলে, যা নারীকে নিজস্ব পছন্দ, অপছন্দ, সংস্কৃতিবোধ, উন্নয়ন সম্ভাবনার যোগসূত্র খুঁজতে সন্দিহান করে প্রশ্নাতীতভাবে। ধর্মীয় অপব্যাখ্যা কবলিত ফতোয়া, মৌলবাদের ক্রমবিকাশমান ধারা, ধর্মীয় অনুশাসন নির্ভর পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ নারীর নিরাপত্তাবোধের চেতনা উদ্বুদ্ধকরণে নেতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। স্বল্প ধর্মীয় জ্ঞান সম্পন্ন এবং ক্ষেত্রবিশেষে ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী অর্থাৎ গ্রামের পীর, মসজিদের ইমাম, মাওলানা, ধর্মীয় অপব্যাখ্যাজনিত দাম্পত্য বিচ্ছেদ, বিবাহ বিচ্ছেদ ও নারী নিগ্রহের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখে বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান কতটুকু সমাজ আরোপিত বৈষম্যনীতি নির্ভর এবং বৈষম্য কেন্দ্রিক চিন্তাধারা কিভাবে নারীর মর্যাদা ও উত্তরাধিকারে প্রতিবন্ধক ভূমিকায় সচেষ্ট হয় তা বিশ্লেষণযোগ্য মাপকাঠিতে যাচাই করতে হবে। নারী পুরুষ বিভাজন, সমাজ আরোপিত বিধি-নিষেধ, অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা, অসমন্বিত ও ভারসাম্যহীন উন্নয়ন কৌশল এবং মৌলিক মানবিক মূল্যবোধহীন সামাজিক কৌশলগুলি শুরু থেকেই নারীর বিপক্ষে কার্যকরী। নারীর অবস্থানের উপর নির্ভর করে সমাজসৃষ্ট, পরিবারসৃষ্ট বৈষম্যমূলক ও শোষণমূলক ক্রিয়া। নারী তার শৈশব থেকেই অর্থাৎ জন্ম সময় থেকেই লিঙ্গ পীড়ণের শিকার হয়। পুরুষ শিশুর জন্ম পরিবারের সদস্যদের কাছে আনন্দদায়ক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলে বিবেচিত হলেও নারী শিশুর ক্ষেত্রে তেমনটি হয়না। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নারীকে বৈষম্যের নীতি দ্বারা নিপীড়িত ও অবহেলিত হতে হয় লক্ষণীয় মাত্রায়। পরিবারের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে পুরুষ আধিপত্য, সমাজ আরোপিত বৈষম্যের প্রকৃত চেহারাটি এমন যে যেখানে নারীর অবস্থান সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হয়ে আছে অধস্তন পর্যায়ে, যেখানে পুরুষের অবস্থান কর্তৃত্বপরায়নতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে। পরিবার ব্যবস্থাপনা, শিশু পালন, পরিবারের জন্য অন্নের সংস্থান, রান্নাবান্না, জ্বালানি সংগ্রহে নারীর স্বতন্ত্র ও কার্যকরী ভূমিকা থাকলেও নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ও অসহযোগিতামূলক মনোভাবই প্রকট হয়ে উঠে।

কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীরা আর্থিক, সামাজিক এবং মনস্তাত্বিক শোষন প্রক্রিয়ায় বৈষম্যের স্বীকার হয়। সমাজের কৃত্রিম লিঙ্গবৈষম্যের প্রতিফলন কর্মক্ষেত্রের ব্যাপক গণ্ডীতেও পড়ে। সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কর্মক্ষেত্রের সব পর্যায়ে নারীর নিয়োগ অত্যন্ত সীমিত গন্ডীতে রয়েছে। সামাজিক অনুশাসন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে সকল প্রকার চাকুরী নারীর জন্য বিবেচ্য নয় বলে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে মহিলা বা নারী শ্রমিকের হার মাত্র ৬% এবং অপেক্ষাকৃত আয় কম হয় এমন সব ক্ষেত্রগুলিতে নারী শ্রমিকের নিয়োগের হার বেশি। গ্রামাঞ্চলে অকৃষিখ্যাত পুরুষ যে পরিমাণ আয় করে, নারী করে তার ৫/১ ভাগ এবং লক্ষণীয় যে, কৃষিখাতে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় নারী শ্রমিক সরকার স্বীকৃত ও নির্ধারিত মজুরির মাত্র ৪০% পায়। শ্রমবাজারে মজুরী বৈষম্য অসমন্বিত ও দ্বৈত নীতি বাংলাদেশের নারীকে অর্থনৈতিকভাবে বিপন্ন ও নিরাপত্তাহীনতার মতো জটিল সংকটের মুখোমুখি করে। বাস্তবিক অর্থে একথা অনস্বীকার্য যে, অনগ্রসর তৃণমূল পর্যায়ের গ্রামীণ নারীরা ব্যাপক হারে মজুরী বৈষম্যের স্বীকার হয়। এই প্রক্রিয়ার

মধ্য দিয়ে একজন কাজ করে পায় ২৫-৩০ টাকা। আইএলওর রিপোর্টে নারী পুরুষের আয়ের বৈষম্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। শুধুমাত্র বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের সর্বত্র এই বৈষম্য কার্যকর রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে উত্তর আমেরিকায় মেয়েরা ১৯৮০ সালে ছেলেদের আয়ের ৬০ শতাংশ এবং ১৯৮৮ সালে ৬৫ শতাংশ আয় করে। অন্যদিকে জাপানে এই পরিমাণ কমে ৫৩ দশমিক ৮ শতাংশ থেকে ৫০ দশমিক ৭ শতাংশ হয়।

সমাজে নারীর শিক্ষা সচেতনতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা লাভ করবে। আর এই অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা লাভ করবে। আর এই অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতাই নারীকে তার গৃহে, সমাজে প্রয়োজনে রাষ্ট্রে নারীর নিজস্ব মতামত, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। আর এর ফলে সমাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। সমাজে পুরুষের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি নারী শিক্ষাকে মানবিক দায়িত্ব বলে মনে করেছেন। উভয়ের সম অংশগ্রহণেই সামগ্রিক সমাজের উন্নয়ন সম্ভব। সমাজে পুরুষের মতো করে নারীর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। আর নারী সমাজ যদি শিক্ষিত হয় তবে দেশের জন্যে মঙ্গল হবে। কেননা নারী সমাজের উন্নয়ন হলে নারী পুরুষ বৈষম্য দূরীভূত হয়ে সামগ্রিক সমাজের উন্নয়ন ঘটবে। তাই নারী শিক্ষার প্রসারতার জন্যে পরিবার ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা আবশ্যক। নারীর অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে । নারী স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্যে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পরিবেশ সৃষ্টি করবে। নারী সমাজ যদি অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল হয়, তবে তাদের মধ্যে এক ধরনের সচেতনতা বোধ জাগ্রত হবে। এই সচেতনতাবোধই নারীকে তার পরিবারে, সমাজে এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে সহায়তা করবে। নারী যেন প্রথম পরিবার, পরে আস্তে আস্তে সমাজে, রাষ্ট্রে তার মতামত প্রকাশ করার অধিকার রাখতে পারেন। পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যোগ্য মায়ের ভূমিকা পালন করে নারী। সমাজে নারী পুরুষ উভয়েই কর্মক্ষম। নারী অবজ্ঞা সুলভ আচরনে অভ্যস্ততা থাকায় তাদের কোন মূল্যায়নই করা হয় না। আর যেহেতু পরিবারে নারীর মর্যাদা স্বীকৃত নয়, তাই রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও নারী কোন বিষয়ে প্রভাব রাখতে পারছে না। আর তাই নারীকে প্রথমে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে হবে । বিশ্বের অনেক দেশেই নারীর শ্রম মর্যাদা স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং নারী ঘরে বাইরে কাজ করার স্বীকৃতি অর্জন করেছে। তাছাড়া দেরিতে হলেও বৃটেনসহ সমগ্র বিশ্বে নীতিগতভাবে নারীর ভোটাধিকারের বিষয়টি স্বীকৃতি লাভ করেছে। নারীর কোন সামাজিক মর্যাদা না থাকায় নারী পুরুষের গলগ্রহ হয়ে থাকত। আর নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নারীশিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক মুক্তি এবং নারী-পুরুষ সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বাড়াতে হবে। সমাজ ধর্মীয় গোড়ামী মুক্ত থাকলে নারীর ন্যায্য অধিকার রক্ষিত হবে। ধর্ম মানুষকে শান্তি ও স্বস্তি দেবার জন্যেই এক সামাজিক বিধি। কিন্তু ধর্মকে মৌলবাদীরা নারী অধস্তনতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে। তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীর স্বাধীনতা হরণ করছে। এই নারী সমাজ যদি উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ না করে তবে সামগ্রিক সমাজের উন্নয়ন সম্ভবপর হবে না। এ জন্যেই সামজিক ক্ষেত্রে কুসংস্কার মুক্ত থেকে আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে।

সৃষ্টিকর্তা সবাইকে সমান বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে সৃষ্টি করেছে। তাই যারাই স্বাভাবিক অবস্থানে আছেন, তারা যেন বিচার বুদ্ধি করে কাজ করেন। এতে করে সমাজে তারা নিজের অস্তিত্ব, মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারবে। ধর্মীয় প্রথাগত কারণেই সমাজে নারীর কর্মক্ষমতা হারিয়েছে এবং গৃহবন্ধী রয়েছে। তাছাড়া কেউ কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করা সৃষ্টিকর্তার বিধান নয়। আমরা যদি সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করি তবে তার বিধানকে অস্বীকার করা যায় না এবং তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকা ঠিক নয়। তাই সৃষ্টিকর্তার বিধান অনুযায়ী সবার সমমর্যাদা, সমনাধিকার মেনে নেয়াই হবে সৃষ্টিকর্তাকে তুষ্ট করা। নারী-পুরুষ বৈষম্য কোন ধর্ম কিংবা প্রকৃতিগত বিষয় নয়, বরং মানুষের তৈরি ব্যবধান। মানুষ প্রথাগত কারণে যুগ যুগ ধরে তাদের মধ্যে বৈষম্যর সৃষ্টি করেছে। নারীশিক্ষার অভাব থাকায় নারী সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্নতায় পরিপূর্ণ ছিল। নাগরিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে প্রত্যেকেই নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারেন। আর নারী সমাজ এ সমস্ত বিষয়সমূহ না জানার কারণে সমাজে নারী পুরুষ বৈষম্য ধর্মীয় ও প্রকৃতিগত সৃষ্ট এ বিষয়টিকে মেনে নিয়েছিল। সমাজে নারীরা অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও স্বৈরতন্ত্রের শিকার। কিন্তু ধর্মে নারীদের এরকম কোন বৈষম্য নেই। নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ধর্মীয় গোড়ামীকে বর্জন করে নারীরা যেন শরীর ও মন ঠিক রেখে পুরুষের মত কাজ করতে পারেন, এক্ষেত্রে সমাজের সকলের সহযোগিতা করতে হবে।

সৃষ্টিকর্তা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সবকিছুরই স্বাধীন স্বত্বা রয়েছে। তার সবকিছুই সক্রিয়, শুধু তাই নয় আমরা যা কিছু দেখি না কেন, সবকিছুরই ক্ষমতা অসাধারণ। আর মানুষ হিসাবে তিনি যে ধারণা দিয়েছেন তা হলো মানুষ হচেছ বুদ্ধিমান প্রাণী। অর্থাৎ এখানে নারীর সামাজিক মর্যাদা ধর্মীয়ভাবেও স্বীকৃত। সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য, এটা মানুষের তৈরি বিধান। সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ধর্ম কোন প্রতিবন্ধক হতে পারেনা। উদাহরণ স্বরূপ- ১৯৯৩ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব মানবাধিকারের স্লোগান নারী নির্যাতন, মানবাধিকার লংঘন, নারীর অধিকার, মানবাধিকার, জাতিসংঘের ঘোষণা ডিক্লেয়ারেশন অন ভায়োলেন্স এগেন্সড ওমেন (১৯৯৩) ইত্যাদি কথাগুলোর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ্য সে দেশীয় ঐতিহ্য, প্রথা ও ধর্মের নামে নারীর

মানবাধিকার বিষয়ে কোন সমাজ বা রাষ্ট্র উদাসীন থাকতে পারে না। ১৯৯৫ সনে অনুষ্ঠিত বেইজিং-এ নারী সম্মেলনেও নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও ধর্মীয় কোন প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে না ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়।

নারী শিক্ষা সচেতন হলে পরিবারে, সমাজে এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রভাব রাখতে পারে। নারী শিক্ষার প্রসারতার জন্যে সরকার উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা ছাড়াও উপবৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সমাজে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইউরোপে এই প্রক্রিয়া অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে শুরু হয়েছিল। অন্যদিকে ভারত বর্ষে তা ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে শুরু হয়েছিল। সমাজে নারীর বৈষম্যমূলক অবস্থান দূরীকরণের জন্য নারী শিক্ষা সচেতনার উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। নারী সমাজ শিক্ষিত হলে গৃহ পরিচালনা থেকে শুরু করে অফিস, আদালত, সমাজ, রাষ্ট্রে সমনাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। সমাজ ব্যবস্থা অমনযোগিতার জন্যই নারী আজ অধিকারহীন, সম্মানহীন ও মর্যাদহীন। বাংলাদেশ সরকার ২০২০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী সহ, নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য নারীশিক্ষা ব্যবস্থাকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করেছে এবং এই লক্ষ্যে নারী সমাজকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (এন.জি.ও) বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী হাতে নিয়েছে এবং নারী সমাজের উন্নয়নের জন্য নারীশিক্ষা সচেতনতার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমিতি গঠিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ মহিলা উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা পরিষদ, উইমেন ফর উইমেন, নারী পক্ষ প্রভৃতির কথা বলা যায়।

সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির প্রয়োজন রয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীরা সচ্ছল হলে যে কোন ব্যাপারে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সামাজিক অসাম্যতার বিরুদ্ধে নিজেদের দাবী-দাওয়া তুলে ধরে তা নিরসনের চেষ্টা করতে পারবে। এভাবে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পরিবেশ সৃষ্টি করবে। বর্তমান সময়ে সমাজের নারীর অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নারী আজ অফিস, আদালতে চাকুরী করছে। বাংলাদেশ সহ বিশ্বের অনেক দেশেই রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছেন নারী। বিশ্বে বর্তমানে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে পরিচিত। কিন্তু এখনো পর্যন্ত নারী শ্রম সামাজিক ভাবে পুরোপুরি স্বীকৃত হয়নি। তাছাড়া বাংলাদেশে অর্ধেক জনসংখ্যা নারী হলেও তাদের পেশা 'কাজ' হিসাবে দেখা হয় না। এই শ্রমকে 'মূল্য সৃষ্টিকারী' কোন ভূমিকায় মূল্যায়ন করা হয়নি। অর্থাৎ মেয়েদের কাজকে এখনো পর্যন্ত পারিবারিক জীবনের অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়।

তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই ধর্মীয় গোড়ামির প্রভাব স্পষ্ট। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নয়। এই ধর্মীয় গোড়ামির প্রভাবেই সমাজে নারী অধনস্তনতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। নিছক ধর্মের বিধানগুলোর কারণেই সমাজে নারীরা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে রয়েছে এবং বাস্তবে সমাজের শাসক শ্রেণী ধর্মকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করছে। আর পুরুষতন্ত্র নিজেদের প্রয়োজনে ধর্মকে ব্যবহার করার ফলে তারা নারী বিদ্বেষী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। সমাজে শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সমাজে যত উন্নতি হচ্ছে, ধর্মে ততই পশ্চাৎপসরণ হচ্ছে। ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাসের ব্যাপার। যদিও প্রতিটি ধর্মই শান্তি ও সততার কথা বলে, যা মানুষকে সুখ, শান্তি ও স্বস্তি দেয়। এ বিশ্বাস যদিও কোন বিজ্ঞানের আবষ্কার কিংবা পর্যবেক্ষণের বিষয় নয়, তবুও একথা ঠিক যে ধর্ম কোন যুক্তিহীন ভিত্তি নয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ বৈষম্য প্রবল আকারে উপস্থিত রয়েছে। যদিও বৈষম্যের মাত্রা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু ভারসাম্যপূর্ণ স্থিতিশীল পরিস্থিতি এখনো নিশ্চিত হয়নি বা নারীর সার্বজনীন অধিকার রক্ষিত হয়নি। আইন সার্বিক অর্থে সকল শ্রেণীর মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সচেষ্ট হলেও সমাজ আরোপিত নারী-পুরুষ বিভাজন বা লিঙ্গ বৈষম্য নিরসনে এর ভূমিকা এতটা আশাব্যঞ্জক নয়। বাস্তবক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইনগুলি এক ধরনের বৈষম্যমূলক আইন ব্যবস্থার স্বীকৃতি দিয়েছে, যা কার্যক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মুসলিম পারিবারিক আইনে এমন কিছু বিধি রয়েছে যা নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক নিপীড়ন এবং নারী-পুরুষের অসম অবস্থানকে নেতিবাচক ভাবমূর্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। বহু বিবাহ, পুরুষের একচ্ছত্র তালাকের অধিকার, সম্পত্তিতে নারীর অসম অধিকার, দাম্পত্য অধিকার ও কর্তব্যের মতো পারিবারিক জীবনের মৌলিক বিষয়গুলোর বাস্তব রূপায়ন নারী প্রকৃত অর্থে বৈষম্যের স্বীকার হয় এবং আইনগত অধিকার ব্যাপক অর্থে বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

নারীর সম-অধিকার ও পারিবারিক জীবনের ভারসাম্যপূর্ণ ভূমিকা বজায় রাখার স্বার্থে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কিছু আইন/অর্ডিন্যান্স পাশ করা হয়েছে মুসলিম বিবাহ ও পারিবারিক জীবনের কাঠামোগত পরিবর্তনকে সামনে রেখে। মুসলিম বিবাহ ও বিচ্ছেদ (নিবন্ধীকরণ) অধ্যাদেশ ১৯৭৪ ও বিধিমালা ১৯৭৫ এর ফলশ্রুতিতে বিবাহিত নারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয় এবং বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানে নারীর অবস্থান স্বীকৃত হয়; নারী নিজ থেকে বিবাহিত জীবনের অধিকার ও নিরাপত্তা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের অসহায় নারীরা গ্রামীণ সমাজের অনগ্রসরতা স্বার্থজনিত দ্বন্দ্ব ও অশিক্ষার কারণে অনেকক্ষেত্রেই এই আইনের সুফল লাভে ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে যৌতুক নিরোধ অধ্যাদেশ ১৯৮০ এবং যৌতুক নিরোধ (সংশোধনী) অধ্যাদেশ ১৯৮২, ১৯৮৬ এবং নারী নির্যাতন (নিবর্তনমূলক শাস্তি) অধ্যাদেশ ১৯৮২ ও নারী নির্যাতন (নিবর্তনমূলক শাস্তি সংশোধনী) অধ্যাদেশ ১৯৮৮; পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ ও পারিবারিক আদালত (সংশোধনী) অধ্যাদেশ ১৯৮৯ পাসের মধ্যে দিয়ে নারীর নিরাপত্তাকে

স্থিতিশীল করার প্রক্রিয়ায় নতুন গ্রহণযোগ্য নীতি কৌশল উদ্ভাবনে নতুন মাত্রা যুক্ত করে আইনী পৃষ্ঠপোষকতা। কিন্তু নারীর নিরাপত্তা সুদৃঢ়করণে এবং নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপে এই আইনগুলি কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ এবং অনেক ক্ষেত্রে পক্ষপাত দুষ্ট, যা নারীর সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভাবনায় নেতিবাচক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়। বাংলাদেশের মুসলিম নারীর আইনগত মর্যাদা পেতে এবং উত্তরাদিকারের ক্ষেত্রে সমাজ আরোপিত লিঙ্গ বৈষম্যসহ অন্যান্য বহুমাত্রিক আর্থসামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও শ্রেণীগত সমস্যা পরস্পর সম্পৃক্ত।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট বিচার করলে দেখা যায় যে, নারী-পুরুষ বৈষম্যের অবসান অর্থাৎ সমতা নীতির বাস্তবভিত্তিক প্রয়োগ কৃত্রিম সামাজিক সাপেক্ষীকরণের মাঝে নীতিগত পরিবর্তন আনতে পারে, যা সমাজের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে, সুশৃঙ্খল, সংহত ও নিরাপদ করতে পারে। এক্ষেত্রে নারী অধিকার নিয়ে সংগ্রামরত নারীবাদী সংগঠনগুলি পর্যাপ্ত সদর্থক ভূমিকা রাখতে পারে। একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, অশিক্ষা, দরিদ্রতা, সুষ্ঠু ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব, পুরুষের মানসিকতায় আজন্ম লালিত নারীর প্রতি আধিপত্যপ্রবণ মানসিকতা ও দখলদারী মনোভাব অনেকাংশে ক্রিয়াশীল থাকে। নারী ও পুরুষের কৃত্রিম বিভাজন যে সমাজ কাঠামোর ভ্রান্ত নৈতিক মূল্যবোধের ফলশ্রুতি, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশে শিক্ষিত সাধারণ মানুষ এবং গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত অনগ্রসর দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও স্বল্প ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন মুন্সী, মাওলানা, ইমামের কাছে যথার্থ অর্থে স্পষ্ট নয়। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে বাংলাদেশের ঐসব দুঃখী, নিরন্ন, অনগ্রসর নারী গোষ্ঠীর উপর। যার ফলশ্রুতিতে নারীর পারিবারিক জীবন সাংঘাতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়। সাধারণভাবে একটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত  গ্রামাঞ্চলের সাধারণ নিরক্ষর মানুষ, তাদেরকে সজাগ করা এবং নারীর সহজাত প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সমাজ আরোপিত বদ্ধ ধারণাগুলির পরিবর্তন আনয়ন এক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা রাখতে পারে। রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নীতি কাঠামোতে নারীর অবস্থান নিশ্চিতকরণ, লিঙ্গ বৈষম্য ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান ও নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নীতিমালাগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপের ব্যাপকতা নির্ধারণে দৃষ্টিভঙ্গীগত ব্যাপক পরিবর্তন ও সামাজিক গ্রহণশীলতা নিশ্চিত করতে হবে।

সংবিধানিক নিরাপত্তা আইনগত নিরাপত্তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হচ্ছে সংবিধান। সরকারের ক্ষমতা শাসিতের অধিকার এবং দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত হয়ে থাকে সংবিধানের মাধ্যমে। এরিস্টটলের মতে, 'সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্র কর্তৃক পছন্দকৃত জীবন প্রণালী,। তার সময়ে অনেকগুলো রাষ্ট্রের সংবিধান পর্যালোচনা করে বলেন যে, আইনের সার্বভৌমত্ব, জনগনের স্বাধীনতা এবং সংবিধানের প্রাধান্য আদর্শ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য যেখানে সংবিধানের প্রাধান্য নেই সেখানে আইনের সার্বভৌমত্ব থাকে না এবং আইনের সার্বভৌমত্ব না থাকলে জনগণের স্বাধীনতাও থাকে না'।

*Dhaka University Institutional Repository*

পরিশিষ্ট

## জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য এবং বাস্তবায়ন কৌশল

**৯.১. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ ঃ**

মানুষ হিসেবে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি, সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে সমতা স্থাপন নিশ্চিতকরণ এবং সমাজে বিদ্যমান নারী পুরুষের মধ্যে বিভিন্ন বৈষম্যের বিলোপ সাধনে প্রণীত জাতিসংঘের সিডও সনদের সাথে বাংলাদেশও একাত্মতা ঘোষনা করে।[১] সিডও (CEDAW) কনভেশন প্রণয়নে রয়েছে তিন দশকের অধিক দীর্ঘ ইতিহাস ও জাতিসংঘ এবং বিশ্বের সচেতন নারী সমাজের অক্লান্ত প্রচেষ্টা বিশ্ববাসী নারী পশ্চাৎপদতা ও বৈষম্য নিরূপনের উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘ "নারী মর্যাদা কমিশন" নামে একটি কমিটি প্রতিষ্ঠা করে যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নারীর তৎকালীন আর্থ সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করা। পরবর্তীতে নারীর মর্যাদা কমিশনের কার্যক্রম এবং সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এটাও ছিল আন্তর্জাতিকভাবে নারী পুরুষের সমতা স্থাপনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।[২]

এর প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে জাতিসংঘ নারীর রাজনৈতিক অধিকার সনদ, বিবাহিত নারীর নাগরিকত্ব সনদ, বিবাহের সম্মতি দাসত্ব ও পতিতা বৃত্তি সনদ ইত্যাদি পদক্ষেপের মাধ্যমে নারীর প্রতি বিভিন্ন প্রকার বৈষম্যের সঠিক রূপ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ১৯৬৭ সালে জাতিসংঘ নারীর প্রতি সকল বৈষম্য নিরসন সম্বন্ধে একটি ঘোষনা গৃহীত হয় যাতে উপরোক্ত সনদগুলোসহ নারীর অন্যান্য অধিকার নিশ্চিত হয়। এই ঘোষনাটির উপর ভিত্তি করেই প্রণীত হয় বিখ্যাত সনদ সিডো।[৩]

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশও দারিদ্র বিমোচন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা, নারী, পুরুষ, নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের অধিকার ও সুযোগের ক্ষমতা নিশ্চিত করা সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার। এ মতাদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিডো সনদে বাংলাদেশে স্বাক্ষর করে ১৯৮৪ সালে।[৪]

নারীর রাষ্ট্রীয় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে নারী যে হিসাবে ঘোষনা করে মেক্সিকোতে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে। ১৯৮০ সালে কোপেন হেগেনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় নারী সম্মেলনে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারী দশক (১৯৭৬-৮৫) এর প্রথম ৫ বছরের অগ্রগতি আলোচনা করা হয়। ১৯৮৫ সালে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বেইজিং এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ এ দলিলে নারীর অগ্রসরতার ১২টি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত মিলোনিয়ামে সামিটের অধিবেশনে বাংলাদেশ অপশনাল প্রটোকল অন সিডো দলিলে (Optional Protocol on CEDAW) স্বাক্ষর করেন। গুরুত্বপূর্ণ এ সনদে স্বাক্ষরকারী প্রথম ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে। এছাড়াও আঞ্চলিক পর্যায়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সনদেও বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণে নিজ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

গ্রামীন নারীরা যে বিশেষ সমস্যা মোকাবেলা করে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে দারিদ্র। দারিদ্রের কারণে তারা অন্নবস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মত মৌলিক প্রয়োজন সমূহ পূরণ করতে পারে না। আয়ের অভাবে সঞ্চয় হয় না সঞ্চয়ের অভাবে পুঁজি গড়ে উঠে না, পুঁজির অভাবে মূলধন সৃষ্টি হয় না, ফলে তাদের পক্ষে বিনিয়োগের প্রশ্ন উঠে না। সংঘত কারণে তারা জীবনযাত্রার বৃদ্ধিতে অক্ষম এবং গ্রামীণ নারীরা দারিদ্রের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ। এরপর কুসংস্কার ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি এবং নানারকম কঠোর সামাজিক অনুশাসন। হাজার হাজার বছর ধরে নারীরা নানাভাবে অবহেলিত। বিভিন্ন সমাজে কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামি ইত্যাদি ধরন বিভিন্ন হলেও প্রায় সব সমাজেই নারী এ উদ্ভট অনাকাঙ্খিত চাপ ও বাধা মোকাবেলা করেছে। গ্রামীন এলাকা এর প্রভাব বেশী হওয়ার কারণ গ্রামীন এলাকায় অশিক্ষার পরিমাণ বেশী। অশিক্ষিত নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলে সামাজিকভাবে কুসংস্কার আচ্ছন্ন হয়। এরা যেমন নিজের অধিকার সংরক্ষণে অক্ষম তেমনি অপরের অধিকার প্রদান করতে অক্ষম। গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি সমস্যা হচ্ছে বিবাহ এবং বিবাহিত জীবনের নির্যাতন। যৌতুকসহ নানাবিধ অজুহাতে স্বামী ও স্বামীর সংসারে অন্যান্য সদস্য কর্তৃক নারীকে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনে শিকার হতে হয়। এর ফলে নারীর জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে। গ্রামীন নারীদের কোন বিষয়ে নিজের মত করে ভাবার অবকাশ নেই। সত্যিকার অর্থে অভাব, সমস্যা, সংকট ইত্যাদি নিয়ে গ্রামীণ নারী জীবন। গ্রামীন পরিবারগুলো টিকে থাকে নারী পুরষের যৌথ শ্রমের ভিত্তিতে। আবার সরাসরি অর্থে সম্পর্কিত নয় এমন কাজও নারী সম্পাদন করে। পরিবারের সন্তান সন্ততি লালন পালন তাদের সেবা যত্ন, খাবার দাবার তৈরি, স্বামীর সেবা যত্ন ইত্যাদি। গ্রামীণ নারীর আয়েশী জীবন যাপনে অবকাশ নেই। পুরুষেরা মাঝে মাঝে খানিকটা অবকাশ

পেলেও নারীর কোন অবকাশ নেই। বস্তুত: গ্রামীন নারীরা শিক্ষা সুবিধা থেকে বঞ্চিত ফলে নিজে অভাব অধিকার ও দাবী সম্পর্কে অজ্ঞ। অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও কুসংস্কারে পশ্চাৎপদ গ্রামীন নারীগণ যাতে বৈষম্য থেকে মুক্তি পায় সে বিষয় রাষ্ট্রসমূহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[৫]

উন্নয়নের মূলস্রোতের সকল স্তরে নারীকে সম্পৃক্ত করা ও তার সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির মূল লক্ষ্য। এছাড়াও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে

১. জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা,

২. রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা,

৩. নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা,

৪. নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা,

৫. নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা,

৬. নারী সমাজকে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা,

৭. নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা,

৮. সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা,

৯. নারী ও মেয়েশিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূর করা,

১০. রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা,

১১. নারীস্বার্থের অনুকূল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানী করা এবং নারীস্বার্থ বিরোধী প্রযুক্তি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা,

১২. নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা,

১৩. নারীর জন্য উপযুক্ত আশ্রয় ও গৃহায়ণ ব্যবস্থায় নারীর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা,

১৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্থ নারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা,

১৫. বিশেষ দুর্দশাগ্রস্থ নারীর চাহিদা পুরণের ব্যবস্থা করা,

১৬. বিধবা, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যাক্তা, অবিবাহিত ও সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা,

১৭. গণমাধ্যমে নারী ও মেয়ে শিশুর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরাসহ জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা,

১৮. মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করা,

১৯. নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা।

**৯.২. নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ঃ**

১. মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার সকল ক্ষেত্রে, যেমন- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ যে সমঅধিকার, তার স্বীকৃতি স্বরূপ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা,

২. নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা,

৩. নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা,

৪. বিদ্যমান সকল বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ করা এবং আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিশন বা কমিটিতে নারী আইনজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা,

৫. স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন ধর্মের, কোন অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারী স্বার্থের পরিপন্থি এবং প্রচলিত আইনবিরোধী কোন বক্তব্য বা অনুরূপ কাজ করা বা কোন উদ্যোগ না নেয়া,

৬. বৈষম্যমূলক কোন আইন প্রণয়ন না করা বা বৈষম্যমূলক কোন সামাজিক প্রথার উন্মেষ ঘটতে না দেয়া,

৭. গুণগত শিক্ষার সকল পর্যায়ে, চাকুরিতে, কারিগরী প্রশিক্ষণে, সমপারিতোষিকের ক্ষেত্রে কর্মরত অবস্থায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার, সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যায় প্রয়োজনীয় নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা,

৮. মানবাধিকার ও নারী বিষয়ক আইন সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান ও সংবেদনশীল বৃদ্ধি করা,

৯. পিতা ও মাতা উভয়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচিতির ব্যবস্থা করা যেমন, জন্মনিবন্ধীকরণ, সকল সনদপত্র, ভোটার তালিকা, ফরম, চাকুরীর আবেদনপত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদিতে ব্যক্তির নাম প্রদানের সময় পিতা ও মাতার নাম উল্লেখ করা।

**৯.৩. মেয়ে শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সাধন এবং সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা ঃ**

১. বাল্যবিবাহ, মেয়েশিশু ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচার এবং পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা,

২. পরিবারের মধ্যে এবং বাইরে মেয়েশিশুর প্রতি বৈষম্যহীন আচরণ করা এবং মেয়েশিশুর ইতিবাচক চিত্র তুলে ধরা,

৩. মেয়েশিশুর চাহিদা যেমন- খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা,

৪. শিশুশ্রম, বিশেষ করে মেয়ে শিশুশ্রম দূরীকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা।

**৯.৪. নারীর প্রতি সকল নির্যাতন দূরীকরণ ঃ**

১. পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ, যৌতুক ও নারীর প্রতি সহিংসতা দূর করা,

২. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশোধন এবং নতুন আইন প্রণয়ন করা,

৩. নির্যাতিতা নারীকে আইনগত পুনর্বাসন করা,

৪. নারীপাচার বন্ধ ও ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন করা,

৫. নারীর প্রতি নির্যাতন দূরীকরণ এবং এক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য বিচার ব্যবস্থায় পুলিশ বাহিনীর সর্বস্তরে বর্ধিত হারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা,

৬. বিচার বিভাগ ও পুলিশ বিভাগকে নারীর অধিকার সংশ্লিষ্ট আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া ও জেন্ডার সংবেদনশীল করা,

৭. নারী ও মেয়েশিশু নির্যাতন ও পাচার সম্পর্কীয় অপরাধের বিচার ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পন্ন করার লক্ষ্যে বিচার পদ্ধতি সহজতর করা।

**৯.৫. সশস্ত্র সংঘর্ষ ও নারীর অবস্থা ঃ**

১. সশস্ত্র সংঘর্ষ ও জাতিগত যুদ্ধে নারীর অধিকতর নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি হয়,

২. সংঘর্ষ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা,

৩. আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার মিশনে নারী প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করা।

**৯.৬. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ঃ**

১. নারী শিক্ষা বৃদ্ধি, নারী পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সক্রিয় ও স্পষ্ট নীতি অনুসরণ করা,

২. আগামী দশ বছরে নিরক্ষরতা দূর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা, বিশেষত মেয়ে শিশু নারী সমাজের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া,

৩. বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা,

৪. মেয়েদের জন্য দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা,

৫. টেকসই উন্নয়ন ও অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে নারীর জন্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ এবং শক্তিশালী করা,

৬. শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও মেয়েশিশুর সমান অধিকার নিশ্চিত করা, শিক্ষার সকল পর্যায়ে অসমতা দূর করা, শিক্ষাকে সর্বজনীন করা, ভর্তির হার বৃদ্ধিসহ নিরক্ষরতা দূর করা এবং মেয়েশিশুকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা,

৭. জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সকল স্তরের পাঠ্যক্রমে নারী পুরুষ সমতা প্রেক্ষিতে সংযোজন করা,

৮. নারীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল প্রশিক্ষণে নারীকে সমান সুযোগ দেয়া,

৯. নারী ও মেয়েশিশুর প্রতি দৃষ্টি রেখে বিদ্যমান নীতিসমূহের খাতওয়ারী সময় ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা,

১০. কারিগরী প্রযুক্তিগত ও উচ্চশিক্ষাসহ সকল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

**৯.৭. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ঃ**

১. ক্রীড়াক্ষেত্রে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা,

২. স্থানীয় পর্যায়ে নারীর জন্য পৃথক ক্রীড়া কমপ্লেক্স গড়ে তোলা,

৩. সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা,

৪. নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণে নারীকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা করা।

**৯.৮. জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকাণ্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ ঃ**

১. অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নারী পুরুষের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য দূর করা,

২. অর্থনৈতিক নীতি (বাণিজ্যনীতি, মুদ্রানীতি, করনীতি প্রভৃতি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা,

৩. নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে ও কর্মসূচিতে নারীর চাহিদা ও স্বার্থ বিবেচনায় রাখা,

৪. সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োগে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার লক্ষ্যে নারীর অনুকূলে নিরাপত্তার জাল গড়ে তোলা,

৫. সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেখা,

৬. শিক্ষা পাঠ্যক্রম, বিভিন্ন পুস্তকাদিতে নারীর অবমূল্যায়ন দূরীভূত করা এবং নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা,

৭. নারী পুরুষ শ্রমিকদের সমান মজুরী ও কর্মস্থলে নিরাপত্তা প্রদান এবং চাকুরির ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা,

৮. নারীর অংশগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে আর্থসামাজিক উন্নয়নে নারীর অবদানের স্বীকৃতি দেয়া,

৯. জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান প্রতিফলনের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ সকল প্রতিষ্ঠানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা,

১০. সরকারের জাতীয় হিসাবসমূহে গার্হস্থ্য শ্রমসহ সকল নারী শ্রমের সঠিক প্রতিফলন নিশ্চিত করা,

১১. নারী যেখানে অধিক সংখ্যায় কর্মরত আছেন সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা, বাসস্থান, বিশ্রামাগার, পৃথক প্রক্ষালণকক্ষ এবং দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

**৯.৯. নারীর দারিদ্য দূরীকরণ ঃ**

১. দরিদ্র নারী শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিকলেপ তাদের সংগঠিত করে ও প্রশিক্ষণ দিয়ে নতুন এবং বিকল্প অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সৃষ্টি করা।

২. দরিদ্র্য নারীকে উৎপাদনশীল কর্মে এবং অর্থনৈতিক মূলধারায় সম্পৃক্ত করা।

৩. অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ নারীর সকল চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।

৪. জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা দান ও অনুপ্রাণিত করা।

**৯.১০. নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ঃ**

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরী বিষয়াদি যথা-স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, তথ্য, উপার্জনের সুযোগ, সম্পদ, ঋণ, প্রযুক্তি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে নারীর সমান সুযোগ এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়া এবং সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা।

**৯.১১. নারীর কর্মসংস্থান ঃ**

(১) শিক্ষিত ও নিরক্ষও উভয় শ্রেণীর নারীর জন্য কর্মসংস্থানের সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(২) চাকরির ক্ষেত্রে নারীর নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবেশ পর্যায়সহ সকল ক্ষেত্রে কোটা বৃদ্ধি এবং কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

(৩) সকল নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে সরকার অনুসৃত কোটা ও কর্মসংস্থান নীতির আওতায় চাকরির ক্ষেত্রে নারীকে সকল প্রকার সমসুযোগ প্রদানের জন্য উন্নয়ন করা।

(৪) নারীর উদ্যোক্তা, শ্রেণী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণ করা।

(৫) নারীর বর্ধিত হারে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ, অবস্থান ও অগ্রসর সমতা বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিবেশ গড়ে তোলা।

(৬) নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধি ও নীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার করা।

(৭) বিদেশে শ্রম বাজাওে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

**৯.১২. সহায়ক সেবা ঃ**

সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সহায়ক সেবা যেমন- শিশু যত্ন, সুবিধা, কর্মস্থলে শিশু দিবাযত্ন পরিচর্যা কেন্দ্র বৃদ্ধি, অক্ষম, প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ, অসহায়, নারীদের জন্য গৃহায়ণ, বৃদ্ধশ্রম স্থাপন, স্বাস্থ্য বিনোদনের ব্যবস্থা প্রবর্তন, সম্প্রসার এবং উন্নীত করা।

**৯.১৩. নারী ও প্রযুক্তি ঃ**

(১) নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আমদানী ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।

(২) উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে নারীর স্বার্থ বিঘ্নিত হলে গবেষণার মাধ্যমে ঐ প্রযুক্তিতে নারীর প্রতি ক্ষতিকারক উপাদানমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(৩) প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারী স্বার্থের অনুকূল লক্ষ্য সমূহ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করা।

**৯.১৪. নারীর খাদ্য নিরাপত্তা ঃ**

(১) দুঃস্থ নারীর চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকারী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

(২) খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান ও বিতরণ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

**৯.১৫. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঃ**

(১) রাজনীতিতে অধিক হারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচার মাধ্যম সহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণের উদ্বুদ্ধ করা।

(২) নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচির বাস্তবায়ন করা।

(৩) নির্বাচনে অধিক হারে নারী প্রার্থীর মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা।

(৪) নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগের লক্ষ্যে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

(৫) জাতীয় সংসদের এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ ও সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়া।

(৬) জাতীয় সংসদে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি সহ অন্যান্য অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়া।

(৭) স্থানীয় সরকার পদ্ধিতির সকল পর্যায়ে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

(৮) সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ হারে মন্ত্রী পরিষদে এবং প্রশাসনের নীতি-নির্ধারনী পর্যায়ে প্রয়োজনে সংবিধানে সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা।

**৯.১৬. নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন ঃ**

(১) প্রশাসনিক কাঠামোর উচ্চ পর্যায়ে নারীর জন্য সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ সহজ করার লক্ষ্যে চুক্তিভিত্তিক এবং পার্শ্ব প্রবেশের ব্যবস্থা করা।

(২) বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোতে রাষ্ট্রদূত সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, পরিকল্পনা কমিশন ও বিচার বিভাগে উচ্চ পদে নারী নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(৩) জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখা ও অঙ্গ-সংগঠনের এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা প্রার্থী হিসাবে নারীকে নিয়োগ/মনোনয়ন দেয়া।

(৪) নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রবেশ পর্যায় সহ সকল পর্যায়ে গেজেটেড ও নন-গেজেটেড পদে কোটা বৃদ্ধি করা।

(৫) সকল ক্ষেত্রে নারীর জন্য নির্ধারিত কোটা পূরণ নিশ্চিতকরণ সহ কোটা পদ্ধতি চালু রাখা।

(৬) কোটার একই পদ্ধতি স্বায়ত্বশাসিত ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে যথাযথ অনুসরণ করা এবং বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহকেও নীতি অনুসরণের জন্য উৎসাহিত করা।

(৭) জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সরকারের নীতি-নির্ধারণী পদ সহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নারীর সম ও পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে প্রচলিত কোটা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা।

**৯.১৭. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ঃ**

(১) নারীর জীবন চক্রের সকল পর্যায়ে যথা- শৈশব, কৈশর, যৌবন, গর্ভকালীন সময় এবং বৃদ্ধ বয়সে পুষ্টি সর্বোচ্চ মানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করা।

(২) নারীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

(৩) প্রসূতি ও শিশু মৃত্যুর হার কমানো।

(৪) এইডস রোগ সহ সকল ঘাতক ব্যাধি প্রতিরোধ করা, বিশেষত: গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসহ নারীর স্বাস্থ্যসম্পর্কিত গবেষণা এবং স্বাস্থ্যতথ্যের প্রচার এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

(৫) নারীর পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

(৬) জনসংখ্যা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা।

(৭) বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় নারীর প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।

(৮) স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সকল সেবায় পরিকল্পনার বিবরণ ও সংরক্ষণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

(৯) নারীর স্বাস্থ্য, শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি, জন্মনিয়ন্ত্রণে সাহায্য, কর্মস্থলে মার কর্মক্ষমতা **বাড়ানো**, মাতৃবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মায়ের বুকের দুধের উপকারিতার পক্ষে যথাপোযুক্ত আইন প্রণয়ন করা।

(১০) মায়ের দুধ শিশুর অধিকার। এ অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাতৃত্বজনিত ছুটির মাস ভোগের জন্য আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। এছাড়াও শিশুর জন্মের পূর্বে ও পরে মাকে মাতৃত্বজনিত কারণে প্রয়োজনীয় ছুটি দেয়া।

**৯.১৮. গৃহায়ণ ও আশ্রম ঃ**

(১) পল্লী ও শহর এলাকায় গৃহায়ন ও পরিকল্পনা ও আশ্রয় ব্যবস্থা নারীর প্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্ত করা।

(২) একক নারী, নারী প্রধান পরিবার, শ্রমজীবি ও পেশাজীবি নারী, শিক্ষানবিশ ও প্রশিক্ষণার্থী নারীর জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ গৃহ ও আবাসন সুবিধা প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।

(৩) নারীর জন্য বিশেষ সুবিধা যেমন- হোস্টেল, ডরমেটরী, বয়স্কদের আশ্রয়কেন্দ্র, স্বল্পকালীন আবাসস্থলের ব্যবস্থা করা এবং গৃহায়ণ ও নগরায়ন দারিদ্র্য-দুস্থ ও শ্রমজীবির জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা।

(৪) সরকারী বাসস্থান বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিম্নবেতনভুক্ত নারী কর্মচারীদের সকল স্তরের নারীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা।

**৯.১৯. নারী ও পরিবেশ ঃ**

(১) প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশের নিরাপত্তা নারীর অগ্রসর স্বীকার করে পরিবেশ সংরক্ষণের নীতি ও কর্মসূচিতে নারীর সমান অংশগ্রহেণের সুযোগ ও নারী প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।

(২) পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

(৩) নারী অঙ্গন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্থ নারী ও শিশু পুনর্বাসন করা।

(৪) কৃষি, মৎস, গবাদি পশু পালন ও বনায়নে নারীকে উৎসাহিত করা ও সমান সুযোগ দেয়া।

**৯.২০. নারী ও গণমাধ্যম ঃ**

(১) গণমাধ্যমে নারীর সঠিক ভূমিকা প্রচার, প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং অংশগ্রহণে বৈষম্য দূর করা, গণমাধ্যমে নারী ও মেয়ে শিশুর অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি এবং নারী ও মেয়ে শিশুর ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটানো।

(২) নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক, সনাতনী প্রতিফলন এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে প্রচার ব্যবস্থা করা।

(৩) বিভিন্ন গণমাধ্যমে ব্যবস্থাপনা ও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে নারীর জন্য সমান সুযোগ রাখা।

(৪) প্রচার মাধ্যম নীতিমালা জেন্ডার প্রেক্ষিতে অন্তর্ভুক্ত করা।

(৫) উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে আইন, প্রচারনীতি, নির্বাচন বিধি ও আচরণ বিধি প্রণয়ন করা।

**৯.২১. বিশেষ দুদর্শাগ্রস্থ নারী ঃ**

(১) নারীর অবস্থানের বিভিন্নতা বিবেচনায় প্রতিবন্ধী নারী সহ বিশেষভাবে দুদর্শাগ্রস্থ নারীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাদেরকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের জন্য পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ করা।

**৯.২২. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন কৌশল ঃ**

**প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কৌশল ঃ**

নারী উন্নয়ন ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব সরকারের, একটি সুসংগঠিত ও সুবিন্যস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ার মাধ্যমে এ দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। নারী উন্নয়নের বিষয়টি যেহেতু Cross Cutting তাই এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে বিভিন্ন সেক্টরে সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। সরকারি বেসরকারি সকল পর্যায়ের কর্মকান্ডে নারী উন্নয়ন প্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে প্রচেষ্টা নেয়ার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

**ক. জাতীয় পর্যায় ঃ**

**১. নারী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ঃ**

নারীর সমতা, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীয় অবকাঠামো, যেমন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর মনিটরিং ক্যাপাসিটিসহ প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী করা হবে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এ সব প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামো বিস্তৃত করা হবে। নারীর উন্নয়নের যাবতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য এ প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। জাতীয় মহিলা সংস্থা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর কেন্দ্রীয়, জেলা, উপজেলা কার্যালয়সমূহকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করা হবে।

**২. জাতীয় মহিলা উন্নয়ন পরিষদ ঃ**

নারী উন্নয়ন নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনার জন্য 'জাতীয় মহিলা উন্নয়ন পরিষদ' গঠন করা হয়েছে।

**৩. সংসদীয় কমিটি ঃ**

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গঠিত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি নারী উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা করে নারীর অগ্রগতির লক্ষ্যে সরকারকে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবে।

**৪. নারী উন্নয়ন ফোকাল পয়েন্ট ঃ**

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির আলোকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। উক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ফোকাল পয়েন্টগণ গৃহতি কার্যক্রমে যাতে জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত হয় সে বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। তাছাড়া তাদের বিভিন্ন প্রতিবেদন ও দলিলসমূহে জেন্ডার বিষয়ে সুস্পষ্ট ও পর্যাপ্ত তথ্য সন্নিবেশের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ফোকাল পয়েন্টগণের কার্যকরী ভূমিকা পালনের জন্য ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহে যুগ্ম-সচিব/যুগ্ম-প্রধনি পদ মর্যাদাসম্পন্ন কর্তকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে ইতোমধ্যে মনোনীত করা হয়েছে।

**৫. নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি ঃ**

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রীকে সভাপতি এবং নারী উন্নয়নে চিহ্নিত মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট ও সরকারি বেসরকারি নারী উন্নয়নমূলক সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি নারী উন্নয়ন সম্পর্কীয় কর্মসূচি পর্যালোচনা, সমন্বয় ও মূল্যায়ন করবে। কমিটি মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সদস্য চিহ্নিত করে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করবে।

**খ. জেলা ও উপজেলা পর্যায় ঃ**

জেলা এবং উপজেলা প্রশাসন নারীর অগ্রগতি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জেলা পরিষদ, পৌরসভা, স্থানীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ও এনজিওদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করবে। তাছাড়া মাসিক সমন্বয় সভায় দাবী উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।

**গ. তৃণমূল পর্যায় ঃ**

তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম ও ইউনিয়নে নারীকে স্বাবলম্বী দল হিসেবে সংগঠিত করা হবে। এ দলসমূহকে নিবন্ধীকৃত সংগঠন হিসেবে রূপ দেয়া হবে। সরকারি, বেসরকারি উৎস, ব্যাংক অন্যান্য আর্থিক সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ আহরণ করে এ সংগঠনগুলোর সাথে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনসমূহের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন।

**৯.২৩. নারী উন্নয়নে এনজিও এবং সামাজিক সংগঠনগুলোর সাথে সহযোগিতা ঃ**

প্রকৃত নারী উন্নয়ন একটি ব্যাপক কাজ। এ কাজে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় ঘটানোর প্রয়াস নেয়া হবে যাতে কওে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। বেসরকারি ও সামাজিক সংগঠনসমূহকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়া হবে ঃ

১. গ্রাম, উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ের সকল স্তরে নারীর ক্ষমতায়ন, অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালনকারী স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠনগুলোকে নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা হবে। নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২. সকল পর্যায়ে নারী উন্নয়ন, নারী অধিকার সংরক্ষণ, সচেতনতা সৃষ্টি, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, আইনগত সহায়তা দান এ জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নরত নারী সংগঠনসমূহকে শক্তিশালী করার জন্য সহায়তা প্রদান করা হবে। নারী উন্নয়ন, নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সর্বস্তরে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্ভাব্য সহযোগিতার যোগসূত্র গড়ে তোলাসহ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে চিন্তা ধারা, দক্ষতা ও তথ্যের আদান-প্রদান করা হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ, বৈঠক, কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে এ আদান-প্রদান চলবে।

**৯.২৪. নারী ও জেন্ডার সমতা বিষয়ক গবেষণা ঃ**

নারী উন্নয়ন ও সমতা বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হবে। সকল গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানকে নারী উন্নয়ন ক্ষমতায়ন এবং নারী ও শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনায় উৎসাহিত করা হবে। জেন্ডার ভিত্তিক পৃথক তথ্য/ উপাত্ত সংগ্রহ, সন্নিবেশ এবং নিয়মিত প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নারীর অবস্থান ও ভূমিকা সংক্রান্ত যেসব উপাত্তের অপ্রতুলতা রয়েছে সে বিষয়ে সকল সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস্ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহকারী অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহ উপাত্ত সংগ্রহ করবে এবং তা প্রতিফলনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জেন্ডার ভিত্তিক ডাটাবেজ গড়ে তুলবে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তর, করপোরেশন, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সকল কার্যের জন্য জেন্ডার ভিত্তিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা করবে। পৃথক জেন্ডার গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গড়ে তোলা হবে। সেখান থেকে নীতি নির্ধারকদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হবে।

**৯.২৫. নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ঃ**

ঢাকায় বিদ্যমান নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী কারণসহ বিভাগ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এসব কেন্দ্রে বিভিন্ন কারিগরি, বৃত্তিমূলক, নারী অধিকার এবং শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

**৯.২৬. কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে কৌশল ঃ**

১. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা এবং জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারি, বেসরকারি সংগঠন সমূহ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

২. সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার নিজ নিজ কর্মপরিকল্পনায় জেন্ডার প্রেক্ষিতেই প্রতিফলন ঘটানো হবে যাতে করে সকল খাতে নারী সুষম অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

৩. সকল কর্মপরিকল্পনায় ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়া হবে।

৪. মনিটরিং ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে সকল কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচির অগ্রগতির নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যালোচনা করা হবে।

৫. মন্ত্রণালয় বিভাগ, সংস্থার কর্মপরিকল্পনার ও কর্মসূচিতে নারী প্রেক্ষিত সঠিকভাবে প্রতিফলনের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নকারী কর্মকর্তাবৃন্দকে বিপিএটিসি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এ লক্ষ্যে পাঠ্যক্রমে ও কোর্সে জেন্ডার ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৬. নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। এ সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে (ক) আইনবিধি ও দলিলাদি থেকে নারীর মর্যাদাহানীকর বক্তব্য ও মন্তব্য অপসারণ, (খ) মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কার্যনির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, নীতি-নির্ধারক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দের সচেতনতা এবং (গ) নারী-পুরুষের সম্পর্ক, অধিকার ও নারী উন্নয়ন সম্পর্ক বিষয়াবলী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ ইত্যাদির বিষয়ের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

৭. সমাজের সকল স্তরের বিশেষভাবে প্রণীত এবং সুষ্ঠু অর্থায়নের ভিত্তিতে নারী বিষয়ে সংবেদনশীল কর্মসূচি নিয়মিত ভাবে পরিচালনা করা হবে। এ ব্যাপারে প্রশাসন বিশেষত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ এবং সরকারি-বেসরকারি সকল উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। নারীর প্রতি সংবেদনশীলতা বিষয়ক কর্মসূচি সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন ক্ষেত্রে সকল চলতি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে পর্যায়ক্রমে **সমাপ্তি** করা হবে।

৮. নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কর্মসূচির উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এ উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হবে। এই সব কর্মসূচিতে নারী উন্নয়ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, আইনগত পরামর্শ ও শিক্ষা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তথা মামলা পরিচালনা করা, মামলা পরিচালনার জন্য নিরাপদ আশ্রয় ও পুনর্বাসন, আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই ক্ষেত্রে একটি বিশেষ কৌশল হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল সহ অন্যান্য নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের কর্মপরিধিকে বিস্তৃত ও শক্তিশালী করা হবে।

**৯.২৭. আর্থিক ব্যবস্থা ঃ**

১. মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় তথা রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রক্রিয়া (জি আর বি) অনুসরণ করা হবে। এ জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যবহার নিশ্চিত করতে এর বাস্তবায়ন, মনিটরিং করার কাঠামো শক্তিশালী করা হবে।

২. তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদে ও জেলা পরিষদে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

৩. জাতীয় পর্যায়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে। নারী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মসূচি চিহ্নিত করে পর্যায়ক্রমে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ করা হবে।

৪. পরিকল্পনা কমিশন সকল খাতে বিশেষ করে শিক্ষা, শিল্প, গৃহায়ণ, পানি সম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য উপখাতে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক ভৌত ও আর্থিক সম্পদ নিশ্চিত করে অর্থ বরাদ্দ করবে।

৫. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক উৎস থেকে নতুন ও অতিরিক্ত আর্থিক সহযোগিতা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বাণিজ্যিক ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নারী ক্ষুদ্র ও মাঝারী নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

**৯.২৮. নারীর ক্ষমতায়ন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ঃ**

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা এবং অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা হবে।

*Dhaka University Institutional Repository*

## তথ্য নির্দেশিকা

১. গবেষক।

২. তাহসিনা আখতার, "মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট" বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৫, পৃ: ১৩৪-১৩৫।

৩. বিচারপতি দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বাংলাদেশের নারী সমাজের স্থিতি সত্ত্বা ও আইনগত অধিকার" মানবাধিকার ও উন্নয়ন সমীক্ষা হিউম্যানিষ্ট এ্যান্ড ইথিক্যাল এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাকা ১৯৯১, পৃ: ২৩-২৪।

৪. গবেষক।

৫. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ: ১২০-১২১।

*Dhaka University Institutional Repository*

## গ্রন্থপুঞ্জি


১. আব্দুল করিম- ইসলামী বিধানে নারী ও বর্তমান বিশ্বে নারী ঃ একটি তুলনামূলক আলোচনা

২. নাজমুন নাহার- নারীর অধিকার ও ইসলাম: বাংলাদেশের নারীর অবস্থান সম্পর্কিত একটি রাজনৈতিক পর্যালোচনা।

৩. আব্দুল খালেক: নারী, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮১।

৪. জালালুদ্দিন উমরী, সাইয়েদ: ইসলামী সমাজে নারী, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১।

৫. নারী নির্যাতনের রকমফের, পূর্বোক্ত ।

৬. নারী অধিকার, পূর্বোক্ত।

৭. মুহম্মদ আবু ইউসুফ- হবাংলাদেশের সমাজে ধর্মের ব্যবহার, অপব্যবহার, অসদ্ব্যবহার, অসদ্ব্যবহার (৯১-২০০১), ফাতওয়া একটি রাজনৈতিক সমাজ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ।

৮. ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১-১২।

৯. আব্দুল খালেক, নারী-দীনা পাবলিকেশন্স, ৯৩, মতিঝিল, ঢাকা, ।

১০. সাইয়েদ আবুল আলী মওদুদী, অনুবাদক আব্বাস আলী খান- পর্দা ও ইসলাম, আধুনিক প্রকাশীন, ঢাকা প্রথম সংস্করণ।

১১. আসমা জাহান হেমা- ইসলামের ছায়াতলে নারী , আল-এছহাক প্রকাশনী২/৩ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা,অক্টোবর, ২০০২ইং।

১২. ড. মুসতাফা আস সিবায়ী,অনুবাদক-আকরাম ফারুক-ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী,বাংলাদেশ ইসলামীক সেন্টার, ঢাকা।১ম সংস্করণঃ ১৯৯৮।

১৩. ইসলামী সমাজে নারী, অনুবাদক, মোহাম্মদ মজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী সংস্থা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭।

১৪. ড. ক্যাপ্টেন আবদুল বাসেত, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩।

১৫. রমেশচন্দ্র মুন্সী, শ্রীঃ ধর্মতত্ত্ব পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, এ.মুখার্জী এন্ড কোং, কোলকাতা, ১৯৭৩।

১৬. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা, নারীর অধিকার ও মর্যাদা, ঢাকা: আসা রাফিয়া বইঘর, ১৯৯৫।

১৭. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদশ, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ-৬২। ড. আলøামা জামাল আল বাদাভী, ইসলামিক টিচিং কোর্স, ৩য় খন্ড, অনুবাদঃ আবু খালদুন আল মাহমুদ, ইসলামের সামাজিক বিধান, ঢাকাঃ দি পাইও নিয়ার, ১৯৯৯।

১৮. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী- ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, ঢাকা: আর আই এস পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫।

১৯. মোঃ আবু বকর সিদ্দিক-নারী ও শিশুর মনবাধিকার বিষয়ে ইসলাম এবং বাংলাদেশের (১৯৭২-২০০০) পরিস্থিতি: একটি পর্যালোচনা।

২০. ড. মাহবুবা রহমান, কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫।

২১. মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী, মহানবী (স:) এর পারিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা, ঢাকা ঃ ফরদাবাদী মহল, ১৯৯৫, আলøামা আবদুল কাইউম নদভী, ইসলাম আওর আওরাত, লাহোরঃ ইদারায়ে ইসলামিয়া, তা.বি. ।

২২. আবদুল খলেক, প্রাগুক্ত।

২৩. ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, প্রাগুক্ত।

২৪. ড. মাহবুবা, প্রাগুক্ত, ।

২৫. আসমা জাহান হেমা, প্রাগুক্ত।

২৬. মাওলানা ইসহাক ওবায়দী, যুগে যুগে নারী, শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৬।

২৭. মুফতী আব্দুলøাহ ফারুক-ইসলাম রমনীর মাল, আলফারুক প্রকাশনী, ১৯৯৮।

২৮. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, দেববানী, দ্রষ্টব্য।

২৯. আল কুর আনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৬ঃ ৫৮-৫৯।

৩০. সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ-২৬।

৩১. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী- ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, ঢাকা: আর আই এস পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫।

৩২. মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, ইসলাম মানবাধিকার, আনু মোহাম্মদ।

৩৩. অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, সাংবিধানিক আইন,(জলিল ল'বুক সেন্টার, ঢাকা, ৪র্থ সংস্করণ (২০০২), পৃ-৬৬।

৩৪. শহীদ আয়াতুল্লাহ ড. মুর্তাজা মোতাহহারি, নিযামে হুকুকেযনদর ইসলাম, আলহুদা আন্তর্জাতিক সংস্থা, ঢাকা ঃ ২০০৭।

৩৫. গাজী শামসুর রহমান, প্রগুক্ত, পৃ-ভূমিকা।

৩৬. অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, প্রগুক্ত, পৃ-৬৭ ।

৩৭. গাজী শামসুর রহমান, 'মানবাধিকার ভাষ্য', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ-৯১০।

৩৮. শহীদ আয়াতুল্লাহ ড. মুর্তাজা মোতাহহারি, নিযামে হুকুকেযনদর ইসলাম, আলহুদা আন্তর্জাতিক সংস্থা, ঢাকা ঃ ২০০৭।

৩৯. মুহাম্মদ গোলাম মুস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৫-১১৬।

৪০. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ-২২।

৪১. আবুল কাশেম, 'মানবাধিকার সংরক্ষন বাস্তবায়নে মানবাধিকার কর্মীর ভূমিকা', বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯০।

৪২. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মোস্তফা চরিত্র, ৪র্থ সংস্কারণ, ঢাকা।

৪৩. ড. এ.বি.এম. মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী, প্রাগুক্ত ।

৪৪. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজকল্যাণ, রোহেল পাবলিকেশনস, ঢাকা, ২০০৫।

৪৫. আব্দুল মালেক, নারী ও সমাজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪।

৪৬. হজ্জোতুল ইসলাম মোহাম্মদ তাকী মেসবাহ, প্রাগুক্ত।

৪৭. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা ঃ ৪৪ বর্ষ; ৩য় সংখ্যা।

৪৮. ইসলামে নারীর মর্যাদা ও কর্তব্য, ইয়াসমিন নূর; পৃ: ২-১৪৬।

৪৯. মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন জিহাদী, ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা,

৫০. আবুল ফেদা ইসমাইল বিন উমর বিন কাছির, তাফসীরুল কোরআন ও আযীম, দারুততাইয়্যিবা লিননাশরি তাওযি, মক্কা,সৌদিআরবঃ ১৪২০-খ.২ ।

৫১. মোঃ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, সহিহুল বুখারী, মাসকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি.খ ১৬, আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, সহিহ মুসলিম, মাসকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব, তা.বি.খ. ৭।

৫২. ইউ.এ.বি. রাজিয়া আক্তার বানু, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৩।

৫৩. সহী বুখারী, কিতাবুল নিকাহ, দ্রষ্টব্য রাজিয়া আক্তার বানু, প্রাগুক্ত।

৫৪. মুহাম্মদ তাহের হোসেন, ইসলামে নারী, হৃদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০০, ঢাকা, ।

৫৫. আল হাদীস, বুখারী ও মুসলিম, মোঃ আতাউর রহমান, প্রাগুক্ত।

৫৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, অনুচ্ছেদ-৬(১)।

৫৭. সিডো কমিটির চতুর্থ প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ-২, পৃ-৩৭।

৫৮. সৈয়দা রহমান মালকানী বনাম বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য আবেদনকারীর পক্ষে ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম, ড. নরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত।

৫৯. নারীর আইনী অধিকার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, জুন ২০০০।

৬০. রেহনুমা আহমেদ, 'ধর্মীয় মতাদর্শ ও বাংলাদেশে নারী আন্দোলন', বাংলাদেশ নারী নির্যাতন, প্রাগুক্ত, দ্রষ্টব্য।

৬১. শহিদ আয়াতুল্লাহ্ ড. মুর্তাজা মোতাহ্হারি, নারীর অধিকার, আলহুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৭ ।

৬২. তাহসিনা আখতার, "মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট" বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৫, পৃ: ১৩৪-১৩৫।

৬৩. বিচারপতি দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বাংলাদেশের নারী সমাজের স্থিতি সত্ত্বা ও আইনগত অধিকার" মানবাধিকার ও উন্নয়ন সমীক্ষা হিউম্যানিষ্ট এ্যান্ড ইথিক্যাল এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাকা ১৯৯১।

৬৪. প্রথম আলো, সংখ্যা-১২৩, ৮ই মার্চ,২০১৪।

৬৫. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান-সরল রীতির কোরআন শরীফ ,১ম খন্ড, জুলা ,২০০৯,রিয়াদ প্রকাশনী ।

৬৬. *সুরাইয়া বেগম, নারী নির্যাতনের একটি দিক, বাংলাদেশে নারী নির্যাতন, সম্পাদক বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও জেরিনা রহমান খান) সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭।

৬৭. * ইসলাম ও নারীর সামাজিক অধিকার, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৯শে জুলাই ২০০৫, ঢাকা ।

৬৮. * আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইবনু শু'আইব আন-নাসাঈ; সুনানুন নাসাঈ, দিলøী, কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ; ১৪১০ হিজরী।

৬৯. *আবু দাউদ, সুলায়মান ইবনুল আশআস, সুনান, ১ম খন্ড, কিতাবুত তালাক, দিলøী, মাকতাবা রাশীদিয়া, প্রা. বি. ।

৭০. * আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইবনু শু'আইব আন-নাসাঈ; সুনানুন নাসাঈ, দিলøী, কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ; ১৪১০ হিজরী।

৭১. * সমাজ নিরীক্ষণ, আগষ্ট ২০০০, কলাভবন, ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত: ।

৭২. * সৈয়দ রওশন কাদের, পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনে মহিলা কমিশনারদের ভূমিকা, ক্ষমতায়ন, সংখ্যা ১, ১৯৯৬, ইউমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ।

৭৩. * ইমাম আল জাসসাসশ (অনু: মাওলানা আবদুর রহীম), আহকামুল কুরআন, ২য় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৫।

৭৪. * মাসিক মদীনা, জুন ২০০২: সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা ৫৫/বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০,পৃ৪১।

৭৫. * সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, গবেষণা বিভাগ, জুন, ২০০১, ।

৭৬. * আবু মুহাম্মদ আব্দুলøাহ ইবনে আবদুল রহমান আল দারেমন, সুনানুদ দারেশী, ১ম খন্ড, করাচীঃ কাদীমী কুতুবখানা, তা.বি.পৃ-১৪/ড. মাহবুবা, প্রাগুক্ত।

৭৭. * আবু দাউদ, সুলায়মান ইবনুল আশআস, সুনান, ১ম খন্ড, কিতাবুত তালাক, দিলøী, মাকতাবা রাশীদিয়া, প্রা. বি. ।

৭৮. * আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ বিন মুসা আল আইনি, উমদাতুল কারি শরহে সহিহুল বুখারী, (আইনী) মুলতাফা উরুদে মান মুলতাকা আহলে হাদীস, মাসকাউল ইসলাম, মদীনা, সৌদিআরব: ২০০৬, খ. ২৯।

৭৯. Islam : A Challege to Religion- G. A. Parvez, Lahore, Pakistan, 1968, P-344।

৮০. Elen Suthar, Village women's at work in women's for women's Dhaka University Press-1975.

৮১. Hummudah Abdalati, Islam in Fucus, Al-Madina Printing and pablication, Jeddah-1973.

৮২. UNICEF Report of a peasibility survey of productive in come severating Activities for means as Bangladesh Development programme, Dhaka-1977.

৮৩. Ruth in Ansion (SM): Family : Its Runction and Desuing Newyourk, Harpar and Brather's 1989, P.58-79.

৮৪. Thamas Arnald: The Prencher of Islam, London, Constable,co-1993, P-8.

৮৫. Encyclopedia Britanicac; 11th ed. 1911 vol-28, p-782.

৮৬. Quotaed in Mace,Dovid and evra, Marriage:East and West Dolphin Books, Double day and co. Lne Ng. D60।

৮৭. Encyclopedia Britanicac, vol-19, 1974।

৮৮. Allen, E.A. History of civilisation, vol-3।

৮৯. Nazhat Afza and Khurshid Ahmed: The position of women in Islam, Islamic Book Publishers, Kuwait 1982, ।

৯০. Husain Al-Shaikh, Studies in the Greek and Romans civilization ।

৯১. Arab civilization by Dr. G.Lebon ।

৯২. Said Abdullah Seif Al-Hatimy: Women in Islam, Islamic Publication Ltd. Lahore, Pakistan, Oct, 1979, p-2-3 ।

৯৩. Ramesh Chandra Mazumdarv op.cit. p- 19.

৯৪. Professor Indra; Statues of Women in Mahbharat, p-16.

৯৫. Thouless, R.H: Introduction to the psychology of Religion, Cambridge University, London, 1923.

৯৬. Rewben Lady, The Social strueture of Islam, London, Cambrize University Press, 1971, P-91-92.

৯৭. Rustum and Zurayk : History of the Arab's and Arabic Culture, Beirut, 1940, P-36.

৯৮. Said Abdullah Seif Al-Hatimy, Ibid, P-15.

৯৯. Jhomas,Berfram-O' Leary D Lacy : Arabia Before Muhammad,London, 1927, P-191,The Arabs,London, 1937.

১০০. Robartson Smith : Kinship and Marrage in Early Arabla (Cambrize University Press, 1903.

১০১. Pospishil, Victor : Divorce and Marriage, London, P-49.

১০২. Klansner, Joseph : From Jesus to Paul, London, 1964, P-571-572.

১০৩. Bible, Mark-10 : 11-12.

১০৪. Pospishil, victor : op.cit. P- 38.

১০৫. Dr. G. Iebon, Arab Civilization, P-406.

১০৬ The Jewish Encyclopaedia, Vol.XII.P-556.

১০৭. Philip Hitti, History of the Arabs, London, Sent Martin Press, 1951, P-28.

১০৮. The New Encyclopedia Britannica Founded 1968, 15th edition, printed in USA, vols, p-200 ।

১০৯. Encylopedia of social work, NASW press, washington, D.C, vol.2, 1995, p.1406.

১১০. F.K.M.Munim, Rights of the citizen under constitution and law', Bangladesh Institute of law and International Affairs Dhaka, 1975.

১১১. Abdel Rahim Umran, Family Planing in the legacy of Islam, New Yourk and London, 1992.

১১২. Hummudah Abdalati, op-cit, p-319.

১১৩. Asaf A Fayzee- Outlines of Muhammadan Law.